স্মারক

জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন ২০০২

জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ

স্মারক

জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন ২০০২

সম্পাদক

সরদার ফরিদ আহমদ

জাকির আবু জাফর

ওমর বিশ্বাস

জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ

www.pathagar.com

স্মারক
জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন ২০০২

প্রকাশক
জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ
৫/৫, গজনভী রোড, কলেজ গেইট
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১২৮৬২১

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০০২

প্রচ্ছদ
মোবাশ্বির মজুমদার

কমপিউটার কম্পোজ
সফটেক কমপিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫-এ/২, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ
আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭

দাম
দুইশ টাকা

Sarok
Jatio Sanskritik Sammelon 2002, Edited by Sarder Farid Ahmad, Zakir Abu Zafar, Omar Biswas. Published by Jatiya Sanskritic Porisad, 5/5, Gajnavi Road, College Gate, Mohammadpur, Dhaka-1207, Phone : 9128621.
Price : Tk.200.00 (US$10)

www.pathagar.com

স্মারক প্রসঙ্গ

১. সংস্কৃতি মূলত বিশ্বাসেরই প্রতিরূপ। সংস্কৃতি আইনের চেয়েও গভীর এবং শক্তিশালী। আইন বদলানো যায়, সংস্কৃতি বদলানো সহজ নয়। প্রতিটি জাতি তার সংস্কৃতিকে লালন করে। ধরে রাখার অব্যাহত চেষ্টায় থাকে। কোনটা সংস্কৃতি আর কোনটা সংস্কৃতি নয়- এই নিয়ে আমরা অযথা বিতর্ক করি। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্য কল্যাণকর সবকিছুই সংস্কৃতির অংশ। তবে আমাদের মৌলিক বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে সেটাকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

২. বর্তমান বিশ্বে রাজনীতি, অর্থনীতি ও মিডিয়াকে সংস্কৃতির মূল নিয়ন্ত্রক হিসেবে ধরা হচ্ছে। শেষের দুটি ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা ভালো নয়। বিশেষ করে মিডিয়ায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। অপসংস্কৃতিকে প্রতিহত করতে হলে এসব দুর্বলতা আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে। স্বনির্ভর হতে হবে। স্পষ্ট করে বলা যায়- সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকতে হলে সংস্কৃতিকে যে সব ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করে সেসব ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান সুদৃঢ় করতেই হবে।

৩. সংস্কৃতির নামে পণ্য হিসেবে যা বিক্রি করা হচ্ছে তার অধিকাংশই অপসংস্কৃতি। সুন্দরী প্রতিযোগিতাকে যারা সংস্কৃতি বলে চালাতে চায়- তারা কেবল সংস্কৃতিরই শত্রু নয়, মানবজাতিরও শত্রু। কারণ এখানে নারীকে মানুষ নয়, স্রেফ পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এরকম অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। পাশ্চাত্যে সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতি সবকিছুকেই পণ্য হিসেবে ধরা হয়। সেখানে তো মানুষও পণ্য। আমরা কি সংস্কৃতিকে পণ্য হিসেবে নেবো? কিংবা সংস্কৃতি কি আদৌ কোনো পণ্য? বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর উত্তর হ্যাঁ এবং না দুটোই। আযানের শব্দ শুনে আমাদের দেশের মেয়েরা মাথায় কাপড় তুলে দেয়- এটা সংস্কৃতি। এখানে পণ্যের বিষয়টি একেবারেই অনুপস্থিত। আবার গান সংস্কৃতির একটি প্রভাবশালী বিষয়। গান গেয়ে অর্থও উপার্জন হয়। এই হিসেবে এটি পণ্যও বটে। তাহলে? এই বিষয়টি নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও চিন্তার সুযোগ রয়েছে বলে আমরা মনে করি।

৪. বাংলা বানান নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। আমরা সেই বিতর্কে যেতে চাইনি। লেখক যেভাবে লিখেছেন আমরা তাই রেখে দিয়েছি।

৫. বাংলাদেশে এই ধরনের সাংস্কৃতিক সম্মেলন নিকট অতীতে হয়নি। একেবারে সংস্কৃতি কেন্দ্রিক এই ধরনের স্মারকও খুব একটা নেই। এবারের এই আয়োজন নিশ্চয় একটি ইতিহাসকে ধারণ করবে। আমরা আশা করছি, এই সম্মেলন এবং এই স্মারক আমাদের ভবিষ্যত বংশধরকে এ ক্ষেত্রে আরো বড় কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা
জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন ২০০২ # ৫
অতিথিদের ভাষণ
বাংলাদেশ বর্ডারের ভিত্তি ইসলাম ও মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ ॥ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী # ৯, বিসমিল্লাহ্ বলে কাজ শুরু করাটাই আমাদের সংস্কৃতি ॥ ড. ওসমান ফারুক # ১২, আমাদের শিকড় অনেক গভীরে ॥ আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ # ১৫, ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা প্রকৃতপক্ষে আগ্রাসনবাদী ও আধিপত্যবাদী ॥ আল মাহমুদ # ১৬, রাষ্ট্র ও ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার আন্দোলন শুরু করতে চাই ॥ মীর কাসেম আলী # ১৮, জোর করে বাঙালী সংস্কৃতি আনা যাবে না ॥ প্রফেসর মোহাম্মদ ইউসুফ আলী # ১৯, আল কোরআনকে আঁকড়ে ধরতে হবে ॥ মুস্তফা জামান আব্বাসী # ২১, আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবেই অগ্রসর হতে হবে ॥ প্রফেসর ড. আবদুস সাত্তার # ২৩, আমাদের সামনে মডেল নেই ॥ আবুল আসাদ # ২৫, সংস্কৃতি জাতির বিশ্বাসের প্রতিফলন ॥ তাসনীম আলম # ২৭, রাজনীতি ও সংস্কৃতি পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ॥ বাবুল আহমদ # ২৯, একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক বোমা তৈরি করতে চাই ॥ ফিরোজ খান নুন # ৩১, সাংস্কৃতিক কর্মী মানে একজন পরিপূর্ণ মানুষ ॥ সাইফুল্লাহ মানছুর # ৩২, সংস্কৃতি আইনের চেয়ে শক্তিশালী ॥ শাহ আবদুল হান্নান # ৩৩
প্রবন্ধ
মুসলিম সংস্কৃতিচর্চা ॥ কাজী নজরুল ইসলাম # ৩৭, সংস্কৃতির মর্মকথা ॥ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী # ৪২, কালচার কি ॥ আবুল মনসুর আহমদ # ৫৬, ভারতীয় সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান ॥ ড. মুহম্মদ এনামুল হক # ৭২ , ইসলামী সংস্কৃতি ॥ ড. হাসান জামান # ৮১, ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ॥ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম # ৯০, বুদ্ধিবৃত্তি স্বনির্ভরতা অর্জন বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব ॥ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী # ১১২, ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা ॥ মোহাম্মদ মার্মেডিউক পিকথল # ১২৪, ইসলামী সংস্কৃতি ॥ হাসান আইউবী # ১৩৯, সাংস্কৃতিক দাসত্ব রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন নয় ॥ মরিয়ম জামিলা # ১৫০, সংস্কৃতি ও ইতিহাস ॥ আলিয়া আলি ইজেতবেগভিচ # ১৫৫, আমরা ও আমাদের নাটক ॥ আরিফুল হক # ১৭৫, সাংস্কৃতিক ভাবনার নানা প্রসঙ্গ ॥ মাসুদ মজুমদার # ১৮৩, সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতি ॥ মতিউর রহমান মল্লিক # ১৯৩, সংস্কৃতি ও ক্যালিগ্রাফি ॥ ইব্রাহীম মণ্ডল # ২১৩, ইকবাল দর্শনে সংস্কৃতি ॥ ড. আবদুল ওয়াহিদ # ২১৯, মিডিয়া : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ॥ সরদার ফরিদ আহমদ # ২২৩, বাংলাদেশের চলমান বিনোদন সংস্কৃতি ॥ রফিক মুহাম্মদ # ২৩৮, বিশ্বব্যাপী মুসলিম বিরোধী আগ্রাসন ও প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা ॥ মোস্তফা খালেদ, মেহেদী পারভেজ, ইসমাঈল শহীদ # ২৪৮
রিপোর্ট : জাতীয় সংস্কৃতি কমিশন ১৯৮৯
বাংলাদেশের সংস্কৃতি # ২৯৪
সাক্ষাৎকার
একজন মুসলমানকে চলমান বিশ্ব সম্পর্কে জানতেই হবে ॥ ইউসুফ আল কারযাভী # ৩২৫
নাটক
ইশারা ॥ ফয়সাল বার্ক ও গোলাম রব্বানী তোতা # ৩৩৩
সম্মেলন সঙ্গীত
কথা ও সুর : আমিরুল মোমেনীন মানিক # ৩৪৯
সম্মেলনের বিভিন্ন কমিটি # ৩৫০
সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিল্পীগোষ্ঠী # ৩৫৯
মিডিয়ায় সম্মেলন ২০০২ # ৩৭৭
সম্মেলন আলোকচিত্র # ৩৮৩

www.pathagar.com

প্রস্তাবনা

জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন ২০০২

বাংলাদেশ নামের এই পাললিক জনপদ আর্যপূর্ব সুসভ্য মানবগোষ্ঠীর এক নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল ছিল। সেই দূর অতীত থেকে নিয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত আমাদের অস্তিত্বের সুরক্ষা, জাতিসত্ত্বার বিকাশ ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সংগ্রামে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়েছে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা। হাজার বছরের বহমান গণ-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত আমাদের অভিন্ন বোধ-বিশ্বাস, জীবন-চেতনা, আচরণ রীতি, স্বপ্ন-কল্পনা ও অভিন্ন প্রতিজ্ঞার ধারাবাহিকতা রচনা করেছে আমাদের জাতিসত্ত্বার সুদৃঢ় বুনিয়াদ। এর সুবিস্তৃত শিকড় ছড়িয়ে আছে আমাদের ঐতিহ্যের গভীর মর্মমূলে।

আর্য সংস্কৃতির আগ্রাসনের মোকাবেলায় জৈন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি জনগণের নেতৃত্বদানে ব্যর্থ ও পরাস্ত হলে এ জনপদবাসীর আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসে ইসলাম। মুক্তির সংগ্রামে একের পর এক সাফল্যের মঞ্জিল অতিক্রম করে উন্মুক্ত ও বিকশিত করে এই ইতিবাচক সংস্কৃতির ধারা।

এ ধারা হিংসাশ্রয়ী আর্য সংস্কৃতির বংশ-বর্ণের বিভেদপূর্ণ সামাজিক অচলায়তন গুড়িয়ে দিয়ে বিশ্বাসের আলোকে গড়ে তোলে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতির কুতুব মিনার। সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিকশিত এই উদার, মুক্ত, মানবিক সংস্কৃতি শুধু নিজের জন্য নয়, বিপরীত বিশ্বাসীদের জন্যও নিশ্চিত করে স্বাধীনতা ও কল্যাণ।

নদীমাতৃক আমাদের এই জনপদ কখনো সামরিকভাবে কারো বশ্যতা মানেনি। তবে কখনো কখনো সাংস্কৃতিক সীমানায় পাহারাদারীর দুর্বলতার কারণে শকুনীরা খামচে ধরেছে আমাদের শ্যামল মানচিত্র। অভিজ্ঞতা আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখতে হলে জাতির সাংস্কৃতিক সীমানাকে অবশ্যই সুরক্ষিত রাখতে হয়। দেশ গড়ার সাথে সমান্তরাল গতিতে এগিয়ে নিতে হয় জাতি গঠনের কাজকেও। আধুনিক কালেও সাংস্কৃতিক সীমান্তের গুরুত্ব মোটেও কমেনি, বরং বেড়েছে বহুগুণ। আমাদের বর্তমান সংগ্রাম আমাদের সাহসী, ত্যাগী ও সচেতন পূর্ব-পুরুষদের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামেরই এক আপোষহীন ধারাবাহিকতা। এই ধারাবাহিকতা সমুন্নত, বেগবান ও সমৃদ্ধ করার অপরিহার্য তাগিদেই সারা দেশের সাংস্কৃতিক কর্মীদের অভিন্ন চেতনা ধারণ করে এ সম্মেলন সকল দেশপ্রেমিক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের নিরঙ্কুশ ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত বর্তমান দেশপ্রেমিক সরকারের কাছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করছেঃ

১. ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক নীতিমালার ভিত্তিতে ১৯৮৮ সালের জাতীয় সাংস্কৃতিক কমিশনের রিপোর্টের আলোকে অনতিবিলম্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিশ্বাস ও চেতনার ধারক সাংস্কৃতিক নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

২. ক্ষয়িষ্ণু পাশ্চাত্য সভ্যতার আগ্রাসী থাবার টার্গেটে পরিণত হয়েছে আজ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশও। এ আগ্রাসন চলছে প্রধানত মিডিয়ার মাধ্যমে ও তথাকথিত সেবার নামে। সম্মেলন এ ব্যাপারে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, আলেম তথা সর্বস্তরের সচেতন জনগণকে ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাচ্ছে। বিশেষ করে এ সম্মেলন সরকারের কাছে জোর

www.pathagar.com

দাবি জানাচ্ছে, যুব চরিত্র ধ্বংসকারী স্যাটেলাইট মিডিয়াগুলোর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও তা কার্যকর করা হোক। অশ্লীলতা রোধকল্পে গ্রহণ করা হোক সামগ্রিক উদ্যোগ।

৩. বাংলাদেশে ভারতীয় বই, পত্র-পত্রিকা, টেক্সট বই এমনকি শিশুপাঠ্য বইও অবাধে অনুপ্রবেশ করছে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের প্রকাশনা শিল্প ও লেখক সমাজ। কিন্তু সমহারে বাংলাদেশী বই ভারতে প্রেরণের কোনো সুযোগ নেই। এর অবসানকল্পে স্বাধীন জাতির মর্যাদার অনুকূল সমতাভিত্তিক বিনিময় বাণিজ্য চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য এ সম্মেলন দেশপ্রেমিক সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছে। সম্মেলন আরো দাবি জানাচ্ছে, সাংস্কৃতিক বিনিময়ের নামে প্রতি বছর ডজন ডজন ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল এলেও এ দেশ থেকে সমহারে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল সেখানে প্রেরণ করা হয় না, যাদের প্রেরণ করা হয় তারাও সেখানে উপযুক্ত মর্যাদা পান না। এর অবসানকল্পে সরকারকে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

৪. ওআইসির সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে মুসলিম দেশগুলোর সাথে সাংস্কৃতিক বিনিময় জোরদার করার জন্য এ সম্মেলন জোর দাবি জানাচ্ছে। সম্মেলন মনে করে, তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে মুসলিম বিশ্বের সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের উদ্যোগী ও কার্যকর ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক বিনিময় ছাড়াও আন্তর্জাতিক ইসলামী রেডিও-টিভি নেটওয়ার্ক এবং বার্তা সংস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য এ সম্মেলন সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৫. দেশপ্রেমিক জনগণের চলমান ঐক্যকে সুসংহত ও সুদৃঢ় করার জন্য জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির সাংস্কৃতিক ঐক্য আজ সময়ের দাবি। অন্যথায় অতীতের ন্যায় রাজনৈতিক বিজয় বিপর্যয়ের মুখে পড়ার আশংকা থেকেই যাবে। এ সম্মেলন এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দের কার্যকরী ভূমিকা প্রত্যাশা করছে।

৬. সরকার পরিচালিত বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, প্রচার মাধ্যম, নানা কমিটি উপকমিটিতে দীর্ঘদিন ধরে চেপে বসে থাকা অপসংস্কৃতির ধারক-বাহকদের আধিপত্য এবং ত্রুটিপূর্ণ নীতিমালার কারণে গণমুখী সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। প্রতিশ্রুতিশীল দেশপ্রেমিক শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীগণ এখনো শিকার হচ্ছে বঞ্চনার। রেডিও-টিভিতে শোনা যায় না জনপ্রিয় হামদ, নাত, ইসলামী সঙ্গীত। এর প্রতিবিধানকল্পে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও সংস্কার সাধনের জন্য এ সম্মেলন জোর দাবি জানাচ্ছে।

৭. অপসংস্কৃতির দোসররা কেবল সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাই নয়, বিদেশী প্রভুদের মনোরঞ্জন করে ভোগ করছে অঢেল সুবিধা। জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী সাংস্কৃতিক কর্মীদের একমাত্র সম্বল দেশপ্রেমিক জনগণের ভালোবাসা। জাতীয় বোধ ও বিশ্বাসের আলোকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে তাই এ সম্মেলন জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী লেখক শিল্পীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছে। #

[জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন ২০০২-এর প্রস্তাবনা অনুষ্ঠানে পড়ে শোনান প্রস্তাবনা কমিটির উপদেষ্টা জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান]

www.pathagar.com

অতিথিদের ভাষণ

জাতীয় সাংস্কৃতিক
সম্মেলন-২০০২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশ বর্ডারের ভিত্তি ইসলাম ও মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

কৃষিমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলনের এই অনুষ্ঠানে আমাকে প্রধান অতিথি করে দাওয়াত দেয়া হলেও আমি কথা বলার উদ্দেশ্যে নয়, স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক অঙ্গনের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য থেকে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্যেই এখানে এসেছি।

আপনাদের সুন্দর সুন্দর কথাগুলো আমি হৃদয় দিয়ে উপলব্দি করার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ তায়ালা তৌফিক দিলে এর সফল বাস্তবায়ন কিভাবে হতে পারে সেজন্যে সাধ্যমতো চেষ্টা করার আশা রাখি।

সংস্কৃতির তাত্ত্বিক আলোচনায় আমি যেতে চাই না। সংস্কৃতি মূলত মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত লালিত বিশ্বাস, চিন্তা চেতনার বহিঃপ্রকাশ। এই বহিঃপ্রকাশ ঘটে কথার মাধ্যমে, কাজের মাধ্যমে, চাল-চলন, আচার ব্যবহারের মাধ্যমে, ব্যবহারিক জীবনের যাবতীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে। মানুষের মনে লালিত প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্বাস বা চিন্তা চেতনার ভিত্তি মৌলিকভাবে তিনটি। একটি ভিত্তি অহীলব্দ, নবী রসূলের মাধ্যমে আগত আল্লাহ প্রদত্ত আকীদা এবং বিশ্বাস। আর একটি ভিত্তি মানুষের কল্পনাপ্রসূত চিন্তা চেতনা। আল্লাহ প্রদত্ত নবী রসূল প্রদর্শিত আদর্শের মাধ্যমে মানুষের মনে যে আকীদা বিশ্বাস, যে চিন্তা চেতনা প্রতিষ্ঠিত হয় তার মৌল ভিত্তি তাওহীদ, রিসালত এবং আখিরাত। মৌলিক জিনিসটি হলো আখেরাতে বিশ্বাস। ধর্মীয় মহলে আখিরাত বিশ্বাসেরও আবার দুই ধরনের এপ্লিকেশন আছে। একটি হলো দুনিয়া বর্জনের মাধ্যমে আখেরাতের মুক্তি। এটা ইসলাম সম্মত বিশ্বাস নয়। আখেরাতে বিশ্বাসের মূল কথা মানুষ এই দুনিয়ায় সীমিত সময়ের জন্যে এসেছে, নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব পালনের জন্যে। আখেরাতে তার কাছে অগ্রাধিকার পাবে কিন্তু আখেরাতে পুরস্কৃত হতে হলে এই দুনিয়াকে ব্যবহার করতে হবে। ইসলাম দুনিয়াকে বর্জন করে নয়। দুনিয়াটাকে আল্লাহ তায়ালার মর্জি মোতাবেক পছন্দ মোতাবেক তাঁর প্রদত্ত বিধি মোতাবেক ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। আমাদেরকে আল্লাহর কাছে যে দোয়া ও মোনাজাত শেখানো হয়েছে তার মধ্যে যেমন আখেরাতের কল্যাণের কথা আছে তেমনি দুনিয়ারও কল্যাণের কথা আছে। দুনিয়াটা মানুষের জন্যে চূড়ান্ত জায়গা নয়। এই দুনিয়ায় মানুষ

www.pathagar.com

আল্লাহর খলিফা, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য থাকবে। এই দুনিয়া, দুনিয়ার সম্পদের সঠিক ব্যবহার করা, দুনিয়াটাকে সাজানো গোছানো দায়িত্ব মানুষের। এ দায়িত্ব তাকে পালন করতে হবে আল্লাহর দেয়া বিধানের উপর ভিত্তি করে। এর বিপরীত বিশ্বাসের মূল কথা এই দুনিয়ার জীবনটাই সবকিছু। যার ভিত্তিতে এই কথাটা বেরিয়ে আসে, "দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাও দাও আর ফুর্তি কর।"

দুনিয়াকে সর্বস্ব মনে করে মানুষ যে চিন্তা-চেতনা লালন করে আসছে দুনিয়াটাকে ভোগ করার লক্ষ্যে সেই চিন্তা চেতনা প্রসূত সংস্কৃতিই মূলতঃ অপসংস্কৃতি। অতএব সংস্কৃতিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি- একটি প্রকৃত সংস্কৃতি, যে সংস্কৃতি মানবতা, মনুষত্বের বিকাশকে বুঝায়। আর একটি অপসংস্কৃতি, যেটা মানুষের সমাজে পশুত্ব এবং বর্বরতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে।

যারা আজকে ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী এবং জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রতিনিধিত্ব করছেন সাংস্কৃতিক অঙ্গনে, তাদের অনেকে বেশ অসহায় মনে করেন। আমি এই বিষয়ে যে কথাটুকু বলতে চাই তা হলো, রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী এবং জাতীয়তাবাদী শক্তির পক্ষে যারা তাদের এতটা কষ্ট থাকার কথা নয়, এখানে ততটা জটিলতাও নেই। কেননা রাজনৈতিক অঙ্গনে সিট ভাগাভাগি নিয়ে জটিলতা হতে পারে, রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে দ্বন্দ্ব সংঘাত হতে পারে। আমার বিশ্বাস সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এই ধরনের কোনো স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা নেই। অতএব রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলামী মূল্যবোধ এবং ইসলামী জাতীয়তাবাদী শক্তির যে ঐক্য বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে অপরিহার্য, সেই ঐক্যকে সিমেন্টেজ করার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আপনারা যারা আছেন আপনারদের ঐক্য একটি যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আজকে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরও মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে কেন পারবেন না? এ পথে বাধা কোথায়? আমার মনে হয় একটু শক্ত হাতে ভর করে আপনারা মাথা তুলে দাঁড়ালে যে বাধাগুলোকে আপনারা কল্পনায় আনছেন সেই বাধাগুলো থাকার কথা নয়। আপনাদের যারা প্রতিপক্ষ সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছেন, পশ্চিমাদের শিখিয়ে দেয়া কিছু বুলি আউড়িয়ে তারা মৌলবাদের ধূয়া তুলছেন। আমার প্রিয় সহকর্মী (শিক্ষামন্ত্রী) বললেন তিনি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন। জোট সরকার সংস্কৃতিকে ধর্মায়ন করছেন। লক্ষ্য করলে দেখবেন, তারাও কিন্তু কথায় কথায় শেকড়ের কথা বলে। তাদের লেখাতেও দেখা যায় শেকড়ের সন্ধান শিরোনাম হয়ে আসে। শেকড়ের সাথে সম্পর্কের নামই তো মৌলবাদ। তারা শেকড় সন্ধান করতে গিয়ে মৌলবাদী হন না। আর আপনারা একটু আল্লাহ খোদার নাম নিলে, একটু বিসমিল্লাহ বললে মৌলবাদী হয়ে যাবেন, এই হীনমন্যতা বোধ আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে।

বাংলাদেশের বর্ডারের ভিত্তি ইসলাম, মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ। এই কথার সহজ স্বীকৃতি দিতে কারো মনে কোনো দ্বিধা সংকোচ থাকা উচিত নয়। এটাই আমাদের শেকড়। এই শেকড়ের সন্ধান আমাদের করতে হবে এবং আগামী প্রজন্মকে নতুন এই শেকড়ের সন্ধান দিতে হবে।

বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা পর্যায়ে মুসলিম জাতিসত্তার সংরক্ষণের তাগিদে মুসলিম মনীষীদের যখন যাত্রা শুরু হয় তখন ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির ধারক বাহকরা

www.pathagar.com

মুসলিম জাতিসত্তাকে বিলীন করার জন্যে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের শ্লোগান তুলেছিল। খুবই লক্ষ্য করার বিষয়, সাতচল্লিশের পর ওই একই গোষ্ঠীর মন্ত্রণায় প্রেরণায় বাঙালী জাতীয়তাবাদের শ্লোগানের জন্ম হয়েছে। আসলে এর সবকিছুর লক্ষ্যই হলো মুসলিম বিরোধিতা।

আমি অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে দেখেছি পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে যে সমস্ত কবি সাহিত্যিকদের ভাষায়, লেখায় তৌহিদের কথা, ঈমানের কথা আসতো, ঈমানদারের কথা আসতো, বেগম সুফিয়া কামালেরও একটি কবিতায় দেখেছিলাম "শক্ত মাটিতে ফসল ফলায় ঈমান যাদের খাঁটি"- কিন্তু হঠাৎ পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে ষাটের দশকে এসে তাদের ভাষা পাল্টে যায়। তাদের চিন্তা চেতনা পাল্টে যায়। বাঙালী জাতীয়তাবাদ ঠাঁয় করে নেয়। অবশ্য পঁচাত্তরের পট পরিবর্তনের পর শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেবের নেতৃত্বে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ মূলত বাংলাদেশের মুসলিম ক্যোরেকটারের ভিত্তি রচনা করে, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি অর্জন করে। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ বাঙালী জাতীয়তাবাদ থেকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পার্থক্য কোথায়, কিসের কারণে, এর দার্শনিক ভিত্তি কিন্তু এখনো জনসমক্ষে সেভাবে আসেনি, যেভাবে আসা উচিত ছিল।

আমি জাসাস নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করব এই কাজটি সঠিকভাবে করার জন্যে। আমি একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলাম বাঙালী জাতীয়তাবাদ আর ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে যদি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করা হয় তাহলে আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে এর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখি না।

আজকে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী যারা আছেন, তারা যদি বাঙালী জাতীয়তাবাদ এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এই দুইয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি, দুটোর বৈশিষ্ট্য কি, এটা যদি স্পষ্ট করতে পারেন তাহলে সেটা হবে একটা ঐতিহাসিক কাজ। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কথা বলেন, আমি এ ব্যাপার বিনয়ের সাথে বলতে চাই- আমরা যদি আমাদের নিজের আদর্শের প্রতি আস্থাশীল হই, আর এই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকি, তাহলে সারা দুনিয়ার সংস্কৃতির আনাগোনার পথে বাধা দেবার জন্য কোনো প্রাচীর তোলার প্রয়োজন নেই। ইসলাম তো সারা দুনিয়ার জন্য। সারা দুনিয়াকে প্রভাবিত করার জন্য। অতএব, আমাদের পায়ের তলার মাটি মজবুত করার জন্য আমি যদি আমার আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত না হই, আমি যদি আমার আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে আস্থাহীন না হই, তাহলে সারা দুনিয়ার অপসংস্কৃতিকে আমাদের ভয় পাবার কারণ নেই। হয়তো এখানেই দুর্বলতা আছে। এই দুর্বলতা যতক্ষণ আমরা কাটিয়ে উঠতে না পারছি ততক্ষণ ডিফেন্সিভ কিছু একটা করতেই হবে। তবে অফেন্সই হলো প্রকৃত ডিফেন্স। বলা হয় Offence is the best defence.

অতএব, মুসলমান যদি তার আদর্শের প্রচার প্রসারে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে তাহলে সংখ্যালঘু হয়েও সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর উপরে তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, আমাদের অতীত ইতিহাস এর সাক্ষী।

আমাদের সংস্কৃতির লালন করতে হলে শিক্ষা এবং ঐতিহ্য যে, সংস্কৃতির বাহন, সেদিকে নজর দিতে হবে। শিক্ষায় মৌলিক সংস্কারের প্রয়োজন আছে। আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এ ব্যাপারে সজাগ। তিনি পশ্চিমা দেশ ঘুরে এসেছেন। তার অভিজ্ঞতা এ ব্যাপারে কাজে

www.pathagar.com

লাগবে বলে আমরা আশা করি। তবে এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের এ ব্যাপারে কিছু করণীয় আছে। পাঠ্যপুস্তকে কি কি আসা উচিত এটা যেমন পরামর্শ দিতে হবে তেমনি এ ধরনের বই পুস্তক বাজারে আনারও ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা রাজনীতি শ্লোগানের মাধ্যমে হতে পারে। কিন্তু সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অপসংস্কৃতি রোধ এবং প্রকৃত সংস্কৃতি- যে সংস্কৃতি মানবতা, মনুষ্যত্বের বিকাশের সহায়ক, সেই সংস্কৃতিকে বেগবান ও জোরদার করতে হলে আমাদেরকে ঠান্ডা মাথায় নিজেদের আদর্শের ইতিবাচক প্রকাশের উদ্যোগ নিতে হবে। এটি করতে হবে সাহিত্যের মাধ্যমে, নিবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, কবিতায় ও গানে। এখানেও নির্ভেজাল ইসলামিক আকিদার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। সেই সাথে মিডিয়াতেও এর প্রতিফলন ঘটাতে হবে। মিডিয়াকে শুধু আইন করে প্রভাবিত করা সম্ভব নয়। আমরা যদি মৌলিক কিছু কাজে হাত দিই, চিন্তার জগতে আমাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পারি, শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারি, বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে আমরা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পারি- তাহলে মনের অজান্তে মিডিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য অংশও আপনার আমার হাতে আসতে পারে।

আমি মুস্তফা জামান আব্বাসী সাহেবের প্রস্তাবের সাথে একমত। আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যেভাবে ঐক্যমত পোষণ করেছেন এগুলোর বাস্তবায়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করতে পারি। তবে সাধ্যের তুলনায় সাধ্যি আমাদের নেই এই বিষয়টিও সামনে থাকতে হবে।

আমি যেহেতু সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সরাসরি মানুষ নই এজন্যে সাজিয়ে গুছিয়ে আপনাদের মনের মতো করে কথা বলতে না পারলেও আপনাদের কথাগুলো আমি হৃদয়ে গেঁথে নিয়ে যাচ্ছি। আল্লাহতায়ালা তৌফিক দিলে, আমি আবারও বলতে চাই, ইনশাআল্লাহ সাধ্যমত এই ময়দানে আপনাদের চলার পথে যতটা সম্ভব আমরা সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে কার্পণ্য করব না।

আজকের এই সম্মেলন বাংলাদেশের ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে মানবতা মনুষ্যত্বের বিকাশের সহায়ক সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে আল্লাহতায়ালা এই সম্মেলনকে কবুল করুন। এই সম্মেলনের যারা উদ্যোগ নিয়েছেন তাদেরকে কবুল করুন। #

বিসমিল্লাহ্ বলে কাজ শুরু করাটাই আমাদের সংস্কৃতি

ড. ওসমান ফারুক

শিক্ষামন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আমি বিয়ামে অনেক অনুষ্ঠানে এসেছি। কিন্তু এমন উপচে পড়া কোনো অনুষ্ঠানে আমি আর আসিনি। এতো লোকের জনসমাবেশ! তারচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এমন উপচে পড়া এবং সুশৃঙ্খল কোনো অনুষ্ঠান আমি এর আগে আর দেখিনি। তাই আজকে যারা এখানে এসেছেন তাদেরকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

আজকে এই মঞ্চে আমি যাদের দিকে তাকাচ্ছি তাদের সবাই শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি। আমি অর্থনীতিবিদ, তাদের পর্যায়ে পড়ি না। আমার অগ্রজ প্রতীম মুস্তফা জামান আব্বাসী সাহেবের মতো সুললিত কণ্ঠও আমার নেই। কাজেই আমি হয়ত, আজকে যারা বক্তব্য রেখে গেছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে সাদামাটা একটি বক্তব্য আপনাদের মাঝে রেখে যাবো। কোনো লিখিত বক্তব্য নয়, এখানে আপনাদের কাছে যা শুনেছি, আপনাদের চেহারায় আপনাদের উচ্ছ্বাসে যে ভাবমূর্তির পরিচয় পেয়েছি সেগুলো সূত্র ধরে আমি দু'একটি কথা বলে যাবো।

সংস্কৃতির বিভিন্ন সংজ্ঞা দেয়া হয়। এপারের সংস্কৃতি ওপারের সংস্কৃতি, পশ্চিমা সংস্কৃতি, পূর্বের সংস্কৃতি, কিন্তু সবকিছু ছাড়িয়ে সংস্কৃতির একটি সংজ্ঞাই থাকে, তা হলো একটি এলাকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন কিসে ঘটে সেটিই হলো সে এলাকার সংস্কৃতি। সে এলাকার লোকের চেতনা, জীবন দর্শন, আপামর জনসাধারণের যে ধ্যান ধারণা, আচার ব্যবহার ইত্যাদির প্রতিফলনই হলো সংস্কৃতি। আমার গ্রামে যে কৃষকটি সকালে ফজরের আজান শুনে ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়ে, বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম বলে ক্ষেতে কাজ করতে বেরিয়ে যায় সেটাই আমার সংস্কৃতির অংশ। বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম বলে আমরা কাজ শুরু করি এটিই আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। কাজেই সংস্কৃতি শুধু কয়েকটি গান কবিতা গদ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। একটি বিশেষ এলাকার মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং চিন্তাধারার যে প্রতিফলন সেটিই হচ্ছে সে দেশের সংস্কৃতি। আমি আরো বলতে চাই যে, নৈতিকতাবিহীন যে সংস্কৃতি মানুষের মনে মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে পারে না বরং মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটিয়ে দেয় সে সংস্কৃতি কখনো গ্রহণীয় সংস্কৃতি হতে পারে না। কাজেই মূলসত্ত্বা বিবর্জিত সংস্কৃতি তা যেখান থেকেই আসুক না কেন সেটি কখনো আমাদের সংস্কৃতি হতে পারে না। তা কখনো কোনো সভ্য সমাজের সংস্কৃতি হতে পারে না।

যে সংস্কৃতি মানুষের সমাজে অশ্লীলতা এনে দেয়, যে সংস্কৃতি মানুষের সমাজে সন্ত্রাস এনে দেয়- সে সংস্কৃতি কোনোদিন গ্রহণযোগ্য সংস্কৃতি নয়। সেদিক দিয়ে যদি দেখেন তাহলে ইসলামে যে মূল্যবোধ রয়েছে, ইসলামের মাঝে যে মানবতাবোধ রয়েছে, ইসলামের মাঝে যে সহমর্মিতা রয়েছে, ইসলাম যে শিক্ষা দেয় সেগুলো আমাদের সংস্কৃতির অংশ হতে অসুবিধা কোথায়?

আমরা পশ্চিমা সংস্কৃতির কথা বলি। পশ্চিমা সংস্কৃতির অনেক ভালো দিক রয়েছে। আমরা সেগুলো গ্রহণ করি না। গ্রহণ করি খারাপ দিকগুলো। সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটে। ভালো জিনিস এসে একটি এলাকার সংস্কৃতিকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিশোধন, পরিমার্জন করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের এখানে যে সংস্কৃতি আসে, সেগুলোর সবগুলোই নেতিবাচক। আমি কিছুদিন আগে ওয়াশিংটনে গেলে এক বুদ্ধিজীবী বা আতেল যাই বলেন জিজ্ঞেস করল, আপনারা চারদলের নামে সংস্কৃতিকে ধর্মান্তর করছেন। আমি তখন উত্তরে বলেছিলাম, একটি এলাকার মানুষের উপর কোনো সংস্কৃতি, কোনো মূল্যবোধ জোর করে চাপিয়ে দেয়া যায় না। সংস্কৃতি মাটি ও মানুষের মাঝখানে সৃষ্টি হয়ে থাকে। কাজেই কোনো সরকার ইচ্ছে করলেই একে কোনো বিশেষ পথে, বিপথে সুপথে চালিত করতে পারে না। সরকার সহায়ক হতে পারে। কিন্তু মানুষের যে ধ্যান ধারণা রয়েছে, চিন্তাধারণা রয়েছে, সেটির মাঝখান থেকে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, সংস্কৃতি মজবুত হয়।

www.pathagar.com

আজকে এখানে সংস্কৃতির আগ্রাসনের কথা বলা হয়েছে। সংস্কৃতির আগ্রাসন সরকার বন্ধ করতে পারে না। সংস্কৃতির আগ্রাসন বন্ধ হয় গণসচেতনতার মাধ্যমে। সংস্কৃতির আগ্রাসন বন্ধ হয় তখন, যখন নিজস্ব সংস্কৃতিকে মজবুত এবং শক্তিশালী করা হয়। কাজেই আইন কানুন করে সংস্কৃতির আগ্রাসন বন্ধ করা যাবে না যতদিন না আমরা আমাদের মাটি ও মানুষের যে সংস্কৃতি রয়েছে, সে সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রভাব থাকতে পারে, সে সংস্কৃতিতে ধর্মীয় চিন্তাধারার প্রভাব থাকতে পারে, সে সংস্কৃতিতে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার প্রভাব থাকতে পারে, কাজেই সেই সংস্কৃতিকে আমরা যে পর্যন্ত শক্তিশালী করতে না পারব ততদিন এই আগ্রাসন চলতেই থাকবে। একজন বক্তা ইসলামী শিল্পকলার কথা বলে গেছেন। ইসলাম কেবল শিল্পকলাতেই নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও ইসলামের অবদান অনস্বীকার্য। আর্কিটেকচারেও ইসলামের অবদান বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। কেবল বিরোধিতার খাতিরে এগুলো অস্বীকার করে লাভ নেই। ইসলামের অনুসারীরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করে গেছেন তাকে আমরা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি বলে মনে করি। সেইগুলোকে যদি আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাই তাতে আপত্তি থাকার কিছু নেই, বর্জন করারও কিছু নেই।

আমি দীর্ঘদিন বিদেশে ছিলাম। ঈদের সময় যখন কোলাকুলি করতাম তখন বিদেশীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত, বলত, এটা কি? আমরা বলতাম, এটা আমাদের সংস্কৃতির একটা অংশ, আমাদের জীবনধারার একটি অংশ। এগুলো তো অস্বীকার করার উপায় নেই, যুগ যুগ ধরে চলে আসছে ধারাবাহিকতার সঙ্গে। মানুষের মনের আশা আকাঙ্ক্ষা যেভাবে প্রতিফলিত হয় সেটিই হলো একটি বিশেষ এলাকার সংস্কৃতি। কয়েকটি কথা কয়েকজন বলেছেন, একটি হলো সংস্কৃতি সম্পর্কে ইউনেস্কোর রিপোর্ট বাস্তবায়ন করা। সেটি আমি দেখবো এবং এর প্রতিফলন কেমনভাবে করা যায় আমাদের দেশে আমাদের সংস্কৃতিকে মজবুত করার জন্য, সেটি আমি চেষ্টা করব। স্যাটালাইট প্রোগ্রাম ভিডিও ইত্যাদি সম্বন্ধে বলা হয়। সংস্কৃতির কথা বাদ দিলেও যে ধরনের প্রোগ্রাম আজকাল দেখানো হচ্ছে সেগুলি আমাদের শিক্ষাঙ্গনের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি অনেক জায়গায় বলেছি যে, যখন আমাদের সন্তানদের পড়াশুনা করা উচিত তখন তারা কতগুলো অত্যন্ত অপসংস্কৃতিমূলক অশ্লীল সিনেমা দেখে যাচ্ছে। আমি আমার এলাকাতে কতগুলো ভিডিও দোকান রেইড করিয়েছিলাম, আইন সঙ্গত হয়েছিল কিনা জানিনা। অনেকে স্যাটেলাইট চ্যানেলকে তথ্য প্রবাহের স্বাধীনতার অংশ হিসেবে বলে থাকে। কিন্তু সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায়, তারা যেগুলো নৈতিকতা বিরোধী বলে মনে করে, তরুণ সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটাতে পারে সেইসব চ্যানেল কিন্তু তারা সেখানে চালু রাখে না। এই বিষয়গুলো যে জোট সরকারের মাথায় নেই সেটা ঠিক না। আমরা চিন্তা করছি এ ব্যাপারে কি করা যায়, কেমন করে চ্যানেলগুলোকে শিক্ষামুখী করা যায়, সংস্কৃতিমুখী করা যায়। মুস্তফা জামান আব্বাসী সাহেব যে প্রস্তাব দিয়েছেন সেটা নিয়ে আমি তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে আলাপ করব। আমি মনে করি এটা একটি অত্যন্ত সুপ্রস্তাব।

মুজাহিদ সাহেব সুন্দর একটি কথা বলে গেছেন, স্রোতের অনুকূলে যারা চলে তারা ভাসমান। আর ভাসমানরা দুর্ঘটনায় পতিত হয়। আশা করি আমরা আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক উত্তরাধিকারিত্বের কথা মনে রাখবো। এবং আমাদের শিকড়

www.pathagar.com

কোথায়- সেই জিনিসটিই আমাদের মনে রাখতে হবে। আমরা চেষ্টা করব, আমাদের যে নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে, নিজস্ব বলতে এই এলাকার মানুষের কথা এবং সংস্কৃতির আমি যে প্রাথমিক সংজ্ঞা দিয়েছিলাম যে মানুষের ভাবধারণা, চিন্তা বা ধর্মীয়, রাজনৈতিক সামাজিক চিন্তার যে প্রতিফলন, সে সংস্কৃতিকে আমরা জোরদার করার চেষ্টা করব। অপসংস্কৃতি, যে সংস্কৃতি আমাদের নৈতিকতাবোধকে ব্যাহত করে, যে সংস্কৃতি আমাদের জাতীয় চিন্তা চেতনাকে ব্যাহত করে, সে ধরনের সংস্কৃতি আমরা পরিহার করব। #

আমাদের শিকড় অনেক গভীরে

আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ও সেক্রেটারি জেনারেল
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

আমি দুটো কথা বলতে চাচ্ছি, একটা হলো স্রোতের অনুকূলেই চলাটা সহজ। সেখানে তেমন কোনো পরিশ্রম করতে হয় না। আপনি যদি সাঁতার কাটতে জানেন, তাহলে বেশি পরিশ্রম করতে হবে না। আর গতিও থাকে বেশ দ্রুত।

স্রোতের অনুকূলে চলাটা সহজ, কিন্তু এখানে কিছু সমস্যাও আছে। সমস্যা হলো, আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখবেন যে উজানে চলার সময় লঞ্চ খুব কমই দুর্ঘটনায় পড়ে। স্রোতের অনুকূলে যখন চলে তখনই লঞ্চ দুর্ঘটনা বেশি হয়। কারণ স্রোতের অনুকূলে যে চলে সে অনেক সময় তার হাল গতির সাথে তাল রাখতে পারে না।

অন্যদিকে অনুকূলে চলে তারা, যাদের শিকড় নেই। শিকড় যাদের অনেক গভীরে প্রোথিত নয়, যেমন খড়কুটো- এগুলো স্রোতের অনুকূলে চলে। এই খড় যখন ধান গাছ হিসেবে থাকে তখন তার একটা অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু খড়ে পরিণত হলে তার আর নিজস্ব অস্তিত্ব থাকে না। আর চলে কচুরিপানা-এরও কোনো গভীর শিকড় নেই। এই জন্য স্রোতের অনুকূলে চলা সহজ। যারা স্রোতের অনুকূলে চলে তাদের শিকড় কখনো গভীরভাবে প্রোথিত থাকে না। হালও ধরতে পারে না। একসিডেন্ট করে ঘনঘন। এবং অপরের ওপর ভরসা করেই চলে।

আমরা এখন পর্যন্ত বিশেষ করে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে স্রোতের অনুকূলে চলায় অভ্যস্থ। আমাদের শিকড় যে অনেক দূর পর্যন্ত প্রোথিত তা আমরা এখনো প্রমাণ করতে পারছি না। আমাদের অবস্থা কচুরিপানার মত। আমি মনে করি আজকের এই সম্মেলন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটা ঐতিহাসিক সংযোজন। বর্তমান সংস্কৃতির নামে যে অপসংস্কৃতি চলছে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে আধিপত্যবাদ চলছে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে সাম্রাজ্যবাদী ধ্বংসাত্মক অভিযান চলছে এই

www.pathagar.com

সম্মেলনের মাধ্যমে স্রোতের অনুকূলে চলার অভ্যাস পরিবর্তন করে স্রোতের প্রতিকূলে চলে নিজস্ব শিকড়কে মজবুতভাবে প্রোথিত করতে হবে।

আজকের সম্মেলনে এটাই আমরা কামনা করি। এটাই অমার প্রথম কথা। আর আমার দ্বিতীয় এবং শেষ কথা হচ্ছে আপনারা সামনে এগিয়ে যাবেন। ইনশাআল্লাহ আমি ব্যক্তিগতভাবে জোট সরকারের একজন প্রতিনিধি হিসাবে, জামায়াত ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবে আপনাদের অগ্রযাত্রার পথে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে যাবো যতদিন আল্লাহতায়ালা সুযোগ দেন।

আর বাবুল সাহেব সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বড় দলের বড় ব্যক্তির সহযোগিতা চেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি, বাবুল সাহেব, মীর কাসেম আলী সাহেবসহ আপনারা এই স্রোতের অনুকূলে ভেসে চলার যে একটা ধ্বংসাত্মক অভিযান চলছে এর বিরুদ্ধে সত্যিকার অর্থে একটি প্রতিরোধ আন্দোলন আপনারা গড়ে তুলুন, যেখানে সত্যিকার অর্থে এদেশের মানুষের বিশ্বাস এবং চিন্তা-চেতনার প্রতিধ্বনি হবে, যদি আপনারা এগিয়ে যেতে পারেন আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যতটুকু জানতে ও চিনতে পেরেছি, আপনারা তাকে আপনাদের সঙ্গে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

এই কথাগুলো বলে আপনাদর সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে আরেকবার আপনাদের কাছ থেকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করে বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। #

ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা প্রকৃতপক্ষে আগ্রাসনবাদী ও আধিপত্যবাদী

কবি আল মাহমুদ

আমার কাছে এই সম্মেলনকে অত্যন্ত ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে ধারণা হয়েছে। বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক আমল থেকে বৃটিশ ঔপনিবেশকালীন সংস্কৃতির আন্দোলন যেটুকু পরিচালনা দেখতে পাই সেটা প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনই ছিল। সেটা করেছিলেন সৈয়দ নিসার আলী তিতুমীর। তিনি বৃটিশ ঔপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে বাঁশের কেল্লা নিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। আজকে শুনলে অবাক লাগে– তিতুমীর কি বোকা ছিলেন যে বৃটিশ কামানের বিরুদ্ধে বাঁশের কেল্লা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন? আমরা তো লেখা পড়া করি, তিনি তার কালে অনেক বেশি লেখা পড়া করেছিলেন। সৈয়দ নীসার আলী তিতুমীর শুধু বাঁশের কেল্লা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন এই জন্য যে, যদি তিনি বাঁশের কেল্লা নিয়ে দাঁড়িয়ে না যান তাহলে আর মুসলমানরা দাঁড়াবে না। এই জন্য তিনি নিশ্চিত পতন জেনেও বাঁশের কেল্লা নিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। এরপর রাজনৈতিক আন্দোলন, ইসলামিক রাজনৈতিক আন্দোলন খুব বেশি আর ওই

www.pathagar.com

রকম সরাসরি দেখি না। পরে অবশ্য সবাই বুঝেছে যে, বৃটিশরা আসলে আমাদের গোড়া কেটে দিতে চায়। ক্রিষ্টিনিটির মাধ্যমে তারা আমাদের সর্বনাশ করতে চায়। তখন বাধ্য হয়ে হাজী শরীয়াতুল্লাহ্ সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এরপর আসছেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ্। আপনারা শুনলে অবাক হবেন যে, এই দীর্ঘ বিরতির পর কোনো পরিকল্পিত সাংস্কৃতিক সম্মেলন হচ্ছে আজ। তাই, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক আন্দোলন। চারদলীয় সরকার নির্বাচনের জিতে ক্ষমতায় এসেছে। তারা সব করে দেবে এটা মুসলমানদের ভাবা উচিত নয়। আমি একজন কবি হিসেবে সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছি। যে কোনো কারণে হোক আমাকে ডাকা হচ্ছে, আমি তো ভাবি না আমাকে ডাকা হবে। আমাকে ডাকছে বলে আমি সেখানে যাচ্ছি। সেখানে যে ধরনের আলোচনা হয় তাতে আমি শত্রু চিনতে পারি। ঘাপটি মেরে সুযোগের অপেক্ষায় থাকা এসব ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা প্রকৃতপক্ষে আগ্রাসনবাদী, আধিপত্যবাদী। সংস্কৃতিকে যারা প্রতিনিধিত্ব করে তারা মুখে একটি প্রলেপ লাগিয়ে বসে আছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। তাদের বক্তব্য হলো বাঙালী সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হলো কলকাতা। এরা সব পরাজিত চক্র। আর কোনোদিন জাগবে না, সেই কেন্দ্রকে আমাদের কেন্দ্র বানাতে চায়। আমি তো বহুদিন আগেই বলেছি ঢাকা হবে বাংলাভাষা ও বাংলা সংস্কৃতির রাজধানী। আমাদের কথাটা হজম করার মতো ক্ষমতা নেই তাদের। সেজন্য যতরকম ষড়যন্ত্র আছে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সেটাই করা হচ্ছে। আমাদের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আমাদের প্রিয় মুজাহিদ ভাই বললেন, অনুকূল পরিস্থিতিতে আমরা যেন গা ভাসিয়ে না দেই। তিনি ঠিকই বলেছেন।

তবে অনুকূলও আমাদের দরকার কিছুক্ষণ ভেসে থাকার জন্য। আমরা কি আনুকূল্য চাই না? চাইতে পারি না। এখন পর্যন্ত আমরা সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে চালিয়ে যাচ্ছি। সম্মিলিতভাবে পরিকল্পিতভাবে সারা বাংলাদেশে মুসলিম সাংস্কৃতিক কর্মীদের, ইসলামিক সাংস্কৃতিক কর্মীদের একটা সম্মেলন হচ্ছে। এরচেয়ে ঐতিহাসিক ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে কি আর হয়েছে? হয়নি। যারা আমাদেরকে পরাজিত করতে চায় তারা আল্লাহর রহমতে পরাজিত হবে। আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলছি, শত্রু লুকিয়ে আছে শিক্ষাক্ষেত্রে যারা এই চারদলীয় সরকারকে যে কোনো রকমে পতন চায়। আমরা আমাদের অঙ্গীকার নামার প্রস্তাবের উপর বলেছি কি চাই আমরা। আমরা দরজাও বন্ধ করতে চাই না, কিন্তু এই দেশ এবং ইসলামিক সংস্কৃতিকে বিজয়ী করতে হলে রাজনীতি এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন এককভাবে পাশাপাশি চলতে হবে। আপনারা যেন সেটা ভুলে যাবেন না। আমরা সাংস্কৃতিক কর্মীরা যেহেতু আগেই বলেছি হাজী শরীয়তুল্লাহ্, মুন্সী মেহেরুল্লাহর যে আন্দোলন, তারা যে হাত মুষ্টিবদ্ধ করেছিলেন সে জন্যই তো আমরা আছি। নাহলে তো রাজনৈতিকভাবে আমাদের পরাজয় ঘটত। তাহলে এদেশে মুসলমান থাকতো না। এমনি আমাদের প্রত্যেকটি শিকড়ে শিকড়ে প্রত্যেকটি জায়গায় জায়গায়। প্রত্যেকটি স্ট্যান্ডে, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখবো। আমাদের সাহায্য করবে সরকার। আমাদের সাহায্য করবে আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে। এটুকু আমাদের বক্তব্য। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। #

www.pathagar.com

রাষ্ট্র ও ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার আন্দোলন শুরু করতে চাই

মীর কাসেম আলী
আহ্বায়ক, জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন-২০০২

আমাদের অতিথিবৃন্দদের পক্ষ থেকে আজকের এ সম্মেলনে যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি। দিক নির্দেশনা পেয়েছি। আমরা দৃপ্ত শপথে বলীয়ান হয়েছি।

আমরা এই সম্মেলন থেকে একটি নতুন যাত্রা শুরু করতে চাই। সেটা হচ্ছে আমাদের আকীদা, বিশ্বাস এবং জাতিসত্তার দিকে। রাষ্ট্র ও আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার এক আন্দোলন আমরা শুরু করতে চাই ইনশাআল্লাহ।

আজকের সম্মেলনের মাধ্যমে এই আন্দোলনের শুভ সূচনা হোক। আল্লাহ পাকের দরবারে মোনাজাত করি এবং আমার সামনে যে সমস্ত শিল্পী সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মীরা আছেন তাদের সবার কাছে আবেদন আমাদের এই চ্যালেঞ্জ কত বড় তা অনুধাবন করতে হবে। আল্লাহ পাক যদি আমাদের সাথে থাকেন, যে জমিনের পাহারাদার শাহজালাল, খানজাহান আলী, শাহমখদুম সেই জমিনে ইনশাআল্লাহ আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। তিতুমীরের সেই বাঁশের কেল্লা শপথের মাধ্যমে যে বিজয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল আমরা চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছা পর্যন্ত আমাদের যাত্রা স্তব্ধ হবে না, ইনশাআল্লাহ।

এই আন্দোলনে আমরা এদেশের জনগণকে নিয়ে পথ চলতে চাই। এই দেশের তৌহিদি জনতাকে সাথে নিয়ে পথ চলতে চাই। এবং বর্তমান সরকারকে জানাতে চাই যে, আমরা আপনাদের সাথে রয়েছি। আপনারা দৃপ্ত ও বলিষ্ঠভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। আপনাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমাদেরকে সাথে পাবেন।

এই জমিনে একদিন কলেমার পতাকা উড়বে ইনশাআল্লাহ। সারা দুনিয়া একটি ইসলামী সমাজ, একটি আধুনিক কল্যাণমূলক ইসলামী রাষ্ট্র দেখার জন্য অপেক্ষা করছে। সামনের দিনগুলোতে আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরম বিজয়ের দিকে এগিয়ে যাবে, আল্লাহপাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন, আমাদেরকে চলার পথ সহজ করে দিন। তার রহমত বরকত কামনা করে এই সম্মেলন সমাপ্ত ঘোষণা করছি। #

www.pathagar.com

জোর করে বাঙালী সংস্কৃতি আনা যাবে না

প্রফেসর মোহাম্মদ ইউসুফ আলী
সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আমি চল্লিশ বছর ধরে রসায়ন পড়েছি এবং পড়িয়েছি। সুতরাং রসায়ন সংস্কৃতির সঙ্গেই আমার সামাজিক পরিচিতি। আমার সঙ্গে আরেকটি সংস্কৃতি বাসা বেঁধে ছিল সেটা এতদিন খেয়াল করিনি। এখন মনে হচ্ছে ওই সংস্কৃতি বিপদগ্রস্ত, অনেক আগ্রাসনের শিকার। তাকে রক্ষা করুন।

একটি শিশু যখন জন্ম নেয়ার পর তার আত্মা থেকে সে আস্তে আস্তে শেখার চেষ্টা করতে থাকে তার বাবা মা তার প্রতি কি রকম আচরণ করে? তার দাদা, দাদী, ভাই বোনেরা কি রকম আচরণ করেন? তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিভাবে রিঅ্যাক্ট করে? এভাবেই সে শিখতে থাকে। কিভাবে সমাজে বসবাস করতে হবে। এবং আরো কিছুদিন পরে সে লক্ষ্য করে যে, তার বাবা মা তার দাদা দাদী সেজদাহ্ করছেন। এবং সে বিশ্বাস করে একদিন তাকেও সেজদাহ্ করতে হবে। এইভাবেই ইসলামী সংস্কৃতি একটি শিশুর মনে দানা বাঁধতে থাকে। সে আরো লক্ষ্য করে কিভাবে অন্যান্য অতিথিদেরকে তার পরিবারে গ্রহণ করা হচ্ছে। কিভাবে তাদেরকে বিদায় জানানো হচ্ছে। এভাবে সংস্কৃতি একটা শিশুর মন গড়তে থাকে। তেমনি একটি হিন্দু শিশুর মনে হিন্দু সংস্কৃতি গড়তে থাকে। একটি খৃস্টান শিশুর মনে এভাবেই একটা খৃস্টান আদর্শ গড়ে উঠতে থাকে। ঠিক তারা যখন একত্রিত হয় তখন পরস্পরকে শত্রুভাবে গ্রহণ করতে থাকে। এইভাবে বিভিন্ন উপাদান নিয়ে একটি সামগ্রিক সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়।

সংস্কৃতি কোথাও থেমে থাকে না। এর উত্তরোত্তর সংস্কার হতেই থাকে। একটি সমাজের তথা দেশের নাগরিকদের জীবনাচার, আচার অনুষ্ঠান, পেশা, আর্থিক অবস্থা, ধর্মীয় চিন্তা চেতনা, জীবন দর্শন, রাজনৈতিক দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা, প্রভৃতি জগতে সংস্কার লাভ করতে থাকে এমনিভাবে।

একশ বছর আগে আমাদের এই ভূ-খণ্ডে যে সংস্কৃতি চালু ছিল, আজ একশ বছর পরে আমরা কি সেই অবস্থানে আছি? নিশ্চয় নয়। এই সংস্কৃতির অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। সন্দেহ নেই ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এই বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডেই একটি ভিন্ন সংস্কৃতি বিরাজিত ছিল। ইসলামের আগমনের পরে মুসলিম জনগোষ্ঠীর জীবনাচার, আচার, অনুষ্ঠান, চালচলন, জীবন দর্শন প্রভৃতি ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে বিকশিত হতে থাকে। আজ আটশত বছর পরে

www.pathagar.com

মুসলিম জনগোষ্ঠী ইসলামের জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে থাকে কিন্তু তাতে অন্য জনগোষ্ঠীর সহিত তাদের দ্বন্দ্ব বা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে তার সংঘর্ষ হয় না বরং সহমর্মিতা বৃদ্ধিতে তারা একে অপরের সঙ্গে সহঅবস্থান করতে থাকে। আবার কোনো জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় চেতনার উপর যখন আঘাত আসে তখন তারা সম্মিলিতভাবে তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে আঘাতকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়েছিল মূলত ইসলাম ও ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বন্দের ফলে। বৃটিশদের বিভাজন শাসন নীতির ফলে মুসলিমরা শিক্ষাদীক্ষা, আর্থিক কর্মকাণ্ডে এবং ইসলামী চিন্তা চেতনায় পিছিয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবেও মুসলমানরা ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়তে থাকে। সেদিন মুসলমানেরা চেয়েছিল হিন্দুবলয়ের থেকে মুক্তি লাভ করতে। একটি পাক পবিত্র পরিবেশে তাদের ঈমান আকীদা বিশ্বাস নিয়ে ইসলামী জীবন দর্শনের ভিত্তিতে একাই স্বতন্ত্র জন্মভূমি যেখানে মুসলমানরা তাদের শিল্প সাহিত্যের বিকাশ ঘটাতে পারবে। তাদের অর্থনৈতিক দৈন্যতার অবসান ঘটাতে পারবে। এবং একটি নিরাপদ ভৌগলিক সীমানার মধ্যে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারবে। এভাবেই ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয় পাকিস্তান। কিন্তু ৪৭ এর স্বাধীনতার পরে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের শোষণের যাতাকলে নিষ্পেষিত হতে থাকে পূর্বে পাকিস্তানের মুসলমানেরা। তারই পরিণতিতে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয় যায়। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে।

বাংলাদেশের শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমান। সুতরাং এখানকার সংস্কৃতি ইসলাম প্রভাবিত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আজ নতুন করে আমাদের শিখানো হচ্ছে যে আমাদের সংস্কৃতি বাঙালী সংস্কৃতি। অর্থাৎ আটশত বছর আগে বাংলাদেশে যে সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল আমাদের সংস্কৃতি সেই বাঙালী সংস্কৃতি। এর আলোকেই বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠানে আপনারা লক্ষ্য করছেন যে এখন মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে সভা শুরু করা হয়।

কালক্রমে আমাদের জাতির উপর আঘাত হানা হচ্ছে। আমরা বাংলাভাষায় কথা বলি। সুতরাং আমরা বাঙালী। একথা যেমন ঠিক আমরা দেখেছি, ইংরেজরা ইংরেজি ভাষায় কথা বলে তাই তারা ইংলিশ, কিন্তু আমেরিকানরা, কানাডীয়রা, অস্ট্রেলিয়ারা- তারাও তো ইংরেজি ভাষায় কথা বলে। তারা তাহলে কি ইংলিশ? তাদের দেশের সংস্কৃতি কি ইংলিশ? সুতরাং ভাষা একটি সংস্কৃতির উপাদান হতে পারে। একটি উপাদান কিন্তু সমগ্র উপাদান হতে পারে না।

আমাদেরকে বাঙালী বলা হচ্ছে। আমরা সত্যি কি বাঙালী? একবার এক বাবু বলেছিলেন তিনজন মুসলমান আর দুইজন বাঙালী মানুষ। অর্থাৎ মুসলমানরা বাঙালী না। তারপরে আরো বিস্ময়কর- মাত্র দুই সপ্তাহ আগে এক মহিলা শান্তি নিকেতনে গিয়েছিলেন। সেখানে অন্য এক মহিলা তাকে বাংলাদেশী মুসলমান দেখে কৌতুহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করতে থাকেন, আপনাদের দেশে আমাদের যেসব বাঙালীর মেয়ে আছে তারা কি আপনাদের বাড়িতে যায়? এই যে কথাগুলো- এর থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি কারা বাঙালী আর কারা বাঙালী নন।

আমরা জোর করে আজকের বাঙালী সংস্কৃতি আনতে পারবো না। সুতরাং এই প্রচেষ্টা আমাদের বর্জন করা উচিত। আমরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী। আমাদের সংস্কৃতি ইসলাম

www.pathagar.com

প্রভাবিত হবে। আমাদের সংস্কৃতি ইসলামী জীবনাদর্শের উপর নির্ভর করবে এটাই স্বাভাবিক। যারা চিৎকার করছেন আমরা বাঙালী, আমাদের সংস্কৃতি বাঙালী- তাদেরকে আমি হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, এই কথা বলবেন না। আমরা যারা বাংলাদেশী এবং ইসলামে বিশ্বাস করি তারা সজাগ আছি। আজকে আমাদেরকে সেভাবে পরাভূত করা যাবে না। বুদ্ধিজীবী বন্ধুরা, আপনাদের উদ্দেশ্য আজ সকলের নিকট জ্ঞাত। আমরা সকলে বুঝে ফেলেছি আপনারা কি বলতে চান, কি করতে চান। নতুন বোতলে পুরাতন মদ খাইয়ে এদেশের মানুষকে বিপদগামী করা যাবে না। মুসলমান এখনো যথেষ্ট সজাগ। তাদেরকে ভোলানো যাবে না। এদেশের তৌহিদী জনতা তাদের সে চেষ্টা সফল হতে দেবে না। তথাকথিত বাঙালী সংস্কৃতিবাদীরা আপনারা ক্ষান্ত হোন। কারণ মসজিদে আজান শুনেই আপনাদের হৃৎকম্পন উপস্থিত হয়। তেরো কোটি তৌহিদি জনতা যদি লাঠির মিছিল নিয়ে এগিয়ে যায় তখন আপনারা কোথায় পালাবেন। আমাদের শুধু মিছিলের জন্যেই প্রস্তুতি নিলে চলবে না। নতুন প্রজন্মকে তাদের নিজেদের সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে হবে। সেজন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে আলোচনা, রেডিও, টেলিভিশনে আমাদের সংস্কৃতি কি, আমাদের জীবন আদর্শ কি এই সংক্রান্ত তথ্য দিতে হবে। এবং তাদেরকে সেভাবেই গড়ে তুলতে হবে।

আল কোরআনকে আঁকড়ে ধরতে হবে

মুস্তফা জামান আব্বাসী
মহা-পরিচালক, শিল্পকলা একাডেমী

আমি শিল্পকলা একাডেমীতে মহাপরিচালক হিসাবে কিছুদিন আগে যোগদান করেছি বটে কিন্তু তার আগেই আমি একজন সাধারণ সাংস্কৃতিক কর্মী ছিলাম, এখনও আছি। *নবীজীর সংস্কৃতি বাংলার মোহনায়* এই শিরোনামে আমি একটি প্রবন্ধ রচনা করেছি। আজকে যারা এখানে উপস্থিত আছেন তাদের জ্ঞাতার্থে বলছি যে, আমার প্রবন্ধটি ৫২৫ পৃষ্ঠার। আমি যেহেতু শিল্পকলা একাডেমীতে প্রায় আট মাস ধরে কর্মরত আছি কাজেই দশ মিনিটে আমার বক্তব্য শুধু আরম্ভ করতে পারি শেষ করতে পারি না।

ইহদিনাস ছিরাতাল মুস্তাকিম, ছিরাতাল্লাজিনা আনআমতা আলাইহিম, গায়রুল মাগদুবি আলাইহিম অলাদ্দয়াল্লিন – এটাই হলো আমার বক্তৃতার সার সংক্ষেপ। কবি গোলাম মোস্তফা আমার পিতার বন্ধু। যিনি *বিশ্বনবী* রচয়িতা। তার লেখা থেকেই উদ্ধৃত করে বলছি, *সরল ও সঠিক ও পূণ্য পন্থা, মোদের দাও গো বলি/চালাও সে পথে যে পথে তোমার প্রিয়জন গেছে চলি। যে পথে ভ্রান্তি চির অভিশাপ, যে পথে ক্লান্তি চির মনস্তাপ, মোদেরে কখনো করো না সে বিপথগামী-*

প্রতিদিন আমরা যে নামাজ পরি তার মধ্যে এগুলোই বলি। নবীর পরবর্তী প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য নবীর সহজ সরল পথের

www.pathagar.com

কথাটি জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে সবার কাছে পৌঁছে দেয়া। ইসলামের সংস্কৃতি হলো আল্লাহ ও রাসূলের ইবাদত। মুসলমানদের সংস্কৃতি হলো প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে প্রতিনিয়ত আল্লাহর সরল পথ, হেদায়াতের পথে মানুষকে আহ্বান করা। এই আহ্বান যেমন করবে পথের একজন সাধারণ মুসলমান, যেমন আমি, তেমনি করেছেন আউলিয়া, কতুব, নবী রাসূলগণ। যে আয়াত পাঠ করলাম তার প্রতিটি শব্দ মুসলিমরা প্রতিদিন অসংখ্যবার উচ্চারণ করে চলেছেন তাদের প্রাত্যহিক প্রার্থনায়। কখনো বুঝে, কখনো অবুঝের মতো। এই সহজ সরল পথের সম্পর্কে চিন্তা করার আছে প্রচুর।

কোন পথে যাবো? একটি পথ চলে গেছে কতদিকে। একটি পথের কত মোড়, কত বাঁক, কত মনীষীর কত আহ্বান। তাদের কোন পথটি সরল? আল্লাহর রহমত কি তাহলে শুধু মুসলমানদের জন্যে? না তা নয়। আল্লাহর রহমত সমস্ত মকলুকাতের জন্যে, তারা বিশ্বাসী হোক বা না হোক। মুমিন হোক, কাফের হোক আল্লাহর রহমতের ছায়াটি তাদের পার্থিব শুভ স্বাচ্ছন্দ্য ও সুস্থতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাহলে মুসলমানদের জন্যে বিশেষ আর কি রইল? তাদের জন্যে আছে বিশেষ রহমতের আকর প্রিয় নবীজী। আল্লাহর নৈকট্যই মুমিনের প্রাপ্তি।

আজকের এখানে, সম্মেলনে বিভিন্ন প্রস্তাব নেয়া হয়েছে। আগামীতেও হবে। গত পঞ্চাশ বছরে আমাদের যে সব সম্মেলন হয়েছে- আমি গান গেয়েছি, সম্মেলনে প্রবন্ধ পড়েছি, আপনারা অনেকেই প্রবন্ধ পড়েছেন, সেগুলোর ফসল ঘরে তুলবে কে?

গত তিন বছর আগে আমি আমেরিকায় নয় মাস ছিলাম। সেখানে আমার মেয়ে থাকে জামাই থাকে। তারা সেখানে ইসলামকে আঁকড়ে ধরেছে। আমি কখনো জানতাম না যে, আমার নিজের মেয়ে এতখানি ভালোবাসবে ইসলামকে। সে আমাকে পথ দেখায়ে বলল, এখানে এসে একটি জিনিসকে সে আঁকড়ে ধরেছে, সেটা হলো মহাগ্রন্থ আল কোরআন। আর আজকে আমরা যারা চৌদ্দ কোটি মানুষ আছি, বড় বড় সুফিয়াকেরামদের মহৎগুণের জন্য আজকে এখানে মুসলমানদের আবাসভূমি হয়েছে, আমরা কি সেই কোরআন এবং সুন্নাহ থেকে বহুদূরে চলে যাচ্ছি না? আমাদের টেলিভিশন- যে টেলিভিশন সম্পর্কে আমি বলেছিলাম যে এমন একটা চ্যানেল কি করা যায় না, যেখানে চব্বিশ ঘন্টা আমাদের দেশের কৃষক কিভাবে কৃষি কাজ করবে, কিভাবে দেশের স্বার্থ রক্ষা করবে, কিভাবে আমাদের দেশের মানুষেরা আমাদের সংস্কৃতির সেবা করবে, তার প্রচার করবে। রাসূলকে ভালো করে চিনতে পারিনি, ভালো করে কোরআন পড়িনি অনেকেই। যারা মাদ্রাসায় যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন তারা এ বিষয়গুলো ভালোভাবে জানতে পেরেছেন। আমি স্কুলে পড়েছি। দশ বছর সেন্ট জোসেফ-এ। দশ বছরে কোনোদিন নবীর জীবনী পাঠ করার সুযোগ পাইনি। কোনোখানে একটি প্যারাগ্রাফও ছিল না। ঢাকা কলেজে ক্লাস করেছি দু'বছর, ভালো ছাত্র ছিলাম। কিন্তু কোনোদিন নবীর জীবনী পাঠ করার কোনোই সুযোগ ছিল না। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছর ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম কোথাও এক প্যারাগ্রাফও নবীর জীবনী ছিল না। যারা ইসলামের ইতিহাসের ছাত্র, আপনারা শুনে অবাক হয়ে যাবেন তাদের জন্য ১০ মার্কও নেই নবীর জীবনী স্টাডি করার জন্য। বলা হয়েছে, বাপ মায়ের চেয়ে, নিজেদের চেয়েও নবীকে বেশি ভালোবাসো। একটা ছোট্ট শিশু টেলিভিশনে কোনোদিন নবীর কোনো কিছু প্রচার হতে দেখে না। নবীর গান, নবীর কথা, তার ভালোবাসার কথা, মহব্বতের কথা, সমস্ত পৃথিবীর মানুষের জন্য তার যে ভালোবাসা, তার যে মহত্ব, তা শিশু টিভি পর্দায় দেখে না, শুনতে পারে না।

www.pathagar.com

আজকে যে কথা বলে চলে যাচ্ছি তা হলো এই যে, যদি সম্ভব হয় তাহলে সমস্ত বাংলাদেশের চৌদ্দ কোটি মানুষের জন্য যদি একটা চ্যানেল আমরা করতে পারি যেখানে আমাদের নবী, মহাগ্রন্থ আল-কোরআন এবং আমাদের জীবন সম্পর্কে যা কিছু জিজ্ঞাসা, সংস্কৃতি সম্পর্কে যা কিছু জিজ্ঞাসা তার সমস্ত উপকরণ আমরা একটা চ্যানেলেই পেয়ে যাব। আসল কথা হলো আমাদের মানুষ যারা গ্রামে পড়ে আছে তারা এখন পর্যন্ত কিছুই পায়নি- এই কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে। #

আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবেই অগ্রসর হতে হবে

প্রফেসর আবদুস সাত্তার

পরিচালক, চারুকলা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমরা জানি আমাদের এই অঞ্চলে যখন বাংলাভাষা এবং সংস্কৃতির গঠন প্রক্রিয়া চলছে তখন আমাদের একটি প্রধান ভূমিকা ছিল। এক সময় আমাদের এই অঞ্চলে অর্থাৎ বাংলাদেশে অনার্যদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এই আমরা আমাদের বাংলাদেশের এই অনার্যদের যে শিল্প সাহিত্য সেটাকে কখনো গ্রহণ করেনি। আর্যরা সব সময় এটাকে অপছন্দ করত এবং অনার্যদের অপবিত্রও মনে করত। তারা যদি কোনো কার্য উপলক্ষ্যে আসতো এবং পরে যখন ফিরে যেত তখন তাদেরকে প্রায় তীর্থ করে শুদ্ধ হতে হতো। অর্থাৎ আমাদের এই অঞ্চলের প্রতি তাদের কেমন মানসিকতা বিরাজ করছিল তার একটা প্রমাণ মেলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সেই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। তারা পরাজিত হয়েছে।

আজ থেকে নব্বই বছর আগে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল। সেই সম্মেলনে আপনারা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারেন যে, যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের সিংহভাগ হিন্দু বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক। মুসলমানদের সংখ্যা খুব কম, উল্লেখ করার মত কেউ নেই। কিন্তু তখনও এই মুসলমানদের শিল্প সংস্কৃতিকে হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা দারুনভাবে শ্রদ্ধা করেছিলেন। তারা মুসলমানদের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে তারা মসজিদ, আদিনা মসজিদসহ বিভিন্ন মসজিদ পরিদর্শন করেছিলেন। এবং সেই সমস্ত মসজিদের যে শিল্পকর্ম তারা সেগুলোর উল্লেখ করেছিলেন, প্রশংসা করেছিলেন। এখন আমরা লক্ষ্য করছি যে, আমাদের মধ্যে যারা বসবাস করেন, আমাদেরই লোক বলে যারা পরিচয় দেন ইতিমধ্যেই আমরা শুনেছি তথাকথিত বুদ্ধিজীবী কিংবা সংস্কৃতসেবী- আমাদের এই সমস্ত

www.pathagar.com

মসজিদের কথা কিংবা শিল্পকর্মের কথা শুনলে তাদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়। তারা এটাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। আপনারা লক্ষ্য করছেন যে, বিশ্বে এক সময় ইসলামী শিল্পকলা কিংবা মুসলমানদের দারুন উত্থান ঘটেছিল। শিল্প-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে তারা স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের সেই স্বর্ণযুগ কোথায় চলে গেল? কেন গেল? কেন আমরা সেগুলো ধরে রাখতে পারলাম না? আমাদের এই দেশে ইসলামী শিল্পকলার খুব একটা চর্চা নেই। চাতকধর্মী শিল্পকলার প্রভাবেই সেগুলো একেবারেই স্তিমিত। ইসলামী শিল্পকলার একটি অংশ ক্যালিগ্রাফি। আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, এই অঞ্চলে ক্যালিগ্রাফি শিল্পচর্চা একদমই ছিল না। কিন্তু ইদানীং আমাদের এই বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফির চর্চার যাত্রা শুরু হয়েছে এবং গত কয়েক বছর ধরে এর প্রদর্শনের আয়োজন করা হচ্ছে। এবং ক্রমান্বয়ে এই শিল্পকর্ম জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

এই শিল্পকর্মের সঙ্গে যেহেতু ইসলামের একটি সম্পর্ক আছে এবং এই শিল্পকর্মের নাম বলতে গেলে ইসলাম শব্দটি এসে যায়, সেজন্য তথাকথিত বুদ্ধিজীবী কিংবা সংস্কৃতসেবী এই শিল্পের প্রতি একটা অনীহা ভাব পোষণ করেন।

শিল্প তো শিল্পই। শিল্প সব সময়ই সুন্দর। এখানে আমরা যারা শিল্পচর্চা করি কিংবা আমরা যারা শিল্প নিয়ে কথা বলি, লেখালেখি করি, তাদের অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। সেগুলো ধর্ম সংক্রান্ত, ধর্মের সঙ্গে শিল্পের বিরোধ। আসলে কোনো বিরোধ নেই। সাধারণ মানুষ, সুস্থ একজন মানুষ ভালো জিনিস পছন্দ করেন। খারাপ জিনিসকে অপছন্দ করেন। এই তো স্বাভাবিক। ধর্ম নিয়ে কথা ওঠে। ভালো জিনিসের পক্ষে ধর্ম। সব সময় ভালো কথা বলা, ভালো বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, এসবের পক্ষেই তো ধর্ম কথা বলে। সুতরাং শিল্প যদি সুন্দর হয়, সুস্থ হয়, সমাজ গঠনের পক্ষপাতি হয় বা মানবজীবনে কল্যাণকামী হয় তাহলে সেই শিল্প কখনো ধর্মের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে না। শিল্প সুন্দর। সুন্দরের সাথে ধর্মের সম্পর্ক আছে।

এখন আমাদের দেশে যেভাবে শিল্প সংস্কৃতির চর্চা চলছে এবং যে অবস্থা বিরাজ করছে তাতে আপনারা লক্ষ্য করবেন আমাদের এই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী কিংবা ইসলামে বিশ্বাসী এই সমস্ত ক্ষেত্রে শিল্পী সাহিত্যিক নেই। সবই তাদের। এটার একটা কারণ আছে। একজন বক্তা বলেছেন যে, আমরা নিজেরা একত্রিত হচ্ছি না। আমরা যে আছি সেইটা আমরা কাউকে দেখাতে পারছি না। জানান দিতে পারছি না। এটা একটা বড় সমস্যা। আমাদের শিল্প সংস্কৃতির জগতে যারা আছি তাদের কেউ কাউকে চিনি না। একেক জন একেক জায়গায় আছি। কারোর সঙ্গে কেউ যোগাযোগ রাখি না। যদি এটি দেখানো যায় যে শিল্পীরা কোথায় কে আছেন এবং সংস্কৃতসেবীদের সবাইকে একত্রিত করা যায় তাহলে কিন্তু এই যে যারা বলেন যে আপনাদের তো কোনো লোকজন নেই এইক্ষেত্রে, তাহলে তাদের কথা বন্ধ হবে। না হলে বন্ধ হবে না। এবং এটা বন্ধ করতে হলে এই কাজটি করতে হবে। ক্ষুদ্র বিভেদ ভুলে সকলকে একত্রিত হতে হবে। যারা শিল্প সাহিত্যে কাজ করছেন, প্রধান ভূমিকা পালন করছেন, তাদের উপর দায়িত্বটা অনেক বড়। আমি আশা করি তারা এই দায়িত্বটি পালন করবেন।

ইসলামের এই এত গণজোয়ার ছিল এটা কেন ধ্বংস হয়ে গেল? আমাদের তাহলে সমস্যাটা কোথায়? আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই, ফ্রান্সের রাজা নবম লুই, যুদ্ধে

www.pathagar.com

মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়ে ধৃত হন, তখন তিনি তার অনুসারীদের জন্য একটা চিঠি লিখেছিলেন। এবং চিঠিতে বলে ছিলেন যে, *যুদ্ধ করে মুসলমানদেরকে পরাজিত করা যাবে না। মুসলমানদেরকে পরাজিত করতে হলে ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে হবে। সুতরাং মুসলমানদের কোন পথে গেলে পরাজিত করা যাবে সেই বিষয় আমি তথ্য দিচ্ছি।* তিনি যে সমস্ত তথ্য দিয়েছিলেন তার মধ্যে এক. মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং বিভেদকে সুদূর প্রসারী করা। দুই. আরব এবং মুসলিম দেশগুলোতে যাতে কল্যাণকামী সরকার গঠিত হতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। তিন. ঘুষ ও নারী কেলেঙ্কারীর মাধ্যমে মুসলিম দেশসমূহের সরকারগুলোকে ফিতনা ফ্যাসাদের শিকারে পরিণত করা যেন তারা একত্রিত হতে না পারে। চার. নিজ দেশের জন্য জীবন বাজী রাখতে প্রস্তুত এমন মুসলিম সেনাগঠনে বাধা প্রদান করা। পাঁচ. আরব দেশেগুলোতে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয়া। ছয়. আরব ভূ-খন্ডের দক্ষিণে গাঁজায়, উত্তরের আনতাসিয়া, পশ্চিমে পাশ্চাত্যে এবং পূর্ব দিকে পাশ্চাত্য ধরনের রাষ্ট্র সৃষ্টি করা।

আপনা লক্ষ্য করবেন মুসলমানদের সঙ্গে না পেরে এই সমস্ত পথ তারা অবলম্বন করেছে। এবং এখনও তারা সেই কাজটি সচেতনভাবেই সর্বত্র করে যাচ্ছে। এই সম্পর্কে আমাদেরকে যদি সচেতন থাকতে হয় তাহলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবেই অগ্রসর হতে হবে সর্বক্ষেত্রে। আমি সবাইকে সেই কাজটি করার জন্য আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। #

আমাদের সামনে মডেল নেই

আবুল আসাদ

সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম

এই সম্মেলনের দাওয়াত পত্রে একটা কবিতার দু'টি লাইন আছে, *কে আছো জোয়ান হও আগোয়ান হাকিছে ভবিষ্যত/এ তুফান ভারী দিতে হবে পারি নিতে হবে তরি পার।* কবি নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কবিতা *কান্ডারী হুশিয়ার*-এর একটা পংক্তির দু'টা লাইন। গোটা পংক্তিটি হলো এরকম, *দুলিতেছি তরি ফুলিতেছি জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ, ছিড়িয়াছে পাল কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত,* এই কবিতাটি কবি নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন প্রায় একষট্টি বছর আগে। ১৯৪০ সালের দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, নিশ্চয় কবিতাটি তার আগের লেখা। অর্থাৎ বিশ শতকের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দশকে কবিতাটি লেখা হয়েছে। এখন আমার মনে একটা প্রশ্ন, যদি কবি এখন বেঁচে থাকতেন তাহলে এই কবিতাটি কেমন হতো?

আমার মনে হয় চারদিকের যে অবস্থা তাতে কবির এই কবিতার প্রথম দুই লাইন এরকম হতো : "ফুলিয়াছে জল, দুলিয়াছে তরি, ভুলিয়াছে মাঝি পথ, ছিড়িয়াছে পাল ধরে নাই হাল, নাই কারো হিম্মত।" *ঠিক* কবিতাটি এরকম হতো। আসলে সেই সময়ের

www.pathagar.com

অবস্থা, কবি নজরুল ইসলাম যখন এটা লিখলেন তখন যে অবস্থা ছিল এখনকার অবস্থার তার চেয়ে অনেক খারাপ। আপনারা জানেন যে বৃটিশ বিরোধী একশ বছরের যে সশস্ত্র সংগ্রাম- ১৮৭৫ সালের যে মহাযুদ্ধ, মহাবিদ্রোহ, এরপরে মুসলমানদের উপর যে সর্বব্যাপী অত্যাচার নেমে আসে তাতে মুসলমানরা রাজনৈতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে নিষ্পিষ্ট হয়েছে। তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি ছিল না। কিন্তু সেই সময়েও ১৮৭৩ সালে বৃটিশের কাছ থেকে তারা দাবি আদায় করেছিল যে স্কুল কলেজে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। কী দুর্যোগের মুহূর্তেই এই দাবি তারা আদায় করেছিল একটু চিনতা করে দেখুন।

১৮৮২ সালে মুসলমানদের– শ্রেণী কোটা ছিল না, সব জায়গায় হিন্দুরা। সেই দুঃসময়ে ১৮৮২ সালে পৃথক স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের দাবি আদায় করেছিল। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। এই কংগ্রেস ষড়যন্ত্র করে এই প্রতিনিধিত্ব বাতিল করে। এই পদদলিত নিষ্পিষ্ট মুসলমানরাই আবার ১৯০৯ সালে সংস্কারের মাধ্যমে এই পৃথক জনপ্রতিনিধিত্বের অধিকার আদায় করে। এই মুসলমানরাই ১৯১৯ সালে টেমসকোর্ড সংস্কার এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম প্রদেশগুলোতে শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অধিকার আদায় করে। এবং সর্বশেষে ১৯৪৭ সালে নিজেদের ভূ-খন্ড আদায় করে। এটার অবদান সেই সময়ের মুসলমানদের যারা সর্বদিক দিয়ে বিজিত ছিল, নিষ্পিষ্ট ছিল, নেতৃত্বহীন ছিল।

আজকের অবস্থাটা কি? আমদের স্বাধীনতা আছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আছে। কিন্তু আমরা যে স্বতন্ত্র এবং আমাদের যে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি সেটা অরক্ষিত। এটা বিলয়মান। যে কারণে আজকের দাওয়াত পত্রে নজরুলের একষট্টি বছরের আগের কবিতার উল্লেখ করতে হয়েছে। সেই সময় ১৯৫৮ সালে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করতে গিয়ে আবুল কালাম শামসুদ্দীন (দৈনিক পাকিস্তানের (পরে দৈনিক বাংলার) সম্পাদক ছিলেন) চিটাগাং-এর এক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন, পাকিস্তানের ধর্মীয় যুগে সেখানকার মুসলমানদের মনে জাতীয় রেনেসাঁর বাণী জোরদারভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছিল। পাকিস্তান উত্তর যুগে তা স্তিমিত হয়ে আসছে। এটা নিশ্চিত দুঃসংবাদ। আবার বিদেশী ও বিজাতীয় সম্মোহন তরুণ মুসলিমদের মনে মায়াজাল বিস্তার করতে দেখতে পাচ্ছি। সেই জাতীয় জীবনে তার প্রতিফলন ঘটেছে। আবার অন্ধ গতানুগতিকতা সমূহ আমাদের জাতীয় জীবনে কোন অন্ধকার অতল গহ্বরে ঠেলে দেয়ার আয়োজন করছে। তারপরের অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। এই বক্তব্য ৪৩ বছর আগের বক্তব্য।

আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন, রাজনীতি এবং সংস্কৃতি মাথা এবং হৃৎপিন্ডের মত। যদি সংস্কৃতি হৃৎপিন্ড হয় তাহলে রাজনীতি মাথা, আর রাজনীতি যদি হৃৎপিন্ড হয় তাহলে সংস্কৃতি মাথা। আসলে এই কথা আমরা ভুলে গেছি। আর এই কারণেই আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ধর্ম-নিপরপেক্ষতার নামে কিংবা রাজনীতি ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে আমাদের সংস্কৃতি থেকে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তারই ফলে আমরা রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকলেও আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা ক্রমশই অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হচ্ছি। অবাক ব্যাপার আমাদের ইতিহাস বিকৃত হয়েছে। আমাদের জাতীয় বীরদের বিদেশী বলে অভিহিত করা হচ্ছে। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে বিদেশী বলা হয়। এবং এই বাংলার যে সব মুসলিম শাসক ছিলেন তাদেরকে বিদেশী বলে অভিহিত করা হয়। একজন বিখ্যাত লেখক

www.pathagar.com

লিখেছেন, বাংলাদেশে কোথায় বাঙালী রাজত্ব করেছে? সব সময় বিদেশী রাজত্ব করেছে। এ ধরনের হতাশা যদি আমাদের সামনে আসে, এই যে আমাদের কোনো ইতিহাস নেই, আমাদের কোনো জাতীয় বীর নেই– আমাদের উত্তরসূরিরা আমাদের ভবিষ্যত বংশধরেরা উঠে দাঁড়াবার অবলম্বন কোথায় পাবে? এখন চলছে সর্বব্যাপি ষড়যন্ত্র। আমাদের বাংলাদেশে আমাদের উত্তরসূরিরা আমাদের অনুসরণ করার মডেল হিসাবে কোন জাতিকে তারা জানবে? আমরা স্বাধীনতার আগে কায়েদ-এ-আজম মোহাম্মদ আলীকে কবর দিয়েছি। শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে আমরা মদ্যপ মাতাল বলে অভিহিত করছি। এরকমভাবে কোনো নেতা বিতর্কের উর্ধ্বে নেই। সমস্ত নেতাকে আমরা বিতর্কিত করেছি। তাহলে আমাদের সন্তানদের সামনে কাকে মডেল হিসাবে দাঁড় করাবো। অথচ ভারতে দেখেন, টেলিভিশন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তারা তাদের সমস্ত নেতাকে রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষ সিরিয়ালি নিয়ে আসে। এইভাবে, একটি সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের ইতিহাস থেকে শুরু করে আমাদের নাম পর্যন্ত বদলে দেয়া হচ্ছে। এই যে সর্বগ্রাসী সয়লাব একে যদি রোধ করতে হয় তাহলে নতুন করে উঠে দাঁড়াতেই হবে।

যদি স্বাধীনতার পূর্বে মুসলমানরা এতবড় দাবি আদায় করতে পারে, তাহলে স্বাধীনতার পরে আমরা আমাদের ন্যায্য দাবিগুলো আদায় করতে পারবো না কেন? এর জন্য বলিষ্ঠ আন্দোলন দরকার।

আমি আজকের এই সম্মেলনকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং এ ধরনের সম্মেলনের মাধ্যমে আমাদের সুস্পষ্ট কর্মসূচি ঘোষিত হওয়া দরকার। এই সম্মেলনের মাধ্যমে যে ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়েছে আমরা তা সমর্থন করেছি। এই সমর্থন যথেষ্ট নয়, এই সমর্থনকে কার্যকরী করতে পারে রাজনৈতিক শক্তি। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সামনে বর্তমান জোট সরকারের তিনজন মন্ত্রী উপস্থিত। তারা শুনেছেন, আমরা আশা করব শুধু ঘোষণা যেন ঘোষণাই না থাকে তা যেন বাস্তবতার মুখ দেখে। #

সংস্কৃতি জাতির বিশ্বাসের প্রতিফলন

অধ্যাপক তাসনীম আলম
সদস্য সচিব, জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ সম্মেলন ২০০২

আজকের এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সম্মানিত সভাপতি, উপবিষ্ট বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি এবং আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত বিশেষ অতিথি কবি আল মাহমুদ, মঞ্চে উপবিষ্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চেন্সেলর ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ইউসুফ আলী, সম্মানিত বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ড. আবদুস সাত্তার, জাসাসের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আহমদ, আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, সম্মানিত সুধী মন্ডলী, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শিল্পীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

www.pathagar.com

আজ সত্যি এক অন্য রকম অনুভতি আমাদের সকলের হৃদয়কে আলোড়িত করছে। এই প্রথমবারের মতো আমরা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করতে পেরে এবং এই আয়োজনের মাধ্যমে নিজেদের ঐতিহ্যকে জাগ্রত করার প্রয়াস পেয়েছি।

সংস্কৃতি একটি জাতির মৌলিক পরিচয় বহন করে। কেননা সংস্কৃতি যে কোনো জাতির বিশ্বাসের প্রতিফলন। সংস্কৃতি বিশ্বাসী মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। রাজনীতিকেও সত্যিকার অর্থে নিয়ন্ত্রণ করে সংস্কৃতি। সেজন্য পৃথিবীতে যে জাতির সংস্কৃতি যত উন্নত, মানবিক গুণাবলীর থেকেও সে জাতি তত উন্নত। এবং একই কারণে তারা অর্থনৈতিক দিক থেকেও সমৃদ্ধ।

আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি একটি স্বাধীন, সার্বভৌম দেশ। অনেক ত্যাগ এবং কোরবানীর বিনিময়ে আমদের এই মাতৃভূমি স্বাধীনতা অর্জন করেছে। কিন্তু একটি কুচক্রী মহল এই স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র করছে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একদিকে যেমন আমাদের সীমান্তের পাহারা জোরদার করতে হবে, ঠিক তার পাশাপাশি আমাদের যে সাংস্কৃতিক সীমানা রয়েছে তাকেও সুরক্ষিত করতে হবে। সাংস্কৃতিক সীমানাকে অরক্ষিত রেখে দেশের স্বাধীনতা কখনোই রক্ষা করা যাবে না। দেশের প্রতি ইঞ্চি মাটি রক্ষার জন্য আমাদের দেশের বীর যোদ্ধারা যেমন সদা প্রস্তুত রয়েছে, তেমনি পাশাপাশি আমাদের সাংস্কৃতিক সীমানাকেও রক্ষা করার জন্য দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবী, সাংবাদিকসহ দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তাই আজকের এই সম্মেলন থেকে আমি আহ্বান জানাবো বর্তমান জনপ্রিয় চারদলীয় জোট সরকারকে, আমাদের লালিত সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে রক্ষার জন্য তারা যেন সদা সতর্ক থাকেন।

ব্রাহ্মণ্যবাদী ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আঘাত শুরু হয়েছে চারদিক থেকে। আর তাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী এবং সংস্কৃতিসেবী। তাদের কাছে দেশ ও জাতি বড় নয়, বড় হচ্ছে স্বার্থ। তাই আজ এই অপসংস্কৃতির অসারতা প্রমাণ করে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির সৌন্দর্য ও যৌক্তিকতাকে তুলে ধরার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আজকের আমাদের এই আয়োজন। সম্মেলনের পক্ষ থেকে আমরা দেশের সকল দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী কবি সাহিত্যিক শিল্পী সাংবাদিকদের কাছে আকুল আবেদন জানাতে চাই, এই অপসংস্কৃতির হাত থেকে দেশকে জাতিকে রক্ষার জন্য আপনারা এগিয়ে আসুন।

আজকের এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তিনজন মন্ত্রী। আজকের এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন খ্যাতিমান সাহিত্যিক বাংলাদেশের জনপ্রিয় কবি আল মাহমুদ। হাজির হয়েছেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ড. আবদুস সাত্তার, হাজির হয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ইউসুফ আলী, হাজির হয়েছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক জনাব আবুল আসাদ। আমরা আশা করছি, তাদের কাছে থেকে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য আসবে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে তরুণ শিল্পীরা এখানে হাজির হয়েছেন তারা নতুন প্রেরণা ও উৎসাহ নিয়ে এখান থেকে বিদায় নেবেন এবং নিজস্ব সংস্কৃতি, আল্লাহ ও রাসূলের বিশ্বাসের ভিত্তিতে বাংলাদেশের যে সংস্কৃতি বছর পর বছর ধরে চর্চা হচ্ছে, সেই সংস্কৃতিকে এগিয়ে নেবার অনুপ্রেরণা তারা এখান থেকে পাবেন। #

www.pathagar.com

রাজনীতি ও সংস্কৃতি পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত

বাবুল আহমদ

সাধারণ সম্পাদক

জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস)

আজকের একটি সুন্দর পরিবেশে সুন্দর জায়গায় একটি চমৎকার সাবজেক্ট নিয়ে আমরা এখানে আলোচনার জন্য উপস্থিত হয়েছি। সাংস্কৃতিক চর্চা কারা করে? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, আল্লাহুল জামালু ইউহিব্বুল জামালী- আল্লাহ নিজে সুন্দর তাই তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। এবং যারা সুন্দর মনের মানুষ তারাই সাংস্কৃতিক চর্চা করেন।

একটি দেশের রাজনীতি এবং সংস্কৃতি একটি আরেকটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি দেশের রাজনীতিকে বাদ দিয়ে যেমন সে দেশের সংস্কৃতি কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে কিন্তু তার রাজনীতিও কখনো প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। একটি দেশের রাজনীতি যদি হয় হৃৎপিন্ড, তাহলে তার সংস্কৃতি হলো মাথা। আর যদি রাজনীতি হয় মাথা, তাহলে সংস্কৃতি হচ্ছে তার হৃৎপিন্ড। চুয়ান্ন হাজার বর্গমাইলের এলাকা নিয়ে আমাদের দেশ। এদেশের ৮৫ ভাগেরও বেশি লোক মুসলমান। আমরা আল্লাহতে বিশ্বাসী, আমরা রাসূলে বিশ্বাসী, আমরা ইসলামে বিশ্বাসী। আমাদের তো একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। আমাদের সংস্কৃতির একটা ঐতিহ্য আছে। আমাদের সেই সংস্কৃতি ইসলামী মূল্যবোধের। এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ভুলণ্ঠিত করার জন্য একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে কাজ করছে। আমাদের দেশে ভারতের খুদ পোড়া খাওয়া বুদ্ধিজীবী যারা বাংলাদেশে খেয়ে কুলি করেন ভারতে, আমাদের নিজস্ব কৃষ্টি, কালচার, ঐহিত্যকে ধ্বংস করার জন্য এজেন্ট হিসাবে তারা এখানে কাজ করছেন। আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি মানে রাম হিন্দু মজুমদার, আলী যাকের, শমী কায়সার নয়। আমাদের দেশের কিছু লোক মনে করে শুধু টেলিভিশনে অভিনয় করলেই সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে গেল। সিনেমায় অভিনয় করলেই সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে গেল। গান গাইলেই সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে গেল। কথাটি সত্য নয়। একটি দেশের সংস্কৃতি শুধু গান গাওয়া, সিনেমা আর কবিতা লেখা নয়। সংস্কৃতি একটি বিশাল, একটি ব্যাপক ব্যাপার। সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে।

আজকে সারাদেশ থেকে যে সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়ে আপনারা কাজটি করেছেন, আপনারা ইসলামী আদর্শে বিশ্বাস করেন, আমার নেতা

www.pathagar.com

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, তিনিও ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধে বিশ্বাস করতেন। আমরা শহীদ জিয়াউর রহমানের সৈনিক।

আসুন, আপনারা আমরা সম্মিলিতভাবে আমাদের নিজস্ব কৃষ্টি কালচার, ঐতিহ্যকে লালন করার জন্য জিহাদ ঘোষণা করি। যারা আমার নিজস্ব শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য চক্রান্ত করবে তাদের বিষদাঁত আমরা ভেঙে দেব। এই দেশে কোনো অপসংস্কৃতিকে আমরা প্রশ্রয় দেব না।

আমাদের একটি জিনিস বুঝতে হবে। আমাদের মধ্যে কিন্তু সাংস্কৃতিক বোদ্ধা আছেন, কিন্তু তাদের অনেকেই যোদ্ধা নন। আমাদের যারা নেতৃত্ব দেন, তাদের অনেকেই কিন্তু সংস্কৃতি চর্চা করতে চান না। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদেরকে কাছে নিয়ে আসতে চান না। এখন আমাদের দেশে সাহিত্য সংস্কৃতির বোদ্ধা যারা আছেন তাদেরকে যদি আমরা এক জায়গায় জড়ো করতে না পারি, তাহলে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে পারব না। আমরা যারা ইসলামী আদর্শে বিশ্বাস করি, আমি বিএনপি করি তাতে কিছু আসে যায় না, আপনারা জামায়াত করেন তাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের মূল লক্ষ্য তো একটাই। আর সেটা হচ্ছে আমরা সবাই ইসলামী আদর্শে বিশ্বাস করি।

আমরা যারা ইসলামী আদর্শে বিশ্বাস করি এবং আমাদের মুসলিম জাতীয়তাবাদের যে সমস্ত শক্তি আছে, যে শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী আছেন তাদেরকে আমাদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে আমাদের একসাথে আন্দোলন করতে হবে। এটা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

কবি আল মাহমুদ আমার বড় ভাই। দীর্ঘদিন আমরা একসাথে রাজনীতি করেছি। সেদিন একটি প্যাকেজ নাটকে অভিনয় করলাম। ওই নাটকের একটি সংলাপ ছিল যে, *আমেরিকায় থেকে আমি নজরুল রবীন্দ্র চর্চা করতাম*। আমি নাট্যকারকে বললাম, না, রবীন্দ্র নজরুলই শুধু নয় কবি আল মাহমুদকেও আমেরিকাতে চর্চা করা হয়। আমি আমার নাটকের সেই সংলাপে বলেছিলাম যে, *বিদেশে থেকে নজরুল রবীন্দ্রনাথের কবিতার সাথে আল মাহমুদের কবিতাও আমি পড়েছি।*

এইভাবে আমরা যখন যেভাবে সুযোগ পাই আমাদের যারা আছেন তাদের সবাইকে আমাদের তুলে ধরতে হবে। তাদের তুলে না ধরলে ওই যে রামহিন্দু মজুমদার এক জায়গায় দাঁড়ালে যেমন দশজন লোক হয়, আমাদের লোকজন যারা আছেন তাদের দেখেও যদি দশজন লোক এক জায়গায় জড়ো হয়, তাহলে কিন্তু তাদেরকে আমরা প্রতিহত করতে পারব। সেজন্য আমি বলব, আমাদের সরকার বিশেষ করে আমার দলের একজন মন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক এখানে রয়েছেন, সরকারে আরো দুইজন মাননীয় মন্ত্রী এখানে রয়েছেন (কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ), আপনারা আমাদের নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এই ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করুন। আমাদের সংস্কৃতির এই লাইনটা অনেক পিছনে পড়ে গেছে। এটাকে কিভাবে এগিয়ে নেয়া যায় সে ব্যাপারে কথা বলুন। জাতীয়তাবাদের চেতনার সমস্ত শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, বুদ্ধিজীবী যারা আছেন আমরা এক সঙ্গে একটা সিটিং পেতে চাই। এক সঙ্গে আমরা বসতে চাই।

আমার সঙ্গে আপনাদের অনেকেরই প্রায় কথা হয়। আপনারাও অনেকে আমন্ত্রণ জানান, আমিও চেষ্টা করি সব সময় আপনাদের প্রোগ্রামগুলোতে আসার জন্য। আমি আরো

www.pathagar.com

কয়েকটি প্রোগ্রামে এসে বক্তৃতা করে গেছি। কিছুদিন আগে নাট্যকর্মীদের নিয়ে একটা আলোচনা সভা হয়েছিল সেখানেও আমি বক্তব্য রেখেছি। আমি আপনাদের সঙ্গে আছি। আপনাদের সঙ্গে থাকব, ইনশাআল্লাহ। আমাদের নিজস্ব শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য, বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপনাদের সাথে আমি জিহাদ ঘোষণা করছি। খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক বোমা তৈরি করতে চাই

ফিরোজ খান নুন

আহ্বায়ক, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক সংসদ (সসাস)

আজকের এই সাংস্কৃতিক সম্মেলন জাতির বহু কাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত একটি সম্মেলন। এই সম্মেলন বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডের জন্যে, গোটা মুসলিম জাতির জন্যে একটি মাইলফলক। এই সম্মেলনের মাধ্যমেই বাংলাদেশের জনগণ যারা ইসলামী সংস্কৃতি লালন করেন, যে সংস্কৃতিকে পছন্দ করেন, আজকের সম্মেলনটি তারই একটি দিক নির্দেশনা। মূলত বাংলাদেশের ইসলামপ্রেমিক সচেতন মহল যখন মনে করলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতি কিংবা অপসংস্কৃতি এই দেশের ইসলামী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য লিপ্ত রয়েছে, তখন দেশের এই সচেতন মহল চিন্তা করলেন নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে কোনো প্রকার অপসংস্কৃতি ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির প্রাধান্য সহ্য করা যায় না। আর তখনই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই দেশের মানুষের জন্য, ইসলামী সংস্কৃতির জন্য এমন কিছু করার দরকার যার মাধ্যমে এই জাতিকে একটি দিক নির্দেশনা দেয়া যায়। আমরা মুসলমান জাতি, আমরা ইসলামী সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করি। কোনো প্রকার অপসংস্কৃতি, কোনো প্রকার ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতি এদেশের মুসলমানেরা অতীতেও কখনো মেনে নেয়নি, আজও মেনে নিচ্ছে না, আগামী দিনেও কখনো তা মেনে নেবে না।

আমাদের আজকের এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হলো, আমরা সারাদেশের ইসলামী সংস্কৃতি লালনকারী সংগঠনগুলোকে একত্রিত করে, এক একটি অনু পরমাণুতে ঐক্যবদ্ধ করে এমন একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক বোমা তৈরি করতে চাই, যে বোমার বিস্ফোরণ এই দেশ থেকে সকল প্রকার অশ্লীলতা, বেহায়পনা, অপসংস্কৃতি আর ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতিকে সমূলে উৎপাটিত করবে।

এদেশের ইসলামের মূল অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত রয়েছে। কোনো ধরনের অপসংস্কৃতি, অশ্লীলতা এদেশের মুসলমানদের উপর আঘাত হানতে পারবে না। আমরা এই দেশের মুসলমানদের জন্য এই

www.pathagar.com

দেশের সংস্কৃতিকে লালন করার জন্য রাসূল (সাঃ) এর সংস্কৃতিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজনে যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে পিছপা হবো না ইনশাল্লাহ।
আজকের এই সম্মেলন আগামী দিনের সকল প্রকার অশ্লীলতাকে উৎপাটন করার জন্য- আর এই শপথ নিয়ে আমরা এই সম্মেলন থেকে ফিরে যেতে চাই। আমরা কিভাবে ইসলামী সংস্কৃতিকে লালন করব, পাশাপাশি সকল প্রকার অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সমাজের সর্বত্র একটি গণসচেতনতা সৃষ্টি করব, তার একটি সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা এই সম্মেলন থেকে পাবো বলে আশা করছি। #

সাংস্কৃতিক কর্মী মানে একজন পরিপূর্ণ মানুষ

সাইফুল্লাহ মানছুর

সভাপতি, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

আমরা এমন একটি সময় অতিক্রম করছি যখন আমরা আমাদের অতীত ঐতিহ্যকে প্রায়ই হারাতে বসেছি। এখনকার তরুণ সমাজকে যদি অতীতের পাঁচশ বছর নয় যদি পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসের কথাও বলা হয় তার সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারবে না। এর পাশাপাশি তরুণ সমাজকে বিভ্রান্ত করার জন্য সর্বত্র অশ্লীলতা, বেহায়াপনায় সয়লাব হয়ে যাচ্ছে।
সমাজের ন্যূনতম যে সততা নৈতিকতা থাকার দরকার ছিল তাও আজ আমাদের মাঝ থেকে অনুপস্থিত। সর্বত্রই একটি অস্থিরতা। রাস্তাঘাটে, আপনে যেখানেই যান দেখবেন মানুষ চঞ্চল, অস্থির- ধীরস্থির ভাবে কিছু ভাবার চিন্তা করার যেন অবকাশ আমাদের নেই। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমাদের ছোট্ট জাতিকে বিভক্ত করার জন্যে অতীতেও যেমন তৎপর ছিল এখনও সেই তৎপরতা চালাচ্ছে। বিভিন্ন ইসুতে আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার যে অপতৎপরতা বর্তমানে চলছে তা আজ ভাবার বিষয়। জাতীয়ভাবে আমরা ন্যূনতম কোনো ইসুতে একমত হতে পারি না। এভাবে একটি জাতি চলতে পারে না। বিভ্রান্ত এবং হতাশাগ্রস্ত এই জাতিকে অবশ্যই বাঁচাতে হবে।
সর্বত্র যে হতাশা তা থেকে পরিত্রাণ যে অত্যন্ত জরুরি সে ব্যাপারে আপনারা সবাই একমত হবেন। কিন্তু দরকার কাজটি এক জায়গায় থেকে শুরু করা। জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ সেই কাজটিই শুরু করতে যাচ্ছে। সাংস্কৃতিক কর্মী মানেই শুধুমাত্র শিল্পী নন, অভিনেতা নন, নাট্যকার নন কিংবা কবি নন। সাংস্কৃতিক কর্মী মানে হচ্ছে একজন পরিপূর্ণ মানুষ। সাংস্কৃতিক কর্মী মানেই হচ্ছে যাকে দেখে অনুপ্রাণিত হওয়া যায়। যাকে দেখে বুক বাঁধা যায়। যেমন পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।
আজকের এই সম্মেলন সেই সুন্দর মানুষ উপহার দিবে, জাতিকে আলোকিত করবে, হতাশাগ্রস্ত জাতিকে পথ দেখাবে এই প্রত্যাশা রেখেই আমি আমার কথা শেষ করছি। #

www.pathagar.com

সংস্কৃতি আইনের চেয়ে শক্তিশালী

শাহ আবদুল হান্নান
চেয়ারম্যান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিডেট
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন ২০০২-এর দ্বিতীয় পর্ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্য]

আমি এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সাংস্কৃতিক পর্বের উদ্বোধন করার আগে সংক্ষেপে দু'একটি কথা আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই।

প্রথমতঃ সংস্কৃতি কি? এ সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। সংস্কৃতি শুধু নাচ, গান বা কবিতাই নয়। সংস্কৃতি হলো মানুষের গোটা জীবনাচার। মোটামুটিভাবে আমরা সংস্কৃতি সম্পর্কে বলতে পারি এই জীবনাচার হলো মানুষ যা করে, তার পরিবার যা করে, অর্থাৎ রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিকতা প্রভৃতিতে যে আচার বা জীবন পদ্ধতি মেনে চলা।

দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের মুসলিম জনগণ অবশ্যই ইসলামী সংস্কৃতি মেনে চলবে। তারা মুসলমান। তারা এদেশে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। এখানে কারোর উপর ইসলাম চাপিয়ে দেয়া হয়নি। ইসলাম প্রচারের জন্য জোর জবরদস্তি করা হয়নি। যেহেতু এদেশের জনগণ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং করেছে তাই ইসলাম ও ঈমানের দাবি এটা যে, তাদের উপর অনৈসলামিক কিছু চাপিয়ে দেয়া যাবে না। ইসলামী সংস্কৃতি এখানে প্রতিফলিত হতে হবে। ইসলাম বিরোধী কোনো কিছু তারা গ্রহণ করবে না। আবার ইসলাম বিরোধী কোনো কিছু গ্রহণ করার দাবি করাও অন্যায়। কেউ এ রকম দাবিও করতে পারে না। তা হবে অযৌক্তিক।

তৃতীয়তঃ বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী থাকতে পারে। আমাদের মধ্যে মুসলিম ও অমুসলিম জনগোষ্ঠী একত্রে বসবাস করে। অমুসলিম জনগণ তাদের সংস্কৃতি অনুসরণ করবে, আর মুসলিম জনগণ তাদের মুসলিম সংস্কৃতি অনুসরণ করবে। মুসলমানরা সেইটুকু শুধু তাদের আচার হিসাবে, জীবন পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করবে যেটা ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

চতুর্থতঃ বাংলাদেশের মুসলিম সংস্কৃতিতে আমরা মুসলিম জনগণ যারা মুসলিম নন তাদের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে পারি না।

আরেকটি কথা অপনাদের বলতে চাই, সংস্কৃতি আইনের চেয়ে গভীর। আইনের মাধ্যমে মানুষের ভেতর সহজে প্রবেশ করা যায় না। কিন্তু সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষের ভেতর অনেক গভীরভাবে

www.pathagar.com

প্রবেশ করা যায়। আইনকে সহজে পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু সংস্কৃতিকে সহজে পরিবর্তন করা যায় না। আমরা চাই ইসলামী মূল্যবোধ সংস্কৃতির অংশে পরিণত হবে। ইসলামের মূল্যবোধ এবং ধারণাকে আমাদের সংস্কৃতির অংশ করে রাখতে হবে। তাহলে আমাদের সংস্কৃতিকে এই ইসলামের ব্যানারে এখানে কখনো অপব্যাখ্যা করা সহজ হবে না। বরং অপসংস্কৃতি প্রতিরোধ করা সহজ হবে।

আপনারা যারা সংস্কৃতির শক্তিশালী ভিত গড়তে চান-তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ-সংস্কৃতি থেকে অশ্লীলতা, নারীর অপব্যবহার ও নারীর অমর্যাদাকর বিষয়গুলোকে দূর করতে হবে। সংস্কৃতিকে মানবতার সেবায় নিয়োগ করতে হবে।

আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে মানবকল্যাণী সংস্কৃতির প্রতি। দেখতে হবে তা মানুষের চরিত্রকে উন্নত করে না ধ্বংস করে।

কাজেই আমরা বলব, গান হোক, কবিতা হোক, সাহিত্য হোক সবকিছুকেই আমাদের পজিটিভ দিক করতে হবে। নেগেটিভ কোনো কিছু নয়।

আমি এই কথাগুলো বলেই এই সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করছি। #

(প্রতিটি ভাষণের অনুলিখন : ওমর বিশ্বাস)

www.pathagar.com

প্রবন্ধ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা

কাজী নজরুল ইসলাম

১৯২৯ খৃস্টাব্দে চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠানের সভাপতি কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই অভিভাষণ প্রদান করেন।

আজ আপনাদের কাছে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে আগে মনে হচ্ছে কবির একটা লাইন-"ঝড় আসে নিমিষের ভুল।" সেদিনের পশ্চিমে-ঝড় যখন এসেছিল বদ্ধ দ্বারের জিঞ্জিরে নাড়া দিতে, সেদিন যখন সে বহিরাঙ্গনে দাঁড়িয়ে গেয়েছিল-

কারাগারে দ্বারী গেলে
তখনি কি মুক্তি মেলে?
আপনি তুমি ভেতর থেকে
চেপে আছে দ্বারখানা।

তখন আপনারা তাকে বরণ করেছিলেন খাঞ্চা-ভরা সওগাত, রেকাবি ভরা শিরনি দিয়ে, শিরিন নজরের নজরানা দিয়ে। আপনাদের হাতের ফুলে তার কণ্ঠের নীল বুকের কাঁটা ঢাকা পড়ে গেছিল। আপনাদের শিরোপার ভারে তার শির সেদিন আপনি নুয়ে পড়েছিল। সে-বার শুধু যে তার সশ্রদ্ধ সালাম নিবেদন করা ছাড়া প্রতিদানে কিছুই দিয়ে যেতে পারেনি।
আজ সে আবার এসেছে সেই পরিচিত দুয়ারে ফুলের লোভে নয়, মালার আশায় নয়, তার স্মরণ-তীর্থ জিয়ারত করতে। সেবার সে বলেছিল-

খুলব দুয়ার মত্ত বলে,
তোদের বুকের পাষাণ-তলে
বন্দিনী যে ঝর্ণাধারা
    মুক্তি দেবো মুক্তি তায়

হারিয়ে গেছে দোরের চাবি,
তাই কেঁদে কি লোক হাসাবি?
আঘাত হেনে খুলব দুয়ার,
    আয় যাবি কে সঙ্গে আয়?

দ্বারের মায়া করে তোরা
বন্দী রবি নিজ কারায়
নাই ক চাবি, হাত আছে তোর,
    খুলব দুয়ার তার সে ঘায়!

www.pathagar.com

সেই ঝড় আবার এসেছে- হয়ত বা তেমনি নিমেষের ভুলেই। এবার সেই ঝোড়ো হাওয়া "পুবের হাওয়া" হয়ে। তার রূপ সুর দুই-ই হয়ত বদলে গেছে। আজ হয়ত সে বলতে চায়-

"ঘা দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান গেয়ে দ্বার খুলবো।

সে-বার যে এসেছিল তরবারির বোঝা নিয়ে, এবার সে এসেছে ফুল ফোটানোর মন্ত্র শিখে। এমনিই হয়। ফাল্গুনের মলয়-সমীর বৈশাখে দেখা কালবৈশাখী- রূপে, শ্রাবণে সেই আসে পুবের হাওয়া হয়ে। হৈমন্তীর আঁচল ভরে ওঠে তারি শিশিরাশ্রুতে, আঁচল দুলে ওঠে তারি হিমেল হাওয়ায়। পউষে তারি দীর্ঘশ্বাস পাতা ঝরায়।

ফুল ফোটানোই আমার ধর্ম। তরবারি হয়ত আমার হাতে বোঝা, কিন্তু তাই বলে তাকে আমি ফেলেও দেইনি। আমি গোধূলি বেলায় রাখাল ছেলের সাথে বাঁশি বাজাই, ফজরে মুয়াজ্জিনের সুরে সুর মিলিয়ে আজান দেই, আবার দীপ্ত মধ্যাহ্নে খর তরবার নিয়ে রণভূমে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তখন আমার খেলাই বাঁশি হয়ে ওঠে যুদ্ধের বিষাণ, রণশিঙ্গা।

সুর আমার সুন্দরের জন্য, আর তরবারি সুন্দরের অবমাননা করে যে- সেই অসুরের জন্য। কিন্তু কিছু বলবার আগে স্মরণ করি সেই বিরাট পুরুষকে যার কীর্তি শুধু তাঁকে মহিমান্বিত করেনি, আপনাদের চট্টলবাসী মুসলমানদের- তথা বাঙলার সারা মুসলিম সমাজকে নর-নারী-নির্বিশেষে মহিমান্বিত করেছে। তিনি আপনাদেরই এবং আমাদেরও পূণ্যশ্লোক মরহুম খানবাহাদুর আবদুল আজিজ সাহেব। শাহজাহানের তাজমহল গড়ে উঠেছিল শুধু মমতাজের ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে- তাজমহল সুন্দর। কিন্তু এই আত্মভোলা পুরুষের তাজমহল গড়ে উঠেছে সকল কালের সকল মানুষের বেদনাকে কেন্দ্র করে। এ তাজমহল শুধু beautiful নয়, এ sublime মহিমাময়!

ব্যক্তিগত জীবনে আমি তাঁকে জানবার সুবিধা পাইনি। চাঁদ দেখিনি কিন্তু সমুদ্রের জোয়ার দেখেছি। জোয়ার শুধু পূর্ণিমার চাঁদই জাগায় না, মৃত্যুর অমাবস্যার অন্তরালে ঢাকা পড়ে যে চাঁদ- সেও জোয়ার জাগায়। তাঁকে দেখিনি কিন্তু তাঁকে অনুভব করেছি এবং আজও করছি আপনাদের জাগরণের মাঝে- আমাদের নারী জাগরণের উদয়-বেলায়।

এমনি করে এক একটা সর্বভোলা সর্বত্যাগী মানুষ আসে আমাদের মাঝে। আমাদের স্বার্থের কালো চশমা দিয়ে তখন তাঁকে দেখি মলিন করে। তাঁকে বলা হয় পাগল নয় স্বার্থপর। কোকিল যখন আসে বাগে বাহারের খোশ-খবরি নিয়ে, কর্তব্যপরায়ণ কাক তখন দল বেঁধে তাকে তাড়া করে। তার গানকে তারা মনে করে উৎপাত। অভিমানী কোকিল বসন্ত শেষে উড়ে যায় নতুন বুলবুলিস্তানের সন্ধানে, তখন সারা কানন জুড়ে জাগে বিরাট একটা অভাব-বোধ, পেয়ে হারানোর তীব্র বেদনা।

পাখি উড়ে যায়- তারপর আসে সেই সুদিন যার আগমনী গান সে গেয়েছিল। তখন সেই সুদিনের সুন্দর আলোকে স্মরণ করি সেই সকলের-আগে-জাগা গানের পাখিকে। কিন্তু পাখি তখন থাকে না ক, থাকে পাখির স্বর।

আমি তাঁরির মত গানের পাখি- আপনাদের এই স্মরণ বেলায় আমিও এসেছি তাই তীর্থযাত্রী হয়ে তাঁকেই স্মরণ করতে- যিনি আমাদের বহু আগে জেগেছিলেন। তাঁর পাক কদমে আমার হাজার সালাম।

তিনি আজ আমার সালাম নিবেদনের বহু উর্ধ্বে, বহুদূরে; তবু এ ভরসা রাখি যে, আমার এই অকূলে ভাসিয়ে দেওয়া ফুল তাঁর চরণ ছুঁয়ে ধন্য হবেই। আমি জানি, এ বিশ্বে কোনো

www.pathagar.com

কিছুই নশ্বর নয়, কোনো কিছুই হারায় না কোনোদিন। যে-রূপে যে-লোকেই হোক তিনি আছেন এবং আমার এই ভাসিয়ে দেওয়া সালামি ফুলও সেই না জানার অকূলে কূল পাবেই পাবে।

আমরা বড় কাউকে যখন হারাই, তখন তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি- তাঁর সৃষ্টিকে, তাঁর সাধনাকে শ্রদ্ধা করে, তাঁকে বাঁচিয়ে রেখে। যে বিরাট আত্মার নৈকট্য থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি, তার দুঃখ বহু পরিমাণে ভুলতে পারব, যদি তাঁরই অসমাপ্ত সাধনাকে আমাদের সাধনা বলে গ্রহণ করতে পারি। চট্টলের আজিজ নাই, কিন্তু বাঙলার আজিজরা- দুলাল ছেলেরা আজও বেঁচে আছে- তাদেরই মধ্যে তাঁকে ফিরে পাব পরিপূর্ণরূপে এই হোক আপনাদের- এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সাধনা। এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার নেই। তাঁর কাজ তিনি করে গেছেন। তাঁর বাহারে'র মত বাহার হয়ত বা থাকতেও পারে কিন্তু তার নাহারে'র মত নাহার আপনাদের চট্টলের মুসলমানের ঘরে কয়টি আছে আমার জানা নেই।

তিনি সুর ধরিয়ে দিয়ে গেছেন, এখন একে 'সমে' পৌঁছে দেওয়া আপনাদের কাজ। উস্তাদ নেই, শিষ্যরা ত আছেন। একজন উস্তাদের অভাব কি শত শিষ্যও পূরণ করেত পারবে না? বন্ধু বান্ধব অনেকের কাছেই শুনেছি আপনাদের উস্তাদের লক্ষ্য ছিল অসীম, আশা ছিল বিপুল, আকাঙ্ক্ষা ছিল বিরাট।

সাগর যাদের চরণ ধোয়ায়, পর্বতমালা যাদের শিয়রের বিনিদ্র প্রহরী, নদী-নির্ঝরিণী যাদের সেবিকা, অগ্নিগিরি যাদের বুকের ওপর, উচ্ছল জলপ্রপাত যাদের অবিনাশী প্রাণধারা, কানন কুঞ্জ যাদের শ্রী-নিকেতন, বন্য-হিংস্র শার্দূল-সর্প যাদের নিত্যসহচর, তারা সেই মহান পুরুষের বিরাট দায়িত্বকে গ্রহণ করতে ভয় করে একথা আর যে বলে বলুক আমি বলব না।

আপনাদের শিক্ষা সমিতিতে এসেছি আমি আর একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। সে হচ্ছে, আপনাদের সমিতির মারফতে বাঙলার সমগ্র মুসলিম সমাজের বিশেষ করে ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে- আমি যে মহান স্বপ্ন দিবা-রাত্রি ধরে দেখেছি- তাই বলে যাওয়া। এ স্বপ্ন যে একা আমারই তা নয়। এই স্বপ্ন বাঙলার তরুণ মুসলিমের, প্রবুদ্ধ ভারতের, এ স্বপ্ন বিংশ শতাব্দীর নব-নবীনের। আমি চাই, আপনাদের এই পার্বত্য উপত্যকায় সে স্বপ্ন রূপ ধরে উঠুক।

আমি চাই, এই পর্বতের বিবর থেকে বেরিয়ে আসুক তাজা তরুণ মুসলিম, যেমন করে শীতের শেষে বেরিয়ে আসে জরার খোলস ছেড়ে বিষধর ভুজঙ্গের দল। বিশ্বের এই নব্য অভ্যুদয়-দিনে সকলের হাতে হাত মিলিয়ে চলুক আমার নিদ্রোত্থিত ভাইরা।

আপনাদের সমিতির উদ্দেশ্য হোক ঃ আদাওতি করে আসন জয় করা নয়- দাওত দিয়ে মনের সিংহাসন অধিকার করা।

আপনাদের ইসলামাবাদ হোক ওরিয়েন্টাল কালচারের পীঠস্থান- আরাফাত ময়দান। দেশ-বিদেশের তীর্থ যাত্রী এসে এখানে ভিড় করুক। আজ নব জাগ্রত বিশ্বের কাছে বহু ঋণী আমরা, যে ঋণ আজ শুধু শোধই করব না- ঋণ দানও করব, আমরা আমাদের দানে জগতকে ঋণী করব- এই হোক আপনাদের চরম সাধনা। হাতের তালু আমাদের শূন্য পানেই তুলে ধরেছি এতদিন, সে লজ্জা আজ আমরা পরিশোধ করব। আজ আমাদের হাত উপুড় করবার দিন এসেছে। তা যদি না পারি সমুদ্র বেশি দূরে নয়, আমাদের এ লজ্জার

www.pathagar.com

পরিসমাপ্তি যেন তারি অতল জলে হয়ে যায় চিরদিনের তরে। আমি বলি, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের মতো আমাদেরও কালচারের সভ্যতার জ্ঞানের সেন্টার বা কেন্দ্রভূমির ভিত্তি স্থাপনের মহৎ ভার আপনারা গ্রহণ করুন– আমাদের মতো শত শত তরুণ খাদেম তাদের সকল শক্তি আশা-আকাঙ্ক্ষা জীবন অঞ্জলির মতো করে আপনাদের সে উদ্যমের পায়ে অর্ঘ্য দেবে।

প্রকৃতির এই লীলাভূমি সত্যিই বুলবুলিস্তানে পরিণত হোক– ইরানের শিরাজের মতো। শত শত সাদি, হাফিজ, খৈয়াম, রুমী, জামী, শমশি-তবরেজ এই সিরাজবাগে– এই বুলবুলিস্তানে জন্মগ্রহণ করুক। সেই দাওতের আমন্ত্রণের গুরুভার আপনারা গ্রহণ করুন। আপনারা রুদকির মত আপনাদের বদ্ধ প্রাণধারাকে মুক্তি দিন।

আমি এইরূপ "কালচারাল সেন্টারের" প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নানা কারণে। একটি কারণ তার রাজনৈতিক।

পলিটিক্সের নাম শুনে কেউ যেন চমকে উঠবেন না। আমি জানি, আপনাদের এই সমিতি রাজনীতি আলোচনার স্থান নয়, তবু যেটুকু না বললে নয়, আমি শুধু ততটুকুই বলব। এবং সেটুকু কারুর কাছেই ভয়াবহ হয়ে উঠবে না। আমি তাই একটু খুলে বলব মাত্র।

ভারত যে আজ পরাধীন এবং আজো যে স্বাধীনতার পথে তার যাত্রা শুরু হয়নি– শুধু আয়োজনেরই ঘটা হচ্ছে এবং ঘটও ভাঙছে– তার একমাত্র কারণ আমাদের হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের প্রতি হিংসা ও অশ্রদ্ধা। আমরা মুসলমানেরা আমাদেরই প্রতিবেশী হিন্দুর উন্নতি দেখে হিংসা করি, আর হিন্দুরা আমাদের অবনত দেখে আমাদের অশ্রদ্ধা করে। ইংরেজের শাসন সবচেয়ে বড় ক্ষতি করছে এই যে, তার শিক্ষা-দীক্ষার চমক দিয়ে সে আমাদের এমনিই চমকিত করে রেখেছে যে, আমাদের দুই জাতির কেউ কারুর শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতার মহিমার খবর রাখিনে। হিন্দু আমাদের অপরিচ্ছন্ন অশিক্ষিত কৃষাণ–মজুরদের– আর তাদের সংখ্যাই আমাদের জাতের মধ্যে বেশি– দেখে মনে করে, মুসলমান মাত্রই এই রকম নোংরা, এমনি মূর্খ, গোঁড়া। হয়ত বা যথা পূর্বং তথা পরং। দারিদ্র্য মূর্খ কালিমদ্দি মিয়াই তার কাছে অ্যাভারেজ মুসলমানের মাপকাঠি।

জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শিল্পে-সঙ্গীতে সাহিত্যে মুসলমানের বিরাট দানের কথা হয়, তারা জানেই না, কিংবা শুনলেও আমাদের কেউ তাদের সামনে তার সত্যকার ইতিহাস ধরে দেখাতে পারে না বলে বিশ্বাস করে না; মনে করে– ও শুধু কাহিনী। হয়ত একদিন ছিল যখন হিন্দুরা মুসলমানদের অশ্রদ্ধা করত না। তখন রাজভাষা State Language ছিল ফার্সি, কাজেই হিন্দুরাও বাধ্য হয়ে ফার্সি শিখতেন– এখন যেমন আমরা ইংরেজি শিখি। আর ফার্সি জানার ফলে তাঁরা মুসলমানদের বিশ্ব-সভ্যতায় দানের কথা ভালো করেই জানতেন। কাজেই সে সময় অর্থাৎ ইংরেজ আসার পূর্ব পর্যন্ত কোনো মুসলমান নওয়াব বাদশার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেও সমগ্র মুসলমান জাতি বা ধর্মের উপর বিরূপ হয়ে ওঠেননি। শিবাজী প্রতাপ যুদ্ধ করেছিল আওরঙ্গজেব আকবরের বিরুদ্ধে, মুসলমান ধর্ম বা ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে নয়। তখনকার সেই অশ্রদ্ধা ছিল ব্যক্তির বিরুদ্ধে Person এর against এ– গোষ্ঠীর বা সমগ্র জাতটার ওপর একেবারেই নয়।

কিন্তু আজ আমাদের জাতীয় জীবনের সবেচেয়ে বড় ট্রাজেডি এই যে, আমরা সবেচেয়ে কাছের মানুষটিকেই সবচেয়ে কম করে জানি। আমরা ইংরাজের কৃপায়, ইংরাজি, গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু থেকে শুরু করে ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, চেক,

www.pathagar.com

স্ক্যানডিনেভিয়ান, চীন, জাপানি, হনলুলু, গ্রিনউইচের ভাষা জানি, ইতিহাস জানি, তাদের সভ্যতার খবর নিই, কিন্তু আমারই ঘরের গায়ে গা লাগিয়ে যে প্রতিবেশীর ঘর তারই কোনো খবর রাখিনে বা রাখার চেষ্টাও করিনে। বরং ঐ না জানার গর্ব করি বুক ফুলিয়ে। একেই বলে বোধ হয়, penny wise pound Foolish!

হিন্দু আরবি, ফার্সি, উর্দু জানে না! অথচ আমাদের শাস্ত্র-সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞান সবকিছুর ইতিহাস আমাদের ঘরের বিবিদের মতোই ঐ তিন ভাষার হেরেমে বন্দী। বিবিদের হেরেমের প্রাচীর বরং একটু করে ভাঙতে শুরু হয়েছে, ওদের মুখের বোরকাও খুলছে, কিন্তু ঐ তিন ভাষার প্রাচীর বা বোরকা-মুক্ত হল না আমাদের অতীত ইতিহাস, আমাদের দানের মহিমা। অতএব, অন্য ধর্মাবলম্বীদের আমাদের কোনো কিছু জানে না বলে দোষ দেবার অধিকার আমাদের নেই। অবশ্য আমরাও অনুস্বারের সঙ্গিন ও বিসর্গের কাঁটা বেড়া ডিঙিয়ে সংস্কৃতের দুর্গে প্রবেশ করতে পারিনি বা তার চেষ্টাও করিনে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু তবু কতকটা কিনারা করেছে সে সমস্যার। তারা প্রাদেশিক ভাষায় তাদের সকল কিছু অনুবাদ করে ফেলেছে। সংস্কৃতের সঙ্গীন-উচানো দুর্গ থেকে রূপ-কুমারীকে গোপনে মুক্তিদান করেছে। তার ভবনের আলো আজ ভুবনের হয়ে উঠেছে।

মাতৃভাষায় সে সবের অনুবাদ হয়ে এই ফল হয়েছে যে, অন্তত বাঙলার মুসলমানেরা হিন্দু কালচার, শাস্ত্র, সভ্যতা প্রভৃতির সঙ্গে যত পরিচিত, তার শতাংশের একাংশও পরিচিত নয় সে তার নিজের ধর্ম সভ্যতার ইত্যাদির সাথে।

কোনো মুসলমান যদি তার সভ্যতা ইতিহাস ধর্মশাস্ত্র কোনো কিছু জানতে চায় তাহলে তাকে আরবি-ফার্সি বা উর্দুর দেওয়াল টপকাবার জন্য আগে ভালো করে কসরৎ শিখতে হবে। ইংরেজি ভাষায় ইসলামের ফিরিঙ্গি রূপ দেখতে হবে। কিন্তু সাধারণ মুসলমান বাঙলাও ভালো করে শেখে না, তার আবার আরবি-ফার্সি। কাজেই ন' মন তেলও আসে না, রাধাও নাচে না। আর যাঁরা ও ভাষা শেখেন, তাঁদের অবস্থা "পড়ে ফার্সি বেচে তেল।" আর তাদের অনেকেই শেখেনও সেরেফ হালুয়া-রুটির জন্য। কয়জন মৌলানা সাহেব আমাদের মাতৃভাষার পাত্রে আরবি-ফার্সি সমুদ্র মন্থন করে অমৃত এনে দিয়েছেন জানি না। সে অমৃত তারা একা পান কোরেই 'খোদার খাসি' হয়েছেন।

কিন্তু এ খোদার খাসি দিয়ে আর কতদিন চলবে? তাই আপনাদের অনুরোধ করতে এসেছি – এবং আপনাদের মারফতে বাঙলার সকল চিন্তাশীল মুসলমানদেরও অনুরোধ করছি, আপনাদের শক্তি আছে, অর্থ আছে– যদি পারেন মাতৃভাষায় আপনাদের সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতার অনুবাদ ও অনুশীলনের কেন্দ্রভূমি যেখানে হোক প্রতিষ্ঠা করুন। তা না পারলে অনর্থক ধর্ম ধর্ম বলে, ইসলাম বলে চিৎকার করবেন না।

আমাদের Next door neighbour এর মন থেকে আমাদের প্রতি এই অশ্রদ্ধা দূর হবে এই এক উপায়ে আর তবেই ভারতে স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হবে। সমস্ত সাম্প্রদায়িক মাতলামিরও অবসান হবে সেই দিন, যেদিন হিন্দু মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে আলিঙ্গন করতে পারবে। সেদিন যে Competition হবে সে competition হবে cultured মনের chivalrous competition - sports-man like competition. #

www.pathagar.com

সংস্কৃতির মর্মকথা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

"ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা" মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদীর একটি আলোচিত গ্রন্থ। প্রয়োজনীয় তো বটেই। গ্রন্থটিতে মাওলানা সংস্কৃতির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা যেমন নতুন মনে হয়, তেমনি তা যে একজন মুসলমানের জন্য জানা কতটা প্রয়োজন- তা পড়ার পর পরিষ্কার বোঝা যায়। মাওলানা তার এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটিতে পার্থিব জগত সম্পর্কে ইসলামের ধারণা, জীবনের লক্ষ্য, ইসলামী সংস্কৃতিতে ঈমানের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয় স্পষ্ট ও সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন। আমরা মাওলানার এই মূল্যবান গ্রন্থটি থেকে এখানে খানিকটা তুলে ধরলাম। আধুনিক প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা' গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেছেন মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

পাশ্চাত্য লেখকগণ এবং তাদের প্রভাবাধীন প্রাচ্য পণ্ডিতদেরও একটি বিরাট দল এই ধারণা পোষণ করে থাকে যে, ইসলামী সংস্কৃতি তার পূর্ববর্তী সংস্কৃতিসমূহ, বিশেষত গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত এবং যেহেতু আরবীয়-মানস এই পুরানো উপাদানগুলোকে এক নতুন ভঙ্গিতে বিন্যস্ত করে এর বহিরাকৃতিকে বদলে দিয়েছে, এ জন্যই এক স্বতন্ত্র সংস্কৃতির রূপ পরিগ্রহ করেছে। এহেন দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই এই শ্রেণীর লোকেরা পারসিক, বেবিলনীয়, সাবমেনীয়, ফিনিসীয়, মিশরীয় এবং গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির ভেতর ইসলামী সংস্কৃতির উপাদান তালাশ করে থাকে। অতঃপর যে মানসিকতা এবং সংস্কৃতিগুলো থেকে আপন সুবিধা মতো মাল-মশলা নিয়ে তাকে নিজস্ব ভঙ্গিতে বিন্যস্ত করে নিয়েছে, আরবীয় প্রকৃতিতে সেই মানসিকতার উপাদান খুঁজে বেড়ায়।

ভুল ধারণা

কিন্তু এ এক মারাত্মক রকমের ভুল ধারণা। কারণ, একথা যদিও সত্য যে, মানুষের বর্তমানকাল চিরদিনই অতীতকাল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে এবং সেহেতু প্রত্যেক নব রূপায়নেই পূর্ববর্তী গঠন-উপাদান থেকে সাহায্য গ্রহণ করা হয়, তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, ইসলামী সংস্কৃতি আপন প্রাণসত্তা ও মৌলিক উপাদানের দিক থেকেই সম্পূর্ণরূপেই ইসলামী এবং এর ওপর কোনো অনৈসলামী সংস্কৃতির অণুমাত্রও প্রভাব নেই। অবশ্য এর বাইরের খুঁটিনাটি বিষয়ে আরবীয় মনন, আরবীয় ঐতিহ্য এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংস্কৃতিগুলোর কিছু না কিছু প্রভাব অবশ্যই পড়েছে। ইমারতের একটা দিক হচ্ছে তার নকশা, তার নির্মাণ কৌশল, উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য মোতাবেক তার গড়ে ওঠা; এটিই হচ্ছে তার আসল ও মূল জিনিস। আর একটি দিক হচ্ছে তার বর্ণ, বৈচিত্র্য, তার কারুকার্য এবং তার শোভা-সৌন্দর্য, এটি হচ্ছে তার খুঁটিনাটি ও

www.pathagar.com

ছোট-খাট ব্যাপার। সুতরাং আসল ও মূল জিনিসের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, ইসলামী সংস্কৃতি-সৌধ সম্পূর্ণত ইসলামেরই গঠন-ক্রিয়ার ফল। তার নকশা তার নিজস্ব- অন্য কোনো নকশা থেকে এ ব্যাপারে সাহায্য নেয়া হয়নি। তার নির্মাণ কৌশল তার নিজেরই উদ্ভাবিত, এ ক্ষেত্রে অপর কোনো নমুনার অনুকরণ করা হয়নি। তার নির্মাণ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অভিনব; এ উদ্দেশ্যে আর কোনো ইমারত না এর আগে নির্মিত হয়েছে, না পরে।

অনুরূপভাবেই এ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যে যে ধরনের গঠনকার্যের প্রয়োজন ছিল, ইসলামী সংস্কৃতি ঠিক সেইরূপেই রূপায়িত হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সে যা কিছু নির্মাণ করেছে, তাতে বাইরের কোনো প্রকৌশলী না কোনো সংস্কার-সংশোধনের ক্ষমতা রাখে, আর না রাখে কোনো সংযোজনের। বাকী থাকে খুঁটিনাটি ও ছোট-খাট বিষয়গুলো; এ ব্যাপারেও ইসলাম অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে খুব কম জিনিসই গ্রহণ করেছে। এমন কি বলা যেতে পারে যে, এরও বেশির ভাগ ইসলামেরই নিজস্ব জিনিস। অবশ্য মুসলমানরা অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে বর্ণ, বৈচিত্র্য, কারুকার্য এবং শোভা সৌন্দর্যের উপকরণ নিয়ে এ দিককার সমৃদ্ধি কিছুটা বাড়িয়েছে। আর এটাই দর্শকদের চোখে এতখানি প্রকট হয়ে উঠেছে যে, গোটা ইমারতের ওপরই তারা অনুকরণের অপবাদ চাপিয়ে দেবার প্রয়াস পাচ্ছে।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা

এ বিষয়ের মীমাংসা করতে হলে সবার আগেই প্রশ্নের জবাব পেতে হবে যে, সংস্কৃতি কাকে বলে? লোকেরা মনে করে যে, সংস্কৃতি বলতে বুঝায় কোনো জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শন, শিল্প-কারিগরী, ললিতকলা, সামাজিক রীতি, জীবন পদ্ধতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো সংস্কৃতির আসল প্রাণবস্তু নয়, তার ফলাফল ও বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সংস্কৃতি বৃক্ষের মূল, কাণ্ড নয়, তার শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব মাত্র। এ সব বাহ্যিক লক্ষণ ও খোলসের ভিত্তিতে কোনো সংস্কৃতির মূল্যমান নির্ধারিত করা যায় না। তাই এগুলো বাদ দিয়ে আমাদেরকে সংস্কৃতির প্রাণবস্তু অবধি পৌঁছা দরকার, তার মূল ভিত্তি ও মৌলিক উপাদানগুলো তালাশ করা প্রয়োজন।

সংস্কৃতির মৌলিক উপাদান

এই দৃষ্টিতে কোনো সংস্কৃতির ভেতর সর্বপ্রথম যে জিনিসটি তালাশ করা দরকার তা হচ্ছে এই যে, দুনিয়াবী জীবন সম্পর্কে তার ধারণা কি? এই দুনিয়ায় সে মানুষকে কি মর্যাদা প্রদান করে? তার দৃষ্টিতে দুনিয়া বস্তুটা কি? এ দুনিয়ার সাথে মানুষের সম্পর্ক কি? মানুষ এ দুনিয়াকে ভোগ-ব্যবহার করবে কিভাবে? বস্তুত জীবন-দর্শন সম্পর্কিত এই প্রশ্নগুলো এমনি গুরুত্বপূর্ণ যে, মানব জীবনের তামাম ক্রিয়াকাণ্ডের ওপরেই এগুলো গভীরভাবে প্রভাবশীল হয়ে থাকে। এই দর্শন বদলে গেলে সংস্কৃতির গোটা স্বরূপ মূলগতভাবেই বদলে যায়।

জীবন দর্শনের সাথে দ্বিতীয় যে প্রশ্ন গভীরভাবে সম্পৃক্ত, তা হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য। দুনিয়ায় মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি? মানুষের এতো ব্যস্ততা, এতো প্রয়াস-প্রচেষ্টা, এতো শ্রম-মেহনত, এতো দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম কিসের জন্যে? কোন অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে মানুষের ছুটে চলা উচিত? কোন লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার জন্যে আদম সন্তানের চেষ্টা সাধনা করা কর্তব্য? কোন পরিণতির কথা মানুষের প্রতিটি কাজে, প্রতিটি প্রয়াস-প্রচেষ্টায় স্মরণ রাখা উচিত?

www.pathagar.com

বস্তুত এই লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষার মানুষের বাস্তব জীবনের গতিধারাকে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে আর উহার অনুরূপ কর্মপদ্ধতি ও কামিয়াবীর পন্থা জীবনে অবলম্বিত হয়ে থাকে।

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, আলোচ্য সংস্কৃতিতে কোন বুনিয়াদী আকীদা ও ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে মানবীয় চরিত্র গঠন করা হয়? মানুষের মন মানসকে উহা কোন ছাঁচে ঢালাই করে? মানুষের মন মস্তিষ্কে কি ধরনের চিন্তা সৃষ্টি করে? এবং তার ভেতরে এমন কি কার্যকর শক্তি রয়েছে, যা তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে এক বিশেষ ধরনের বাস্তব জীবন ধারার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে? এ ব্যাপারে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই যে, মানুষের কর্মশক্তি তার চিন্তা শক্তিরই প্রভাবাধীন। যে চেতনা তার হাত ও পা'কে ক্রিয়াশীল করে তোলে, তা আসে তার মন ও মস্তিষ্ক থেকে। আর যে আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, তার মন ও মস্তিষ্কের ওপর চেপে বসবে, তার গোটা কর্ম শক্তি ঠিক তারই প্রভাবাধীনে সক্রিয় হয়ে উঠবে। অন্যকথায় তার মন মানস যে ছাঁচে গড়ে ওঠবে, তার ভেতর আবেগ-অনুভূতি ও ইচ্ছা স্পৃহাও ঠিক তেমনি পয়দা হবে এবং তারই আজ্ঞাধীনে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো কাজ করতে থাকবে। বস্তুত দুনিয়ার কোনো সংস্কৃতিই একটি মৌলিক আকীদা এবং একটি বুনিয়াদী চিন্তাধারা ছাড়া প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। এ হিসেবে যে কোনো সংস্কৃতিকে বুঝতে এবং তাঁর মূল্যায়ন করতে হলে প্রথমত তার আকীদা ও চিন্তাধারাকে বোঝা এবং তার উৎকর্ষ-অপকর্ষ পরিমাপ করা প্রয়োজন- যেমন কোনো ইমারতে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের কথা জানতে হলে তার ভিত্তির গভীরতা ও দৃঢ়তার কথা জানা আবশ্যক।

চতুর্থ প্রশ্ন এই যে, আলোচ্য সংস্কৃতি মানুষকে একজন মানুষ হিসেবে কি ধরনের মানুষ রূপে গড়ে তোলে? অর্থাৎ কি ধরনের নৈতিক ট্রেনিং-এর সাহায্যে সে মানুষকে তার নিজস্ব আদর্শ মোতাবেক স্বার্থক জীবন যাপনের জন্যে তৈরি করে? কোন ধরনের স্বভাব-প্রকৃতি, গুণরাজি ও মন-মানস সে মানুষের মধ্যে পয়দা করে এবং তার বিকাশ বৃদ্ধির চেষ্টা করে? তার বিশেষ নৈতিক তালিম-এর সাহায্যে মানুষ কি ধরনের মানুষে পরিণত হয়? সংস্কৃতির আসল উদ্দেশ্য যদিও সমাজ ব্যবস্থার পুণর্গঠন, কিন্তু ব্যক্তির উপাদান দিয়েই সে সমাজ-সৌধ নির্মিত হয়। আর সে সৌধটির দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে তার প্রতিটি পাথরের সঠিকরূপে কাটা, প্রতিটি ইটের পাকা-পোক্ত হওয়া, প্রতিটি কড়ি কাঠের মজবুত হওয়া, কোথাও ঘুণে ধরা কাঠ না লাগানো এবং কোথাও অপক্ক, নিকৃষ্ট ও দুর্বল উপকরণ ব্যবহার না করার ওপর।

পঞ্চম প্রশ্ন এই যে, সে সংস্কৃতিতে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে মানুষে মানুষে কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়? তার আপন খান্দানের সঙ্গে, তার পাড়াপড়শির সঙ্গে, তার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে, তার সাথে বসবাসকারী লোকদের সঙ্গে, তার অধীনস্ত লোকদের সঙ্গে, তার উপরস্ত লোকদের সঙ্গে, তার নিজ সংস্কৃতির অনুসারীদের সঙ্গে এবং তার সংস্কৃতি বহির্ভূত লোকদের সঙ্গে কি ধরনের সম্পর্ক রাখা হয়েছে? অন্যান্য লোকদের ওপর তার কি ধরনের অধিকার এবং তার ওপর অন্যান্য লোকদের কি অধিকার নির্দেশ করে দেয়া হয়েছে? তাকে কোন কোন সীমা রেখার অধীন করে দেয়া হয়েছে? তাকে আজাদী দেয়া হলে কতোখানি আজাদী দেয়া হয়েছে আর বন্দী করা হলে কতদূর বন্দী করা হয়েছে? বস্তুত এ প্রশ্নগুলোর

www.pathagar.com

ভেতর নৈতিক চরিত্র, সামাজিকতা, আইন-কানুন, রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সকল বিষয়ই এসে যায়। আর আলোচ্য সংস্কৃতি কি ধরনের খান্দান, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করে, তা এ থেকেই জানা যেতে পারে।

এ আলোচনা থেকে জানা গেছে যে, যে বস্তুটিকে সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা হয়, তা গঠিত হয় পাঁচটি মৌলিক উপাদান দ্বারা ঃ যথা (১) দুনিয়াবী জীবন সম্পর্কে ধারণা (২) জীবনের চরম লক্ষ্য (৩) বুনিয়াদী আকীদা ও চিন্তাধারা (৪) ব্যক্তি প্রশিক্ষণ এবং (৫) সমাজ ব্যবস্থা।

দুনিয়ার প্রত্যেক সংস্কৃতি এই পাঁচটি মৌলিক উপাদান দিয়েই গঠিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, ইসলামী সংস্কৃতিরও সৃষ্টি হয়েছে এই উপাদানগুলোর সাহায্যেই।

ইসলামী সংস্কৃতিতে ঈমানের গুরুত্ব

ঈমানের বিষয়গুলো মিলে কি ধরনের সংস্কৃতির জন্ম দেয়, তার প্রতি একবার সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করে দেখা দরকার। ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তিপ্রস্তর হচ্ছে পার্থিব জীবন সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণা। তা হলো এই যে, এ দুনিয়ায় মানুষের মর্যাদা সাধারণ সৃষ্ট বস্তুর মতো নয়, বরং তাকে এখানে বিশ্বপ্রভুর তরফ থেকে প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। এ ধারণার প্রেক্ষিতে একটি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত হিসেবে আপন স্রষ্টা ও মনিবের সন্তুষ্টি অর্জন করা মানবজীবনে স্বাভাবিক লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, আর এ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে প্রয়োজন হয়ে পড়ে:

প্রথমত, খোদা সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করা।

দ্বিতীয়ত, শুধু খোদাকেই আদেশ ও নিষেধকারী, আইন ও বিধানদাতা, বন্দেগী ও আনুগত্য লাভের যোগ্য মনে করা এবং নিজের যাবতীয় ক্ষমতা ইখতিয়ারকে সম্পূর্ণ খোদায়ী বিধানের অধীন করে দেয়া।

তৃতীয়ত, খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করার বিশেষ প্রণালী ও পদ্ধতিগুলো জানা।

চতুর্থত, খোদার সন্তুষ্টি বিধানের সুফল এবং অসন্তুষ্টি বিধানের কুফল অবহিত হওয়া, যাতে করে পার্থিব জীবনের অসম্পূর্ণ ফলাফল থেকে কেউ প্রতারিত না হয়।

খোদার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে কোরআনে যা কিছু বিবৃত হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হলো ঃ যে মহান সত্তার তরফ থেকে মানুষকে প্রতিনিধি বানিয়ে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে এবং যাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করাই তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য, তাঁর সম্পর্কে যেনো সে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করতে পারে। তেমনি ফেরেশতাদের সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হলো ঃ মানুষ যেনো বিশ্ব-প্রকৃতির ক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর কোনোটিকে প্রভু মনে করে না বসে এবং প্রভুত্বের ব্যাপারে খোদা ছাড়া অন্য কাউকে শরিকদার ঘোষণা না করে। এরূপ নির্ভুল জ্ঞানলাভের পর খোদার প্রতি ঈমান আনার তাৎপর্য হলো ঃ বিশ্ব-প্রকৃতির ওপর, এমন কি স্বয়ং মানব জীবনের অচেতন দিকের ওপর যেমন খোদার নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব বিরাজমান, তেমনি জীবনের সজ্ঞান ও সচেতন দিকেও মানুষ শুধু খোদারই কর্তৃত্ব স্বীকার করবে। প্রতিটি ব্যাপারে খোদাকেই আইন-প্রণেতা এবং নিজেকে সেই আইনের অনুবর্তী জ্ঞান করবে। নিজের ক্ষমতা ইখতিয়ারকে খোদার নির্ধারিত সীমারেখার অধীন করে দেবে। বস্তুত এরূপ ঈমানী শক্তিই মানুষকে খোদার প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের সামনে স্বেচ্ছায় সাগ্রহে মাথা নত করে দেয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এর দ্বারা মর্দে-মুমিনের ভেতর এক বিশেষ ধরনের বিবেকের সৃষ্টি হয় এবং এক বিশেষ ধরনের চরিত্র গড়ে ওঠে- যা খোদায়ী আইন-বিধানে বাধ্যতামূলক নয়, বরং স্বেচ্ছামূলক অনুসৃতির জন্যে একান্ত প্রয়োজন।

www.pathagar.com

তৃতীয় প্রয়োজনটি পূর্ণ করে নবুওয়াত ও কিতাবের প্রতি বিশ্বাস। এ দুটির মাধ্যমেই মানুষ তার জন্যে খোদার নির্ধারিত আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করে। মানুষের ক্ষমতা ইখতিয়ারকে আল্লাহ যে সব সীমা-রেখার অধীন করে দিয়েছেন, এ দুটির মাধ্যমেই মানুষ সেগুলো চিনে নিতে পারে। 'ঈমান বির-রিসালাত' এবং 'ঈমান বিল-কিতাবের' মানেই হচ্ছে রসূলের শিক্ষাকে খোদার শিক্ষা এবং তাঁর পেশকৃত কিতাবকে খোদার কিতাব মনে করা। আর এ ঈমানের বলেই খোদার রসূল ও তাঁর কিতাবের মাধ্যমে প্রদর্শিত বিধি-ব্যবস্থা, আইন-কানুন ও রীতি-নীতি, দৃঢ়তা ও সংকল্পের সাথে পালন করার মতো যোগ্যতা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে।

চতুর্থ বা সর্বশেষ প্রয়োজনটি পূর্ণ করার জন্যে রয়েছে পরকাল সংক্রান্ত জ্ঞান। এর দ্বারা মানুষের দৃষ্টি এতো প্রখর হয়ে যায় যে, দুনিয়াবী জীবনের এ বাহ্যদৃশ্যের পেছনে সে এক স্বতন্ত্র জগতের অস্তিত্ব দেখতে পায়। তার স্পষ্টত মনে হয় যে, এ দুনিয়ার মঙ্গল-অমঙ্গল ও উপকার-অপকার খোদার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কোন মাপকাঠি নয়। খোদার তরফ থেকে কর্মের সুফল ও কুফল এ দুনিয়ায় শেষ হয়ে যায় না, বরং তার চূড়ান্ত ফয়সালা ও ফলাফল ঘোষিত হবে স্বতন্ত্র এক জগতে। এবং সেই ফয়সালাই হবে সম্পূর্ণ নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য। সেই ফয়সালার সাফল্য ও কামিয়াবী লাভ করতে হলে এ দুনিয়ায় খোদায়ী আইন-বিধানের নির্ভুল অনুসরণ এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখার পূর্ণ সংরক্ষণই হচ্ছে একমাত্র উপায়। এ জ্ঞান ও বিশ্বাসের প্রতি সুদৃঢ় প্রত্যয়কেই বলা হয় ঈমান বিল-আখেরাত বা পরকাল বিশ্বাস। বস্তুত ঈমান বিল্লাহর পর মানুষকে ইসলামী আইন কানুনের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে এটিই হচ্ছে সবচাইতে কার্যকরী শক্তি। আর ইসলামী সংস্কৃতির জন্যে মানুষকে মানসিক দিক থেকে যোগ্য ও সমর্থ করে তোলার ব্যাপারেও এ প্রত্যয়টির রয়েছে বিরাট ভূমিকা।

এ আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, পার্থিব জীবন সম্পর্কে ইসলামের বিশিষ্ট ধারণা ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য ইতিপূর্বে যে ধারাগুলো এঁকে দিয়েছিলো, আলোচ্য মৌল প্রত্যয়গুলো ঠিক সেই ধারায়ই সংস্কৃতির সংগঠন ও ভিত্তি স্থাপন করেছে। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে এমনি সংস্কৃতির জন্যে যে মৌল প্রত্যয়ের প্রয়োজন, তা এ পাঁচটি বিষয় নিয়েই গঠিত হতে পারে। এ ছাড়া অন্য কোনো প্রত্যয়ের ভেতরেই এ বিশেষ ধরনের সংস্কৃতির ভিত্তি হওয়ার মতো যোগ্যতা নেই। কারণ অন্য কোনো প্রত্যয়ই জীবন সম্পর্কে এ বিশেষ ধারণা ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

ইসলামী সংস্কৃতির কাঠামো

ঈমান তথা ইসলামের প্রত্যয়বাদ সম্পর্কে উপরের বিস্তৃত আলোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই এর ভিত্তির ওপর গড়া সংস্কৃতির একটা পূর্ণ কাঠামো আমাদের সামনে এসে পড়ে। এ কাঠামোর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপঃ

এক ঃ এ সংস্কৃতির ব্যবস্থাপনা একটি রাজ্যের ব্যবস্থাপনার মতো। এতে খোদার মর্যাদা সাধারণ ধর্মীয় মত অনুসারে নিছক একজন উপাস্যের মতো নয়। বরং পার্থিব মত অনুযায়ী তিনি সর্বোচ্চ শাসকও। প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন এ বিশাল রাজ্যের বাদশাহ শাহানশাহ। রসূল তাঁর প্রতিনিধি। কোরআন তাঁর আইন গ্রন্থ। যে ব্যক্তি তাঁর বাদশাহীকে স্বীকার করে তাঁর প্রতিনিধির আনুগত্য এবং তাঁর আইন গ্রন্থের অনুসরণ করে, সেই এ রাজ্যের প্রজা। মুসলমান হওয়ার মানেই হচ্ছে এই যে, সেই বাদশাহ তাঁর প্রতিনিধি ও আইন গ্রন্থের

www.pathagar.com

মাধ্যমে যে আইন-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তার কার্যকরণ ও যৌক্তিকতা বোধগম্য হোক কি না হোক বিনা বাক্য ব্যয়ে তা স্বীকার করতে হবে। যে ব্যক্তি খোদার এ সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং তাঁর আইন বিধানকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উর্ধ্বে স্থান দিতে স্বীকৃত না হবে এবং তাঁর আদেশাবলী মানা বা না মানার অধিকারকে নিজের জন্যে সুরক্ষিত রাখবে, তার জন্যে এ রাজ্যের কোথাও এতোটুকু স্থান নেই।

দুই ঃ এ সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে চূড়ান্ত সাফল্যের (অর্থাৎ পরকালীন বিচারে বিশ্বপ্রভুর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হওয়ার) জন্যে প্রস্তুত করা আর তার দৃষ্টিতে এ সাফল্য অর্জনটা বর্তমান জীবনে মানুষের নির্ভুল আচরণের ওপর নির্ভরশীল। পরন্তু চূড়ান্ত ফলাফলের দৃষ্টিতে কোন সব কাজ উপকারী, আর কোন সব কাজ অপকারী, তা জানা মানুষের সাধ্য নয়, বরং আখেরাতে ফয়সালাকারী খোদাই তা উত্তমরূপে অবহিত। এ কারণেই এ সংস্কৃতি জীবনের সকল বিষয়াদিতে খোদার নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করার এবং নিজের কর্ম-স্বাধীনতাকে খোদায়ী শরীয়ত দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে মানুষের কাছে দাবী জানায়। অনুরূপভাবে এ সংস্কৃতি হচ্ছে দ্বীন ও দুনিয়ার এক মহত্তম সমন্বয়। একে প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে ধর্ম নামে আখ্যায়িত করা চলে না। এ হচ্ছে একটি ব্যাপকতর জীবন ব্যবস্থা- বা মানুষের চিন্তা-কল্পনা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, পারিবারিক কাজকর্ম সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড রাজনৈতিক কর্মধারা, সভ্যতা ও সামাজিকতা সবকিছুর ওপরই পরিব্যাপ্ত। আর এ সমস্ত বিষয়ে যে পদ্ধতি ও আইন-বিধান খোদা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তারই সামষ্টিক নাম হচ্ছে দ্বীন-ইসলাম বা ইসলামী সংস্কৃতি।

তিন ঃ এ সংস্কৃতি কোনো জাতীয়, (ভৌগলিক বা ভাষাগত অর্থে) দেশীয় বা গোত্রীয় সংস্কৃতি নয়। বরং সঠিক অর্থে এটি হচ্ছে মানবীয় সংস্কৃতি। এ মানুষকে শুধু মানুষ হিসাবেই আহবান জানায়। যে ব্যক্তি তওহীদ, রিসালত, কিতাব ও পরকালের প্রতি ঈমান পোষণ করে, তাকেই সে নিজের চৌহদ্দির মধ্যে গ্রহণ করে। এমনিভাবে এ সংস্কৃতি এক বিশ্বব্যাপী উদার জাতীয়তা গঠন করে–যার মধ্যে বর্ণ-গোত্র-ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষই প্রবেশ করতে পারে। তার মধ্যে রয়েছে সমগ্র দুনিয়ার বুকে বিস্তৃত করার এবং তাদের সবাইকে একই সংস্কৃতির অনুসারী করে তোলার মতো যোগ্যতারও সে অধিকারী। কিন্তু এ বিশ্বব্যাপী মানবীয় ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা দ্বারা তার আসল লক্ষ্য শুধু নিজ অনুসারীদের সংখ্যাবৃদ্ধি করাই নয়, বরং মানব জাতির খোদা তার মঙ্গল ও ভালোইর জন্যে যে নির্ভুল জ্ঞান ও কর্মনীতি দান করেছেন, সমগ্র মানুষকে তার সুফলের অংশীদার করে তোলাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এ কারণেই এ ভ্রাতৃসংঘে শামিল হবার জন্যে প্রথমত সে ঈমানের শর্ত আরোপ করেছে এবং সেই সঙ্গে যারা খোদার সর্বোচ্চ ক্ষমতার সামনে মাথানত করতে প্রস্তুত এবং খোদার রসূল ও তার কিতাবের দ্বারা নির্ধারিত সীমারেখা ও আইন-বিধান পালন করতে ইচ্ছুক কেবল তাদেরকেই এ সংঘের জন্যে মনোনীত করেছে। কারণ এ ধরনের লোকেরাই শুধু (তারা সংখ্যায় যতো অল্পই হোক) এ সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় খাপ খাওয়াতে পারে এবং এদের দ্বারাই একটি নির্ভুল ও সুদৃঢ় জীবন-ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে। এ ব্যবস্থায় অবিশ্বাসী, মুনাফেক বা ক্ষীণ বিশ্বাসী লোকদের স্থান পাওয়া এর শক্তির লক্ষণ নয়, বরং তা দুর্বলতারই লক্ষণ।

চার ঃ সীমাহীনতা ও বিশ্বজনীনতার সঙ্গে এ সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর প্রচন্ড নিয়মানুবর্তিতা (Discipline) এবং শক্তিশালী বন্ধন। এর সাহায্যেই সে নিজের

www.pathagar.com

অনুসারীদেরকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক থেকে নিজস্ব আইনের অনুগত করে তোলে। এর কারণ এই যে, আইন প্রণয়ন ও সীমা নির্ধারণ করার পূর্বে সে আইনের অনুসরণ ও সীমা সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করে নেয়। অন্য কথায়, আদেশ দেয়ার পূর্বেই সে আদেশ দ্বারা কার্যকরী হওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে। এ জন্যে সর্বপ্রথম সে মানুষের খোদার প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়ে নেয়। তারপর তাকে এ নিশ্চয়তা দেয় যে, রসূল ও কিতাবের মাধ্যমে যে বিধান দেয়া হয়েছে তা খোদারই বিধান এবং তার আনুগত্য ঠিক খোদারই আনুগত্য। পরন্তু তার মনের ভেতর সে এক অতন্দ্র প্রহরী নিযুক্ত করে দেয়- সে সর্বদা ও সর্বাবস্থায় তাকে খোদায়ী বিধান পালনে উদ্বুদ্ধ করে, তার বিরুদ্ধাচরণের জন্যে তিরস্কার করে এবং পরকালীন শাস্তির ভয় দেখায়। এভাবে যখন প্রতিটি ব্যক্তির মন ও বিবেকের ভেতর এ কার্যকর শক্তিকে বদ্ধমূল করে নিজের অনুসারীদের মধ্যে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে আইনানুবর্তন, বিধিনিষেধ পালন ও সদগুণরাজিতে বিভূষিত হওয়ার মতো যোগ্যতার সৃষ্টি করা হয়, তখনি সে তাদের সামনে নিজস্ব আইন-বিধান পেশ করে, তাদের জন্যে কর্মসীমা নির্ধারণ করে, তাদের জন্যে জীবন যাত্রা প্রণালী তৈরি করে এবং নিজস্ব লক্ষ্য হাসিলের জন্যে তাদের কাছে কঠোরতর ত্যাগ স্বীকারের দাবী জানায়। বস্তুত এটা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক কর্মপন্থা, এর চাইতে বিচক্ষণ পন্থা আর কিছুই হতে পারে না। এ পন্থায় ইসলামী সংস্কৃতি যে বিরাট প্রভাবপ্রতিপত্তি লাভ করেছে, অন্য কোনো সংস্কৃতি তা লাভ করতে পারেনি।

পাঁচ ঃ পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে এ সংস্কৃতি এক নির্ভুল সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করতে এবং এক সৎ ও পবিত্র জন-সমাজ (society) গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু এর অন্তর্ভুক্ত লোকেরা উত্তম চরিত্র ও সদগুণরাজিতে বিভূষিত না হওয়া পর্যন্ত এরূপ সমাজ গঠন সম্ভবপর নয়। এ কারণেই এর সভ্যদের ব্যক্তি চরিত্র সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন, যাতে করে তারা শুধু অকেজো ও প্রক্ষিপ্ত চিন্তাধারায় প্রতিমূর্তি হয়ে না থাকে। তাদের মধ্যে নির্ভুল ও বিশুদ্ধ মানসিকতা পরিস্ফুট করা প্রয়োজন, যাতে করে অতি স্বাভাবিকভাবে সৎ কর্মরাজির অনুশীলন হওয়ার মতো সুদৃঢ় চরিত্র তাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে। বস্তুত ইসলাম তার সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় এ নিয়মটির প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখেছে। লোকদের ট্রেনিং এর জন্যে ইসলাম সর্বপ্রথম তাদের মধ্যে ঈমান ও প্রত্যয়কে বদ্ধমূল করে দেয়- কারণ তাদের মধ্যে উঁচু মানের মজবুত চরিত্র সৃষ্টি করার এটাই হচ্ছে একমাত্র পন্থা। এ ঈমানের বলেই সে লোকদের মধ্যে সততা, বিশ্বস্ততা, সচ্চরিত্র, আত্মানুশীলন, সত্যপ্রীতি, আত্মসংযম, সংগঠন, আত্মত্যাগ, কর্তব্যবোধ, ধৈর্যশীলতা, দৃঢ়চিত্ততা, বীর্যবত্তা, আত্মতৃপ্তি, নেতৃআনুগত্য, আইনানুবর্তিতা ইত্যাকার উৎকৃষ্ট গুণরাজির সৃষ্টি করে। সেই সঙ্গে তাদের সংঘবদ্ধতার স্বাভাবিক পরিণামে যাতে একটি উৎকৃষ্ট জনসমাজ গড়ে ওঠে, তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে যোগ্য করে তোলে।

ছয় ঃ এ সংস্কৃতির ঈমান তথা প্রত্যয়বাদে এক দিকে সচ্চরিত্র ও সৎগুণরাজি সৃষ্টি করা এবং তা প্রতিপালন ও সংরক্ষণের উপযোগী সকল শক্তি বর্তমান রয়েছে। অন্যদিকে পার্থিব উন্নতি ও প্রগতির জন্যে মানুষকে সর্বদা উদ্বুদ্ধ করা এবং তাকে পার্থিব উপায়-উপকরণ উত্তমরূপে ব্যবহার করার ও খোদার দেয়া শক্তি নিচয়কে সুষমভাবে প্রয়োগ করার জন্যে যোগ্য করে তোলার মতো শক্তিও এর ভেতরেই নিহিত রয়েছে। পরন্তু এ প্রত্যয়বাদই দুনিয়ায় প্রকৃত উন্নতি করার জন্যে প্রয়োজনীয় উৎকৃষ্ট গুণাবলী মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে। এর মধ্যে মানুষের কর্মশক্তিকে সুসংহত করার এবং তাকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করার

www.pathagar.com

মতো প্রচণ্ড শক্তি বর্তমান রয়েছে। সেই সঙ্গে এ কর্মশক্তিকে সীমাতিক্রম করতে না দেয়ার এবং সত্যিকার কল্যাণ পথ থেকে বিচ্যুত হতে না দেয়ার শক্তিও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। এভাবে যে সব গুণাবলী অন্যান্য ধর্মীয় ও পার্থিব প্রত্যয়ের মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে পাওয়া যায়, ইসলামী প্রত্যয়বাদে তা সবই একত্রে ও উৎকৃষ্টরূপে বর্তমান রয়েছে। আর যে সব বিকৃতি বিভিন্ন ধর্মীয় ও পার্থিব প্রত্যয়ে লক্ষ্য করা যায় সেই সব থেকে এ প্রত্যয়বাদ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

ইসলামী সংস্কৃতিতে ঈমানের গুরুত্ব

এ হচ্ছে ইসলামের প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতির একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামো, আমরা যদি উদাহরণত একে একটি ইমারত ধরে নেই. তা হলে বলতে হয়ঃ এ ইমারতটিকে সুদৃঢ় করে তোলার জন্যে এর ভিত্তিভূমিকে গভীরভাবে খনন করা হয়েছে। তারপর খুব বাছবিচার করে আরও পাকা পোক্ত ইট এর জন্যে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তা উৎকৃষ্ট সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা হয়েছে। অতঃপর ইমারতটি এমন জাঁকালোভাবে নির্মিত হয়েছে যে, উচ্চতায় তা আসমান পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে এবং প্রশস্তে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছে। কিন্তু এতো প্রশস্ত ও উচ্চতা সত্ত্বেও এর প্রাচীর ও স্তম্ভগুলো এতোটুক কেঁপে ওঠে না, বরং তা পাহাড়ের ন্যায় অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এ ইমারতের দরজা জানালাগুলো এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যে, বাইরের আলো ও নির্মল বায়ু এর মধ্যে সুন্দর ভাবেই প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু ধুলা, বালু আবর্জনা ও দূষিত বায়ুকে তা আদৌ প্রবেশ করতে দেয় না। আলোচ্য ইমারতটির এ সমস্ত গুণ বৈশিষ্ট্য একটি মাত্র জিনিসের কারণে সৃষ্টি হয়েছে, আর তা হচ্ছে ঈমান। এটিই তার মূল ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে দিয়েছে। এটিই অকেজো ও নিষ্ক্রিয় উপাদান বর্জন করে উৎকৃষ্ট উপাদান গ্রহণ করেছে। এটিই কাঁচা মাটি পুড়ে পাকা ইট তৈরি করেছে। এটিই বিক্ষিপ্ত ইটগুলোকে সারিবদ্ধভাবে গেঁথে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করেছে। এর উপরই ইমারতের প্রশস্ততা, উচ্চতা ও দৃঢ়তা নির্ভরশীল, এটি যেমন তাকে প্রশস্ততা, উচ্চতা ও দৃঢ়তা দান করেছে তেমনি বাহ্যিক অনিষ্ট থেকেও তাকে সুরক্ষিত করে দিয়েছে এবং সর্বপ্রকার নির্দোষ ও পবিত্র জিনিসকে তার মধ্যে প্রবেশ করার সুযোগ দিয়েছে। কাজেই ঈমান হচ্ছে এ ইমারতের প্রাণতুল্য। এটি না হলে তার কায়েম থাকা দূরের কথা, নির্মিত হওয়াই সম্ভব নয়। আর এটি দুর্বল হলে তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, ইমারতের গোটা ভিত্তিই কম জোর, তার ইটগুলো কাঁচা, তার চূর্ণ-সিমেন্ট খারাব, তার স্তম্ভগুলো টলটলায়মান, তার প্রাচীরগুলো সুগ্রথিত নয়। তার মধ্যে প্রশস্ততা ও উচ্চতার কোনো যোগ্যতা নেই। তার ভেতর বাহ্যিক অনিষ্টকে প্রতিহত করার এবং নিজের পবিত্র ও নির্দোষ জিনিসগুলোকে সুরক্ষিত রাখার মতো শক্তি নেই।

ফলকথা, ঈমানের অনুপস্থিতি ইসলামেরই অনুপস্থিতির শামিল। অনুরূপভাবে ঈমানের দুর্বলতা তারই দুর্বলতা এবং ঈমানের শক্তি তারই শক্তির নামান্তর। পরন্তু ইসলাম যেহেতু একটি ধর্ম মাত্রই নয়, বরং এটি সভ্যতা, সংস্কৃতি, নৈতিকতা, সামাজিকতা, রাজনীতি সবকিছুরই সমন্বয়, এ কারণে এখানে ঈমানের গুরুত্ব নিছক ধর্মীয় বিন্যাসের মতোই নয়; বরং এর ওপর লোকদের গোটা নৈতিক আচরণ ও জীবনধারা একান্তভাবে নির্ভরশীল। এটিই তাদের পারস্পরিক ক্রিয়াকর্মের সুস্থতা পরিচ্ছন্নতার প্রধান অবলম্বন। এটিই তাদেরকে সংহত করে একটি জাতিতে পরিণত করে। এটিই তাদের জাতীয়তা ও সংস্কৃতির নিরাপত্তা বিধান করে। এটিই তাদের সভ্যতা, সামাজিকতা ও রাজনীতির মূল প্রাণবস্তু।

www.pathagar.com

এটি ছাড়া ইসলাম শুধু একটি 'ধর্ম' হিসেবে কায়েম হতে পারে না তাই নয়, বরং একটি সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। ঈমান দুর্বল হয়ে পড়লে তাকে শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসেরই দুর্বলতা বলা চলে না, বরং তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, মুসলমানদের নৈতিক জীবন খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাদের স্বভাব-চরিত্র দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাদের পারস্পরিক ক্রিয়াকর্ম বিগড়ে গিয়েছে। তাদের সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। তাদের জাতীয়তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। একটি স্বাধীন, সম্মানিত ও শক্তিমান জাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে তারা অক্ষম হয়ে পড়েছে। বস্তুত এ কারণেই ইসলামী ব্যবস্থায় ঈমানকেই ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যের মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এক ব্যক্তি যখন ঈমান কবুল করল, তখন সে মুসলিম জাতির মধ্যেই প্রবেশ করে; মুসলমানদের সভ্যতা, সামাজিকতা, রাজনীতি সবকিছুতেই সে সমান অংশীদার হয় এবং সমস্ত রীতিনীতি ও আইন-কানুন তার প্রতি বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। কিন্তু সে যদি ঈমান কবুল না করে তা হলে ইসলামের সীমার মধ্যে সে কিছুতেই প্রবেশ করতে পারে না। মুসলমানদের জামায়াতে সে কিছুতেই শরীকদার হতে পারবে না। কারণ এ ব্যবস্থাপনায় তার পক্ষে খাপ খাওয়ানো সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। এর আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থা সে কিছুতেই পালন করতে পারে না।

মুনাফেকীর ভয়

যারা ঈমানের দাওয়াতকে খোলাখুলি প্রত্যাখ্যান করে, তাদের ব্যাপার তো সুস্পষ্ট। তাদের এবং মুসলমানদের মধ্যে কুফর ও ঈমানের অতি সুস্পষ্ট ও দুর্লংঘ্য সীমারেখা বিদ্যমান। সেই সীমা ডিঙিয়ে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে তারা কখনো অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। কিন্তু যারা মুমিন না হয়েও ঈমানের দাবী করে মুসলমানদের দলে ঢুকে পড়েছে, যাদের অন্তরে সন্দেহের ব্যাধি লুকিয়ে রয়েছে কিংবা যাদের বিশ্বাস অতি দুর্বল তাদের অস্তিত্ব ইসলামী ব্যবস্থার পক্ষে অতীব মারাত্মক। কারণ তারা ইসলামের সীমার মধ্যে দাখিল হলেও ইসলামী চরিত্র ও ইসলামী জীবনধারা গ্রহণ করেনি। তারা ইসলামী আইনের অনুসরণ এবং খোদায়ী বিধানের সংরক্ষণ করেনি; বরং তারা নিজেদের বিকৃত চরিত্র ও আচরণ দ্বারা মুসলমানদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিকৃত করে দিচ্ছে, নিজেদের মানসিক ব্যাধির সাহায্যে মুসলমানদের জাতীয়তা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার শিকড় উপড়ে ফেলছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ভেতর ও বাহির থেকে নানারূপ ফেতনা সৃষ্টিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে। কোরআন মজীদে এ ধরনের লোকদেরকেই মুনাফেক বা কপট-বিশ্বাসী বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং এদের অনুপ্রবেশের ফলে মুসলিম সমাজে যে সব ফেতনার সৃষ্টি হয়ে থাকে, সেগুলোও সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ শ্রেণীর লোকদের পরিচয় এই যে, এরা ঈমানের দাবী করে বটে, কিন্তু আদতে ঈমানদার নয় :

> যারা বলে যে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ তারা ঈমানদার নয়। *(আল-বাকারা:৮)*

তারা মুসলমানদের সঙ্গে মুসলমানের মতো কথা বলে আর কাফেরদের সঙ্গে কাফেরদের মতো :

> তারা ঈমানদার লোকদের সঙ্গে দেখা হলে বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি। আর তাদের শয়তানদের কাছে গেলে বলে যে, আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি। *(আল-বাকারা:১৪)*

www.pathagar.com

তারা খোদায়ী বাণীকে উপহাস করে এবং তাদের মধ্যে সন্দেহের কথা ছড়িয়ে লোকদেরকে বিভ্রান্ত করে :

> তোমরা যখন খোদয়ী আয়াতের প্রতি অবিশ্বাস করতে এবং তাকে উপহাস করতে দেখবে, তখন তাদের সঙ্গে উপবেশন করবে না। *(আন-নিসা:১৪০)*

তারা ধর্মীয় কর্তব্য পালনে কুণ্ঠাবোধ করে আর পালন করলেও নিতান্ত বাধ্য হয়ে মুসলমানদের দেখাবার জন্যেই করে, নচেত মূলত তাদের অন্তর খোদায়ী বিধানের আনুগত্যের ব্যাপারে অত্যন্ত কুণ্ঠিত :

> তারা যখন নামাজের জন্যে দাঁড়ায় তো অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে দাঁড়ায়। তারা শুধু লোকদেরকে দেখাবার জন্যেই এরূপ করে থাকে, নচেত খোদাকে স্মরণ করে না। আর স্মরণ করলেও খুব কমই করে থাকে। তারা মাঝখানে দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে; তারা পুরোপুরি এদিকেও নয় ওদিকেও নয়।
>
> তারা নামাজের জন্যে আসে না কুণ্ঠাবোধ ছাড়া এবং খোদার পথে ব্যয় করে না বিরক্তি ছাড়া। *(আত-তাওবা:৫৪)*
>
> এমন কতক বেদুইন রয়েছে, তারা খোদার পথে কিছু ব্যয় করাকে বাধ্যতামূলক জরিমানা মনে করে। *(আত-তাওবা:৯৮)*

তারা ইসলামের দাবী করে বটে, কিন্তু ইসলামী আইনের অনুসরণ করে না; বরং নিজেদের বিষয়-কর্মে কুফরী আইনের অনুসরণ করে:

> তুমি কি সেই সব লোককে দেখোনি, যারা তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান আনার দাবি করে বটে, কিন্তু নিজেদের বিষয়-কর্মকে শয়তানী বিচারকদের কাছে নিয়ে যেতে চায়। অথচ তাদেরকে তার (শয়তানী শক্তির) আদেশ না মানারই হুকুম দেয়া হয়েছে। *(আন-নিসা: ২০)*

তারা নিজেদের ক্রিয়াকর্ম তো খারাপ করেই, পরন্তু মুসলমানদের আকীদা-আমলকেও খারাপ করার প্রয়াস পায়।

> তারা (লোকদেরকে) দুষ্কৃতির আদেশ দেয়, সৎকাজ থেকে বিরত রাখে এবং সৎকাজ থেকে তাদের হাত সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। তারা খোদাকে ভুলে গিয়েছে, এ জন্যে খোদাও তাদেরকে ভুলে গিয়েছেন।*(আত-তাওবা: ২৭)*
>
> তারা চায় যে, তারা যেমন কুফরী করেছে, তোমরাও যদি তেমনি কুফরী করতে। তা হলে তোমরা এবং তারা সমান হয়ে যেতে! *(আন-নিসা:৮৯)*

তারা মুসলমানদের সঙ্গে ততোক্ষণই থাকে, যতোক্ষণ তাদের স্বার্থ থাকে। যেখানে স্বার্থ থাকে না কিংবা কম থাকে, সেখানেই তারা মুসলমানদের সঙ্গ ত্যাগ করে।

> তাদের কেউ কেউ ছদকার বিলি-বন্টনে তোমার প্রতি বিদ্রুপ বর্ষণ করে; তাদেরকে যদি ছদকার অংশ দেয়া হয় তো খুশি হয়ে যায় আর না দেয়া হলেই বিগড়ে যায়। *(আত-তাওবা:৫৮)*

এভাবে যখন ইসলাম ও মুসলমানের ওপর বিপদ ঘনিয়ে আসে তখন তারা যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বসে; কারণ ইসলামের প্রতি তাদের আদতেই কোনো ভালোবাসা নেই বিধায় তার জন্যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতেই তারা সম্মত নয় আর সে ত্যাগ স্বীকারে কোনো প্রতিফল পাওয়া যাবে, এমন প্রত্যাশাও তারা করে না। এমন কি ইসলামের সত্যতায়ই তাদের বিশ্বাস নেই; এ কারণেই তার স্বার্থে জীবন পণ করতে তারা প্রস্তুত নয়।

www.pathagar.com

তারা নানাভাবে যুদ্ধ থেকে দূরে থাকার এবং নিজেদের জীবন বাঁচাবার চেষ্টা করে। আর কখনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও নিতান্ত অপ্রসন্নচিত্তেই করে। ফলে তাদের এ অংশগ্রহণ মুসলমানদের জন্যে শক্তির পরিবর্তে দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের এ অবস্থাটিই *সূরায়ে আলে ইমরান* (রুকু ঃ ১২-১৭), *সূরায়ে নিসা* (রুকু ঃ ১০-১১-১২-২০), *সূরায়ে তাওবা* (রুকু ঃ ৭-১১-১২) এবং *আহজাব* (রুকু ঃ ২)- এ সবিস্তারে বিবৃত করা হয়েছে। এদের সবচাইতে মারাত্মক পরিচয় হলো এই যে, মুসলমানদের ওপর যখন বিপদের ঘনঘটা নেমে আসে, তখন এরা কাফেরদের পক্ষে গিয়ে যোগদান করে। তাদেরকে মুসলমানদের ভেতরকার খবর সরবরাহ করে। তাদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে। মুসলমানদের বিপদ দেখে খুশি হয়। নিজ কওমের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে কাফেরদের কাছ থেকে স্বার্থ ও মর্যাদা লাভ করে। প্রতিটি ইসলামের বিরোধী ফেতনায় তারা সামনে এগিয়ে অংশ গ্রহণ করে। এবং মুসলমানদের দলে অনৈক্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্যে ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। এ পরিচয়টিও *আলে-ইমরান, নিসা, তওবা, আহজাব* এবং *মুনাফিকুন*-এ বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

এর থেকে ভালো মতোই আন্দাজ করা চলে যে, ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার জন্যে খাঁটি, নির্ভুল ও যথার্থ ঈমান একান্ত আবশ্যক। ঈমানের দুর্বলতা এ ব্যবস্থার মূল শিকড় থেকে নিয়ে ডালপালা পর্যন্ত সবটাকেই অন্তঃসার শূন্য করে দেয়। এর মারাত্মক প্রভাব থেকে সভ্যতা, সংস্কৃতি, নৈতিকতা, সামাজিকতা, রাজনীতি কোনো কিছুই রক্ষা পেতে পারে না।

ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য

এ আলোচনার সূচনায়ই এ কথা ভালোমত মনে রাখা দরকার যে, জীবন-লক্ষ্যের প্রশ্নটি আসলে জীবন-দর্শন সম্পর্কিত প্রশ্নের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। আমরা পার্থিব জীবন সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করি এবং দুনিয়ায় নিজেদের মর্যাদা ও নিজেদের জন্যে দুনিয়ার মর্যাদা সম্পর্কে যে মতবাদটি বিশ্বাস করি, তাই স্বাভাবিকভাবে জীবনের একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেয় এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে আমাদের তাবৎ শক্তি-ক্ষমতাকে নিয়োজিত করে দেই। আমরা যদি দুনিয়াকে একটা চারণক্ষেত্র বলে মনে করি এবং জীবনটাকে শুধু পানাহার আর পার্থিব বিলাস ব্যসনে পরিতৃপ্তি লাভের একটা অবকাশ বলে ধারণা করি, তাহলে এ জৈবিক ধারণা নিঃসন্দেহে আমাদের ভেতর জীবন সম্পর্কে এক জৈবিক লক্ষ্য জাগিয়ে দেবে এবং জীবনভর আমরা শুধু ইন্দ্রিয়জ ভোগোপকরণ সংগ্রহের জন্যেই চেষ্টা করতে থাকবো। পক্ষান্তরে আমরা যদি নিজেদেরকে জন্মগত অপরাধে দুনিয়ার এই কারাগার ও বন্দীশালায় আমাদের নিক্ষেপ করা হয়েছে বলে ধারণা করে নেই তা হলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মধ্যে এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবে এবং এ কারণে মুক্তিকে আমরা আমাদের জীবন-লক্ষ্য বলে ঘোষণা করবো। কিন্তু দুনিয়া সম্পর্কে আমাদের ধারণা যদি চারণভূমি আর বন্দীশালা থেকে উন্নতর হয় এবং মানুষ হিসেবে আমরা নিজেদেরকে সাধারণ প্রাণী ও অপরাধীর চাইতে উচ্চ মর্যাদাবান বলে মনে করি তা হলে নিশ্চিতরূপে বৈষয়িক ভোগোপকরণের সন্ধান ও পরিত্রাণ লাভ-এই উভয় লক্ষ্যের চাইতে উন্নততর কোনো লক্ষ্যেরই আমরা সন্ধান করবো এবং কোনো তুচ্ছ বা নগণ্য বস্তুর প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে না।

www.pathagar.com

এই নিয়মটিকে সামনে রেখে আপনি যখন দেখবেন যে, ইসলাম মানুষকে খোদার খলীফা এবং দুনিয়ার বুকে তাঁর প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেছে, তখন এই জীবন দর্শন থেকে স্বাভাবিকভাবেই যে লক্ষ্যের সৃষ্টি হতে পারে এবং হওয়া উচিত, আপনার বিবেক-বুদ্ধি স্বভাবতই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে। একজন প্রতিনিধি তার মালিকের সন্তুষ্টি ও রেযামন্দী লাভ করবে এবং তাঁর দৃষ্টিতে একজন উত্তম, অনুগত, বিশ্বস্ত ও কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মচারী বলে বিবেচিত হবে- এছাড়া তার আর কি লক্ষ্য হতে পারে? সে যদি সত্যনিষ্ঠ ও সদুদ্দেশ্যপরায়ণ হয়, তাহলে মনিবের আজ্ঞাপালনে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ ছাড়া আর কোনো বস্তু কি তার উদ্দেশ্য হতে পারে? সে কি নিজের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি, কোনো স্বার্থ লাভের আশা, কোনো পদোন্নতি বা পুরস্কার লাভ, অথবা খ্যাতিযশ ও পদ মর্যাদা বৃদ্ধির প্রলোভনে পড়ে তার কর্তব্য পালন করবে? অবশ্য মনিব যদি খুশি হয়ে তাকে এসব দান করেন, সেটা আলাদা কথা। মনিব তাকে সুষ্ঠু খেদমতের বিনিময়ে এগুলো দান করবার আশ্বাসও দিতে পারেন, এমন কি সঠিকভাবে কর্তব্য পালন করলে মনিব তাকে খুশি হয়ে অমুক-অমুক পুরস্কার দান করবেন, একথাও সে জানতে পারে। কিন্তু সে যদি পুরস্কারকেই নিজের লক্ষ্য বানিয়ে নেয় এবং নিছক স্বার্থলাভের উদ্দেশ্যে কর্তব্য পালন করে তাহলে এমন কর্মচারীকে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই কি কর্তব্য-নিষ্ঠ কর্মচারী বলতে পারে? এই দৃষ্টান্ত দ্বারা খোদা এবং তাঁর প্রতিনিধির বিষয়টিও অনুমান করতে পারেন। মানুষ যখন দুনিয়ার বুকে খোদার প্রতিনিধি, তখন খোদার রেযামন্দী ও সন্তুষ্টি লাভ ছাড়া তার আর কী জীবন লক্ষ্য হতে পারে?

ইসলাম মানুষের সামনে যে জীবনদর্শন পেশ করেছে, বিবেক-বুদ্ধি ও স্বভাব প্রকৃতি তার থেকে এ জীবন-লক্ষ্যই উদ্ভাবন করে, আর এ হচ্ছে নির্ভুল ও অবিকৃত ইসলামী লক্ষ্য। কোরআন মজীদের ভাষণসমূহ পর্যালোচনা করলে আপনারা জানতে পারবেন যে, এই একমাত্র লক্ষ্যবস্তুকে মানুষের মনে বদ্ধমূল করে দেয়া এবং তার হৃদয় ও আত্মার ভেতর একে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করা হয়েছে এবং এছাড়া অন্য সব লক্ষ্য বস্তুকে সুস্পষ্ট ও দৃঢ়তার সাথে বাতিল করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

> হে নবী, তুমি বলে দাও আমার নামাজ, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সব কিছুই সে আল্লাহর জন্যে যিনি সমস্ত জাহানের প্রভু এবং যাঁর কোনোই শরীক নেই। আমাকে এরই হুকুম দেয়া হয়েছে এবং আমিই তাঁর সামনে সর্বপ্রথম মস্তক অবনতকারী আত্মসমর্পণকারী। *(আন-আম:১৬২-১৬৩)*
>
> আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন বেহেশতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, হত্যা করে এবং নিহত হয়। .....সুতরাং (খোদার সাথে) তোমরা যে বেচাকেনা করেছো, তার জন্যে আনন্দ করো, প্রকৃতপক্ষে এটাই বড়ো সাফল্য। *(আত-তাওবা:১১১)*

সুরায়ে বাকারায় নাফরমান ও ফর্মাবর্দার বান্দাদের পার্থক্য বর্ণনা করে ফর্মাবর্দার বান্দার প্রশংসা করা হয়েছে এইভাবে :

> লোকদের ভেতর এমন লোকও রয়েছে, যে নিজের জানকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে বিক্রি করে দেয়; আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল।

www.pathagar.com

সূরায়ে ফাতহে মুসলমানদের প্রশংসাই করা হয়েছে এই মর্মে যে, তাদের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা এবং তাদের রুকু' ও সেজদা সবকিছুই আল্লাহর জন্যে :

> মুহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত রসূল এবং তাঁর সঙ্গি-সাথীগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পর রহমদিল। তোমরা হামেশা তাদেরকে রুকু ও সেজদায় অবনত দেখছো। এরা আল্লাহর ফযল এবং তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে। *(আল ফাতহ:২৯)*

সূরায়ে মুহাম্মদে কাফেরদের ক্রিয়াকলাপ ব্যর্থ হবার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা খোদার জন্যে কিছুই করে না, বরং অন্য উদ্দেশ্যে কাজ করে খোদার অসন্তুষ্টিকেই বরণ করে নেয় :

> তাদের ওপর এই জন্যেই আঘাত পড়বে যে, যে বস্তু খোদাকে অসন্তুষ্ট করে, তারা তারই অনুসরণ করেছে এবং খোদার সন্তুষ্টি অর্জনকে তারা অপছন্দ করেছে। এজন্যেই আল্লাহ তাদের কৃতকর্মকে বিনষ্ট করে দিয়েছেন। *(মুহাম্মদ:২৮)*

সূরায়ে হজ্জে দুনিয়াবী ফায়দার জন্যে কৃত ইবাদতকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল এবং ক্ষতির কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে :

> লোকদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যে আগ্রহহীনভাবে আল্লাহর ইবাদত করে। যদি সে কোনো কল্যাণ করলো তাহলে সে নিশ্চিত হয়ে গেলো। আর যদি কোনো পরীক্ষার সময় এলো তা হলে মুখ ফিরিয়ে নিলো। এরূপ লোকই দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হলে আর এ-ই হচ্ছে সুস্পষ্ট ক্ষতি। *(আল-হজ্ব:১১)*

সূরায়ে বাকারায় বলা হয়েছে যে,

> যে দান লোকদের দেখানোর উদ্দেশ্যে করা হবে এবং যে মাল দিয়ে মানুষ অনুগ্রহ জাহির করবে তা হচ্ছে নিষ্ফল। এর দৃষ্টান্ত এই যে, কোনো এক প্রস্তুর খণ্ডের ওপর কিছুটা মাটি পড়ে ছিলো। তোমরা তাতে বীজ বপণ করলে; কিন্তু পানির ঢল এসে তাকে ধুয়ে নিয়ে গেলো। পক্ষান্তরে যে সকল সুকৃতি একাগ্রচিত্তে শুধু খোদারই সন্তুষ্টির জন্যে করা হবে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন বাগিচার তুল্য, যার ওপর প্রবল বারিপাত হলে দ্বিগুণ ফলধারণ করে আর প্রবল বারিপাত না হলেও হালকা পানির ছিটাই তার ফলধারণের পক্ষে যথেষ্ট। *(রুকু:৩৬)*

কোরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে এই বিষয়টিকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যে কোন সৎকাজই করো না কেন, কেবল খোদার সন্তুষ্টির জন্যেই করো এবং এর পেছনে আর কোনো উদ্দেশ্য পোষণ করো না।

> তোমরা যা কিছুই দানের খাতে ব্যয় করবে তার ফায়দা তোমাদেরই জন্যে আর যা কিছুই তোমরা ব্যয় করো, শুধু খোদার সন্তুষ্টির জন্যেই করতে থাকো। *(আল-বাকারা:২৭২)*

> যারা আপন প্রভুর সন্তুষ্টির জন্যে ছবর করেছে এবং নামাজ কায়েম করেছে আর তাদেরকে আমরা যে রুজি দান করেছি তার থেকে গোপনে বা প্রকাশ্যে ব্যয় করেছে আর যারা পূণ্যের দ্বারা পাপকে দূরীভূত করে, এমন লোকদের জন্যেই রয়েছে আখেরাতের ঘর। *(আর-রায়াদ:২২)*

www.pathagar.com

দোযখের আজাব থেকে সেই বড়ো পরহেজগারই বেঁচে যাবে, যে আত্মশুদ্ধির সাথে নিজের মাল দান করে। তার প্রতি কারো কোনো অনুগ্রহ নেই যে, তার বদলা তাকে দিতে হবে। বরং সে শুধু তার মহান প্রভুর সন্তুষ্টিই কামনা করে আর তিনি অবশ্যই সন্তুষ্ট হবেন।

> অতএব তুমি নিকটাত্মীয়কে তার হক বুঝিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও (তার হক)। যারা খোদার সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্যে এ-ই হচ্ছে উত্তম। আর প্রকৃতপক্ষে এরাই কল্যাণের অধিকারী হয়ে থাকে। *(আর-রুম:৩৮)*

> তুমি যে যাকাত দিয়েছো এবং তা দ্বারা তুমি শুধু আল্লাহরই সন্তুষ্টি লাভ করতে চাও তো যারা এরূপ করছে তারাই নিজেদের দানকে দ্বিগুণ চতুর্গুণ করেছে। *(আর-রুম:২৯)*

তারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার খাতিরে মিসকীন, এতীম ও বন্দীকে আহার করায় এবং বলে যে, আমরা তোমাদেরকে শুধু খোদার জন্যেই খাওয়াচ্ছি। আমরা তোমাদের কাছ থেকে না কোনো প্রতিদান চাই আর না-চাই কোনো কৃতজ্ঞতা। আমরা তো আমাদের প্রভুকে সেই দিনের জন্যে ভয় করি যেদিন মানুষের মুখ বিমর্ষ হয়ে যাবে আর তাদের মুখমণ্ডলের চামড়া কু'কড়ে যাবে। অতএব আল্লাহ তাদেরকে সেই দিনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাদেরকে সজীবতা ও স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছেন।

ফাই' হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ সেই সব গরীব লোকেরও অংশ রয়েছে যারা হিজরত করেছে এবং যারা আপন ঘর-বাড়ি ধন-সম্পদ থেকে বিতাড়িত হয়েছে; (এবং যারা এই সবকিছু এ জন্যে স্বীকার করেছে যে,) তারা আল্লাহর ফযল এবং তার সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাজে সাহায্য করে। প্রকৃতপক্ষে এরাই হচ্ছে সত্যবাদী।

> আল্লাহ সেই সব লোককে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সীসা-জমানো প্রাচীরের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হয়ে লড়াই করে। *(আস-সাফ:৪)*

> যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, আর কাফেরগণ লড়াই করে জুলুম ও বিদ্রোহের খাতিরে। *(আন-নিসা:৭৬)*

আল্লাহ কেবল সেই আমলকেই কবুল করেন, যা খালেছভাবে তাঁরই জন্যে করা হবে এবং যা দ্বারা শুধু তাঁর সন্তুষ্টিলাভই লক্ষ্য হবে।

এই আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইসলাম সর্বপ্রকার পার্থিব ও পরকালীন স্বার্থ পরিত্যাগ করে একটি মাত্র বস্তুকে জীবনের লক্ষ্য, মানুষের সকল প্রয়াস-প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য এবং সমগ্র ইচ্ছা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবস্তু বলে ঘোষণা করেছে আর সে বস্তুটি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার রেযামন্দী ও তাঁর সন্তুষ্টিলাভ। #

www.pathagar.com

কালচার কি?

আবুল মনসুর আহমদ

আমাদের কালচারের কথা জানিতে হইলে আগে বুঝিতে হইবে কালচারটা কি? কালচারের প্রতিশব্দরূপে আমরা সাধারণতঃ 'কৃষ্টি', 'সংস্কৃতি', 'তহ্যিব' ও 'তমদ্দুন' শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া থাকি। ধাতুগত অর্থের দিক হইতে বিচার করিলে কিন্তু এর একটাও কালচারের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। তবে কৃষ্টি শব্দটা কর্ষণ কালটিভেশন বা চাষ অর্থে কালচারের পরিভাষারূপে ব্যবহার করা হয় বলিয়া অন্য দুইটি শব্দের চেয়ে এইটাই কালচারের বেশী কাছাকাছি। ইংরাজীতে যাকে বলা হয় রিফাইনমেন্ট, আরবীতে যাকে তহ্যিব বলা হয়, সংস্কৃতি শব্দটা সেই অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তমুদ্দুন শব্দটা নাগরিক অর্থে কালচার অপেক্ষা সিভিলিযেশনের প্রতিশব্দ-রূপেই অধিকতর উপযোগী।

কিন্তু এ সব বিতণ্ডা নিরর্থক। কারণ, খোদ কালচারের অর্থ লইয়াই ইংরাজী সাহিত্য এবং ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতদের মধ্যে ঘোরতর মত-বিরোধ রহিয়াছে। সে মত-বিরোধ এত তীব্র যে বাংলায় আমরা ঐ তিনটি শব্দের যে-কোনও একটিকে স্বচ্ছন্দে কালচারের প্রতিশব্দরূপেই ব্যবহার করিতে পারি।

www.pathagar.com

কালচারের সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। এত কঠিন যে উনিশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পুরা একশ বছরের দীর্ঘ মুদ্দতে ইউরোপ আমেরিকার দুইজন পণ্ডিতও এ ব্যাপারে একমত হইতে পারেন নাই। তার উপর অনেকেই আবার কালচার ও সিভিলিযেশনকে একই অর্থে ব্যবহার করিয়া বিষয়টাকে আরও জটিল ও সমস্যটাকে আরও ঘোরালো করিয়া ফেলিয়াছেন। ফলে অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে কালচারকে ডিফাইন করার আর কোনও উপায় নাই। বিশ্লেষণ দ্বারাই উহাকে বুঝিতে হইবে।
ইংরাজী সাহিত্যে কালচার শব্দটা প্রথম আমদানি করেন ফ্রান্সিস্ বেকন ষোল শতকের শেষদিকে। উহাকে ডিফাইন করার চেষ্টা করেন সর্ব প্রথম ম্যাথু আর্নল্ড ইংলণ্ডে এবং ওয়াল্ড ইমার্সন আমেরিকায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি। কিন্তু কালচার শব্দের যে অর্থে তাঁরা উহার সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন শব্দটা বেশীদিন সে অর্থে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। বিশ শতকের মাঝামাঝি রবার্ট এযরা পার্ক ও টেইলার প্রভৃতি মার্কিন পণ্ডিত এবং টার্নার ও লাস্কি প্রভৃতি ইংরাজ পণ্ডিতগণের লেখায় কালচার শব্দটা অনেক ব্যাপক ও গভীর অর্থে ব্যবহৃত হইতে শুরু করে। এর ফলে শব্দটা ব্যাপকতর ও গভীরতর মানে গ্রহণ করার ফলে এই দিককার জটিলতাও ব্যাপক ও গভীর হইয়াছে। সম্প্রতি পশ্চিমা সাহিত্যে 'কালচার' শব্দটা আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতে শুরু করিয়াছে। সেখানে 'পলিটিক্যাল কালচার', 'এথিক্যাল কালচার' 'এস্থেটিক কালচার' 'রিলিজিয়াস কালচার' ইত্যাদি কথার প্রচলন হইয়াছে। এ সব কথা কিন্তু 'এগ্রিকালচার', 'হর্টিকালচার', বা 'ব্লাড কালচার' ইত্যাদি টার্মের মত অকৃষ্টিক কোন বিশেষ বিষয় বা বস্তু-জ্ঞাপক নয়। বরঞ্চ মানুষের মন ও মস্তিষ্ক বিকাশের বিশেষ স্তর-বোধক। তার মানে কোনও সমাজ বা জাতির মনে কোনও এক ব্যাপারে একটা স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার-বিধি মোটামুটি সার্বজনীন চরিত্র, ক্যারেক্টার, আচরণ বা আখলাকের রূপ ধারণ করিলেই সেটাকে ঐ ব্যাপারে ঐ মানবগোষ্ঠীর কালচার বলা হইয়া থাকে। এ অবস্থায় আজিকার পরিবেশে কালচার ও সিভিলিযেশনের সীমা-সরহদ্দ ঠিক রাখা এখন খুবই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তবু কালচার ও সিভিলিযেশন যে এক নয়, সেটা আমাদের বুঝিতে হইবে। সভ্য জগতের মনীষীরাও সে চেষ্টা করিতেছেন। কারণ এটা যুগের দাবি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপ্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসারের দ্বারা দুনিয়াটা যতই ছোট হইতেছে, কালচারে অটনমির প্রয়োজনীয়তা ততই তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। ফলে কালচার ও সিভিলিযেশনের সীমা নির্ধারণ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এ সীমা নির্ধারণ ডেফিনিশন দ্বারা সম্ভব নয়। বিশ্লেষণ দ্বারাই তা করিতে হইবে। এখানে সে চেষ্টাই আমি করিতেছি।

কালচার বনাম সিভিলিযেশন

সহজ কথায় ব্যষ্টি বা ইণ্ডিভিজুয়্যালের যা ব্যক্তিত্ব বা পার্সন্যালিটি, সমষ্টি বা কমিউনিটির তাই কালচার। আমরা যখন কোন একজন লোক সম্বন্ধে বলি ঃ ' লোকটার পার্সন্যালিটি আছে' তখন আমরা সেই লোকটির এমন কতকগুলি গুণ-সমষ্টির দিকে ইশারা করি, যেগুলি ঐকান্তিকভাবে তার নিজস্ব এবং যার দ্বারা সে অপর সাধারণ হইতে পৃথক। অথচ ঐ গুণ-সমষ্টি বা পার্সন্যালিটি ঐ লোকটির বিশেষত্ব নয়। কারণ পার্সন্যালিটি আরও অনেক লোকের আছে। পার্থক্য শুধু এই যে সকলের পার্সন্যালিটি রূপে-গুণে এক নয়। ব্যক্তিত্বে-ব্যক্তিত্বে সুস্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। ঐ পার্থক্যের দ্বারাই তাদেরে চিনা যায়। ঐ পার্থক্যটুকুই তাদের নিজস্বতা। নিজস্বতাই ঐ পার্থক্যের প্রাণ। ঐটুকুই ব্যক্তিত্ব।

www.pathagar.com

ঠিক তেমনি, সকল লোক-সমষ্টিরই অর্থাৎ সব কমিউনিটি সমাজ বা জাতিরই একটি নিজস্ব সমবেত ব্যক্তিত্ব বা কর্পোরেট পার্সন্যালিটি আছে। তারই নাম ঐ লোক-সমষ্টি বা কমিউনিটির কালচার। এই লোক সমষ্টি বা কমিউনিটিকে আমরা অবস্থাভেদে, জাতি বা ন্যাশন, উপজাতি বা ন্যাশন্যালিটি, সমাজ বা সোসাইটি, এমন কি পরিবার বা ফ্যামিলি বলিতে পারি ও বলিয়া থাকি।

জাতি বা ন্যাশন শব্দটা ইদানিং বেশীর ভাগ রাষ্ট্রীয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নৃতাত্ত্বিক এথ্‌নিক্যাল বা র‍্যাশিয়াল অর্থে ততটা নয়। ধর্মীয় অর্থে তো নয়ই। একটি রাষ্ট্রের সব নাগরিক মিলিয়াই ন্যাশন বা রাষ্ট্রীয় জাতি, নৃতত্ত্ব ধর্ম ও ভাষার দিক দিয়া এক না হইলেও। যেমন আমরা পাকিস্তানীরা এক রাষ্ট্রীয় জাতি বা ন্যাশন, যদিও নৃতত্ত্ব ধর্ম ও ভাষার দিক হইতে আমরা এক নই। অপর দিকে, রাষ্ট্রের নাগরিক না হইলে নৃতত্ত্ব ও ভাষার দিক হইতে এক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের লোক হইয়াও এক ন্যাশন হয় না। যেমন পশ্চিম বাংলার লোকেরা ভাষা ও নৃতত্ত্বের দিক হইতে আমাদের গোষ্ঠী ও সমাজের লোক হইয়াও আমাদের সাথে এক জাতি বা ন্যাশন নয় এবং ভাতরীয় মুসলমানরা ধর্ম নৃতত্ত্ব ও ভাষার দিক হইতে এক গোষ্ঠী এক সমাজের লোক হইয়াও আমাদের ন্যাশনের লোক নয়।

কিন্তু এই রাষ্ট্রীয় জাতির পার্সন্যালিটি অর্থাৎ কালচার এক নাও হইতে পারে। একই ন্যাশনের ভিতরে একাধিক ন্যাশনালিটি থাকিতে পারে। সে সবের পৃথক-পৃথক কর্পোরেট পার্সন্যালিটি বা কালচার থাকিতে পারে। যেমন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা একই রাষ্ট্রীয় ন্যাশনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও পৃথক ও স্বতন্ত্র ন্যাশনালিটি এবং পৃথক ও স্বতন্ত্র কর্পোরেট পার্সন্যালিটির অধিকারী। দুই অঞ্চলের কালচারও তাই স্বতন্ত্র।

কালচার ও সিভিলিযেশনের পার্থক্য

এইখানেই আমরা সভ্যতা বা সিভিলিযেশন হইতে কৃষ্টি বা কালচারকে আলাদা করিয়া দেখিবার মত আলোর সন্ধান পাই। আগেই বলিয়াছি, কালচার আমাদের কর্পোরেট পার্সন্যালিটি বা সমবেত ব্যক্তিত্ব। এইবার আরেকটু সহজ করিয়া বলি কালচার আমাদের সামাজিক আমিত্ব। আমরা যা আছি তাই কালচার। পক্ষান্তরে সভ্যতাটা কি? কালচারকে মানুষের ব্যক্তিত্বের সাথে তুলনা করা যায়। অর্থাৎ আমাদের যা আছে তাই আমাদের সিভিলিযেশন। কথাটার আর একটু তফসির করা দরকার। 'আমরা যা আছি' ও 'আমাদের যা আছে' কথা দুইটির মধ্যে যে মৌলিক প্রভেদ আছে, সেদিকে আমাদের নযর দেওয়া উচিত। কাজটা বেশী কঠিন নয়। আমরা আমিত্ব ও আমার সম্পত্তির মধ্যে যে পার্থক্য সুস্পষ্ট, তা মনে রাখিলেই কালচারটা বোঝার কাজ সহজ হইবে। এই দিক হইতে একটু তলাইয়া বিচার করিলে এটাও স্পষ্ট হইয়া আসিবে যে এই কারণে এক জাতির একাধিক কালচার থাকিতে পারে, কিন্তু একাধিক সিভিলিযেশন থাকিতে পারে না। অপর দিকে তেমনি বহু-জাতির এক সিভিলিযেশন থাকিতে পারে বটে, কিন্তু এক কালচার থাকিতে পারে না। কারণ কালচারে নিজস্বতা বা জাতীয় রূপ থাকিতেই হইবে; পক্ষান্তরে সিভিলিযেশনের কোনও জাতীয় রূপ থাকিতে পারে না। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

আমরা যখন মিসরীয় আসিরীয় ব্যাবিলনীয় আর্য গ্রীক রোমান আরব বা চীনা সভ্যতার কথা বলি, তখন কোন ভৌগলিক দেশের রাষ্ট্রীয় জাতির সভ্যতার কথা বুঝাই না। বুঝাই একটা যুগের সভ্যতা। শিক্ষা-দীক্ষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে দর্শন-সাহিত্যে শিল্প-বাণিজ্যে কলা-

www.pathagar.com

কারিগরিতে মানুষের সামগ্রিক অগ্রগতির নামই সভ্যতা। মানব-মনের ক্রমবিকাশের ইহা নিদর্শন। সে কারণে গভীরতা ও ব্যাপ্তিতে প্রসার লাভ সভ্যতার স্বভাব। বনের আগুনের মত নিজের আলোকে ও দাহিকা শক্তিতে বিস্তার লাভই ইহার অন্তর্নিহিত জীবনী শক্তি। আগুন যেমন ইন্ধন হইতে ইন্ধনান্তরে ছড়াইয়া পড়ে, সভ্যতাও তেমনি জাতি হইতে জাত্যন্তরে ছড়াইয়া পড়ে। জ্ঞান যেমন শিক্ষক হইতে আরও বড় হইয়া ছাত্রের মধ্যে বিকশিত হয়, সভ্যতাও তেমনি শিক্ষক-জাতি হইতে শিষ্য-জাতিতে অধিকতর উন্নত ও প্রসারিত হয়। সভ্যতা ক্রমবিকাশমান। জ্ঞানের মতই সে অক্ষয়, আগুনের মতই সে অবির্নাণ। কাজেই অতীতের ঐ সব সভ্যতার সাথে কোন একটা বিশেষ মানব গোষ্ঠীর নাম সংযুক্ত থাকার অর্থ এই নয় যে ঐ ঐ সভ্যতার ফল ঐ ঐ মানব গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বস্তুতঃ ঐ সব সভ্যতার ফল ঐ ঐ মানব গোষ্ঠীর বাহিরের লোকেরাও ভোগ করিয়াছিল। প্রদীপ যার আংগিনাতেই জ্বলুক, পথচারীও সে আলোকে সুবিধা ভোগ করিবে।

একেবারে ঘরের কাছে নাযির লওয়া যাক। বর্তমান যুগের সভ্যতাকে আমরা কিছুদিন আগে পর্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যতা বলিতাম। ঐ সভ্যতার নেতৃত্ব এখন আমেরিকার হাতে চলিয়া যাওয়ায় উহাকে আমরা এখন ওয়েস্টার্ন সিভিলিযেশন বা পশ্চিমা সভ্যতা বলিয়া থাকি। মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই সভ্যতা অচিন্তনীয় উন্নতি বিধান করিয়াছে। পাকা রাস্তা মোটর গাড়ী রেলগাড়ী হাওয়াই জাহাজ পোস্ট-টেলিগ্রাম টেলিফোন রেডিও-টেলিভিশন ইত্যাদি যোগাযোগ ব্যবস্থায়, ক্যামেরা মুভি ক্যামেরা টেক্‌নিকালার থ্রিডাইমেনশন, মঞ্চ ও পর্দা ইত্যাদি চারুশিল্পে, রোটারি মেশিন লাইনোটাই মনোটাইপ ইত্যাদি জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের সাজ-সরঞ্জামের আবিষ্কারে, শিল্প-সাহিত্যের উন্নতিতে, ইঞ্জেকশন-অপারেশন, রেডিওলজি-কার্ডিওলজি প্রভৃতি চিকিৎসা প্রণালীতে, স্টিলফ্রেমের শতাধিক তলার আকাশচুম্বী ইমরাত নির্মাণে, ঐ সব ইমারতে উঠানামার জন্য লিফট-এস্কেলেটার স্থাপনায়, বিদ্যুৎ ও এটম শক্তিকে মানবের সেবায় নিযুক্তিতে, শূন্যলোকে গ্রহ-উপগ্রহ পরিভ্রমণের বাস্তব আয়োজনের সাফল্যে মানব-মনের যে অভাবনীয় বিকাশ লাভ ঘটিয়াছে এবং এর ফলে মানুষের বৈষয়িক জীবনে যে সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং তাদের নৈতিক জীবনে যে উন্নতি (অথবা যদি বলিতে চান অবনতি) হইয়াছে, তার সামগ্রিক নাম বর্তমান যুগের সভ্যতা। পশ্চিমা জাতিসমূহ এই সভ্যতার স্রষ্টা বলিয়া এর নাম পশ্চিমা সভ্যতা। কিন্তু তাই বলিয়া এই সভ্যতার ফল কি আমরা পূরবীরাও ভোগ করিতেছি না? নিশ্চয় করিতেছি। শুধু ব্যবহারে দিক হইতে নয়, সৃষ্টির দিকে হইতেও। পশ্চিমাদের আবিষ্কৃত যন্ত্রাদি ও তাদের তৈরী জিনিসপত্র ব্যবহার করিয়াই শুধু আমরা সন্তুষ্ট থাকিতেছি না। নিজেরাও সে সব তৈরী করিতেছি। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে আর্টে-সাহিত্যে শিল্পে-বাণিজ্যে আমরা পশ্চিমাদের সমান ও মতন হইবার চেষ্টা করিতেছি। স্বয়ং পশ্চিমারাও আমাদের সব শিখাইবার ও আমাদের মান উন্নত করিবার জন্য সযত্নে ও সাগ্রহে চেষ্টা করিতেছি। ফলে এই সভ্যতার সুযোগ ও সুবিধা পশ্চিমাদের মতই আমরাও ভোগ ও ব্যবহার করিতে পারিতেছি। যে যে-পরিমাণে তা পারিতেছে, তার জীবনের মান ও মনের দিগন্ত সেই পরিমাণে উন্নত ও প্রসারিত হইতেছে। সেই হেতু ও সেই পরিমাণে দেশ ও জাতি-নির্বিশেষে গোটা দুনিয়ার মানুষ বর্তমান সভ্যতার অংশীদার। কাজেই পশ্চিমা সভ্যতাটা নামে পশ্চিমা ও অবদানে ইউরোমার্কিন হইলেও আসলে এটা কোন এক জাতির বা জাতি-সমষ্টির সভ্যতা নয়, বর্তমান যুগের

www.pathagar.com

সভ্যতা। এইভাবে সভ্যতাটা আসলে যুগেরই বৈশিষ্ট্য, কোন জাতি বা দেশের বৈশিষ্ট্য নয়। বর্তমান যুগের সভ্যতা সম্বন্ধে যা সত্য, অতীতের সভ্যতা সমূহ সম্বন্ধেও তাই সত্য ছিল।

কালচারের ধারক পাড়াগাঁ

কিন্তু কৃষ্টি সম্বন্ধে এ-কথা বলা যাইতে পারে না। আগেই বলিয়াছি, কৃষ্টি সামাজিক ব্যক্তিত্ব। সামাজিকতা পল্লী-জীবনের বৈশিষ্ট্য। এই দিক হইতে কালচারের ধারক ও বাহক পল্লীগ্রাম। শহরে সামাজিক জীবনের অভাব। সেখানে প্রতিবেশিত্ব গড়িয়া উঠিতে পারে না। শহরের বাসিন্দাদের অধিকাংশই ভাসমান জনতা। আজ এ এখানে কাল ও ওখানে। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরি-বাকুরির সমাবেশ হইতেই শহরের পত্তন ও প্রসার। তাতে নিত্য-নতুন লোকের আমদানি। পুরাতনের রফতানি। ওদের মধ্যে প্রতিবেশিত্ব গড়িয়া উঠিবার সময়ই হয় না। শহরের বুনিয়াদী বাশিন্দাদের মধ্যে মহল্লায়-মহল্লায় যে একটা প্রতিবেশিত্ব চালু ছিল তাও ভাংগিয়া গিয়াছে বা যাইতেছে। শহরের উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি ও পুনর্নির্মাণের বন্যায় ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের গ্রাস্ট বা ধাক্কায় ঐ সব যে কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে, তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। পক্ষান্তরে পাড়াগাঁয়ে এই প্রতিবেশিত্ব স্বাভাবিক। সেখানে এক বাড়িতে একজনের অসুখ হইলে সারা গ্রামে রটিয়া যায়। শহরে পাশের বাড়িতে লোক মরিয়া গেলেও কেউ খবর রাখে না। পাশের বাড়িতে কে বা কারা থাকে, তাদের পরিবারে লোক কত, কে কি করে, অনেক সময় তাও আমরা জানি না। জানিতে পারি না। জানিবার অবসর নাই। শহরের সবাই আমরা কাজের লোক। অতিমাত্রায় ব্যস্ত। পারতপক্ষে কেউ পায়ে হাঁটিয়া চলে না। রিকশা-ট্যাকসি-মোটরে ছুটা-ছুটি। দৌড় ছাড়া গতি নাই। নষ্ট করিবার সময় নাই। এই পরিবেশে প্রতিবেশিত্ব বা আত্মীয়তা গড়িয়া উঠিতে পারে না। পরিচয় যা ঘটে, তা নিতান্ত বৈষয়িক। সংক্ষিপ্ত। দুইদন্ড বসিয়া আলাপ করিবার সময় নাই। যাদের আছে তারা ক্লাবে যায়। ক্লাব প্রতিবেশিত্ব নয়। কাজেই শহরবাসীর চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্র, ভাব-গতিক এক হইতে পারে না। ফলে শহরের বাশিন্দারা হয় মাল্টিকালার; শত-রংগা; রং-বেরং এর লোক। পক্ষান্তরে পল্লীর লোকেরা হয় ইউনিকালার বা একরংগা। শহরের জনতার পরিবর্তন ঘটিতেছে প্রতিদিন, প্রতি ঘন্টায়, প্রতি মিনিটে। পল্লীর লোক দাদা-পরদাদার আমল হইতে চৌদ্দ পুরুষ ধরিয়া একই জায়গায় একই ধরনে বসবাস করিতেছে। এই কারণেই পল্লী-গ্রামের লোকদের মধ্যে সুখে-দুঃখে হাসি-কান্নায় একটা আন্তরিক সমবেদনা ও আত্মীয়তা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই আত্মীয়তা হইতে তাদের আনন্দে-উল্লাসে আমোদে-প্রমোদে শোকে-মাতমে অভাবে-অনটনে আচারে-ব্যবহারে পোশাকে-পরিচ্ছদে চিন্তায়-ভাবনায় প্রথায়-সংস্কারে কাহিনী-কিংবদন্তিতে, এমন কি ভূত-প্রেত দর্শনে-শ্রবণে, একটা একাকারত্ব বা ইউনিফর্মিটি দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। পল্লী-জীবনের অচঞ্চলতার মতই এই ইউনিফর্মিটি অচঞ্চল ও স্থায়ী। উপরে বর্ণিত সামাজিক আচারের সমাবেশ ও সমষ্টিই জাতির কালচার।

পল্লী জীবনের ঐ ইউনিফর্মিটিই কালচারের বুনিয়াদ। এই জন্য কালচারটা মূলতঃ এবং প্রধানতঃ পল্লী সম্পদ। পল্লী জীবনই সে সম্পদের ধারক ও রক্ষক।

শহর কালচারের স্রষ্টা

অপর দিকে শহর শিল্পবাণিজ্য শিক্ষা সাহিত্যে ও রাষ্ট্র পরিচালনার কর্ম-কেন্দ্র। ঐ সব কাজকর্ম উপলক্ষে দেশ বিদেশের হরেক রকমের লোকের সেখানে সমাবেশ। তাদের ধর্ম ঈমান আচার অনুষ্ঠান চিন্তা ভাবনা খোরাক পোশাক চাল চলন বিদ্যা-বুদ্ধি এক নয়।

www.pathagar.com

এদের আলাপ পরিচয় মিলামিশাও স্থায়ী নয়। এমন পরিবেশ ইউনিফর্মিটি ঐক্য ও আত্মীয়তা, এক কথায় কালচার গড়িয়া উঠার অনুকূল নয় সে কথা একটু আগেই বলিয়াছি। কিন্তু এর একটা ভাল দিকও আছে। নিত্য-নতুন লোকের আসা-যাওয়া কাজে-কর্মে তাদের আলাপ-পরিচয় ও পরস্পরের ভাবের আদান- প্রদান হয় শহরে। তাতে নিত্য নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ হয় তাদের। তাদের সকলের দৃষ্টিভংগিতেই আসে একটা উদারতা। এক জায়গায় বসিয়া বায়স্কোপে বিদেশ দেখার মতই শহরের লোকেরা ঘরে বসিয়া দুনিয়া দেখে। নিত্য-নতুন সমস্যার সৃষ্টি ও সমাধান দেখে তার চোখের সামনে। এইভাবে আসে তাদের মধ্যে নতুন চিন্তাধারা। তাতে বিচার বুদ্ধিতে তাদের আসে উদারতা। মনে আসে প্রসারতা। তারা লাভ করে বিদেশের ভাল জিনিস গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আর নিজেদের খারাপ জিনিস বর্জন করিবার সাহস। পল্লী-জীবনে যে সব বিশ্বাস থাকে তাদের ঈমানের অংগ শহর-জীবনে বিজ্ঞান প্রভাবিত মুক্ত বুদ্ধির বিচারে সে সবই হইয়া পড়ে নির্বোধ কুসংস্কার। তাই পাড়াগাঁয়ে যারা সন্ধ্যা বেলায়ই বাড়ির পাশের ছোট শেওড়া গাছটিতে ভূত-প্রেত দেখে তারাই শহরে আসিয়া বড় বড় বটগাছে অমাবস্যার রাত্রেও ভূত প্রেত দেখে না।

বহুদর্শনের ফলে শহরবাসীর এই যে মনের বিকাশ ও দৃষ্টি প্রসারতা, এটা তারা লাগাইতে চায় নিজের সমাজের ও দেশের কাজে । অপরের দেখাদেখি নিজের লোকদের ভাল করিয়া তুলিবার প্রবল ইচ্ছা জাগে তাদের অন্তরে। তারা হইয়া উঠে রিফর্মিস্ট। তারা নিজেদের চাল-চলনে আচার-ব্যবহারে ঈদে-পার্বণে এমনকি ধর্ম-বিশ্বাসে, এক কথায় নিজেদের কালচারে সংস্কার প্রবর্তন করিয়া সেটাকে করিতে চায় অধিকতর ভব্য শালীন ও সুন্দর। শিক্ষা-কেন্দ্র সাহিত্য-সংঘ সংবাদপত্র পত্রিকার অফিস রংগমঞ্চ ক্লাব-রেস্তরা মসজিদ-মন্দির-গির্জার প্রাচুর্য থাকে শহরেই। এই সব জায়গা হইতেই নতুন নতুন ভাব ও চিন্তা জন্ম ও প্রসার লাভ করে। রাস্তাঘাট ট্রেন মোটরবাস ডাক-তার ইত্যাদি যানবাহনের ক্রমবর্ধমান বিস্তারে ঐ সব নতুন চিন্তাধারা ছড়াইয়া পড়ে মফস্বলে। মফস্বলের লোকেরা সকল চিন্তা ও কাজে অনুকরণ ও অনুসরণ করে শহরবাসীকে। এইভাবে শহরে কালচার সৃষ্টি হইয়া বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছুরিত হয় পল্লী-জীবনে। শহর করে যা সৃষ্টি, পল্লী করে তা ধারণ ও পালন ।

কালচার ও সিভিলিযেশনের সীমারেখা

অতএব দেখা গেল, শহর সভ্যতা ভিত্তিক এবং পল্লী কৃষ্টি ভিত্তিক, এ কথাও যেমন নিরাধারা বলা যায় না, সভ্যতা শহরবাসী এবং কৃষ্টি পল্লীবাসী একথাও তেমনি চোখ বুঁজিয়া কওয়া যায় না। এই কারণে সিভিলিযেশন ও কালচারের সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা এত কঠিন।

এ ছাড়া আরেকটা অসুবিধা আছে। এমন অনেক ব্যাপার আছে, যার খানিকটা কালচার আর খানিকটা সিভিলিযেশন। উদাহরণস্বরূপ বিয়ার কথাটাই ধরা যাউক। বিয়া প্রথাটা সভ্যতা। যে দেশ ও সমাজে বিবাহ প্রথা চালু নাই, সে দেশ ও সমাজকে সভ্য বলা যায় না। সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্রেরা জানেন যে আদিকালে মানুষের মধ্যে বিবাহ প্রথা ছিল না। সভ্যতা বিকাশের সংগে সংগে এই প্রথা সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে একরূপ আইনে পরিণত হইয়াছে। কাজেই বিবাহটা সভ্যতা। কিন্তু বিবাহের রসুম বা প্রণালী সভ্যতা নয়, কালচার মাত্র। বিয়ার রসুমের খুঁটিনাটি এক-এক দেশে এক-এক জাতিতে এক-এক

www.pathagar.com

রকম। এক দেশে দুলা-দুলহান নিজেরা দেখাশোনা ও কোর্টশিপ করিয়া বিয়া করে। আরেক দেশে দুলা-দুলহানের দেখাশোনা হয় না। তাদের বাপ-ভাই মুরুব্বিরাই বিয়া ঠিক করেন। এক দেশে প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে বিয়া হয়। আরেক দেশে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে বিয়া হয়। এক দেশে বা এক জাতিতে বরপক্ষ দেয় কাবিন ও দেনমোহর। আরেক জাতিতে কন্যাপক্ষ দেয় পণ ও যৌতুক। এক দেশে পুরুষ নারীকে বিয়া করে। আরেক দেশে নারী করে পুরুষকে। এক দেশে একই সময়ে একাধিক বিয়া করা বেআইনী। আরেক দেশে এক সংগে চার বা তারও বেশী বিয়া করা যায়। এক দেশে তালাক বা বিবাহ-বিচ্ছেদের দস্তুর আছে। আরেক দেশে তা নাই। এক দেশে বিধবারা বিয়া করিতে পারে। আরেক দেশে পারে না। এক দেশে আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে যে কেউকে বিয়া করা যায়। আরেক দেশে তা চলে না। এই সব নিয়ম-কানুনের একটাও সিভিলিযেশনের প্রশ্ন নয়, কালচারের প্রশ্নমাত্র। তার মানে এই সব নিয়মকানুনের পার্থক্যের দরুন কোন জাতি সভ্য বা অসভ্য বিবেচিত হয় না। বরং এ সবই বিভিন্ন সভ্য জাতির নিজ-নিজ বিশেষ সামাজিক বা ধর্মীয় ব্যবস্থা; সুতরাং তাদের কালচারের অংগ।

যৌন-সমতার প্রশ্নটাও তাই। নারীকে নরের অধীন দাসী-বান্দী গৃহপালিত জীব বা পণ্য মনে করা অসভ্যতা। কিন্তু পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে উভয়ের কর্তব্যের পৃথকীকরণটা অসভ্যতা নয়, কালচারের পার্থক্য মাত্র।

বিয়ার বেলা যেমন, জন্মের বেলায় তেমনি। সন্তান জন্মের সময় বিভিন্ন দেশে ও ভিন্ন-ভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন প্রথা চালু আছে। কোনও দেশে ও জাতিতে সন্তানের জন্মে আকিকা দেওয়া হয় এবং আকিকা দেওয়ার সময়েই নাম রাখা হয়। আরেক দেশে সন্তানকে ধর্মস্থানে ধর্ম যাজকের কাছে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানেই তার নামকরণ হয়। এক দেশে প্রতিবছর সন্তানের জন্মবার্ষিকী পালন করা হয় এবং আত্মীয়-স্বজন তাকে উপহার উপঢৌকন দেয়। আরেক দেশে সন্তানের জন্মতারিখটি আল্‌গোছে ভুলিয়া যাওয়া হয়। এক দেশে ছেলেদের খৎনা করান হয়। আর এক দেশে হয় না। এ সবই কালচারের অংগ। সিভিলিযেশনের অংগ নয়। কিন্তু সন্তান জন্মের সময় ছেলে-সন্তান রাখিয়া মেয়ে-সন্তানকে নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইলে তাকে আর কৃষ্টি-অকৃষ্টির প্রশ্ন বলা যায় না। তা হইয়া পড়ে সভ্যতা-অসভ্যতার প্রশ্ন।

জন্মের সময় যা, মৃত্যুর সময়েও তাই। এর খানিকটা সভ্যতা, খানিকটা কৃষ্টি। যেমন ধরুন, মৃত্যুর পর লাশটার গোশত খাইয়া ফেলিলে বা শিয়াল-কুত্তার ও চিল-শকুনের খাওয়ার জন্য ফেলিয়া দিলে সেটা হইবে অসভ্যতা। আর সযত্নে সাড়ম্বরে সে লাশটার সৎকার করাটা হইবে সভ্যতা। এই সৎকারেরও আবার বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। বিভিন্ন দেশে ভিন্ন-ভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন প্রণালীতে তা করা হয়। সে প্রণালীগুলি হইবে ঐ ঐ দেশ বা জাতির কালচার। এই ধরুন, কোন দেশে বা জাতিতে লাশ পুড়াইয়া ফেলা ও পুঁতিয়া ফেলাও আবার ভিন্ন-ভিন্ন রকমের হইতে পারে। কেউ কাঠ-লাকড়িতে পুড়ায়, কেউ বিজলির তাপে পুড়ায়। পুঁতিবার বেলাও তেমনি এক জাতি লাশ সযত্নে ধুইয়া মুছিয়া নয়া কাপড় পরাইয়া খুশবু লাগাইয়া দাফন করে। আরেক জাতি লাশটি কাঠের বাক্সে ভরিয়া মাটিতে চাপা দেয়। এক জাতি তাদের মৃত ব্যক্তিদেরে বিশালায়তনের ফুল-বাগিচাওয়ালা গোরস্থানে পৃথক পৃথক সমাধি দখল করিতে দিতেছে। আর এক জাতি তাদের মৃত ব্যক্তিদেরে স্বল্পায়তনের শ্মশানঘাটের ছাই হইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য করিতেছে। এ সবই

www.pathagar.com

বিভিন্ন জাতি বা মানব গোষ্ঠীর কালচারের অংশ। সিভিলিযেশনের সংগে এই সবের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু এই কালচারই একদিন সিভিলিযেশনের প্রশ্ন হইয়া উঠিতে পারে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যদি ভবিষ্যতে প্রমাণিত হয় যে, এই দুই প্রথার কোনও একটি বা উভয়টি মানব-স্বাস্থ্যের পক্ষে অকল্যাণকর, তখন উহা আর কালচারের প্রশ্ন থাকিবে না; হইয়া উঠিবে উহা সিভিলিযেশনের প্রশ্ন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সতীদাহের কথা বলা যায়। মৃত স্বামীর চিতায় বিধবা পত্নীকে পুড়াইয়া ফেলা একদা কোন-কোন জাতির কালচারের অংগ ছিল। কিন্তু উহা সিভিলিযেশনের পরিপন্থী বিবেচিত হওয়ায় এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। কাজেই দেখা গেল, এই সব ব্যাপারের খানিকটা কালচার আর খানিকটা সিভিলিযেশন। মানুষের ভাষা উপাসনা- প্রণালী এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিরও খানিকটা কালচার আর খানিকটা সিভিলিযেশন। বর্ণমালাযুক্ত ভাষা মানুষের সভ্যতার নিদর্শন। কিন্ত হরফের আকৃতি ও ডাইনে-বামে উপরে নিচে লেখার প্রণালী কালচারের নিদর্শন। গির্জা-মন্দির-মসজিদে প্রার্থনা-উপাসনা করা, রোযা-নামায পড়া, সন্ধ্যা-আহ্নিক করা, বুকে ক্রস ঝুলান, ধর্মস্থানে গমন, কবর যিয়ারত এমনকি পীরের দরগায় শিরনী ও কালীবাড়িতে কবুতর মানত করা ইত্যাদি ইত্যাদি সবই মানুষের কালচারের অংগ। সিভিলিযেশনের সংগে এর কোন সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ এই সব ক্রিয়া-কলাপ এইরূপে করিলে সভ্যতা হইবে, আর ঐ ধরনের করিলে তা অসভ্যতা হইবে, এমন কোন কথা নাই। কিন্তু এইসব কালচারের প্রতিপালনে, পূজা-অর্চনা বা ইবাদত-বন্দেগি করিতে গিয়া উপাস্য দেবতার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রাণী বলি দিলে উহা আর কালচারের প্রশ্ন থাকে না, হইয়া পড়ে তা সিভিলিযেশনের প্রশ্ন।

ধর্ম ও কৃষ্টির সীমারেখা

এইখানে ধর্ম ও কৃষ্টির সীমারেখা সম্বন্ধে দুই-একটা কথা নিতান্ত প্রাসংগিক হইয়া পড়িতেছে। কারণ উপরে যে সব ক্রিয়া-কলাপের দিকে ইশারা করা হইল তার অনেকগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অংগ। রিলিজিয়ান ও কালচারের বাউন্ডারি নির্দেশ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কালচার ও সিভিলিযেশনের সীমা নির্ধারণই ইহার প্রতিপাদ্য। তবু কালচারের কথা বলিতে গেলে ধর্মের কথা স্বতঃই আসিয়া পড়ে বলিয়া এখানে অতি সংক্ষেপে ধর্ম ও কালচারের সীমা নির্দেশের চেষ্টা করিতেছি।

ধর্ম ও কৃষ্টির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। কিন্তু তা হইলেও দুইটা এক বস্তু নয়। এক কথায় বলা যায় ধর্ম কালচারের নির্যাস; পোটেন্‌টাইয্‌ড্‌ কালচার। দার্শনিক ম্যালিনস্কির ভাষায় 'মাস্টার ফোর্স অব হিউম্যান কালচার।' কাজেই ধর্মের সবটুকই কালচার; কিন্তু কালচারের সবটুকুই ধর্ম নয়। সহজে বুঝিবার জন্য কালচারকে গাছের সংগে তুলনা করিলে ধর্মকে গাছের ফলের সংগে তুলনা করিতে হয়। গাছ হইতে রিলিজিয়ান ও রিলিজিয়ান হইতে কালচারের উৎপত্তি। গাছ কিন্তু ফলের মত নিটোল ও অনাবিল নয়। তেমনি ভাল-মন্দ ও ফুল-কাঁটা লইয়াই কালচার।

কালচারের ব্যাপকতা

এমনিভাবে মানুষের গৃহনির্মাণ পোষাক-পাতি রান্না-বান্না খেলা ধুলা নাচ-গান মায় ওয়ারিসী আইন-কানুন পর্যন্ত সব ব্যবস্থার মধ্যেই খানিকটা কালচার ও খানিকটা সিভিলিযেশন রহিয়াছে। মানুষ আদিকালে বনে-জংগলে-গুহায় বাস করিত। স্থায়ী বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া তারা সভ্য হইয়াছে। স্থপতি বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন করিয়া অধিকতর সভ্য হইয়াছে।

www.pathagar.com

কাজেই আবাসগৃহ নির্মাণ সভ্যতা। কিন্তু স্থাপত্যের রূপ কি হইবে, দালান-ইমারত চূড়াওয়ালা বা গুম্বুজওয়ালা হইবে, না চৌকোণা বা চ্যাপ্টা হইবে, ইট-পাথরের হইবে, না কাঠ-বাঁশের হইবে, এ সব কালচারের ব্যাপার। কাপড়-পরা-না-পরাটা সভ্যতার প্রশ্ন। কিন্তু কি ধরনের পোশাক পরা হইবে, প্যান্ট না পাজামা, কোট না কোর্তা, শাড়ি-সেলওয়ার, না স্কার্ট-গাউন, সেটা কালচারের প্রশ্ন। মাছ-গোশত তরকারি রাঁধিয়া খাইবে, না কাঁচা খাইবে, এটা হইবে সভ্যতার প্রশ্ন। কিন্তু কি প্রণালীতে রান্না করিবে, কোন্‌টা খাইবে, আর কোন্‌টা খাইবে না, কোন্‌টা হালাল, কোন্‌টা হারাম, কি ধরনের পাক প্রণালী পছন্দের, পেস্ট্রি প্যাটিস ভাল, না রসগোল্লা-সন্দেশ ভাল, এসব কালচারের প্রশ্ন। খেলাধুলাকে মানুষের কর্ম জীবনের স্বাভাবিক অংগ স্বীকার করা সভ্যতা। কিন্তু খেলার বিভিন্ন রূপঃ ফুটবল না রাগবি, ক্রিকেট না বেসবল, পলো না ঘোড়দৌড়, হকি না ডাংগুলি, এসব সভ্যতার প্রশ্ন নয়, কালচারের প্রশ্ন মাত্র। সংগীত ও নৃত্যকে চারুশিল্পের অন্তর্গত করা সভ্যতা। কিন্তু নাচ-গানের বিষয়বস্তু ধরন ও প্রণালীটা কালচারের ব্যাপার। সম্পত্তি মালিকানার স্বীকৃতি সভ্যতার নিদর্শন। কিন্তু সে সম্পত্তির ওয়ারিস নির্ধারণ ও বন্টন প্রণালীটা কালচার মাত্র।

কালচারের উৎস

উপরের আলোচনা হইতে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে মন ও মস্তিষ্ক মানুষকে অন্যান্য জীব-জন্তু হইতে পৃথক করিয়াছে সেই মনের বিকাশের নাম কালচার, মস্তিষ্কের নাম সিভিলিযেশন। আগের আলোচনা হইতে এটাও স্পষ্ট হইয়াছে যে এই নির্ধারণও নিক্তির ওজনে নিখুঁত নয়, মাত্র মোটামুটিভাবে সত্য। সভ্যতা বুদ্ধির বস্তু বলিয়াই সে নিজের জোরে রাজ্য জয় করে। প্রসার ও বিস্তার লাভ করে। হৃদয়ের সাথে সভ্যতার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য নয়। তাই গ্রহণকারীকে অন্তর দিয়া সভ্যতা গ্রহণ করিতে হয় না। তার কোনও দরকারও নেই। এ্যারোপ্লেনকে শয়তানের কল বলিয়াও অনেকে হাওয়াই জাহাজে চড়িয়া হজ করিতে যাইতেছেন। অন্যান্য সব সম্পদের মতই সভ্যতার সাফল্য তার প্রয়োজন।

আজিকার যান্ত্রিক সভ্যতাই তার প্রমাণ। প্রয়োজনের তাকিদেই সারা দুনিয়া এই পশ্চিমা সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছে। মস্তিষ্কের ব্যাপারে বলিয়া ইহা গ্রহণ করিতে কারও কোনও অসুবিধা হয় নাই। দুনিয়ার সব দেশেই ইহা খাপ খাইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির বিধানেই ইহা ঘটিয়াছে। কথাটা সহজে বুঝিবার জন্য আমরা সভ্যতাকে ইমারতের সংগে তুলনা করিতে পারি। আর কালচারকে তুলনা করিতে পারি, এবং আগেই করিয়াছি, গাছের সংগে। ইমারত মাটি হইতে রস গ্রহণ করে না। কাজেই যে কোন সরঞ্জামের যে কোনও প্লানের ইমারত যে কোনও দেশে নির্মিত হইতে পারে। কিন্তু গাছকে মাটি হইতে রস সংগ্রহ করিয়া বাঁচিতে হয়। সেজন্য যে কোনও গাছ দুনিয়ার যে কোনও দেশে লাগান যায় না। মাটি রস সংগ্রহের উপযোগী না হইলে চারা লাগাইলেও তা বাঁচে না।

কালচার সম্বন্ধেও এই কথা। যে কোন দেশের কালচার, তা যতই সুন্দর হউক না কেন, অন্য যে কোন দেশে চালান যাইবে না। স্থানীয় রসের অভাবে তা মারা যাইবে। কারণ আগেই বলিয়াছি কালচারটা মনের বস্তু, মস্তিষ্কের বস্তু নয়। এই দিক হইতে বিচার করিয়া বলা যায় সিভিলিযেশন একটা র‍্যাশনাল কনস্ট্রাকশন; আর কালচার একটা ইমোশ্যনাল গ্রোথ।

www.pathagar.com

ঠিক এই কারণেই দুনিয়ার লোককে যত সহজে পশ্চিমা সভ্যতা গ্রহণ করান গিয়াছে, তত সহজে পশ্চিমা কৃষ্টি গ্রহণ করান যায় নাই। সভ্যতা প্রসার লাভ করে বিজয়ীর বেশে। পশ্চিমা জাতিসমূহ রাজ্য বিস্তারে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে তিন শ বছর ধরিয়া সারা দুনিয়ায় প্রভুত্ব করিয়াছে। এই উপলক্ষে তারা জগতবাসীর কাছে নিজেদের সভ্যতা প্রচার করিয়াছে। বিশ্ববাসী তা গ্রহণও করিয়াছে।

নিজেদের সভ্যতার সাথে সাথে পশ্চিমারা নিজেদের কালচার প্রচারের চেষ্টাও কম করে নাই। কিন্তু শহরের মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া সাধারণভাবে দুনিয়ার সব দেশের জনগণ পশ্চিমা কালচার গ্রহণ করে নাই। শাসক জাতির কালচারের প্রবল স্রোতের মুখেও তারা নিজেদের কালচার মজবুত হাতে ধরিয়া রাখিয়াছে। এটা মানুষের দর্প নয়, প্রকৃতির দর্প। সব দেশের মাটি পশ্চিমা কালচারের চারা গাছের রস যোগাইতে পারে নাই বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়াছে। এটা কি অন্যায় হইয়াছে? পশ্চিমা কালচার গ্রহণ না করিয়া পূরবীরা কি ভুল করিয়াছে? এটা কি তাদের কুসংস্কারী মনোভাবের জন্য হইয়াছে? এটা কি তাদের সংস্কার বিরোরী নস্টালজিয়া? তারা কি জানে না, কি জিনিস তারা হারাইতেছে? না, প্রকৃত অবস্থা তা নয়। মানব জাতির কল্যাণের খাতিরেই তা ঘটিয়াছে। যে বৈচিত্র্যে বিশ্বের সৌন্দর্য নিহিত, স্রষ্টার কারিগরির অসাধারণত্বের যা নিদর্শন, তারই খাতিরে প্রকৃতি এরূপ ঘটাইয়াছে।

ধরুন, এমন যদি না হইত, দুনিয়ার সব জাতি যদি পশ্চিমা কালচার গ্রহণ করিত, তবে অবস্থা কি দাঁড়াইত? সভ্যতার দিক হইতে দুনিয়া যেমন একাকার হইয়া গিয়াছে, কালচারের দিক হইতেও তেমনি সব জাতি এক রংগা হইয়া যাইত। দেহের রং অবশ্য এক হইত না। কিন্তু মনের রং এক হইয়া যাইত। তাতেও কার কি লোকসান হইত?

মানবতার লোকসান হইত দুই দিক হইতে। প্রথমতঃ দুনিয়ার বৈচিত্র্য নষ্ট হইত। বিভিন্ন জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অবসান ঘটিত। হাজার ফুলের বাগিচা যে দুনিয়ায়, সেটা পরিণত হইত এক রংগা গেন্দা ফুলের ক্ষেতে। দুনিয়ার সব জাতি নকল পশ্চিমা জাতিতে পরিণত হইত।

লাখ লোকের সমাজের মধ্যে দুই-চারজন মাত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন থাকিয়া বাকী সব লোক ব্যক্তিত্বহীন হইলে সমাজের অবস্থা যা দাঁড়াইবে, দুনিয়ার সব জাতি নিজ-নিজ কালচারের স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়া পশ্চিমা কালচার গ্রহণ করিলে বিশ্ববাসীর অবস্থা দাঁড়াইবে ঠিক তাই।

দ্বিতীয়তঃ দুইচারজন লোক বা শ্রেণীবিশেষ বাদে সমাজের আর সব লোক ব্যক্তিত্বহীন হইলে সে সমাজ সচেতন সমবেত গণ-জীবন থাকিবে না, হইয়া যাইবে রাখালের পরিচালনায় একপাল গরু। স্বকীয় কালচার বা ব্যক্তিত্বহীন জাতিসমূহ ঠিক তেমনি পশ্চিমা রাখালের অধীনে গরুর পাল হইয়া যাইত। ফলে পশ্চিমা জাতিসমূহ ছাড়া আর সব জাতি হারাইত স্বাধীন চিন্তা কর্মোদ্যম ও সৃষ্টির অভিলাষ। বিশ্ব-সভ্যতায় তাদের কোনও অবদান থাকিত না। কার্যতঃ তারা পরিণত হইত প্রাণহীন যন্ত্রে।

কাজেই দেখা গেল, লোক-সমাজে আদর-কদর মান-ইয্যৎ পাইতে হইলে যেমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হইতে হয়, তেমনি বিশ্ব সমাজে আদর-কদর ও মর্যাদা পাইতে হইলে আমাদের জাতিকেও হইতে হইবে সমবেত ব্যক্তিত্বের, মানে নিজস্ব কালচারের অধিকারী। নিজস্ব কালচারের প্রয়োজন এইখানেই।

www.pathagar.com

বৈচিত্র স্বাভাবিক

মনে রাখা দরকার, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যেমন, জাতির ব্যক্তিত্বও তেমনি, কদাচ নিখুঁত ত্রুটিহীন হইতে পারে না। মারিয়া-পিটিয়া যেমন ব্যক্তিত্ব হয় না, ছাঁচে ঢালিয়া তেমনি কালচার হয় না। আগেই বলিয়াছি, কালচারটা ডিযাইন করা কনস্ট্রাকশন নয়। ওটা গাছের মতই ন্যাচারেল গ্রোথ। বলা যায় ওটা প্রকৃতির তৈরী নদী। মানুষের হাতে-কাটা খাল নয়। দুই কূল ছাপিয়া দুই পাড় ভাংগিয়া ইচ্ছামত চলাই নদীর ব্যক্তিত্ব। কৃত্রিম খালের মত তার দুই পাড় শানে বাঁধা নয়। এই জন্যই দোষেগুণে যেমন ব্যক্তিত্ব, ভাল-মন্দেই তেমনি কালচার। দুনিয়ার সব কালচারের শুধু গুণগুলি বাছিয়া লইয়া একটা নিখুঁত সুন্দর কালচার গড়িবার চেষ্টা করিয়া দেখুন, পারিবেন না। সেটা কালচার হইবে না, হইবে বড় জোর কালচারের ল্যাবরেটরি। মিউযিয়াম হইবার সম্ভাবনাই বেশী।

এর কারণও সুস্পষ্ট। মানুষ ফেরেশতা নয়। দোষে-গুণেই তারা মানুষ। তাদের এ দোষ-গুণের বিশেষত্ব এই যে এক দিক হইতে যেটা দোষ, আর এক দিক হইতে সেটাই গুণ। এক দিক হইতে যেটা দুর্বলতা, আর এক দিক হইতে সেটাই সবলতা। ধরুন, মানুষের রাগের কথা। এক সময় এটা দোষ। কিন্তু সময়ান্তরে এটাই গুণ। নিষ্ঠুরতারই আর এক নাম বীরত্ব। কাপুরুষতাইকেই সময়বিশেষে সহিষ্ণুতা বলা হয়। আহাম্মকির সাধু নাম সরলতা।

কালচারের বেলাও তাই। একের জন্য যা দোষ, অপরের জন্য তাই গুণ। এটাই তাদের পার্থক্য। এই পার্থক্যটুকুই যার-তার বৈশিষ্ট্য। হুবহু ব্যষ্টির ব্যক্তিত্বের মতই। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। হাত-পা চোখ-মুখ নাক-কান খানা-পিনা হাগা-মুতা এবং জন্ম-মৃত্যু কোনও ব্যাপারেই জানোয়ার ও মানুষের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। মন ও মস্তিষ্কের দোহাই দিয়া তাহাদের মধ্যে যে পার্থক্য করি, তাও বড়ই ক্ষীণ। বানরের বেলায় সে পার্থক্যের সীমা কোথায়? শুধু মন-মস্তিষ্কই নয়, তাদের অন্তরও আছে। তাহারাও হাসে-কাঁদে। ভাষাও তাদের একটা আছে।

বৈশিষ্ট্য কি?

তথাপি মন-মস্তিষ্ক ও অন্তরের এক স্তরে জানোয়ার ও মানুষের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য স্থূল দৃষ্টিতে যতই ক্ষীণ হউক না কেন ঐ পার্থক্যটুকুই মানুষের নিজস্বতা। ঐ টুকুই তার বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তিত্ব ও কালচারের বেলাও অবিকল তাই সত্য। হাজার বিষয়ে এক ও সদৃশ্য হইয়াও সামান্য দুই-এক বিষয়ে তারা পৃথক স্বতন্ত্র ও অসদৃশ। দেখা যাইবে সবই ত এক। তবে আর পার্থক্যটা কি? হাঁ, আছে। ঐ যে মানুষের ভিড়ের মধ্যে মাত্র এক ইঞ্চি বেশী লম্বা একটা লোক দেখা যাইতেছে, ঐ দৈর্ঘ্যটুকুই তার বিশেষত্ব। হাতে-পায়ে রং-চেহারায় কথা বার্তায় সব ব্যাপারই আর সবার সাথে তার মিল আছে। কারণ সেও মানুষ। মানুষ না হইয়া সে যদি একটা খুঁটি বা উট হইত, তবে তার উচ্চতা তার বৈশিষ্ট্য হইত না।

তেমনি আগে কালচার হইতে হইবে। তারপর আসিবে কালচারের বৈশিষ্ট্য। সব কালচারের মধ্যে ঐক্য মিল ও সাদৃশ্য থাকিবে হাজার। আর পার্থক্য থাকিবে মাত্র দুই একটি। ঐ পার্থক্যটুকুই তাদের বৈশিষ্ট্য। অপরের চোখে বা বিজ্ঞানের বিচারে সে

www.pathagar.com

পার্থক্যটুকু তুচ্ছ হইতে পারে। কিন্তু ঐ কালচারের জন্য তুচ্ছ নয়। খুব ছোট দৃষ্টান্ত দিয়াই বিচার করা যাউক। মুসলমানের নূরের দাম হিন্দু-খৃষ্টানের কাছে যা, হিন্দুর টিকির দাম মুসলিম খৃষ্টানের কাছে তাই। আবার খৃষ্টানের ক্রসের দামও হিন্দু-মুসলমানের কাছে তুচ্ছ। ইহুদি-মুসলমানরা তাদের ছেলেদের কেন খৎনা করায় এটা হিন্দু-খৃষ্টানরা বুঝিতে না পারিলেও ইহুদি-মুসলমানরা কিন্তু কাজটাকে তাদের কালচারের ফান্ডামেন্টাল মনে করে। বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ পোশাকে অত বাবু ও চেহারায় অত সুন্দর হইয়াও মোচ দিয়া তাঁর অমন সুন্দর মুখখানা ঢাকিয়া রাখিতেন। সে জন্য আমরা তাঁর মুসলমান-খৃষ্টান ভক্তদের অন্তরে দুঃখের অন্ত ছিল না। সম্রাট শাহজাহান ও সার সৈয়দ আহমদের মত না হউক, মার্কস এংগেল্সের মত মোচ তিনি রাখিলেন না কেন? কারণ ওটা কালচার।

ঠিক তেমনি দাঁড়ি-গোঁফের বেলা হিন্দু-খৃষ্টানেরা এত বিলাসী ক্লিনশেভার হইয়াও বগলতলা ও নাভির নিচ সম্বন্ধে অত সঞ্চয়ী কেন, মুসলমানরা তা বুঝি না। পোশাক-পাতিতে অত টাকা পয়সা খরচ করিয়াও পশ্চিমা মেয়েরা পিঠ ও হাঁটুর নিচ ঢাকিবার কাপড়ের পয়সা জুটাইতে পারে না কেন, আমরা পূরবীরা তার কারণ খুঁজিয়া পাই না।

পক্ষান্তরে আমরা আমাদের মেয়েদের অত-অত কাপড়ে আপাদ মস্তক ঢাকিয়া রাখি কেন, তা বুঝাও পশ্চিমাদের পক্ষে কম কঠিন নয়। পশ্চিমাদের ক্লাব-লাইফ ও ঢিলা-দাম্পত্য জীবন দেখিয়া তাদের মেয়েদের জন্য আমরা কত আফসোস করি। কিন্তু আমাদের এক সংগে একাধিক বিবি লইয়া ঘর করিতে দেখিয়া পশ্চিমারাও আমাদের নারীজাতির জন্য কম আফসোস করে না। আমরা মুসলমানরা আরবী-ফারসীতে সুন্দর সুন্দর অর্থপূর্ণ নাম রাখি। হিন্দুরা সংস্কৃত-হিন্দীতে সুন্দর অর্থজ্ঞাপক নাম রাখে। কিন্তু পশ্চিমা খৃষ্টানরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও সভ্যতা-ভব্যতায় অত উন্নত হইয়াও যা তা অর্থহীন ও কদর্য নাম রাখিতে লজ্জা পায় না। আমরা যাকে অখাদ্য মনে করি, অনেক সভ্যজাতি তাই খায় লয্যতের সাথে। বিজ্ঞানী দার্শনিকের কাছে এসব ব্যাপারে যতই ছোট হউক না কেন, এ সবের মধ্যেই নিহিত কালচারের পার্থক্য। আসলে এ সবের সমষ্টির নামই কালচার। এই সব ব্যাপার দিয়াই আমাদের কালচারেরও বিচার করিতে হইবে। পাক-বাংলার কালচারেরও মাপকাঠি হইবে ইহাই। আসুন, এখন সে বিচার করা যাউক।

পাক-বাংলা বনাম গোটা বাংলার কালচার

প্রথমেই একটা ব্যাপার পরিষ্কার করিয়া লওয়া যাক। গোটা বাংলার কালচার না বলিয়া শুধু পাক বাংলার কালচার বলিলাম কেন? কারণ এই বাংলার কালচার বলিয়া কোনও কালচার নাই। কথাটা প্রথম দৃষ্টিতে ভ্রান্ত মনে হইবে। বাংলা একটা দেশ। বাংগালী একটা জাতি। এটাই স্থূল সত্য। কারণ দেশ, গোত্র, ভাষার দিক হইতে বাংলার বাশিন্দারা একটা জাতি। এই জাতির একটা জাতীয় কালচার থাকার কথা। কিন্তু সত্য কথা এই, বাংলায় কোনও জাতীয় কালচার নাই। বাংলা যেদিন বৃটিশ ভারতের এবং তারও আগে মোগল ভারতের প্রদেশ ছিল বলিয়াই বাংগালীরা স্বাধীন জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই এবং সেই কারণে বাংগালীদের কোনও জাতীয় কালচার নাই, ব্যাপারটা তা নয়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ছাড়াও মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় কালচার গড়িয়া উঠিতে পারে। বাংলায় জাতীয় কালচার গড়িয়া না উঠার কারণ রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা নয়, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা। এটা সবাই

www.pathagar.com

জানেন যে সমাজই কলচারের নার্সারি জননী বা সূতিকাগার। বাংলার মানুষের সমাজ একটা নয়, দুইটা। সে দুইটা সমাজ এক্সক্লুসিভ। তাদের মধ্যে খাওয়া পরা বিবাহ-শাদি ইত্যাদি সামাজিক মিল নাই। তাই এগারশ বছর এক দেশে বাস বাস করিয়া একই খাদ্য পানীয় খাইয়াও তারা দুইটা পৃথক সমাজে রহিয়া গিয়াছে। এক সমাজের লোক জন্মিয়া খৎনা করিয়া নিজস্ব সমাজে বাস করিয়া মরিয়া গোরস্তানে যায়, অপর সমাজের লোক অশৌচান্তে ও উপনয়ন করিয়া নিজের সমাজে বাস করিয়া মৃত্যুর পর শ্মশানে যায়। ফলে এই দুইটি সমাজে দুইটা প্যারালেল কালচার গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতীয় কালচার গড়িয়া উঠে নাই। বাংলা ভাগের মধ্যে দুইটা কালচার নিজ-নিজ আশ্রয় স্থল খুঁজিয়া পাইয়াছে। পাক-বাংলার কালচার অর্থে বিভক্ত বাংলার পূর্বাঞ্চলের কালচার বুঝাইতেছি।

আমাদের সভ্যতা

রাষ্ট্রীয় জাতি হিসাবে আমরা নতুন। মাত্র আঠার বৎসর আগে আমাদের পয়দায়েশ। যত বিভ্রান্তি এইখানে। আমাদের চিন্তার যত অস্বচ্ছতা, যত অপরিচ্ছন্নতা, সব শুরু হয় এইখানে। আমরা ভুলিয়া যাই রাষ্ট্রীয় জাতি হিসাবে আমরা নতুন হইলেও সভ্য মানুষ কৃষ্টিমান জাত হিসাবে আমরা শিশু নই। আমাদের মাতৃভূমির নাম পাক বাংলা। এটা প্রাচীন সমতট দেশ। হঠাৎ জলধি হইতে ভাসিয়া উঠা চরভূমি নয়। অন্ততঃ দুই হাজার বছরের প্রাচীন কাহিনী ইহার ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

আধুনিকতম ধর্মের উম্মত হিসাবে, তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সভ্য জাতি হিসাবে, আমরা প্রায় সাতশ বছরই এই দেশ ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ কৃতিত্বের সংগে শাসন করিয়াছি। সে শাসন বিদেশী বিজয়ীর বেশে উচ্চাসনে বসিয়া করি নাই। এ দেশকে মাতৃভূমি জ্ঞান করিয়া জনগণের সাথে মিশিয়া তাদের মধ্যে হইতে তাদেরই নেতা হিসাবে খাদেম হিসাবে সে শাসন করিয়াছি। জীবন শেষে জনগণের সাথেই মাতৃভূমির মাটিতে মিশিয়া আছি।

এই মুদ্দতে বাংলাদেশ ছিল শিক্ষা-সভ্যতার পীঠস্থান। শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র। কৃষ্টি-স্থপতির লীলাভূমি। চীন-আরব-গ্রীক-রোমান প্রভৃতি সভ্য জাতির পন্ডিতগণের তীর্থক্ষেত্র। আজ হইতে মাত্র তিন শ বছর আগেও পাক বাংলা তৎকালীন সভ্য জগতের দরবারে উচ্চ আসনের অধিকারী ছিল। নবাব শুজা ও শায়েস্তা খাঁর আমলে ফরাসী চিকিৎসক বার্নিয়ার ও ব্যবসায়ী টেভানিয়ার এবং ইংরাজ পরিব্রাজক রাল্ফ ফিশ্ ব্যাপকভাবে পাক বাংলা পরিভ্রমণ করিয়া এদেশের উচ্ছসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। তারা দেখিয়া ছিলেন, পাক বাংলা তৎকালে বিভিন্ন দেশে চাউল চিনি সুতি কাপড় রেশমী কাপড় জবক্ষার আফিম ও লবণ রফতানি করিত। ঐ সব জিনিস এ দেশে এত সরস ও সস্তা ছিল যে বিদেশ হইতে বড় বড় সওদাগর বিশাল-বিশাল জাহাজে করিয়া এসব জিনিস নিতে আসিতেন। ষোল শতকের মাঝামাঝি ভিনিশীয় পরিব্রাজক সিযার ফ্রেডরিক পাক বাংলা ভ্রমণ করিয়া লিখিয়াছিলেন ঃ 'এখানকার সন্দ্বীপ বন্দর জন-বহুল এক বিশাল বাণিজ্য-কেন্দ্র। এই বন্দরে প্রতিদিন গড়ে দুই শ জাহাজ লবণ বোঝাই হইয়া বিদেশ গমন করে। এখানকার জাহাজ নির্মাণ কৌশল এত সুন্দর ও কাঠ এত মজবুত যে ইস্তাম্বুলের সুলতান আলেকযান্দ্রিয়ার বদলে এখন তাঁর রাজ্যের প্রয়োজনীয় সমস্ত জাহাজ এইখান হইতে তৈয়ার করাইয়া থাকেন।'

www.pathagar.com

পাক বাংলার সভ্যতা ও শিল্প-বাণিজ্যিকে আমরা মুসলমানরা এতখানি উন্নত করিয়াছিলাম। সেই সংগে পাক বাংলার কালচারকেও আমরা নানা ফুল ফলে ও রূপে-গন্ধে সুসজ্জিত ও সুরভিত করিয়াছিলাম। এটা আমরা একদিনে করি নাই। বাংলার মাটির সাথে আমাদের সম্পর্ক হাজার বছরেও বেশী কালের। পুরা সাড়ে ছয়শ বছর আমরা এই দেশের শাসক ছিলাম। তার মধ্যে প্রায় তিন শ বছর আমরা স্বাধীন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা শাসন করিয়াছি। এই মুদ্দুতে আমরা বাংলাকে নিজস্ব জাতি-নাম ভাষা ও সাহিত্য দিয়াছিলাম। সে ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাংগালীত্বকে নতুন মর্যাদা, তার ভাষায় নতুন সুর, তার গলায় নতুন জোর দিয়াছিলাম। কৃষ্টি-সভ্যতা শিল্প-বাণিজ্য ও শিক্ষা-সাহিত্যে সভ্য জগতের দরবারে বাংলাদেশকে করিয়াছিলাম সুপ্রতিষ্ঠিত। পাক বাংলার শিল্প-সাহিত্যে ও কৃষ্টি-সভ্যতায় হাজার বছরের এই মুসলিম ছাপ সুস্পষ্ট দীপ্তিমান।

প্রাকৃতিক আনুকূল্যেও মুসলমানদের এই সাফল্যের সহায়ক ছিল। কি নৃতত্ত্বের দিক হইতে, কি ভাষা-কৃষ্টির দিক দিয়া পাক বাংলা আর্য-ভারত হইতে বরাবরই ছিল পৃথক। আর্যরা কোনও দিন পারে নাই বাংলা জয় করিতে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই এ দেশ দ্রাবিড়দের দখলে ছিল। দ্রাবিড়রা বর্ণাশ্রম-ধর্মী আর্য ধর্মের চেয়ে বর্ণবিরোধী সাম্যবাদী বৌদ্ধধর্মের দিকেই বেশী আকৃষ্ট হয়। বাংলার পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁদের আমলে এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম, দ্রাবিড়ী কৃষ্টি ও বৌদ্ধসংস্কৃত ভাষার প্রচলন ছিল। পাল রাজারা বাংলাদেশকে শুধু আর্যকৃষ্টি ও সংস্কৃত ভাষার হাত হইতেই বাঁচান নাই, তাঁদের কেউ-কেউ মগধ পর্যন্ত দখল করিয়া আর্য-ধর্ম ও সংস্কৃত ভাষাকে বাংলার সীমানার বাহিরে বহুদূরে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন।

পাল রাজাদের পরে সেন রাজারা যখন বাংলার নিজস্ব ভাষা ও কৃষ্টি দমন করিয়া ইহার উপর আর্য-কৃষ্টি ও সংস্কৃত ভাষা চাপাইবার অপচেষ্টা শুরু করেন, ঠিক সেই মুহূর্তে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ণাশ্রম বিরোধী বৌদ্ধধর্ম সাম্যবাদী ইসলামের সাহায্য ও সহযোগিতায় চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়। ইসলামী ছাপ লইয়া বাংলায় নয়া কৃষ্টি-জীবন গড়িয়া উঠা শুরু হয়। মুসলিম আমলে একটানা সাড়ে ছয়শ বছর ধরিয়া চলিতে থাকে এই নয়া কৃষ্টি-জীবন সৃষ্টির কাজ। তা এমন দানা বাঁধে যে মুসলিম শাসনের অবসানের পরেও উনিশ শতকের শেষদিন অবধি দীর্ঘ একশ বছর ধরিয়া সে কৃষ্টি-সাহিত্যের প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকে।

নবাগত ইংরাজ শাসকরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী কূটনৈতিক তাকিদে ও দেশ শাসনের সুবিধার খাতিরে হিন্দু-মুসলিম-বিরোধ সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে প্রচলিত ভাষা-কৃষ্টি-সাহিত্যের বিরুদ্ধে হিন্দুদের উস্কানি দেয়। বাংলা কৃষ্টি-সাহিত্যকে ইসলামী ছাপমুক্ত এবং বাংলা ভাষাকে আরবী-ফারসী শব্দ-বর্জিত বিশুদ্ধ আর্য ভাষা করিবার পরামর্শ দেয়। বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের কন্যা সাজাইবার অলঙ্করাদির নির্মাণ-কার্য শুরু হয় এই সময় হইতে। এ কাজ শুরু করে ইংরাজরা একাই। সরকার ও মিশনারীদের সমবেত শক্তি নিয়োজিত হয় এই শুদ্ধিকরণে।

www.pathagar.com

পুরা একশ বছরের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় বিশ শতকের গোড়ার দিকে এই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিষময় ফল ফলিতে শুরু করে। প্রচলিত বাংলা ভাষা ও হাজার বছরের কৃষ্টি-সাহিত্যের বিরুদ্ধে এ্যাংলো-হিন্দু অভিযান সফল হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পিতা, বাংগালী জাতির মেজরিটি মুসলমান এই অভিযানের মোকাবেলায় রুখিয়া দাঁড়ায়। ক্রমে মুসলিম-কৃষ্টির সাথে রিভাইভ্যালিস্ট-হিন্দু-কৃষ্টির এবং প্রচলিত বাংলা যবানের সাথে সংস্কৃতীকৃত নব্যবংগ ভাষার সংঘাত বাধে। এই সংঘাতের শেষ পরিণাম পাকিস্তানের সৃষ্টি। পাক-বাংলার কৃষ্টির ইহাই পটভূমি।

তিনটি মুদ্দা কথা

এই আলোচনার গোড়াতেই তিনটা মুদ্দা কথা বুঝিতে হইবে। এক. সাড়ে ছয় শ বছরের মুসলিম-শাসন বাংলায় কৃষ্টি-সাহিত্যের যে গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছিল, তার সবটুকুই শাহী-নবাবী কালচার ছিল না। তার বেশীর ভাগেরই একটা জাতীয় প্রাণ ও গণরূপ ছিল। বাদশাহি যাওয়ার পরও একশ বছর এইটাই বাঁচিয়া ছিল। দুই, বিদেশী শাসকরা স্বদেশী প্রতিবেশীদের সহায়তায় দেড় শ বছর ধরিয়া যে কৃষ্টি-সাহিত্যের বিরুদ্ধে সমবেত অভিযান চালাইয়াছিল, সেটা ছিল এরই বিরুদ্ধে। তিন, এই অবলুপ্ত জাতীয় কৃষ্টির রেনেসাঁ সাধনে তাকে যুগোপযোগী করিয়া আমাদের জাতীয় ব্যক্তিত্বকে সঞ্জীবিত করার দুর্নিবার তাকিদেই পাকিস্তানের সৃষ্টি। আরও সংক্ষেপে তিনটি কথা এই ঃ আমরা কি ছিলাম? কি হইয়াছি? কি হইব?

আমরা নির্ভয়ে দাবি করিতে পারি, বাংগালী মুসলমানরা একটি সমৃদ্ধিশালী ঐতিহাসিক কালচারের উত্তরাধিকারী প্রাচীন সভ্য জাতি। কালচার ঐতিহ্যহীন একটা ভূঁইফোঁড় জাতি আমরা, এমন কথা পরম শত্রুও বলিতে পারিবে না। নয়া রাষ্ট্রীয় জাতিত্বের দোহাই দিয়া অমন অজুহাত আমরা নিজেরাও দিতে পারি না। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, বাংগালী মুসলমানরা ধর্ম ও সমাজ-জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের বিশ্বাসে-ঈমানে আচারে-অনুষ্ঠানে আদবে-কায়দায় খোরাকে-পোশাকে জন্মে-মৃত্যুতে শাদি-গমিতে পরবে-উৎসবে আমোদে-প্রমোদে খেলায়-ধুলায় নাচে-গানে আর্টে-সাহিত্যে শিল্পে-বাণিজ্যে বীরত্বে-মহত্ত্বে যুদ্ধে-শান্তিতে কামানে-বন্দুকে অস্ত্রে-শস্ত্রে দালানে-ইমারতে ইনসাফে-আদালতে আইনে-কানুনে একটা ব্যাপক ও সামগ্রিক, উদার ও উন্নত কালচার গড়িয়া তুলিয়াছিল।

সে কালচার শুধু মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। অমুসলমান বাংগালীর মধ্যেও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ফলে তা পাইয়াছিল একটা জাতীয় সত্তা ও সার্বজনীন রূপ। যুগের দাবিতে দেশজ পরিবেশে জাগরণের প্রেরণায় সামাজিক কল্যাণ ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের তাকিদে ন্যাচারেল গ্রোথের মতই সে কালচার ধীরে-সুস্থে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই জন্যই তা পাইয়াছিল জাতীয় রূপ। ইতিহাস এও সাক্ষ্য দিতেছে যে বিদেশী শাসকরা তাদের রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেই আর্য রিভাইভ্যালিযমের উস্কানি দিয়া আমাদের হাজার বছরের প্রতিবেশীকে শত্রুভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল এবং তাদেরই সহায়তায় রাজশক্তির দমন-নিষ্পেষণের দ্বারা সে কালচারের ধ্বংসাভিযান চালাইয়াছিল। এমনিভাবে রাজ-রোষে আমাদের কালাচরের অপমৃত্যু ঘটে; বার্ধক্যের দরুন তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নাই।

সে নিধন-যজ্ঞের কথা ইতিহাস-পাঠকরা জানেন। শাসকরা কেমন করিয়া কলমের এক খোঁচায় প্রচলিত রাষ্ট্র-ভাষার পরিবর্তন করিয়া যুগ-যুগান্তের শাসক-বিচারকদের অফিস-

www.pathagar.com

আদালত হইতে বাহির করিয়া রাস্তার ধুলায় নামাইয়া দেয়, শিক্ষা-নীতি পাল্টাইয়া কেমন করিয়া তারা হাজার বছরে ইন্টেলিজেনশিয়াকে নিরক্ষর মূঢ়ের জাতে পরিণত করে, রিযাম্পশন-পলিসির নামে কিরূপে তারা এক কালের সম্পদশালী অভিজাত সম্প্রদায়কে দীনহীন পথের কাংগালে রূপান্তরিত করে, ইতিহাসের ছাত্ররা তার সব খবরই রাখেন। এটা কালচার রক্ষার পরিবেশ ছিল না। মুসলমানদের আত্মরক্ষাই যখন একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল, তখন কালচার রক্ষার প্রশ্নই উঠে না।

আজিকার প্রশ্ন

কিন্তু আজ? আজিকার কৈফিয়তটা কি? এত বড় সম্পদশালী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী প্রাচীন জাতি হইয়াও যদি আমরা আজ কালচারে গরিব হই, আঠার বছরের স্বাধীনতার পরেও যদি আমরা কৃষ্টির স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিয়া থাকি, তবে সে দোষ দিব আমরা কাকে? বাদশাহি যাওয়ার সাথে সাথেই আমাদের কালচারের শাহী রূপটুকু যে গিয়াছে, সেটা বড় কথা নয়। বাদশাহি থাকিবার জিনিসও নয়। এ যুগের তন্ত্রও সেটা নয়। আমরা সবাই নবাব-বাদশাও ছিলাম না। সবাই আমরা নবাব-বাদশার বংশধরও নই। আমরা মুসলিম জনসাধারণ মুসলিম শাসনামলেও আর দশজনের মতই প্রজাসাধারণই ছিলাম। কাজেই মুসলিম আমলের কালচারের শাহীরূপ নয়, গণ রূপটাই বড় কথা। ঐ রূপেই ছিল সেটা আমাদের কালচার। ওটারই আমরা উত্তরাধিকারী। তারই রক্ষণ ও বিকাশনই আমাদের দায়িত্ব। কাজেই আমাদের বুঝা দরকার, সেটার রূপ কি ছিল, কি হইয়াছে, আর কি হইতে হইবে।

আগের আলোচনা হইতে এইটুকু নিশ্চয় পরিষ্কার হইয়াছে যে মানুষের ধর্মোৎসবে আচার-অনুষ্ঠানে নামে-নিশানায় খোরাকে-পোশাকে, আর্টে-সাহিত্যে, নাচে-গানে ও আদবে-কায়দায়ই তাদের কালচারের গণরূপ প্রতিফলিত ও বিকশিত হয়। কাজেই আমাদেরও কালচারের ঐতিহ্য ও বর্তমান এ সবের মধ্যেই সন্ধান করিতে হইবে।

প্রথমেই ধরুন ধর্মোৎসবের কথা। ধর্মোৎসবের সকল জাতির কৃষ্টি-জীবনের সবচেয়ে প্রশস্ত ও উর্বর ক্ষেত্র। ধর্ম ও কৃষ্টির সম্পর্ক যে গাছ ও ফলের সম্পর্কের মতই ঘনিষ্ঠ, সে কথা আগেই বলিয়াছি। বস্তুতঃ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের স্কেলিটন ঘেরিয়া সামাজিক আচার-আচরণ ও আমোদ-প্রমোদের যে লহু-গোশ্‌ত ও রগ-রেশা গড়িয়া উঠে, তার সমষ্টির নাম ধর্মোৎসব। এই ধর্মোৎসবের বিকাশ ও বিস্তৃতিই কালচারের ইনফ্রাস্ট্রাকচার। এই সব উৎসবের প্রথম গুণ এই যে এতে পুণ্যার্জন ও আনন্দ উপভোগ এক সংগে করা চলে। শেষ পর্যন্ত ধর্মোৎসবের ধর্মটুকু যে উৎসবের মধ্যে তলাইয়া যায় তাতেও মানবজাতির লোকসান হয় না। কারণ ধর্মের দিক হইতে তারা যা হারায়, কৃষ্টির দিক হইতে লাভ করে তার চেয়ে অনেক বেশী। বস্তুতঃ স্থপতি-ভাস্কর্য শিল্প-সংগীত ও কাব্য-সাহিত্যের জন্মই এইখানে। ওদের দ্বিতীয় গুণ এই যে ও-সবের আয়োজন করে অবশ্য মুষ্টিমেয় ধনী-লোক, কিন্তু আনন্দটা ভোগ করে ধনী-নির্ধন সকলে। তৃতীয় গুণ এই যে সব উৎসব অন্য ধর্মের লোকদেরও আকৃষ্ট করে এবং তাদের ভোগেও লাগে। ফলে তারা পরিণত হইতে পারে জাতীয় উৎসবে। মসজিদ মন্দির গির্জার বাইরে যে উৎসব যতটা প্রসারিত হয় জাতীয় রূপ পাইবার সম্ভাবনা হয় তার তত বেশী। #

(প্রবন্ধটি আবুল মনসুর আহমদের 'বাংলাদেশের কালচার' গ্রন্থ থেকে নেয়া।)

www.pathagar.com

ভারতীয় সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান

ড. মুহম্মদ এনামুল হক

ভারতীয় সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদানের পরিমাণ নির্ণয় খুব সহজসাধ্য কাজ নহে। বলিতে গেলে এক প্রকারের সংস্কৃতিতে অন্য প্রকার সংস্কৃতির প্রভাবের পরিমাণ নির্ধারণ একটি দুঃসাধ্য কাজ।

জাতীয় জীবন সংস্কৃতিরই রূপায়ণ। সংস্কৃতি লইয়াই জাতীয় জীবনের বেসাতি। সংস্কৃতির পটভূমিকা হইতে জীবনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখা এবং কোন্ ভিন্ন রকমের সংস্কৃতির প্রভাব জাতীয় জীবনে কতদূর কার্যকর ও প্রতিফলিত, তাহার পরিমাণ নির্ণয়ে যেই কষ্টসাধ্য সাধনা এবং মুক্তবুদ্ধি-প্রবুদ্ধ মানসিকতার প্রয়োজন, তাহা আমাদের অনেকের মধ্যে দেখা যায় না। এতৎসত্ত্বেও, ভারতীয় জীবনের কয়েকটি প্রধান অভিব্যক্তিতে মুসলিম সংস্কৃতির যেই সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে, তৎপ্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই বর্তমান আলোচনার অবতারণা।

www.pathagar.com

ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, আরবেরাই ভারতের প্রাচীনতম মুসলিম আগমনকারী। কথিত আছে, হজরত মুহম্মদ মুস্তফার (দঃ) জীবদ্দশায় (৭৫১-৬২৩ খ্রীঃ) তাঁহার কতিপয় শিষ্য সরন্দীপ বা শ্রীলঙ্কায় অবস্থিত কিংবদন্তী-বিশ্রুত হজরত আদমের (আঃ) পদচিহ্ন দর্শনার্থী হইয়া লঙ্কাভিমুখে সমুদ্র-পথে যাত্রা করেন। এই আরব তীর্থযাত্রিগণ মালাবার উপকূলের 'চেরুমান পেরমল' নামক জনৈক হিন্দু রাজার সহিত 'ক্রেঙ্গানোর' নামক স্থানে সাক্ষাৎ করিয়া হজরত মুহম্মদ মুস্তফা (দঃ) কর্তৃক চন্দ্র-বিভাজন কাহিনী বর্ণনা করেন। প্রকাশ, রাজা এই অতিপ্রাকৃত (miraculous) ঘটনায় বিশ্বাস করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ আরব মুসলমানগণ লঙ্কা হইতে তীর্থ সমাধা করিয়া প্রত্যাবর্তনকালে, রাজা 'চেরুমন পেরুমল' গোপনে তাহাদের সহিত হজরত মুহম্মদকে (দঃ) দর্শন করিবার জন্য মক্কায় গমন করেন। ইহাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল– শরফ্-বিন্-মালিক। রাজা কিছু দিন আরবে বাস করিয়া দেশে ফিরিয়া ইসলাম প্রচারে বদ্ধপরিকর হইলে, হঠাৎ একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু, মৃত্যুর অব্যহতি পূর্বে, তিনি শরফ্ বিন-মালিক ও তাঁহার সঙ্গিগণকে মালাবারে ইসলাম প্রচার করিতে অনুরোধ করেন এবং এক পত্রে এই অনুরোধের কথা রাজ্যের প্রধানগণকে জানাইয়া দেন। রাজার মৃত্যুর পর, শরফ্-বিন্-মালিক ও তাঁহার বন্ধুগণ রাজ-অনুরোধপত্র সঙ্গে লইয়া যথাসময়ে 'ক্রেঙ্গানোরে' আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজপ্রধানগণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইলেন। রাজপ্রধানগণ তাঁহাদিগকে বাসোপযোগী এক খন্ড ভূমি দান করেন এবং তথায় তাঁহারা একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই ধর্মপ্রচারক দলের জনৈক মালিক-বিন্-দীনার এই স্থানে থাকিয়া যান এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে অন্য এক প্রচারক মালিক-বিন্-হবীব্ সমগ্র মালাবারে ধর্ম প্রচার ও মসজিদ নির্মাণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। তাঁহার যাত্রাপথে সর্বপ্রথম 'কুইলন' এবং তৎপর 'হিলি-মরবী' নামক স্থানে মসজিদ স্থাপিত হইল এবং ধীরে ধীরে আরও সাত সাতটি স্থানে মসজিদ নির্মিত হইল। তিনি পরিশেষ 'ক্রেঙ্গানোরে' প্রত্যাবর্তন করিলেন। মালাবারের 'মোপলা'-দের মধ্যে এখনও এক প্রকারের বিকৃত 'আরবী-ভাষার' প্রচলন দেখিয়া মনে হয়, এই কিংবদন্তী একান্ত অমূলক নহে।

ভারতের সহিত মুসলিম সম্বন্ধের প্রাচীনতম কিংবদন্তীভিত্তিক ইতিহাস এইরূপ। ইহা যুদ্ধ-বিগ্রহের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে বলিয়া নররক্তে কলঙ্কিত নহে। অতঃপর আরবী-বণিকেরা ভারতে আগমন করিতে থাকেন। ইহারাও ভারতে উপকূলবর্তী বন্দরসমূহে ব্যবসা বাণিজ্য চালাইয়াছেন ও ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের হস্তও ভারতীয় শোণিতে রঞ্জিত হয় নাই। ভারতে যখন হর্ষবর্ধন রাজস্ব করিতেছিলেন, তখন আরবে হজরত উমর খলীফার পদে অধিষ্ঠিত। হর্ষবর্ধনই (মৃত্যু- ৬৪৮ খ্রীঃ) ভারতের শেষ হিন্দু সম্রাট। তাঁহার মৃত্যুর পর ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

হযরত উমরের খিলাফতকালেই (৬৩৪-৬৪৪ খ্রীঃ) মুসলিম রাজ্য বিস্তৃতির স্বর্ণময় যুগ। ভারতীয় উপকূলভাগ কয়েকবার মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত হয় বলিয়া আল্-বলাজুরীর 'ফতূহু-ল-বুলদান' বা 'নগরী বিজয়' নামক ইতিহাসে লিখিত আছে। এই সমস্ত আক্রমণ ছিল সাময়িক; ইহাতে আরবদের কোন স্থায়ী ফললাভ হয় নাই। ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আরব সেনাপতি আল-মুহল্লব কর্তৃক স্থলপথে মুলতান বিজয়ও একটি অনুরূপ ঘটনা।

www.pathagar.com

অতঃপর ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ-বিন-কাসিম কর্তৃক সিন্ধু-বিজয় ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নানা কারণে তাঁহার সিন্ধু অধিকার একটি স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। সিন্ধু দেশে মুসলিম রাজত্ব বেশী দিন টিকিল না বটে, কিন্তু ইহার পর হইতে ভারতের সহিত আরব জাতির ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্বন্ধ একরূপ পাকাপাকিভাবে স্থাপিত হইল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের সহিত এই সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতে লাগিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, ভারতের সহিত ইউরোপ ও আফ্রিকার বাণিজ্য এই সময়ে আরবী মুসলমানদের মধ্যস্থতায় চলিয়াছে। কেবল, সুরাট, কালিকট প্রভৃতি সমুদ্রতীরবর্তী বন্দরমালা, মালদ্বীপ, লাক্ষ্যদ্বীপ ও সরদ্বীপ প্রভৃতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং লাহোর, মুলতান, কাবুল প্রভৃতি ভারতীয় ও ভারত প্রভাবিত নগরগুলি এই সময়ে গড়িয়া উঠে এবং বহির্জগতের নিকট পরিচিত হইয়া পড়ে। বলাবাহুল্য, কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যই এই সমস্ত স্থানের খ্যাতি জগৎময় ছড়াইয়া পড়ে।

আরবী মুসলমানদের সহিত ভারতের এই দীর্ঘ সংস্রবের কি কোন ফল ফলে নাই? এই সময় ভারতে সাংস্কৃতিক জগতে যে কতিপয় ফল ফলিয়াছিল, তন্মধ্যে নিম্নের কয়েকটি প্রধান বলিয়া মনে হয় ঃ

প্রথমতঃ দেখা যায়, ভারতীয় সংস্কৃতি পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য স্থানগুলির (যেমন- মিশর, বাবিল, উর, কালদিয়া, ফিনিসিয়া প্রভৃতি) সংস্কৃতি হইতে খুব অল্প প্রাচীন না হইলেও, স্মরণাতীতকাল হইতে ভারতবর্ষ নিকটবর্তী ব্রহ্ম, মালয়, শ্যাম, লঙ্কা প্রভৃতি কতিপয় এশীয় অঞ্চল ব্যতীত সভ্য জগতের জন্য কোন অংশের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিল না। কালক্রমে ভারতের সহিত এই সমস্ত অঞ্চলের যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ভারতের সহিত আরবী মুসলমানদের সংস্রবকালে ভারত একরূপ একক ও নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিতেছিল। ভারতবাসী মনে করিতেন, তাঁহাদের এই নিঃসঙ্গ জীবনই পরিপূর্ণ জীবন। এই আত্মতৃপ্ত ও আত্মসমাহিত জীবনের ফাঁকে ফাঁকে যে অপরিপূর্ণতা বিরাজ করিতেছিল, তাহা তখনও ভারতবাসীর নিকট প্রকট হইয়া ধরা পড়ে নাই। ভারতে আরবী মুসলমানদের আগমনে, ভারতীয় সংস্কৃতির দুর্বলতা ভারতবাসীর নিকট প্রকট হইয়া উঠে। মুসলিম সংস্কৃতিকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া তাহার সহিত তুলনামূলক সমালোচনায় ভারতীয় মন-মানস এই সময় হইতে আপন সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট ও স্বাভাবিকভাবেই সজাগ হইয়া উঠিতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ আরবী মুসলমানদের আগমনেই ভারতের সহিত বহির্জতের প্রকৃত যোগাযোগ সংস্থাপিত হয় এবং ভারতের নিঃসঙ্গত্ব ভাঙ্গিয়া পড়ে। প্রাচীনতমকাল হইতে অমূল্য ও অফুরন্ত প্রাকৃতিক ও শ্রমজাত সম্পদের অধিকারী হইলেও, আপন নিঃসঙ্গতার জন্য এই সমস্ত সম্পদের বিষয় ভারত বিশেষভাবে অবহিত ছিল না। আরব বণিকেরাই ভারতের এই সম্পদ একদিকে স্বয়ং ভারতের নিকট এবং অন্যদিকে ইউরোপ ও আফ্রিকার নিকট পরিচিত করিয়া দেন। এই সমস্ত বাণিজ্য সম্পদের জন্যই ভারতের খ্যাতি প্রাচীন পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপে জগতের নিকট ভারতের পরিচয় এবং পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে জগতে তাহার প্রতিষ্ঠা ভারতীয় সংস্কৃতিতে আরবী মুসলমানেরই এক অপূর্ব অবদান।

তৃতীয়তঃ বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের কোন ধারণাই ছিল না। অন্তর্বাণিজ্য সম্বন্ধে ভারত পূর্ব হইতেই অবগত ছিল। ভারতীয় প্রদেশগুলিতে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য চলিত বটে,

www.pathagar.com

কিন্তু তদ্দ্বারা ভারতের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির আয়োজন করা হয় নাই। বাণিজ্য সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় ধারণা ব্যক্তিগত ধন বৃদ্ধির ধারণা– জাতি ও রাষ্ট্রগত ধনাগমের ধারণা নহে। নিম্নের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত শ্লোকটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে উক্ত উক্তির সারবত্তা সহজে বুঝিতে পারা যায়-

> বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্ধং কৃষিকর্মণি।
> তর্দধং রাজসোয়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ ।।
>
> অনুবাদ ঃ বাণিজ্যে গৃহস্থের সৌভাগ্য অর্থাৎ বাণিজ্য দ্বারা পর্যাপ্ত অর্থাগম হয়, কৃষিকর্মের দ্বারা তাহার অর্ধেক পাওয়া যায়, রাজসেবা বা চাকরি দ্বারা তাহারও অর্ধেক পাওয়া যায়, কিন্তু ভিক্ষায় কিছুমাত্র লাভ হয় না, হয় না।

এই শ্লোকটিতে চাকরি (রাজসেবা) এবং ভিক্ষা- এই দুইটিই ব্যক্তিগত কেননা সমষ্টিগতভাবেই ভিক্ষা ও চাকরি করা চলে না। আপাতদৃষ্টিতে বাণিজ্য ও কৃষিকার্য দ্বারা সমষ্টিগত অর্থ প্রকাশ পায় বলিয়া মনে হইলেও অর্থের দিক হইতে চাকরি ও ভিক্ষার সহিত সংযুক্ত হওয়ায়, এই দুইটিও যে ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল, তাহা বেশ ভালরূপেই বুঝা যাইতেছে।

আরবী মুসলমানদের আগমনে, ভারত বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে সর্বপ্রথম জ্ঞান লাভ করে; এই জ্ঞান ধীরে ধীরে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া অর্থনৈতিক দিক হইতে ভারত সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে থাকে। কালক্রমে এই উন্নতি ভারতের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় উন্নতিতে পরিণত হয়। ভারত অর্থনৈতিক দিক হইতে যেমন লাভবান হইল, অন্য এক দিক হইতে তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হইল; কেননা এই সময় হইতেই ভারতেই প্রতি বহির্জগতের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইল।

চতুর্থতঃ ভারতে হিন্দু ধর্মের পার্শ্বে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা। যাঁহারা বলেন বা মনে করেন যে, ভারতে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্মও এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ উঠিয়াছে, তাঁহাদের গভীর ঐতিহাসিক জ্ঞানের প্রশংসার সহিত বিভ্রান্ত দৃষ্টির যশোগাথাও ঘোষণা করিতে হয়। ভারতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ইতিহাস, শান্তি প্রবর্তনারই ইতিহাস। এই ইতিহাস নর শোণিতে কলঙ্কিত নহে। প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অন্তর্নিহিত গভীর ধর্মীয় বিশ্বাস, আত্মত্যাগ ও প্রবল প্রেরণাই এই যুগে ভারতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রথম ও প্রধান কারণ। পরবর্তী যুগের মুসলিম রাজ্য পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ইসলামের ভিত্তিকে সম্প্রসারিত ও সুদৃঢ় করিয়া দিয়াছে মাত্র।

আরবদের পরই খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে মুসলিম তুর্কীগণ ভারতে আসিতে থাকেন। ইহারাই ভারতের ইতিহাসে প্রথমতঃ 'পাঠান' নামে পরিচিত। গজনীর সুলতান মাহমুদ (১০০০ খ্রীঃ) কর্তৃক পাঞ্জাব বিজিত হওয়ার পর হইতে, ভারতের এই প্রদেশ সুদীর্ঘকালের জন্য মুসলিম রাজ্যভুক্ত হইল। অতঃপর খ্রীষ্টীয় ১২০০ অব্দ হইতে দিল্লীতে যে তুর্কী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা আর লোপ পায় নাই; আফগান ও মুঘলগণ তুর্কীদের উত্তরাধিকারী হইয়া ভারতে মুসলিম শাসন বজায় রাখিয়াছে। এই সময়ে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মুসলিম রাজ্য বিস্তৃত ও প্রতিষ্ঠিত এবং মুসলমানদের ধর্ম-কর্ম, আচার-ব্যবহার ও রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা বিকীর্ণ হইয়াছে।

ভারতে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ও বিস্তৃত হওয়ার ফলে এদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক নূতন প্রভাব অনুভূত হইল। হর্ষবর্ধনের (মৃঃ ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) পর ভারতে কোন হিন্দু রাজা

www.pathagar.com

একচ্ছত্র রাজত্ব করেন নাই। এই সময়ে ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খন্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া আত্মঘাতী বিষ ভক্ষণ করে। তখনকার ভারতীয় সংস্কৃতির মূল উৎস এক হইলেও ভারতের রাষ্ট্রীয় বিভিন্নতা সাংস্কৃতিক বিভিন্নতায় রূপান্তরিত হইতে থাকে। এই কারণেই আজও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ এবং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণে, কিংবা মাদ্রাজী হিন্দু এবং মৈথিল হিন্দুতে এত প্রভেদ। এই কারণেই মনুসংহিতা ভারতের সর্বত্র হিন্দুদের মধ্যে একমাত্র ধর্মীয় বিধানরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই বা করিতে সমর্থ হই নাই। এই কারণে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতারও অনুরূপ দুর্দশা ঘটিয়াছে। এই কারণেই ভারতের হিন্দুদের মধ্যে দেশে দেশে নূতন শাস্ত্র, নূতন বিধান এবং নূতন আচার-বিচার প্রচলিত হইয়াছে।

কে তখন কল্পনা করিতে পারিত, সমগ্র ভারত এক রাজার শাসনে শাসিত হইবে? কে তখন ভাবিতে পারিত, এক রাজার শাসনে শাসিত হইয়া ভারত কখনও এক রাজ্যের স্বপ্ন দেখিতে পাইবে? কে তখন মনে করিয়াছে, ভারতীয় হিন্দুরা কখনও উপলব্দি করিবেন যে, তাঁহারা এই দেশের অধিবাসী এবং একই ধর্মের অনুসারী? একমাত্র মুসলমান রাজত্বকালেই তাহা সম্ভবপর হইয়াছে। বলিতে কি, মুসলমান আমলে ভারতে রাজনৈতিক একত্ব ও একচ্ছত্রত্ব, ভারতীয় সাংস্কৃতিক একত্বকে এবং ভারতীয় রাষ্ট্রের একচ্ছত্রত্বকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিল; ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাকে সুষুপ্ত অবস্থা হইতে জাগাইয়া তুলিয়াছে। স্বীয় নেতৃত্বে উত্তর ভারতীয় বহু নরপতির সম্মিলন ঘটাইয়া রায় পিথুরা বা পৃথীরাজ ইতিহাস প্রসিদ্ধ তেরৌরী ক্ষেত্রে মুহম্মদ ঘুরীর সহিত যেই যুদ্ধে (১১৯৩ খ্রীঃ) লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই 'ভারতীয় জাতীয়তাবোধের' বীজ সর্বপ্রথম উপ্ত হইয়াছিল। অতঃপর ধীরে ধীরে সমস্ত ভারতীয় হিন্দু ধর্মাবলম্বী এক সংস্কৃতিভুক্ত এবং এক দেশবাসী বলিয়া ভাবিতে শিখে এবং পরিশেষে মহারাষ্ট্রীয় নেতা শিবাজীর মধ্যে এই ভারতীয় অনুভূতির শেষ দীপ্তি জ্বলিয়া উঠে।

আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, প্রাক-মুসলিম-ভারত বিশ্বপরিবারে একরূপ একক ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছিল। এই নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক হয় নাই। ইহা ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় জীবন গ্রাস করিয়া মানস-রাজ্যেও প্রবেশ করিয়াছিল। দেখা যায় যে, এই সময়ে রাষ্ট্রীয় জীবনের সীমাবদ্ধতার সহিত মানসিক সঙ্কীর্ণতাও ভারতীয়দের মনে ক্রমশঃ দানা বাঁধিতে শুরু করিয়াছিল। তাহাদের এই মানসিক সঙ্কীর্ণতাও কালক্রমে এক একটি সংস্কারে এবং পরে সেই সংস্কারগুলি ধর্মে পরিণত হইতে থাকে। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই ভারতবাসী ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া পড়িতে লাগিল। অচিরেই ভারত শূদ্র ও শূদ্রাধম অস্পৃশ্য জাতের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই অস্পৃশ্য বা অচ্ছুৎ হিন্দু জাতিকেই মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' নামে অভিহিত করিয়াছেন। হিন্দু সমাজের নিম্নতম স্তরের এই মানুষগুলির দুঃখ দুর্দশায় তখন ভারতীয় সমাজের দেহ কন্টকিত, জর্জরিত ও বিষাক্ত; ইহাদের নিপীড়নের আর্তনাদে ভারতের পবন মুখরিত এবং অভিশাপের দীর্ঘশ্বাসে ভারতের গগণ নিনাদিত। পুরোহিত-প্রপীড়িত ভারত মানবতার এই অপমান রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের ন্যায় সোল্লাসে উপভোগ করিতেছিল। পুরোহিতদিগের এই অত্যাচারে রাজ-রাজড়াদেরও কোন হাত ছিল না।

www.pathagar.com

এই সময়ে মুসলমানগণ ইসলামের সাম্যের বাণী লইয়া মানবতার জয়গান গাহিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। তাঁহাদের এই বাণীকে দরবেশ ও মুসলিম সাধকেরা আপন জীবনে রূপদান এবং শাসক সম্প্রদায় রাষ্ট্রীয় জীবনে গ্রহণ করিয়া প্রবল হইতে প্রবলতর করিয়া তুলিলেন। ভারতীয়েরা এই-ই-প্রথম শুনিল, "মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নাই। শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষমতা, রাজপদ ও জীবন-জীবিকা মানুষকে মানুষ হইতে পৃথক উত্তম অথবা অধম করিয়া তুলিতে পারে না. সকল মানুষ এক আল্লাহর সৃষ্টি, এক আল্লাহর দাস, এই পরম ও চরম প্রভু আল্লাহর নিকট তাঁহার সমস্ত দাসই সমান, এই আল্লাহ স্বয়ম্ভু ইচ্ছাময় ও অনন্ত-শক্তির আধার, তাঁহারই ইচ্ছা ও ইঙ্গিতেই সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে।"

প্রাচীন জগতে, ইসলামের এই দৃদৃঢ় "তৌহীদ" বা একত্ববাদ এবং এই বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী এক মহা চিন্তা-বিপ্লবরূপে দেখা দিয়াছিল। প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ এই বৈপ্লবিক চিন্তার আধার ও বাহনরূপেই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মধ্যযুগে আসিয়াও এই চিন্তা বিপ্লবে ভাটা পড়ে নাই, অবশ্য তখন ইহার বেগ ক্রমশ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। এতৎসত্ত্বেও প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুর সনাতন চিন্তাধারায় মুসলমানেরা বিপ্লব আনিতে সমর্থ হয়। ভারতের তেত্রিশ কোটি দেব-দেবতার অনুধ্যানে, ইসলামের 'তৌহীদ' দারুণ আঘাত হানিল; ভারতের বর্ণ-হিন্দু প্রপীড়িত অন্ত্যজ-জাতিগুলি ইসলামের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের বাণী শুনিয়া এবং কর্মক্ষেত্রে সেই বাণীর কোন ব্যতিক্রম না দেখিয়া উল্লাসে মুসলমানগণকে মুক্তিদাতারূপে বরণ করিতে লাগিল; পুরোহিত শ্রেণীও ধর্মরক্ষায় গত্যন্তর না দেখিয়া প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। ভারতের লোক দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। ফলে, ভারতে ইসলাম ধর্ম উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হইতে শুরু করিল এবং ভারতীয় সনাতন হিন্দু-ধর্মের পার্শ্বে অর্বাচীন ইসলাম ধর্ম সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। বলাবাহুল্য, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতেই শঙ্কারাচার্যের মতবাদে ইসলামের প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত।

ইহাতে ভারতের মানসিক সঙ্কীর্ণতা কতকটা বিদূরিত এবং মানসিক দৃষ্টিও কতকটা সুদূরপ্রসারী হইতে বাধ্য হয়। কেননা ভারতীয়রা দেখিলেন, পৃথিবী শুধু ভারতবর্ষ নয় এবং পৃথিবীর লোক শুধু হিন্দু নহেন, এই সমস্ত লোকের ধর্ম, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি ভারতীয়দের চেয়ে কোন অংশে খর্ব ও নিকৃষ্ট নহে, বরং কোন কোন অংশে উন্নত ও উৎকৃষ্ট। ইসলামের প্রতি পুরোহিত শ্রেণীর অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শ্রেণীরও দৃষ্টি পড়িল। এই বিদ্যান ও বুদ্ধিজীবী ভারতীয়গণই ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির সনাতন ধর্মের (হিন্দু-ধর্মের) একটি বুঝাপড়া করিয়া লইতেও তৎপর হইয়া পড়িলেন। ফলে ইসলামের আল্লাহকে ভারতের সনাতন-ধর্মে স্থান দিবার জন্য খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বা তৎপরবর্তী পুরোহিত শ্রেণীর কাহারও দ্বারাই "অল্লোপনিষদ" নামে এক নূতন উপনিষদ রচিত হইল। ইহাতে আল্লাহ ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ (রসূল) হজরত মুহম্মদ (দঃ) এর মহিমা পরিকীর্তিত হইয়াছে। পুরোহিত শ্রেণীর এই চেষ্টা কতটা ফলবর্তী হইয়াছিল বলা যায় না. তবে তাঁহাদের দ্বারা রচিত "আল্লোপনিষদ" এখনও ভারতীয় হিন্দুগণ রক্ষা করিতেছেন।

ভারত বেদ-বেদান্তের দেশ বটে. কিন্তু পুরাণের লীলাক্ষেত্র। মুসলমান শাসনের পূর্বে, ভারত বেদবেদান্তকে একরূপ ছাড়িয়া দিয়া পৌরাণিক উপাখ্যান ও পূরাণ-চর্চায় ডুবিয়া

www.pathagar.com

থাকে। এই পৌরাণিক যুগেই ভারতে মূর্তিপূজা প্রবল হয় এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবতা ঢুকিয়া পড়ে। এই শাসনে ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে পুরাণ যেরূপ প্রবল হয়, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল উৎস বেদ-বেদান্ত তেমন তলাইয়া যায়। এক দারা- শিকোহ্ যত উপনিষদ রক্ষা করিয়াছেন, কোন ভারতীয় হিন্দু তত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর ভারতীয়রা নতুন করিয়া বেদ-বেদান্ত চর্চায় মনোনিবেশ করেন। কেননা একমাত্র বেদ-বেদান্ত ব্যতীত নিরাকার ঈশ্বরবাদী মুসলিম সংস্কৃতির সম্মুখীন হইবার মত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট বেশী ছিল না। বেদান্তে একদিকে আত্মার অমরত্ব, মহিমা ও পবিত্রতা যেমন বিঘোষিত হইয়াছে, অন্যদিকে ব্রহ্ম বা এক ঈশ্বরের প্রতিও মানুষের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করা হইয়াছে।

মুসলমান আমলে ভারতে ভক্তিবাদ প্রবল হয়। গীতার ভক্তিযোগের প্রতি ভারতীয় হিন্দুদের বিশেষ প্রবণতাও পরিলক্ষিত হয়। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যে রামানুজ কর্তৃক "বৈষ্ণব" মত প্রচার এবং চতুর্দশ শতাব্দীর রামানন্দ কর্তৃক "রামাৎ বৈষ্ণব"-বাদ ঘোষণা, ভারতে ভক্তিবাদের জয় প্রকাশ করিতেছে। ইসলাম ধর্ম প্রধানতঃ বিশ্বাস ও ভক্তির ধর্ম। এই ধর্মের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবার জন্য বৈষ্ণববাদ প্রচারের আবশ্যকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং বলিতে হয়, ভারতের পরবর্তী ভক্তিবাদ মুসলিম সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ বলিয়া অস্বীকৃত হইলেও পরোক্ষ অবদান বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

মুসলমানদের সহিত তাহাদের মর্মবাদী (mystic) সূফী সাধকরাও ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ভারতে মুসলিম সংস্কৃতি ও ইসলাম ধর্ম প্রচারে ইহাদের দান অপরিসীম। ভারতের সাধু সন্ন্যাসীরা পাতঞ্জল মুনির যোগ সাধনা লইয়া সূফী সাধকের মোকাবিলা করিয়াছিলেন। ফলে মুসলমান সূফীরা হিন্দু-শিষ্য এবং হিন্দু-সন্ন্যাসীর মুসলমান চেলা দেখিতে পাওয়া যায়। সাধনার ক্ষেত্রে এইরূপ ভাবের বিনিময়ে ভারতীয় সংস্কৃতি যেই বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে থাকে, তাহা অল্প কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে পারি, মধ্যযুগীয় ভারতেই কবীর (১৩৯৮-১৪৪৮), নানক (১৪৬৯-১৫৩৯), দাদু (১৫৪৪-১৬০৩) ও চৈতন্য দেবের (১৪৮৪-১৫৩৩) ন্যায় ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকের জন্ম সম্ভবপর হইয়াছিল এবং এই সংস্কৃতির অন্য যুগে ইহাদের ন্যায় মহাপুরুষগণের আবির্ভাব সম্ভবপর হয় নাই। ইহাদের আবির্ভাবে মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব, এমন কি ইহাদের জীবনেও ঐসলামিক প্রভাব দেদীপ্যমান। ইহাদের সকলেই একেশ্বরবাদিতায় প্রবুদ্ধ এবং মানুষে-মানুষে, ধর্মে-ধর্মে ভিন্নতর বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ইসলামের ঔদার্য্য ও ভ্রাতৃভাবকে গ্রহণ করিয়া ভারতের অস্পৃশ্যতাকে দূরীভূত করিয়া দেওয়ার সাধনাই ইহাদের জীবনের সাধনামালার অন্যতম।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, ভারতের রাষ্ট্রীয় একত্ববোধ মুসলমান আমলেই জাগিয়াছে। এই রাষ্ট্রীয় একত্ববোধ ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে রূপ গ্রহণ করিতেছিল। উদাহরণস্বরূপ উর্দু ভাষার উদ্ভবের কথা উল্লেখ করা যায়। একদিকে রাষ্ট্রীয় একত্ববোধ এবং অন্যদিকে শাসক ও শাসিতের মধ্যে ভাব বিনিময়ের আবশ্যকতার মৌলিক উপলব্ধি হইতেই এই ভাষার উদ্ভব ঘটে। ইহাকে আরও একটু স্পষ্টতর করিয়া বলা উচিত।

www.pathagar.com

একথা সত্য যে, উত্তর ভারতীয় সমুদয় ভাষা প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষা (যাহা পরবর্তীকালে প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়া বিবর্তিত হইয়াছিল) হইতে সমুৎপন্ন। এতৎসত্ত্বেও উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা পরস্পর এতই বিভিন্ন যে, এক ভাষাভাষীর অন্য ভাষাভাষীকে বুঝিবার উপায় নাই। এই বিভিন্নতা মধ্য যুগীয় বিভিন্নতা নহে। ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই উত্তর ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া রূপ পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহার কারণ খুঁজিতে গেলে, রাষ্ট্রীয় বিভিন্নতার কথাই সকলের আগে মনে পড়ে, কেননা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা যখন প্রাকৃতে বিবর্তিত হইল, শৌরসেনী, মাগধী, উদীচ্য, প্রাচ্য প্রাকৃতরূপেই আখ্যালাভ করিল। এইগুলি প্রায়ই এক একটি রাষ্ট্রীয় মণ্ডলের নাম। মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে উত্তর ভারতীয় এক প্রদেশ অন্য প্রদেশকে বুঝিত না বা বুঝিতে পারিত না। মুসলমান আমলে প্রায় সমগ্র ভারত এক শাসনাধীন হইল, ভারতের নানা প্রদেশের লোক মুসলিম রাজধানী দিল্লী ও আগ্রায় সমবেত হইতে বাধ্য হইল। এতদ্ব্যতীত এই দুই স্থানে বোখারা, সমরকন্দ, তুর্কীস্থান, কুর্দীস্তান, ইরান, ইরাক, তুরান, আফগানিস্তান, মিশর, বাগদাদ, বসরা প্রভৃতি স্থানের বহু লোক নানা কার্যব্যপ্রদেশে সমবেত হইয়াছিল। মুসলিম শাসন-কালের গোড়ার দিকে, কেবল বিদেশীয় মুসলমানদের মধ্যে ভারতে তুর্কী ভাষা ও সংস্কৃতি প্রবল ছিল বটে, কিন্তু তাহা বেশী দিন চলে নাই। ভারতে ফারসী ভাষাই রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হইয়াছিল এবং ইরানী সংস্কৃতিই মুসলিমদের মধ্যে জোর চলিয়াছে।

মোটের উপর, মুসলমান আমলে গোড়ার দিকে ভারতীয় কিংবা অভারতীয় কাহারও মধ্যে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানের জন্য কোন সাধারণ ভাষা ছিল না। এই অভাবটি মুসলমানদের শিবির-জীবনেই সর্বাধিক অনুভূত হয়। ভারতে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুসলিম জীবন শিবির-জীবনরূপেই অধিক মাত্রায় কাটিয়াছে। এই শিবির-জীবনে ভারতীয়দের সহিত মুসলমানদের যোগাযোগ রক্ষা করা একান্তই আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই সময় হিন্দী-ভাষার যে কয়েকটি রূপ প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে 'ব্রজভাষা' অন্যতম; ইহা দিল্লী, আগ্রায় এবং তৎপার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে প্রচলিত ছিল। ভারতীয় ও অভারতীয় উভয় শ্রেণীর লোক এই 'ব্রজভাষাকে' কেন্দ্র করিয়া একটি 'খিচুড়ি' ভাষার সৃষ্টি করিতে বাধ্য হয়। এই ভাষার পদবিন্যাস-পদ্ধতি হিন্দী হইলেও, যে ভাবে ইহাতে আরবী, ফারসী, তুর্কী প্রভৃতি ভাষার শব্দ ও রীতিনীতি গৃহীত হইতে লাগিল, তাহাতে অনতিবিলম্বেই ইহা এক নূতন রূপ গ্রহণ করিয়া বসিল। 'ব্রজভাষা' তথা পশ্চিমা হিন্দীর আধারে ঢালিয়া যেই নতুন ভাষার রূপ দেওয়া হইল, তাহার নাম হইল- উর্দু। 'উর্দু' তুর্কী শব্দ; ইহার অর্থ হইল- 'শিবির' 'স্কন্ধাবার' বা 'তাঁবু'। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, এই ভাষার সাহায্যে শুধু 'ব্রজমণ্ডলে নহে, উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র কাজ-কারবার চলে। এই হিসাবে ইহা মুসলিম আমলেই ভারতের Lingua Franca বা সর্বজনীন ভাষার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় দেশরূপে ভারতীয় ধারণাকে ঘনীভূত করিয়া তুলিবার পক্ষেও উর্দু-ভাষার দান নিতান্তই অবহেলার সামগ্রী নহে।

ভারতে মুসলিম রাজত্ব যতই সুদৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হইয়া চলিল, ভারতীয় জীবনে মুসলমান সংস্কৃতির ছাপ ততই সম্প্রসারিত হইতেছিল। আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতীয় সমাজ জীবনের প্রতিস্তরে মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব ও অনুকরণ

www.pathagar.com

সভ্যতার নিদর্শনরূপে গৃহীত হইতে লাগিল। দেশীয় রাজ-রাজড়াদের দরবারে তাহার শেষ চিহ্ন অধিকমাত্রায় পরিস্ফুট হইয়া দেখা দিয়াছিল।

এই সময়ে ভারতীয় সঙ্গীত ও চিত্রকলায়ও যুগান্তর উপস্থিত হইল। 'ললিতকলা' হিসাবে সঙ্গীত ও চিত্র-বিদ্যা ইসলামে নিন্দিত তো নহেই বরং ইসলামের ইতিহাসে ইহা চিরদিন শিল্প হিসাবে উৎসাহিত হইয়াছে। তবে মানুষের ভোগ-লালসার উপাদান হিসাবে সঙ্গীতকে এবং পূজার উপাদান হিসাবে মূর্তি নির্মাণ, চিত্রাঙ্কন ও সংরক্ষণ ইসলাম যে শুধু ভাল চক্ষে দেখে নাই, তাহা নহে, বরং সুস্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করিয়াছে।

ভারতে মুসলমান আমলে মুসলমানেরা শুধু সঙ্গীতচর্চা করেন নাই, চিত্রচর্চাও করিয়াছেন। তাঁহাদের চিত্রচর্চার রীতি, মোটামুটিভাবে ইরানী রীতি; ইহা ভারতীয় রীতি হইতে পৃথক। ভারতের চিত্র-জগতে মুসলমানদের এই রীতি ভারতীয় রীতির সহিত সম্মিলিত হইয়া 'মুঘলাই রীতি' নামে একটি পৃথক ভারতীয় অঙ্কন-শিল্পের জন্মদান করিয়াছে। রাজপুত চিত্র-শিল্পেও মুসলিম চিত্র-শিল্পের ছাপ ঠিকরিয়া পড়িতেছে।

ভারতীয় মুসলমানেরা সঙ্গীতচর্চার জন্য চির খ্যাত। তাহাদের সঙ্গীত বিদ্যা ও যন্ত্র ভারতীয় সঙ্গীত বিদ্যা ও যন্ত্রাদি হইতে পৃথক ছিল। ভারতীয় পৌরাণিক সঙ্গীত মুসলমান সংস্কৃতির এই অংশের সংস্রবে আসিয়া অনেকখানি নূতন রূপ গ্রহণ করে। ফলে, ধ্রুপদ, ভৈরব, মেঘমল্লার, গান্ধার প্রভৃতি ভারতীয় রাগরাগিণীর সহিত মুসলমানদের গজল, কাওয়ালী, দাদরা, খেয়াল প্রভৃতি মিলিয়া গেল। বীণা, মুরলী, ঢাক, ঢোল প্রভৃতি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র জগতে মুসলমানদের তবলা, রবার, সেতার, নাকারা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রও স্থান করিয়া লইল। ধীরে ধীরে ঠুমরী, টপ্পা, জৌনপুরী, আশাবরী প্রভৃতি নানা মিশ্র রাগিণীর উদ্ভবে ভারতীয় সঙ্গীতে যুগান্তর উপস্থিত হইল।

মোটের উপর, ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া ধীর স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, ভারতীয় সংস্কৃতি মুসলিম সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই; বরং লাভবান হইয়াছে। মুসলমানরা ভারতীয় সংস্কৃতিকে ক্ষেত্রবিশেষে জোরালো, স্থান বিশেষে পরিপুষ্ট এবং পাত্রবিশেষে গরিষ্ঠ ও মহীয়ান করিয়া দিয়াছে। মিশর, ইরান, তুরান, তুর্কীস্থান প্রভৃতি দেশে মুসলিম সংস্কৃতি দেশীয় সংস্কৃতিকে একেবারেই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ভারতে তাহা করে নাই, এই দেশে উভয় সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটিয়াছে। এই জন্য বলিতে হয়, ভারতে বর্তমান সংস্কৃতি কোন জাতির বিশেষের একার দান নহে, ইহা প্রাচীন ভারতীয় এবং মধ্যযুগীয় মুসলিম সংস্কৃতির সংমিশ্রণেই প্রস্তুত একটি যৌগিক সংস্কৃতি। #

(প্রবন্ধটি ড. মুহম্মদ এনামুল হকের 'মনীষা মঞ্জুষা' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।)

www.pathagar.com

ইসলামী সংস্কৃতি

ড. হাসান জামান

ইসলামী সংস্কৃতি বা তমদ্দুন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে 'তমদ্দুন' কাকে বলে জানা দরকার হয়ে পড়ে। তমদ্দুন কথাটি আরবী 'মাদানুন' থেকে এসেছে, 'মাদানুন' মানে শহর। বাংলা ভাষায় 'তমদ্দুন' কথাটি মুসলিম সমাজে গত কয়েক বছর হল চালু হয়ে গেছে। শহরের বুকেই গড়ে উঠেছিল প্রথম সভ্যতা, গোড়াপত্তন হয়েছিল সংস্কৃতির। এর ভেতরই হয়ত পাওয়া যাবে তমদ্দুন কথাটির সার্থকতা। বাংলা ভাষায় সাধারণত তমদ্দুন বলতে সংস্কৃতি কথাটা ব্যবহার করা হয়- তমদ্দুন বা সংস্কৃতি দিক নির্দেশ করে এক মার্জিত উন্নত রুচির ভাবের দিকে। ইংরাজিতে একেই বলা হয় কালচার।

সমাজবিজ্ঞানে কিন্তু আমরা মার্জিত রুচি আর মার্জিত রুচিহীনতার সংগে পরস্পর পার্থক্য দেখিয়ে তমদ্দুনের সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করি না। কালচার্ড আর আন্‌কালচার্ডের পার্থক্যই আমাদের সংজ্ঞার মাপ কাঠি হয় না। ব্যাপক অর্থেই আমরা ব্যবহার করি 'তমদ্দুন' কথাটা। তবে সবচাইতে বোয়া (Boas) ও টাইলর (Tylor)-এর সংজ্ঞাই ব্যাপক ও সুষ্ঠু। বোয়া তাঁর "জেনারাল অ্যানথ্রোপলজী" (General Anthroplogy-p.p.4-5) তে কালচার বা তমদ্দুনের সংজ্ঞার ভেতর উল্লেখ করেছে -(১) প্রাকৃতিক পরিবেশের উপরে মানুষের নিয়ন্ত্রণ, (২) অনুভূতিশীল মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও বিভিন্ন সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক, (৩) মানসিক হাবভাব- ধর্ম, নীতি, সৌন্দর্য-জ্ঞান। 'তমদ্দুন' বলতে আমরা বুঝি সামাজিক প্রতিষ্ঠার, যন্ত্রাদি প্রত্যয় (Ideas), ধর্ম (পাশ্চাত্য অর্থে), নীতি, আইন, আচার ব্যবহার -এসবেরই সমষ্টি। টাইলর তাঁর "প্রিমিটিভ কালচার"-এ তমদ্দুনের এই ধরনেরই সংজ্ঞা দিয়েছেন: Culture is that complex which includes

www.pathagar.com

Knowledge, Belief, Art, Moral, Law, Custom and other capabilities and habits acquired by man as a member of society .

সভ্যতা ও তমদ্দুন

এখানে মনে রাখা দরকার যে, তমদ্দুন ও সভ্যতা বলতে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জিনিস বুঝায়। সভ্যতা বলতে বুঝায় মানুষের কার্যধারার বিভিন্ন দিকগুলো, সামাজিক সংগঠন, প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। বাইরের খোলস আর বাইরের কাজ এই যেন সভ্যতা। ম্যাকিভার (Maciver) বলেন: "Our culture is what we are, our civilization is what we use".

আমরা কি বা কি হতে পেরেছি এ'ই হল 'তমদ্দুন'। আর আমরা কি ব্যবহার করি এ'ই হল 'সভ্যতা'। স্পেংলারের মতে মানুষের সভ্যতার ব্যবহারিক দিকের উন্নতির সংগে সংগে তমদ্দুনের অবলুপ্তি হয় শুরু। ম্যাসিগননের মতে: Culture is a certain involution within.. civilization, characteristic educational tradition. (Massignon: Reflections on Our Age, 1948,p.134) আর কান্ট বলেন, তমদ্দুনের সাথে নৈতিক মূল্যবোধ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আবার অনাবিল সুখভোগ হল ম্যাথু আরনল্ডের তমদ্দুনের সংজ্ঞার নিরিখ - "The study of perfection, the disinterested search for sweetness and light."

ইসলামী তমদ্দুনের স্বরূপ

ইসলামী তমদ্দুনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তমদ্দুনের ব্যাপক সংজ্ঞাটাকেই আমাদের নিতে হবে। ইসলাম ধর্মের সংকীর্ণ সংজ্ঞা দেয় নি। 'দ্বীন' বলতে বোঝায় জীবন-দর্শন বা জীবনের একটি সুষ্ঠু আদর্শ। কাজেই ইসলামের তমদ্দুন যেমন একদিকে ব্যাপক হবে, তেমনি অন্যদিকে এই তমদ্দুন ইসলামের আদর্শভিত্তিক হওয়া চাই। ইসলামী তমদ্দুন বলতে মোটামুটি আমরা যা বুঝি তার মধ্যে প্রথম হ'ল তওহীদবাদ, মানব জীবনে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা- মানুষের সামাজিক জীবনে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সার্বজনীন নীতির প্রবর্তন। সার্বজনীন বিচার প্রতিষ্ঠা তওহীদবাদের লক্ষ্য।

এ-ছাড়া আছে প্রত্যয় বা চিন্তা ধারা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আইন কানুন, ঈমান, নীতি, আচার-ব্যবহার- যা ইসলাম পজিটিভ রূপে বা অস্তিত্ববাচক হিসেবে নিজেই গড়ে তোলে। প্রত্যয় বা চিন্তাধারা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আইন-কানুন, নীতি, আচার-ব্যবহার যেগুলো তওহীদবাদ ও সার্বজনীন নীতির বিরোধী নয়, তাকে ইসলামী তমদ্দুন বলা যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, সাধারণভাবে সবই ইসলামী শিক্ষা, যদি তার আরম্ভ, উদ্দেশ্য ও সামাজিক ফল ভাল হয়। হযরতের সময়ে শিক্ষার এই সংজ্ঞাই দেয়া হত। [কুরআন: ১৬:১২; ৩:১৯০-৯১; ৪৫:১৩; ৩১:২০; ১০:১০২; ২:১৬৪; ১৩:২; ৩১:২৯; ১৩০:৫৪]

বলা বাহুল্য, 'কালেমা' আমাদের শিক্ষা দেয়, আল্লাহ্ ছাড়া সব প্রভুত্ব নাশ ক'রে জ্ঞানের মারফত মানব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

www.pathagar.com

আদর্শের দিক থেকে বিচার করলে তমদ্দুনকে ভাগ করা যায় দু'ভাগে- আদর্শভিত্তিক তমদ্দুন (Ideological culture) আর আদর্শ-নিরপেক্ষ তমদ্দুন (Chance culture) এই প্রকারভেদ চরম পার্থক্য নির্দেশ নয়। আপেক্ষিক পার্থক্য নির্দেশ করা হল কেবলমাত্র বুঝাবার সুবিধার জন্যে। কারণ পরিপূর্ণ আদর্শ-নিরপেক্ষ তমদ্দুন কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অবশ্য আদর্শভিত্তিক তমদ্দুন হলেই যে সেটি ভাল হবে তার মানে নেই। আদর্শটা কেমন তার উপরেই এটা নির্ভর করবে। যত নিকৃষ্টই হোক, হেঁয়ালিবাদ বা ঔদাসীন্যবাদও এক ধরনের আদর্শ। আদর্শভিত্তিক তমদ্দুনের ভেতরে- ফ্যাসিবাদ, কমিউনিজম ও ইসলাম আদর্শভিত্তিক তমদ্দুন।

জাতিবিদ্বেষ, শ্রেণীবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ ও সাম্রাজ্যবাদের উপর সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে না। হিটলারের আর্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব, হেগেলের সার্বজনীন প্রজ্ঞা (Universal spirit), স্পেংলারের বিশ্বসংজ্ঞা (World plan-the powers of blood and race are more importent than blood and money), কমিউনিজমের শ্রেণী- সাম্রাজ্যবাদ, ইওরোপীয় জাতীয়তাবাদ আদর্শভিত্তিক হলেও সুষ্ঠু সামাজিক কল্যাণ আনতে পারে না। আদর্শ-নিরপেক্ষ তমদ্দুনের ঐ একই দশা। আদর্শ-নিরপেক্ষ তমদ্দুন হেঁয়ালিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় ও ব্যক্তিগত স্বৈরাচার, জাতিগত ও আঞ্চলিক নীতিবোধের ওপর গড়ে ওঠে। সেই আদর্শই মানুষের গ্রহণীয় হওয়া উচিত, যার-মৌলিক ভাব ও নীতিবোধ মানবিক ও সার্বজনীন; সামাজিক ফল মঙ্গলজনক এবং যা থেকে অনাবিল আনন্দ পাওয়া যেতে পারে ও যেটা সুকুমার ও মানসিক প্রবৃত্তির বিকাশ সাধন করতে পারে।

ইসলামী তমদ্দুন ও মুসলিম তমদ্দুন

ইসলামী তমদ্দুনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, 'মুসলিম' তমদ্দুন ও ইসলামী তমদ্দুনে আসমান - জমিন প্রভেদ। মুসলমানদের তমদ্দুন হলেই তা ইসলামী তমদ্দুন নাও হতে পারে। জাতিগত ও ভাষাগত পার্থক্য, বাদশাহী ও সামন্ততান্ত্রিক হাবভাব নানা কারণে মুসলমানদের তমদ্দুনে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু সেগুলোকে ইসলামী তমদ্দুনের অংশ বলা যায় না। আব্বাসীয়দের সময় থেকেই ইসলামী তমদ্দুনে সংকীর্ণতা ঢুকে পড়ে-একজন অত্যাচারী শাসক 'খলীফা' বা নামে 'আমীরুল মুমিনীন' হলেই যথেষ্ট, তা তিনি ইসলামের সামাজিক বিধান প্রয়োগ করুন আর না করুন। সামাজিক ঐক্য বা সংহতি নিশ্চয়ই প্রয়োজন আর এটা ইসলামেরই বিধান। কিন্তু জালিম শাসনকেও 'আল্লাহর ছায়া' শাহানশাহ্ বা বাদশাহ্ বলে মেনে নেওয়া কিছুতেই ইসলামের নীতি অনুগ হতে পারে না। মনে রাখা দরকার যে, তথাকথিত ধর্মীয় শাসক মুখে ইসলামের নাম করে শাসন চালালেই ইসলামী শাসন হবে না। কেবলমাত্র ধর্মীয় নেতার সঙ্গে সামাজিক ব্যাপারের যোগ থাকলেই ইসলামী সমাজ পাওয়া যাবে না। বাহ্যিক হাবভাব বা পোশাক আশাকই যথেষ্ট নয়। ইসলামের নীতির সংগেই সামাজিক ব্যাপারের সংযোগ হওয়া চাই। এই হিসেবেই (তথাকথিত ধর্মীয় নেতার অস্তিত্বের জন্যেই শুধু নয়) ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ, ধর্মীয় বা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ। জুলুমের বিরুদ্ধে জিহাদ ইসলামী তমদ্দুনের একটা বড় কথা।

www.pathagar.com

যা হোক মোগল, তুর্কী ও ইরানী তমদ্দুনের প্রভাবের ফলে মুসলিম তমদ্দুনে জাতিগত বিদ্বেষ ও সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতা ঢুকে পড়েছে ও ইসলামের সার্বজনীন দিকগুলোকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা চলেছে। বাইরের পোশাকের দিকে দেওয়া হয়েছে বেশী নজর। ফলে মুসলমানদের তমদ্দুনে এমন একটা ভাব ঢুকে পড়েছে যে, যা ইরানী বা তুর্কী তাই ইসলামী আর যা ভারতীয়, ইন্দোনেশীয় বা ইওরোপীয় তাই ইসলাম বিরোধী। কিন্তু বিচার করে দেখা হয় না যে, এগুলো ইসলামী তমদ্দুনের মৌলিক দিকগুলোর বিরোধী কিনা।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আরও সাফ হয়ে যাবে। বাংলা ভাষায় লেখা হলেই যেমন কোন সাহিত্য ইসলামী হয় না বা ইসলাম বিরোধী হয় না, তেমনি প্রত্যেক ভাষা সম্বন্ধে ঐ একই কথা। একই ভাষাতে ইসলাম- সংগত ও ইসলামবিরোধী ভাব ধারা প্রচার করা যায়। ভাষা সৃষ্টির ব্যাপারে বিশ্বনিয়ন্তার কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল না।

আল্লাহ তা'লাই কুরআনে বলেছেন, 'বিভিন্ন ভাষা ও রঙ সৃষ্টির ভেতরে মানুষের জন্যে রয়েছে অজস্র চিন্তার খোরাক'। (সূরা রুম ৩০:২২) সব ভাষার সৃষ্টি ও বিভিন্ন রঙের মানুষের সৃষ্টি তাই তাঁর অভিপ্রেত। সাদাকালোর বিরোধ জাতিগত বিদ্বেষ বা ভাষাগত বিদ্বেষ তাই আল্লাহর সৃষ্টি উদ্দেশ্যের ঘোর বিরোধী। কুরআন শরীফ প্রথমত ছিল আরববাসীর জন্যেই। অবশ্য এর গূঢ় উদ্দেশ্য ও সম্বোধন রয়েছে তামাম জাহানের মানব জাতির জন্যেই। সেজন্যে কুরআন বলেছে: 'আরবী ভাষায় কুরআন রয়েছে, যাতে তোমাদের বোধগম্য হয়।' -(সুরা ফুসিলাত ৪১: ৪৪) এর দ্বারা কুরআন এই নীতিরই প্রতিষ্ঠা করছে যে, শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে মাতৃভাষাই সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন বা মাধ্যম। জাতিগত বিদ্বেষ ধুলিস্যাৎ করে হযরত বলেছেন, অনারবদের উপর আরবদের কোনও শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সবাই আদমের সন্তান আর আদমের সৃষ্টি মাটি থেকে।

কাজেই এ-কথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, ভাষাগত পার্থক্য, জীবিকার পার্থক্য, পার্থক্য হতে পারে, কিন্তু এগুলো কখনই আদর্শিক পার্থক্য নির্দেশ করে না। কারণ ইসলামী আদর্শ ভাষাভিত্তিক বা আঞ্চলিক নয়।

ইসলামী জীবনবোধ থেকে পাওয়া মৌলিক ভাবের উপরেই নির্ভর করে ইসলামী তমদ্দুনের ও ইসলামী সাহিত্যের মৌলিক ভিত্তি।

ধরা যাক, স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কোন একজন লোক 'জিহাদের' জিগির তুলল, আর ঘোষণা করল- 'আমি জিহাদ করছি।' কিন্তু এটা কি সত্যি জিহাদ হবে? কখনই না। আবার ধরুন, আর একটি লোক স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে একটি ভাল কাজে এগিয়ে এল, কিন্তু সে আরবী জানে না আর জিহাদ কথাটিও কোনও দিন শোনেনি। সে হয়ত ঘোষণা করল -'আমি সত্যের জন্যে সংগ্রাম করছি। আল্লাহর চোখে, মানবতার চোখে, সত্য ও ন্যায়- বিচারের চোখে এই সংগ্রামই প্রকৃত 'জিহাদ' পদবাচ্য হবে। হাদীস বলেছে : উদ্দেশ্য দেখেই কাজের বিচার হবে।

ভাষাগত আধিপত্য বা অন্য যে কোন রকমের সংকীর্ণতা ইসলামের প্রকৃত অগ্রগতির পক্ষে দারুণভাবে ক্ষতিকর। পোমাক্স (Pomaks) বা বুলগেরীয় মুসলিমদের ওপর জোর করে

www.pathagar.com

তুর্কীভাষা চাপিয়ে দেওয়া যে উস্‌মানী (Ottoman) সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ ছিল, তাও প্রায় সব ইতিহাস পাঠকেরই জানা আছে। ইতিহাসের শিক্ষা যেন আমরা গ্রহণ করি, নতুন সমাজ গঠনের ভাবপ্রবণতায় যেন আমরা নতুন করে ভুল না করে বসি।

বাঙালী সংস্কৃতি এবং ইসলামী তমদ্দুন ও সাহিত্য

বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে বাঙালী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল পাল ও সেন বংশের আমলে। হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৈষ্ণববাদের সংগে সংগে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বৈরাগ্যবাদ, মায়াবাদ ও নির্মাণবাদের ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। পালি ও প্রাকৃত ভাষার মারফত এই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি বাংলা সংস্কৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। .. তারপর এল তুর্কী বিজয়। বাংলা ভাষার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব যুগের অভ্যুদয় হল। বিজয়ী মুসলমানদের দরবারে বিজিতের এই বাংলা ভাষা সগৌরবে স্থান পেল। দুর্বোধ্য সংস্কৃতের নিগড় থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলা ভাষা বিকাশের নতুন পথ বেছে নিল। এর ফলে যে বিরাট লোকসাহিত্য ও পুঁথি- সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, তা হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির ছাপ সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে না পারলেও ইসলামী ভাবধারার প্রভাব বাংলা সাহিত্যে তখন থেকেই পড়তে শুরু করে। বাদশাহী পৃষ্ঠপোষকতার চাইতেও মুসলমান ফকীর দরবেশদের প্রভাব এই ব্যাপারে কোন অংশে কম নয়। তারপর বৌদ্ধ সংস্কৃতির উদার নৈতিক ভাবধারাও এদেশে ইসলামের সার্বজনীন ভাবধারার প্রসারে কম সাহায্য করে নি। ওহাবী আন্দোলনের ভারতীয় ধারা পরবর্তীকালে এদেশীয় মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবন থেকে ইসলামবিরোধী ভাবধারা দূর করবার চেষ্টা করে।

কোন বিশেষ দেশের তমদ্দুন হলেই তা ইসলাম -মুখী বা ইসলাম - বিরোধী হবে তা বলা যায় না। বাংলাদেশ সম্পর্কেও একথা খাটে। প্রয়াসসাধ্য হলেও দুনিয়ার যে কোন ভাষার ভেতর দিয়ে ইসলামী সাহিত্য গড়ে তোলা যায়। (কুরআন নাজিল হবার আগে আরবী ভাষা কাফিরদের ভাষা ছিল) আরবী, ফারসী, উর্দু, বাংলা ও ইংরাজি ভাষার মারফত ইসলামী সাহিত্যের বিকাশেই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আরবীতে কথা বললেই যে ইসলামী সমাজ থাকতে পারে না, বর্তমান আরবীয় সমাজই তার নজির। কাজেই বাংলাদেশের ইসলামী সংস্কৃতি বা ইসলামী তমদ্দুন ইসলামী থেকেও বাংলাদেশী হতে পারে, আবার বাংলাদেশী থেকেও ইসলামী হতে পারে। তবে তার ভেতরে ইসলামী ভাবধারার প্রভাব থাকা চাই এবং ইসলামী তমদ্দুনের যেসব মাপকাঠির কথা আগে বলা হয়েছে (তওহীদ, সার্বজনীন নীতি ইসলামী চিন্তাধারা ও প্রতিষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, সুষ্ঠু ইসলামী সমাজের সংগঠন, পরিশেষে আল্লাহর সৃষ্টির মহাত্ম উপলব্ধি ও অনাবিল সুখ ভোগ) সেগুলোর উপরেই বাংলাদেশেও ইসলামী তমদ্দুন বিকাশ লাভ করবে। এক সময় আরবীতে ইসলামের নামগন্ধ ছিল না, কিন্তু পরে আরবী ভাষায় ইসলামী সাহিত্য গড়ে তুলতে কোন বাধা হয় নি। কাজেই মুসলমানের লেখা হলেই তমদ্দুনের দিক থেকে তা ইসলামী সাহিত্য নাও হতে পারে। ভাবধারার উপরেই এটা নির্ভর করবে। উর্দুতে লেখা হলেই মার্কসীয় সাহিত্য বা সিনেমা সাহিত্য ও ইসলামী সাহিত্য পদবাচ্য হতে হবে তার কোন মানে নেই। তবে যে-

www.pathagar.com

সব সাহিত্য তওহীদের বিরোধী নয় ও মানব মনের সার্বজনীন দিকগুলো তুলে ধরে, সেগুলো ইসলামী সমাজে সাদরে গৃহীত হতে পারে। বাংলাদেশের ইসলামী সাহিত্যের তাই বর্তমানের মুসলিম সমাজের প্রতিফলন পাওয়া যাবে, এমন সাহিত্য- কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক, গল্প ইত্যাদি বাঞ্ছনীয়। অন্য সমাজের চিত্র এতে থাকতে পারে, তবে সেটা মুখ্য উদ্দেশ্য হবে না। সার্বজনীন সাহিত্যের সামাজিক ফল তওহীদ বা মনের বিরোধী না হলে ইসলামী সমাজে গৃহীত হতে পারে এবং ইসলামী তমদ্দুন অনুযায়ী লেখকগণও তওহীদী তমদ্দুনের বিরোধিতা না করেও এগুলো লিখতে পারেন।

ইসলামী তমদ্দুনের সুষ্ঠু প্রচার ও ধর্মীয় সাহিত্য

বাংলাদেশের সাহিত্যে মুসলিম কৃষ্টি জীবন আলেখ্যই বেশী স্থান পাবে, কেননা এখানে লোকসংখ্যার চার ভাগের তিন ভাগই হলো তারা। কিন্তু ইসলামী তমদ্দুনের প্রধান স্বরূপগুলোই তার হাবভাব নিয়ন্ত্রিত করবে। প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী সমাজ গঠনের সংগে সংগে এটা আরও সহজ হয়ে উঠবে।

মোগল সংস্কৃতি ও বাংলাদেশের ইসলামী তমদ্দুন

বাংলাদেশের জনগণের সংগে ইসলামী তমদ্দুনের নাড়ির যোগ রয়েছে। অন্যান্য জায়গায় ভাবধারার চাইতে বাহ্যিক পোশাকের চটক ও জাতিগত এবং সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতাই বেশী দেখতে পাওয়া যায় । এর পেছনে ঐতিহাসিক ও তামদ্দুনিক কারণ রয়েছে। বাংলাদেশে বখ্‌তিয়ার খিল্‌জীর আসার অনেক আগেই চট্টগ্রামে ও দক্ষিণ ভারতে আরব ব্যবসায়ীগণ আগমন করেন। এদের সঙ্গে অনেক ফকীর দরবেশ ও মুসলিম প্রচারকও আসেন। মালাবার উপকূলে মোপলা মুসলমানদের মধ্যে বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের বিশ্বজনীন ও প্রকৃত প্রগতিশীল ও মানবিক ভাবধারার হদিস মেলে। এসব জায়গা ছাড়া উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানে ইসলামের তওহীদী ভাবধারার চাইতে পারসিক তুর্কী ও মোগল সভ্যতার জাকজমক, বাদশাহী হাবভাব ও জাতিগত সংকীর্ণতা বেশী পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। উপমহাদেশের মুসলিম জাগরণে আলীগড় আন্দোলনের বিরাট দান অনস্বীকার্য। তবুও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ভাব ধারায় সংকীর্ণতা স্থান পেয়েছে। মুসলিম রাজা বাদশাহরা এদেশ শাসন না করলে ও ইসলামের সার্বজনীন ভাবধারায় পুষ্ট চিন্তাবিদদের হাতে রাজনৈতিক ও তামদ্দুনিক আন্দোলনের ভাব থাকলে, এদেশে ইসলামের ভবিষ্যৎ যে অনেক গৌরবজনক হত ও ইসলামী জীবনবোধের রূপায়ণ অনেকখানি সহজ হয়ে যেত তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

সাহিত্য ও কবিতা, চারুকলা ও সঙ্গীত

তারপর আসে চারুকলা ও সাহিত্যের সাধারণ প্রশ্ন। সাধারণ সাহিত্য ও চারুকলা কি আদতেই ইসলাম বিরোধী? চারুকলা ও সাহিত্যের উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে মানুষের বিচার শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার ভেতরে। আর এগুলোকে কুরআন হাদীসে আল্লাহর নিয়ামতরূপে

www.pathagar.com

বা মহাদানরূপে অভিহিত করা হয়েছে। কলা ও সাহিত্যের শেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজকে সুন্দর করা আর এই ধরনের পরিবেশ ও আবহ সৃষ্টি করা যাতে করে মানুষ সার্বজনীন ও অনাবিল সুখের অধিকারী হতে পারে। মূর্তি থাকলেই যে তা ইসলাম বা তওহীদ বিরোধী নয়, কুরআন থেকেই আমরা এর প্রমাণ পাই। হযরত সুলায়মান ইসলামেরও নবী। তার জন্যে জিনেরা বড় দালান, (বাড়ী সাজানোর) মূর্তি, থালা, ঘটি, বাটি তৈরী করেছিল। (সূরা শেবা-৩৪:১৩) কলা ও সাহিত্য ইসলামী তমদ্দুনের বিরোধী নয়। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, তার সামাজিক ফল ইসলামের তওহ্দীবাদ ও নীতিবোধের বিরোধী কি না। প্রত্যেক জিনিসেরই অপব্যবহার আছে, কিন্তু এই অপব্যবহারের ভয়ে মধ্যযুগীয় 'আলিমগণ' চারুকলা ও সাধারণ সাহিত্য বিকাশের যে বিরোধিতা করেছেন, ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধারণ মাপকাঠিতে তা ইসলামী তমদ্দুনের বিরোধী। হযরত বলেছেন : "দুটি পয়সা পেলে এক পয়সার খাবার কিন, আর এক পয়সার কিন ফুল"। বিশ্বস্রষ্টা তার কুরআনে প্রকৃতির দিকে চেয়ে তার সৌন্দর্য উপলব্ধি করবার জন্য বারবার আহ্বান জানিয়েছেন। হযরতও বলেছেন "আল্লাহ্ চিরসুন্দর, তাই তিনি সৌন্দর্য ভালবাসেন।" আল্লাহ্র প্রত্যেক নবী ফুলের খুশবু আতর ও গন্ধ দ্রব্য পছন্দ করতেন। হযরত আরও বলেছেন, 'দুনিয়াকে আমি ভালবাসি, কারণ এখানে আছে খুশবু জিনিস ও নারী'। তাই সৌন্দর্যবোধ ও চারুকলা ইসলামবিরোধী হতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেক জিনিসের অপব্যবহারের মত চারুকলা, সংগীত ও কবিতা যখন মানুষকে অমানবিক, অসামাজিক ও নীতিহীন কাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় আর তওহীদবাদ বা আল্লাহ্র একত্ববাদ থেকে বিচ্যুত করে তখনই এগুলো ইসলামী তমদ্দুনের ঘোর বিরোধী হয়ে পড়ে। তওহীদের বিরোধিতা করবে বা অতিরিক্ত বিলাসিতার দিকে নিয়ে যাবে, এই ভয়ে কোন প্রাণীর ছবি আঁকতে এবং কবরের উপর সৌধ গড়তে হযরত নিষেধ করেছিলেন। ইসলাম চায় সার্বজনীন আনন্দ। ইসলাম চায় না শিল্প গুটিকতক ধনী বা শাসকের বিলাস সামগ্রী হোক এবং এদের খেয়ালিপনা চরিতার্থ করার জন্যে জনসাধারণ শোষিত হোক কিংবা তাদের দ্বারা অবহেলিত ও উপেক্ষিত হোক। শিল্পকে ইসলাম অত্যন্ত উচ্চ স্থান দেয়, কিন্তু শিল্পকে বিলাসিতায় পর্যবসিত করে ধনিক বা শাসক গোষ্ঠী মশগুল থাকলে তারা রাষ্ট্র বা সমাজের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন না। ইসলাম এই ধরনের শিল্পকেই বাধা দেয়।

সৌন্দর্যবোধ ও তার মারফত সৌন্দর্য সৃষ্টি কখনই আল্লাহ্র অনভিপ্রেত হতে পারে না। কারণ সৌন্দর্যই বিশ্ব রহস্যের অন্তর্নিহিত সুর। সংগীত ও কবিতা সম্পর্কেও ঐ একই কথা। মাদকদ্রব্য ও নারী জাতির ইজ্জতহানি করে যে সংগীত পরিবেশন করা হয় তা নিশ্চয়ই ইসলাম-বিরোধী। কিন্তু সংগীত ইসলাম বিরোধী হতে পারে না। সংগীতজ্ঞরা ও ক্বারী-হাফেজেরা একথা ভালভাবেই জানেন যে, কুরআন তিলাওয়াত, মীলাদ শরীফ পাঠ ও আজানের ভেতরেও বিশেষ সুর ধ্বনিত হয়ে থাকে। বিশেষ প্রয়োজনবোধে বা কোন অনুষ্ঠানের সময় হযরত গান-বাজনার ভেতর দিয়ে আমোদ আহ্লাদ করতে বাধা দেন নি বরং উৎসাহই দিয়েছেন। এখানে হযরত আবুবকরের বাড়ীতে হযরত মুহম্মদ (সা:)-এর

www.pathagar.com

আয়েশার (রা:) সঙ্গে কুমারীদের সংগীত শোনার কথা উল্লেখ করা যায়। লড়াইয়ের মাঠেও কুরআন শরীফের আয়াত সুর করে গাওয়া হত: (Ameer Ali - History of the Saracens ; Macmilan and Co;1251, p. 65)

খন্দকের যুদ্ধে সাহাবীদের সংগে পরিখা খননের সময়ে হযরত নিজে কাজ করেছিলেন আর সুরের সাথে গেয়েছিলেন-

"লা-খাইরা ইল্লা-খাইরাল আখিরা,
আল্লাহুম্মা আরহামাল আনসারা
ওয়াল মুহাজিরা।"

আখেরাতের শুভ ছাড়া, শুভ নেই কোন আর,
আনসার ও মুহাজিরে রহম কর পরওয়ারদিগার।

সৎ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বা চিত্তবিনোদনের জন্যে যে কবিতা ও গান লেখা হয় তা ইসলাম বিরোধী হতে পারে না। কাফিরেরা খণ্ড কবিতা লিখে হযরতকে নানাভাবে কষ্ট দিত। সেজন্যেই কুরআনে বলা হয়েছে, "কবিরা মিথ্যাবাদী"। আবার অনেক কবি ইসলামকে সমর্থন করে কবিতা লিখে ছিলেন। হাসান-বিন-সাবিতের নাম এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য। তাছাড়া কুরআন শরীফই তো একটা উঁচুদরের কাব্য, যাকে হযরত "আমার একমাত্র অলৌকিকতা" বলে দাবী করতেন।

শিল্পকলা ও সাহিত্যের উৎস কি শ্রেণী - সংগ্রাম?

মার্কসবাদের সাহিত্যরূপ ব্যাখ্যাকারী লেনিনের মতে প্রগতিশীল তমদ্দুন ও সাহিত্য সব সময়ই শ্রেণীভিত্তিক ও সংগ্রামমুখী হবে। আমাদের মতে কথাটি আংশিক সত্য। সমাজের এমন অবস্থা কল্পনা করা যায় বা সমাজের এমন অবস্থা প্রকৃতই থাকতে পারে, যখন জনগণের রুটির লড়াই, ভুখা মিছিলের ছবি সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান পাবে; কেননা সাহিত্য হচ্ছে সমাজেরই ছবি, "জীবনের সমালোচনা"। কিন্তু কলা ও সাহিত্যের ভিত্তি শ্রেণী সংগ্রাম নয়, মানব মনের কৌতূহল ও সৌন্দর্যপ্রীতিই এর পেছনে কাজ করছে। চলে যাই আমরা সেই আদিম সমাজে, যখন মানুষ খাদ্যের খোঁজে পাহাড়ে জঙ্গলে সংগ্রাম করে চলেছে। অস্ত্র-শস্ত্রের ছবি হয়ত সে আগে আঁকতেও পারে, কিন্তু এই আঁকার পেছনে বেঁচে থাকার প্রবৃত্তির চাইতে কৌতূহল ও সৌন্দর্যবোধই বেশী কাজ করেছিল। হয়ত সে গুহার দেয়ালে দিল এক আঁচড়। বেশ লাগল তার কাছে এই আঁচড়টা; আরও কয়েকটি আঁচড় হয়ত গড়ে তুলল সুন্দর ছবি- প্রথম মানবশিল্পীর এক সার্থক সৃষ্টি। লেনিন যদিও স্বীকার করেছেন যে, বুর্জোয়া সাহিত্যকে অবলম্বন করেই শ্রমিক সাহিত্য গড়ে উঠবে, তবু তিনি সাহিত্যে শ্রেণী-সংগ্রামের কথাই বেশী উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কলা ও সাহিত্যে মুল উৎসটুকু দেখান নি। সাহিত্যের মার্কসবাদী ধারণার পাল্টা জবাব দিয়েছেন টি.এস.ইলিয়ট। তিনি বলেন যে, শ্রেণী ব্যবধানই তমদ্দুনের অগ্রগতি ও বিকাশের বড় কারণ। শ্রেণীবিভাগ না থাকলে তমদ্দুনের জন্মও হয় না, উন্নতিও হয় না।

www.pathagar.com

শ্রেণীবিভাগ বলতে তিনি যদি প্রাকৃতিক শ্রেণী-বিভাগ বোঝেন তবে এ কথা মানব প্রগতিবিরোধী নয়। কিন্তু শ্রেণী-বিভাগ বলতে শ্রেণী আধিপত্য বোঝালে এ মতবাদ ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল।

মানব সংস্কৃতিতে সুষ্ঠু জীবনবোধের আবশ্যকতা

প্রাচীন গ্রীক দর্শন থেকে আজ অবধি দর্শনের পেছনে মানুষ ছুটেছে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ জীবন পদ্ধতি এসব দর্শন দিতে পারেনি। কোন দর্শন হয়ত সমাজকে দেখতে গিয়ে মানুষের মনকে অবহেলা করেছে, আবার কোনটা বা মনের উপর জোর দিতে গিয়ে সমাজিক সংগঠনের দিকে নজরই দেয়নি। এজন্যেই মানুষের তমদ্দুন ও কলা সাহিত্যে সুষ্ঠু জীবনবোধ ও জীবনাদর্শের আবশ্যকতা রয়েছে। সে জীবন-দর্শন এক দিকে যেমন সমগ্র মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলো মেটাবে, তেমনি মানবিক গুণের ও সুকুমার প্রবৃত্তির বিকাশ সাধন করে অনাবিল সুখ ভোগের দুয়ার খুলে দেবে। "Arts for Arts sake-" "শিল্পের জন্যেই শিল্প"- সত্যি সত্যিই শেষের কথা। কিন্তু সুষ্ঠু জীবন-দর্শনের সংগে যোগাযোগ না থাকলে শিল্পভোগ ও আনন্দবোধ তো দূরের কথা, মাঝ পথেই মানুষের হয় পতন। সামাজিক বিচার ও খাদ্য ভোগ করাই তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইসলামী তমদ্দুনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারা যায় যে, ইসলাম মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের এক সুষ্ঠু জীবনধারা দিতে পেরেছে। সামাজিক ফল খারাপ না হলে ও তওহীদবাদের বিরোধী না হলে শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ ও অগ্রগতি কোন ক্ষেত্রেই ইসলামী তমদ্দুনের বিরোধী নয়। মানব সমাজের সুষ্ঠু সংগঠনের জন্যে আল্লাহ্ ইসলাম নাজিল করেছেন, যার সংগে বিশ্বসৃষ্টির ও সৌন্দর্যের কোন বিরোধিতা নেই, বরং একটি অপরটিরই পরিপূরক। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ইসলামের মৌলিক ভাবধারাকে দুর্বল করা তো দূরের কথা তাকে সবল করেছে, তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে।

ইসলামী সংস্কৃতি ও নতুন সমাজ

পরিশেষে ইসলামী তমদ্দুনকে কিভাবে আবার সামাজিক শক্তিতে পরিণত করা যায়, সে সম্বন্ধে কয়েকটি ইংগিত পেশ করে আমার আলোচনা শেষ করবো।

ইসলামী তমদ্দুনের মৌলিক ও সার্বজনীন নীতিগুলোর বিশ্লেষণ ও প্রচার এবং শিক্ষা।

তথাকথিত মুসলিম তমদ্দুন থেকে সংকীর্ণতা, ভাষাগত ও জাতিগত গোঁড়ামি এবং তওহীদ ও মানবতাবিরোধী হাবভাব দূর করা। আল্লামা ইকবাল এগুলোকে "আরবীয় সাম্রাজ্যবাদের চিহ্ন" (The stamp of Arabian imperialism) বলেছিলেন ।

ইসলামী সমাজ কায়েম করা- ইসলামের নীতির মারফত সামাজিক সমস্যার সমাধান- ইসলামী সমাজ- রীতির সুষ্ঠু রূপায়ণ- ইসলামের মূলনীতি থেকে সরে না গিয়ে জ্ঞানলাভ ও মঙ্গলজনক সব কিছুই গ্রহণ করার প্রবৃত্তি আমাদের ভেতর থাকা চাই। "বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা কর- আল্লাহ্ কিছুই বৃথা সৃষ্টি করেন নি।"-(কুরআন) #

www.pathagar.com

ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম

ইসলামী সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তওহীদ। তওহীদ বা একত্ববাদ বলতে বুঝায় আল্লাহ তা'আলার নিরঙ্কুশ এককত্বের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন। তওহীদ ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা উপস্থাপন করে। ইতিবাচক ধারণা এই যে, বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং তিনি এক ও একক। আর নেতিবাচক ধারণা এই যে, তাঁর মতো কেউ নেই- কিছু নেই; কেউ হতে পারে না তাঁর সমতুল্য। গোটা বিশ্বলোকে তিনি একক ইখতিয়ারসম্পন্ন ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী সত্তা। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন; যা ইচ্ছা তারই ফয়সালা করেন-আদেশ ও নির্দেশ দেন। ইসলামের দৃষ্টিতে তওহীদের ধারণা পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ। 'ইলাহ' হিসেবেও তিনি এক ও একক। তিনি ছাড়া আর কেউ 'ইলাহ' নয় এবং 'ইলাহ' হওয়ার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য কেবল এককভাবে তাঁরই জন্যে শোভনীয়-তাঁর সত্তায়ই নিহিত।

স্রষ্টা বা খোদাকে 'এক' বলে জানার ও মানার কথা অন্যান্য ধর্মে ও সংস্কৃতিতে স্বীকৃত হলেও তাতে রয়েছে অসংখ্য ভুল ও ভ্রান্তি। কেউ তাকে একটি শক্তিমাত্র মনে করেছে। কেউ মনে করেছে প্রথম কার্যকারণ (First cause of causes)। কেউ তাঁর সাথে বংশধারাকে সংযোজিত করেছে। কেউ কেউ আবার তাঁকে আকার-আকৃতি বিশিষ্ট মনে করেছে। কিন্তু ইসলামের তওহীদী ধারণা এসব কলুষতা থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন। ইসলামের খোদা পবিত্র ও মহান সত্তার অধিকারী। তাঁর সত্তা যাবতীয় মহৎ গুণে বিভূষিত। তিনি কারোর মুখাপেক্ষী নন, সবকিছু বরং তাঁরই মুখাপেক্ষী। তিনি সর্ববিধ জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর রহমত সর্বব্যাপক। তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা সর্বজয়ী। তাঁর হিকমত ও সুবিচার নীতিতে কোন ত্রুটি বা বিচ্যুতি নেই। তিনি জীবনদাতা ও জীবন সামগ্রীর একমাত্র পরিবেশক। ক্ষতি ও কল্যাণের যাবতীয় শক্তি তাঁরই হাতে নিবদ্ধ।

www.pathagar.com

হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও পুরস্কার তাঁরই ইখতিয়ারভুক্ত। তিনিই চিরন্তন মা'বুদ, অবিনশ্বর ইলাহ। পূর্ণত্বের সব গুণ তাঁরই সত্তায় নিহিত। তাঁর কোন গুণ-বৈশিষ্ট্যে নেই একবিন্দু দোষ-ত্রুটি। বস্তুত খোদা সম্পর্কে এ ধারণা অত্যন্ত ইতিবাচক। এরই পাশাপাশি রয়েছে নেতিবাচক ধারণাও অর্থাৎ খোদার এ মহৎ গুণাবলী খোদা ছাড়া আর কারোর মধ্যে নেই। খোদা সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, তা আর কারোর সম্পর্কেই বলা যেতে পারে না। বিশ্বলোকের অন্য কোন শক্তি বা সত্তা এই গুণাবলীর অধিকারী নয়। এ কারণে অপর কেউই কোন কিছুই 'ইলাহ' হতে পারে না।

ইসলামের তওহীদী ধারণা পূর্ণতার একটি অপরিহার্য দিক হল নবুয়্যাত বা রিসালাত বিশ্বাস। তওহীদী ধারণায় আল্লাহ্-ই যেহেতু সর্ব ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ফয়সালা গ্রহণকারী-একমাত্র বিধানদাতা, তাই মানুষের নিকট তাঁর বিধান পৌঁছানোর মাধ্যম হল এই রিসালাত বা নবুয়্যত। এ জন্যে মানব সমাজের মধ্য হতেই এক এক ব্যক্তিকে তিনি নিজ ইচ্ছানুযায়ী বাছাই করে নেন এবং এ কাজ সম্পাদনের জন্যে মনোনীত করেন। মানুষের ইতিহাসে এ ধরনের বহু মনোনীত পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে এ দুনিয়ায়। এদের মধ্যে সর্বশেষ ও পূর্ণ-পরিণত ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মাদ (স.)। তিনি কিয়ামত অবধি সমস্ত মানুষের জন্যে রাসূল।

বস্তুত নবুয়্যাত ও রিসালাত মানুষের বিবেক, বুদ্ধি চিন্তা ও কর্মের দিক দিয়ে একটি অপরিহার্য প্রয়োজন। মানুষের জীবনে যতটা প্রয়োজন খাদ্য পোশাকের, তার চাইতেও অধিক প্রয়োজন এই রিসালাতের। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে যেসব আইন বিধানের প্রয়োজন, তা সবই এই রিসালাতের মাধ্যমে পূরণ হয়েছে। আর এসব আইন বিধানের ভিত্তিতে মানুষের জীবন যতটা উন্নত মানে চলতে পারে, ততটা উন্নত মান অপর কোন বিধানের সাহায্যেই অর্জিত হতে পারে না। এখন মানুষ যদি নবুয়্যাত বা রিসালাতকে গ্রহণ না করে তাহলে নিজের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন-বিধান হয় সে নিজেই রচনা করবে, নচেত অপর কোন মানুষকে তার রচনার অধিকার দিতে হবে কিংবা বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষকে বিভিন্ন পর্যায়ের জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন-বিধান রচনার দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে অথবা প্রতিটি জন-সমাজ নতুন করে আইন-বিধান রচনার পরিবর্তে প্রচলিত রসম-রেওয়াজের আশ্রয়ে জীবন পরিচালিত করবে। এছাড়া মানুষের সামনে অন্য কোন উপায় আছে কি? কিন্তু বর্ণিত উপায়সমূহ গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টত দেখা যাবে, এর কোন একটি উপায়ও মানুষকে নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত জ্ঞানের সন্ধান দিতে সমর্থ নয়। এ কারণে মানুষ তার সীমাবদ্ধ পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে কোন সর্বজনীন, সর্বকালীন ও সর্ব মানুষের জন্যে কল্যাণকর বিধান রচনা করতে পারে না; বরং তার (মানুষের) মানসিক যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের পার্থক্যের কারণে মানব-সমাজের বিভিন্ন অংশ চরম দুর্গতি ভোগ করে আসছে যুগ যুগ ধরে। দুনিয়ায় সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের মূলে প্রধানত এ কারণটিই নিহিত।

এদিক থেকে বিবেচনা করলে মানুষকে শেষ পর্যন্ত মহান সৃষ্টিকর্তার দেয়া বিধানের নিকটই আত্মসমর্পণ করতে হয়- এছাড়া তার আর কোনই উপায় নেই। ইসলামের দাবী হল, মানুষের মর্যাদা রক্ষা তথা সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন যাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন-বিধান দানের অধিকার কেবল আল্লাহরই রয়েছে। রিসালত হচ্ছে এ বিধান দানের একমাত্র মাধ্যম। রাসূল তার বিশেষ ধরনের যোগ্যতা-প্রতিভা ও খোদায়ী নিয়ন্ত্রণ লাভের কারণে

www.pathagar.com

সাধারণ মানুষ থেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি আল্লাহর বিধানকে যথাযথভাবে পৌছানো ও তার বাস্তবায়নে পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করেন। তাই আল্লাহর বিধান সঠিকভাবে লাভ করতে মানুষের কোন অসুবিধে হয়নি। বস্তুত রাসূলের উপস্থাপিত বিধানে সর্বশ্রেণী মানুষের এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন-কানুন বর্তমান। মানব জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগে সামঞ্জস্য রক্ষা করা কেবলমাত্র এই রাসূল-বিশ্বাসের সাহায্যেই সম্ভবপর।

রিসালাত বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তওহীদী আকীদার আর একটি অপরিহার্য দিক হল পরকাল বিশ্বাস। বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতি আধ্যাত্মিক কাঠামোর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল আল্লাহর নিকট জবাবদিহীর সন্দেহাতীত বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই মানুষের চিন্তা ও কর্মকে পবিত্র ও নির্দোষ করে তোলে। মানুষ এর তাগিদেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ-ভীতি ও তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। এক পরিপূর্ণ চিন্তা-ব্যবস্থা ও যুক্তিধারার ওপর ভিত্তিশীল হচ্ছে এই আকীদাটি। মানুষের নৈতিক সুস্থতার জন্যে এর মত প্রভাবশীল দৃঢ় ভিত্তি আর কিছুই হতে পারে না। এ আকীদার মূল কথা হল, মানুষ প্রতিটি বিষয়ের জন্যে নিজেকে দায়িত্বশীল মনে করবে। কোনরূপ বাহ্যিক চাপ, প্রলোভন ও লালসা ছাড়াই মনের ঐকান্তিক তাগিদে সে আল্লাহর বিধান পালন করে চলবে। এই হল পরকাল বিশ্বাসের লক্ষ্য।

মানবতার সম্মান

ইসলামী সংস্কৃতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল মানবতার সম্মান। মানুষ মানুষ হিসেবেই সম্মানার্হ। মানবতার এই সম্মান নির্বিশেষ-পার্থক্যহীন। মানুষে মানুষে নেই কোনরূপ তারতম্য। উচ্চ-নীচ ও আশরাফ-আতরাফের বিভেদ মানবতার পক্ষে চরম অপমান স্বরূপ। সমাজের সব মানুষই সমান মর্যাদা ও অধিকার পাওয়ার যোগ্য। সুতরাং আইনের দৃষ্টিতেও কোনরূপ পার্থক্য ও বৈষম্য করা চলতে পারে না। ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চ পদাধিকারী ও নিম্নপদস্থ কর্মচারী, গ্রামবাসী ও শহরবাসী, নারী আর পুরুষ- ইত্যাদির মধ্যে কোনই পার্থক্য বা বৈষম্য স্বীকৃতব্য নয়। ইসলামী সংস্কৃতি এ ধরনের কৃত্রিম ভেদ-বৈষম্যকে নিঃশেষ ও নির্মূল করে দিয়ে সব মানুষকে একই মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। বংশ, বর্ণ, ভাষা, স্বদেশিকতা, আঞ্চলিকতা, শাসন-সংস্থা এ ধরনের কৃত্রিম ভেদ-বৈষম্যকে নিঃশেষ ও নির্মূল করে দিয়ে সব মানুষকে একই মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। বংশ, বর্ণ, ভাষা, স্বদেশিকতা, আঞ্চলিকতা, শাসন-সংস্থা প্রভৃতি দিক দিয়ে মানুষের মাঝে কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করা ইসলামী সংস্কৃতির পরিপন্থী। ইসলামী সংস্কৃতিতে সব মানুষের সম্মান, মর্যাদা, অধিকার, ক্ষমতা সর্বতোভাবে সমান। এখানে পার্থক্য কেবলমাত্র একটি দিক দিয়েই করা হয়। তাহল মানুষের চিন্তা-বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনধারা। অন্য কথায়, কুফর ও ইসলাম এবং ইসলামী সমাজের তাকওয়ার বিভিন্ন মানগত অবস্থা হচ্ছে পার্থক্যের মাপকাঠি।

ইসলামী সংস্কৃতি উচ্চ-নীচের অন্যসব ব্যবধান নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। মানবতার ইতিহাসে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত এ সাম্যের কোনই তুলনা নেই। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের এ সাম্য দুনিয়ার অপর কোন সংস্কৃতিই কায়েম করতে পারেনি।

www.pathagar.com

বিশ্ব-ব্যাপকতা ও সর্বজনীনতা

ইসলামী সংস্কৃতি এক সর্বজনীন সংস্কৃতি। তা বিশেষ কোন গোত্র, বর্ণ, শ্রেণী, বংশ, কাল বা অঞ্চলের উত্তরাধিকার নয়। তার সীমা-পরিধি সমগ্র বিশ্বলোক এবং গোটা মানববংশে পরিব্যাপ্ত ও বিস্তীর্ণ। তাতে বিশেষ ভাষা বা বংশের দৃষ্টিতে কোন সংকীর্ণতার অবকাশ নেই। ইসলামী সংস্কৃতির এ হল তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর একত্ব ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর রিসালাতে বিশ্বাসী প্রত্যেক ব্যক্তিই এ সংস্কৃতির অধিকারী- সে যে ভাষাই কথা বলুক, তার গায়ের বর্ণ যা-ই হোক, সে প্রাচ্য দেশীয় হোক, কি পাশ্চাত্য দেশীয়। তার আচার-আচরণ ও জীবনযাত্রা ইসলামী ভাবধারায় পরিপুষ্ট, ইসলামী রঙে রঙীন- এটুকুই যথেষ্ট। এ কারণেই ইসলামী সংস্কৃতি ব্যাপক ও সর্বাত্মক ভূমিকার অধিকারী।

বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব

ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি হল দ্বীন রক্ত সম্পর্ক এর তুলনায় একেবারেই গৌণ। তাই এ দুটির কোন একটিকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রশ্ন উঠলে দ্বীনী সম্পর্কের দিকটিই প্রাধান্য পাওয়ার অধিকারী হবে। ইতিহাসে এ সংস্কৃতির প্রথম প্রকাশ ঘটেছে হিজরতের পরে নবী করীম রচিত সমাজ সংস্থায় বহিরাগত এবং স্থানীয় লোকদের পারস্পরিক ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। এ ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠেছিল রক্ত-সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়। ভাষার, বর্ণের বা স্বাদেশিকতার ভিত্তিতেও নয়; বরং তা গঠিত হয়েছিল একমাত্র দ্বীনের ভিত্তিতে। এরা সবাই ছিলেন একই দ্বীনে বিশ্বাসী, একই জীবনাদর্শের অনুসারী, একই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ও একই লক্ষ্য-পথের যাত্রী। হাবশার (আবিসিনিয়া) বেলাল, রোমের সুহাইব, পারস্যের সালমান, মক্কার আবুবকর, উমর (রা) ও মদীনার আনসারগণ এ আদর্শ-ভিত্তিক ও সংস্কৃতিবান সমাজে নিঃশেষে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। এভাবে একটি মানব সমাজ তার সাংগঠনিক পর্যায়ে একই সংস্কৃতির অনুসারী একটি মহান মিল্লাতে পরিণত হয়েছিল। এ মিল্লাতটি ছিল যেন একটি পূর্ণাঙ্গ মানব-দেহ। এর যে কোন অঙ্গে ব্যথা অনুভূত হলে পূর্ণ দেহটিই সে ব্যথায় জর্জরিত হয়ে উঠত। বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতির এটাই হয়ে থাকে পরিণতি।

বিশ্বশান্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

ইসলামী সংস্কৃতির পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল বিশ্বশান্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। সমাজে অকারণ রক্তপাত কিংবা বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া এবং প্রতিবেশী জাতি বা রাজ্যের সাথে নিত্য সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া ইসলামী সংস্কৃতির পরিপন্থী। যা কিছু ভালো-কল্যাণময়, তার সম্প্রসারণ এবং যা কিছু মন্দ ও ক্ষতিকর, তার প্রতিরোধই হল এ সংস্কৃতির ধর্ম। অন্যায়কে প্রতিরোধ করার জন্যে শক্তি প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে উঠলে তাকে এড়িয়ে না যাওয়াও এর বৈশিষ্ট্য। বিশ্বশান্তি স্থাপনে ইসলামী সংস্কৃতির ভূমিকা চিরকালই সুস্পষ্ট ও বিজয়দৃপ্ত। বিশ্ব-সমাজকে যুদ্ধের দাবানল থেকে মুক্ত রাখতে হলে ইসলামী সংস্কৃতির ভাবধারাই হল একমাত্র উপায়।

বিশ্ব-মানের ঐক্য

মানবতার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে হলে মানুষের পারস্পরিক ঐক্য অপরিহার্য। ঐক্য ছাড়া যেমন মানবতার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার ধারণা করা যায় না, তেমনি বিশ্বশান্তিরও বিঘ্নিত ও বিনষ্ট হওয়া অবধারিত। বিশ্ব-মানবের পরস্পরে পরিপূর্ণ ঐক্য সৃষ্টি করতে হলে চিন্তার ঐক্য বিধান সর্বপ্রথম কর্তব্য; তারপরই হল কর্মের ঐক্য ও সামঞ্জস্য। অন্যকথায়, মানব সমাজের সার্বিক ঐক্য তাদের আভ্যন্তরীণ ঐক্যের ওপর নির্ভরশীল। বস্তুত মানুষের মনন-চিন্তা ও মানসিকতার ঐক্য ও সামঞ্জস্য হচ্ছে বিশ্ব-মানবের কাংক্ষিত ঐক্যের একমাত্র উপায়।

www.pathagar.com

ইসলাম যে 'কালেমায়ে শাহাদাত' মানব-সাধারণের নিকট উপস্থাপন করেছে এবং তার যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পেশ করেছে, চিন্তার ভারসাম্য রক্ষার জন্যে তা-ই হল প্রধান হাতিয়ার। এর সাহায্যে চিন্তা-বিশ্বাস ও মননশীলতায় যে ঐক্য দানা বেঁধে ওঠে, তা-ই বাস্তব কর্মে নিয়ে আসে ঐক্যের ধারাবাহিকতা। বিরোধ ও বিভেদের সমস্ত প্রাচীর এর বন্যা-প্রবাহে চূর্ণবিচূর্ণ হতে বাধ্য। মানুষ এরই ভিত্তিতে সমান মর্যাদার অধিকারী হয়ে এক আল্লাহর বান্দাহ হয়ে ওঠতে পারে এবং মানব-সমাজের ওপর থেকে এক আল্লাহ ছাড়া অপর শক্তিগুলোর প্রভাব প্রতিপত্তি, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বকে উৎখাত করে মানুষ সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা ও অবমাননা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। তাই তওহীদ হচ্ছে মানবতার মুক্তি সনদ। শিরক হচ্ছে এর বিপরীত অশান্তি ও বিপর্যয়ের সর্বনাশা বীজ; তা মানুষকে নানাভাবে বিভক্ত করে। এসব থেকে মানুষ যখন মানসিক দিক দিয়ে পবিত্রতা লাভ করে, তখনই আসে মন ও মননশীলতার ঐক্য এবং তখন বাহ্যিক ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিক ঐক্যের সৃষ্টি করা আর কঠিন হয়ে দাঁড়ায় না। তাই এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে ইসলামে বিশেষ কর্মনীতি ও সুফলদায়ক কর্মপন্থা গৃহীত হয়েছে। বাহ্যিক ঐক্য স্থাপনের জন্যে যেখানে নামায ও হজ্বের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আন্তরিক ঐক্যবিধানের জন্যে সেখানে গৃহীত হয়েছে রোযা ও যাকাতের ব্যবস্থা। পাঁচ ওয়াকতের নামায হোক কিংবা জুম'আ ও দুই ঈদের নামায, উভয় ক্ষেত্রেই সীমিত ধার্মিকতা ও জাতীয়তার ঊর্ধ্বে ওঠে মানুষ আন্তর্জাতিকতার উদার পরিবেশে স্থান গ্রহণ করে। আর বায়তুল্লাহর হজ্জ বিশ্ব-মানবের এক পোশাকে, এক আল্লাহর দরবারে, একই ভাষায়, একই দিকে মুখ করে একই প্রকারের আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে, পারস্পরিক সহানুভূতির সাথে, এক সমাবেশের এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে জোয়ার-ভাঁটা তথা উপার্জনে কম-বেশী হওয়া এক স্বাভাবিক অবস্থারই লক্ষণ। অন্যথায় বৈচিত্রহীনতা ও একঘেয়েমীতে মানব সমাজে এক চরম অচলাবস্থা সৃষ্টির পূর্ণ আশংকা দেখা দিত। এমনকি, এর ফলে দুনিয়ার আবর্তন স্তিমিত হয়ে যেত। এ কারণে মানব জাতির বেঁচে থাকার জন্যে ব্যক্তির অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের অবাধ সুযোগ-সুবিধে থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়। একদিকে প্রয়োজন, অপরদিকে উপার্জন। এ দুয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং পরস্পরের পরিপূরক হওয়া অপরিহার্য। এ কারণেই ইসলামে যাকাত ও সাদকার সুষ্ঠু মানবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজের প্রতিটি মানুষই এ কারণে পরস্পরের সাথে সম্পর্ক রেখে চলতে বাধ্য হয়। এর দরুন ব্যষ্টি ও সমষ্টির সংযোজনে এক বৃহত্তর সমাজ গড়ে ওঠতে পারে। বস্তুত উম্মতে মুসলিমা এমনিভাবেই স্বীয় উন্নত মানের সংস্কৃতির ভিত্তিতে বিশ্বজনীন ঐক্যের পতাকা ঊর্ধ্বে উড্ডীন করতে পারে।

কর্তব্য ও দায়িত্বানুভূতি

ইসলামী মিল্লাতের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই যেমন অবহিত হতে হয় নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে, তেমনি সমষ্টির প্রতি স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও তাকে বিস্তারিতভাবে জানতে হবে। একজন অনুগত সন্তান, স্নেহময় পিতা, সহৃদয় ভাই-বোন এবং বিশ্বাসী স্বামী ও স্ত্রীরূপে প্রত্যেকেরই অধিকার এখানে সুনির্ধারিত। কর্তব্যের অনুভূতি তাকে সমগ্র জীবনভর সক্রিয় করে রাখে। অধিকার হরণ বা লঙ্ঘন তার কাছে চিরন্তন আযাবের কারণরূপে বিবেচিত। এ জন্যে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থায় পূর্ণ ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে সে বদ্ধপরিকর। এতে করে অর্থনৈতিক শোষণ ও লুণ্ঠন

www.pathagar.com

আপনা-আপনি নিঃশেষ হয়ে যেতে বাধ্য। তার ফলে এ সমাজে অর্থনৈতিক অসাম্যের কোন প্রশ্নই ওঠতে পারে না- পারে না নৈতিক চরিত্র-বিধ্বংসী প্রবণতা জেগে ওঠতে।

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে চলাও ইসলামী সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ পবিত্রতা যেমন বাহ্যিক, তেমনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। এ জন্যে ইসলাম যেমন শিরককে সম্পূর্ণ বর্জন করে চলার আদেশ করেছে, তেমনি হারাম ও অনৈতিক কর্ম-কাণ্ডকে সম্পূর্ণ বর্জন করে চলার নির্দেশ দিয়েছে। 'তাকওয়া' বা আল্লাহভীতি আধ্যাত্মিক পরিচ্ছন্নতার জন্যে অতিশয় কার্যকর হাতিয়ার। এর অনুশীলনের ফলে সমগ্র সমাজ-পরিবেশ এক পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র ভাবধারায় মূর্ত হয়ে ওঠে। এ জন্যে ইসলামী সংস্কৃতিময় জীবন ও চরিত্র নির্মল ও পবিত্র হয়ে ওঠে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে সমাজের মূল ভিত্তি প্রস্তর। এছাড়া ব্যক্তির সুষ্ঠু উন্নয়ন ও বিকাশ কখনো সম্ভবপর নয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে যে জীবন-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তাতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে সামষ্টিক স্বার্থের বেদীমূলে উৎসর্গ করা হয়েছে। সেখানে 'কমিউন' প্রথা চালু করে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও পারিবারিক জীবনের মর্যাদাকে গুরুত্বহীন করে দেয়া হয়েছে। সে সমাজের জনগণের প্রেম-ভালোবাসা, মানসিক, শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের উপায় এবং জীবন-জীবিকার উৎস হচ্ছে সরকার বা রাষ্ট্র। নারী-পুরুষ, বালক-শিশু, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল মানুষই সরকারের মালিকানা। কাজেই সরকারী নির্দেশ মেনে চলায় কোনরূপ দ্বিধা-কুণ্ঠা প্রকাশ করার একবিন্দু অবকাশ নেই সে সমাজে। জমি-জায়গা, অর্থ-সম্পদ, বিত্ত-সম্পত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুই সেখানে ব্যক্তির মালিকানা থেকে কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় সোপর্দ করা হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য হয়েছে সরকারী অর্থ শোষণের এক প্রবল হাতিয়ার। নানা বাধা-প্রতিবন্ধকতার আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী হয়ে সেখানকার জনগণ যেন জেলখানার কয়েদী। ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন নাম-গন্ধ নেই সেখানে। তার জন্যে কোন সামান্য চেষ্টা করা হলেও তা হয় বিদ্রোহের নামান্তর। পঞ্চাশ ষাটের দশকে হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লাভাকিয়ায় সোভিয়েত আক্রমণের দৃষ্টান্ত বিশ্ববাসীর চোখ খুলে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। হাজার হাজার দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাকামী সোভিয়েট ট্যাংক বহরের প্রতিরোধে এসে প্রাণ দিয়েছে। নব্য উপনিবেশবাদী সমাজতন্ত্রের সর্বগ্রাসী অভিযান তাদের স্বাধীনতা লাভের অধিকারকে নির্মমভাবে কেড়ে নিয়েছে।

পাশ্চাত্যের তথাকথিত সভ্যতা-সংস্কৃতিও জনগণকে সত্যিকার কোন স্বাধীনতা দিতে সক্ষম হয়নি। তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলোর শাসনতন্ত্রে একথা স্পষ্টাক্ষরে লেখা থাকে যে, সরকার যে কোন সময় জরুরী অবস্থা ঘোষণা কিংবা নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স জাতীয় আইনের সাহায্যে ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করতে পারে। নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্টকালের জন্যে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখার অধিকারও এ সরকারের জন্যে সুরক্ষিত। বিশেষ জরুরী অবস্থায় সমস্ত জনগণ সরকারেরই নিরংকুশ কর্তৃত্বাধীনে চলে যেতে বাধ্য হয়; তাতে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন প্রশ্ন ওঠতে পারে না। অন্যদিকে নারী-পুরুষের সমতার নামে নারীর মর্যাদা সেখানে চরমভাবে ভুলণ্ঠিত। আর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সেখানে আত্মকেন্দ্রিকতার নামান্তর বই কিছুই নয়। সেখানে কেউ কারোর জন্যে এক বিন্দু সহানুভূতি বোধ করেনা। পারস্পরিক

www.pathagar.com

প্রেম-ভালোবাসা ও সহানুভূতি কর্পূরের মতো উবে গেছে সে সমাজ থেকে। আত্মহত্যার ঘটনা সেখানে এক নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতি এ অমানবিক বন্যতার প্রশ্রয় দেয়নি। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও সমাজ-স্বার্থের মাঝে এখানে ভারসাম্যপূর্ণ এক সীমারেখা অংকিত। যার ফলে এ দুটি দিকই পরস্পরের জন্যে রহমত হয়ে ওঠে। মানুষের মৌল অধিকারে কোন বৈষম্য বা তারতম্য এখানে স্বীকৃত নয়। প্রত্যেকেরই স্থান ও মর্যাদা সুনির্দিষ্ট এখানে। এতে কমবেশী করার এতটুকুর অবকাশ নেই। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য হরণ করার অধিকার এখানে কাউকেই দেয়া হয়নি। ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপরও অকারণ সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরোপের অধিকার কারো নেই। প্রত্যেকের জন্যেই যথোচিত কাজের ও স্বীয় প্রতিভার বিকাশ সাধনের অবাধ সুযোগ এখানে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত। জনগণের সম্পদ পরিমাণে কম-বেশী হতে পারে; কিন্তু তাদের মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন অপূর্ণ থাকার কোন কারণ ঘটতে পারে না এ সমাজে।

এ পর্যায়ের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হল সর্বক্ষেত্রে ও সর্বদিকে পরম ভারসাম্য রক্ষা। বাড়াবাড়ি, সীমালঙ্ঘন, উচ্ছৃঙ্খলতা- এক কথায় সর্বপ্রকার জুলুম, অত্যাচার ও কদাচার ইসলামী সংস্কৃতিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফ এ সংস্কৃতির উজ্জ্বল দ্বীপশিখা।

ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা

বর্তমান কালে সংস্কৃতির কথা বললেই সাধারণভাবে প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, অংকন বা চিত্রশিল্প, কাব্য ও সাহিত্য চর্চা বা নৃত্যকলা, সঙ্গীত, নাট্যাভিনয় এবং অন্যান্য ললিতকলার কথা আপনা থেকেই মনের পটে ভেসে ওঠে। 'সংস্কৃতির' কথা বললে লোকেরা এসবই মনে করে বসে। কিন্তু সংস্কৃতি বলতে সত্যই কি বুঝায় কিংবা অধুনা যে সব জিনিসকে সংস্কৃতি বলে মনে করা হচ্ছে, সেগুলো সত্যই সংস্কৃতি নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য কিনা এবং এগুলো ছাড়া সংস্কৃতির আর কোন অর্থ আছে কি না, তা সাধারণত কারোরই মনেই জাগে না। এর ফলে আমরা দেখতে পাই, এগুলোকেই সাংস্কৃতিক কাজ বলে ধরে নেয়া হচ্ছে এবং এ পর্যায়ের এক-একটা কাজকে 'সাংস্কৃতি'ক অনুষ্ঠান বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে; বরং বর্তমানে তো কেবলমাত্র নৃত্য-সঙ্গীত ও নাট্যাভিনয়ই সংস্কৃতি-চর্চা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলে পরিচিতি লাভ করছে। এসবের জন্যে এ শব্দটির ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত কিনা, তা এ কালের লোকেরা একবার ভেবে দেখবারও অবকাশ পাচ্ছে না। শুধু তা-ই নয়, সংস্কৃতির নামে প্রচিলত এসব জিনিসকে আবার ইসলামী বলে চালিয়ে দিতেও অনেকে দ্বিধাবোধ করছে না।

কিন্তু আমার মনে হয়, সংস্কৃতি সম্পর্কে আমদের গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে। সংস্কৃতির নামে সমাজে যা কিছু চলছে, অবলীলাক্রমে তাকেই সংস্কৃতি বা Culture বলে মেনে নেয়া অন্তত চিন্তাশীল ও বিদগ্ধজনের পক্ষে কিছুতেই শোভন হতে পারে না। তাই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আবশ্যক।

সংস্কৃতি ঃ তাৎপর্য ও সংজ্ঞা

'সংস্কৃতি' বাংলা শব্দ। নতুন বাংলা অভিধানে-এর অর্থ লেখা হয়েছে ঃ *সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ, কৃষ্টি, Culture*। অপর এক গ্রন্থকারের ভাষায় বলা যায় ঃ *সাধারণত সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মার্জিত রুচি বা অভ্যাসজাত উৎকর্ষ*। সংস্কৃতিকে ইংরেজীতে বলা হয়

www.pathagar.com

Culture। এ শব্দটি ল্যাটিন শব্দ CALTURE থেকে গৃহীত। এর অর্থ হল কৃষিকার্য বা চাষাবাদ। তার মানে- জমিতে উপযুক্তভাবে বীজ বপন ও পানি সিঞ্চন করা; বীজের রক্ষণাবেক্ষণ, লালন-পালন ও বিকাশ-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। বিশেষজ্ঞরা Culture শব্দের অনেকগুলো অর্থ উল্লেখ করেছেন বটে; কিন্তু এ শব্দকে সাধারণত উত্তম স্বভাব-চরিত্র এবং ভদ্রজনোচিত আচার-ব্যবহার ও আচরণ অর্থেও ব্যবহার করা হয়। ললিত-কলাকেও Culture অভিহিত করা হয়ে থাকে। অশিক্ষিত ও অমার্জিত স্বভাবের লোকদেরকে Uncultured এবং সুশিক্ষাপ্রাপ্ত, সুরুচি-সম্পন্ন ও ভদ্র আচরণবিশিষ্ট মানুষকে Cultured man বলা হয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন Culture বা সংস্কৃতি বলতে একদিকে মানুষের জাগতিক, বৈষয়িক ও তামাদ্দুনিক উন্নতি বুঝায় আর অপরদিকে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষকেও সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা যায়।

এ দেশের জনৈক চিন্তাবিদ কলম-নবিশের মতে ঃ সংস্কৃতি শব্দটি 'সংস্কার' থেকে গঠিত। অভিধানে তার অর্থ ঃ কোন জিনিসের দোষ-ত্রুটি বা ময়লা-আবর্জনা দূর করে তাকে ঠিক-ঠাক করে দেয়া। অর্থাৎ সংশোধন ও পরিশুদ্ধকরণ তথা মন-মগজ, ঝোঁক-প্রবণতা এবং চরিত্র ও কার্যকলাপকে উচ্চতর মানে উন্নীতকরণের কাজকে 'সংস্কৃতি' বলা হয়। খনি থেকে উত্তোলিত কাঁচা স্বর্ণকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নকরণ এবং পরে তা দিয়ে অলংকারাদি বানানোও সংস্কৃতির মূল কাজ। ইংরেজী শব্দ Culture-এর বাংলা অর্থ করা হয় সংস্কৃতি। মূলত সংস্কৃতি সংস্কৃত ভাষার শব্দ। তার সাধারণ বোধগম্য অর্থ হল, উত্তম বা উন্নত মানের চরিত্র।

অধ্যাপক Murray তার লিখিত ইংরেজী ডিক্শনারীতে বলেছেন ঃ Civization বা সভ্যতা বলতে একটি জাতির উন্নত সমাজ ব্যবস্থা বুঝায়, যাতে রাষ্ট্র-সরকার, নাগরিক অধিকার, ধর্মমত, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আইন বিধান এবং সুসংগঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান রয়েছে। আর Culture বা সংস্কৃতি হচ্ছে সভ্যতা বা Civilization- এরই মানসিক ও রুচিগত ব্যাপার। তাতে থাকা-খাওয়ার নিয়ম-নীতি, সামাজিক-সামষ্টিক আচরণ-অনুষ্ঠান, স্বভাব-চরিত্র এবং আনন্দ স্ফূর্তি লাভের উপকরণ, আনন্দ-উৎসব, ললিতকলা, শিল্পচর্চা, সামষ্টিক আদত-অভ্যাস, পারস্পরিক আলাপ-ব্যবহার ও আচরণ বিধি শামিল রয়েছে। এসবের মাধ্যমে এক একটা জাতি অপরাপর জাতি থেকে আলাদা ও বিশিষ্টরূপে পরিচিতি লাভ করে থাকে।

প্রখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক Will Duran এক নিবন্ধে Culture বা সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে ঃ 'সংস্কৃতি সভ্যতার অভ্যন্তর ও অন্তঃস্থল থেকে আপনা থেকেই উপচে ওঠে, যেমন ফুলবনের ফুল আপনা থেকেই ফুটে বের হয়ে আসে।' তাঁর মতে সংস্কৃতিতে Regimentation বা কঠোর বিধিবদ্ধতা চলে না। জাতীয় সভ্যতার প্রভাবে যেসব আদত-অভ্যাস ও স্বভাব-চরিত্র আপনা থেকে গোটা জাতির মধ্যে ছড়িয়ে থাকে, তা-ই সংস্কৃতি। জাতীয় সংস্কৃতি বলে কোন জিনিসকে জোর করে চালু করা যায় না। তা পয়দা করা হয় না, বরং আপনা থেকেই পয়দা হয়ে ওঠে। অবশ্য বিশেষ বিশেষ চিন্তা-বিশ্বাসের প্রভাবে তাতে পরিবর্তন আসা সম্ভব। প্রখ্যাত দার্শনিক কবি T. S. Eliot Culture বা সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেন ঃ 'সংস্কৃতির দুটি বড় চিহ্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ-একটি ভাবগত ঐক্য আর দ্বিতীয়টি তার প্রকাশ ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের কোন রূপ বা দিক।' তাঁর মতে সংস্কৃতি ও ধর্ম

www.pathagar.com

সমার্থবোধক না হলেও ধর্ম সংস্কৃতিরই উৎস। সংস্কৃতি রাষ্ট্র-শাসন-পদ্ধতি, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং দর্শনমূলক আন্দোলন-অভিযানেও প্রভাবিত হতে পারে। Oswald Spengler-এর মতে, একটি সমাজের সংস্কৃতি প্রথমে উৎকর্ষ লাভ করে। তারই ব্যাপকতা ও উৎকর্ষের ফলে গড়ে ওঠে সভ্যতা, যা তার প্রাথমিক ক্ষেত্র পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা ছড়িয়ে পড়ে ও সম্প্রসারিত হয়ে অপরাপর দেশগুলোর ওপরও প্রভাব বিস্তার করে বসে। কিন্তু ডুরান্টের মতে, প্রথমে রাজ্য ও রাষ্ট্র এবং পরে সভ্যতা গড়ে ওঠে আর এরই দৃঢ় ব্যবস্থাধীনে সংস্কৃতি আপনা থেকে ফুটে ওঠে। আর রুচিগত, মানসিক ও সৃজনশীল প্রকাশনার অবাধ বিকাশের মাধ্যমে সৌন্দর্যের একটা রূপ গড়ে ওঠে। তাতে গোটা জাতির ওপর প্রভাবশালী ধারণা-বিশ্বাস ও মূল্যমানের একটা প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হয়। এ পর্যায়ে আরবী শব্দ সাক্বাফাতের ব্যাখ্যাও আমাদের সামনে রাখতে হবে। তাতে সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে।

বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি বলতে যা বুঝায়, ইংরেজীতে তা-ই কালচার এবং আরবীতে তাই হল সাক্বাফাত। আরবী তাহযীব শব্দটিও এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সাক্বাফাত এর শাব্দিক বা আভিধানিক অর্থ হল ঃ চতুর, তীব্র সচেতন, তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ও সতেজ-সক্রিয়া মেধাশীল হওয়া। আরবী 'সাক্বাফ' অর্থ সোজা করা, সুসভ্য করা ও শিক্ষা দেয়া। আর আস-সাক্কাফ বলতে বুঝায় তাকে যে বল্লম সোজাভাবে ধারণ করে। আরবী হায্‌যাবা শব্দের আভিধানিক অর্থ হল 'গাছের শাখা-প্রশাখা কেটে ঠিকঠাক করা, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করে তোলা, পরিশুদ্ধ ও সংশোধন করা।' আর ইংরেজী Culture মানে কৃষিকাজ করা, ভূমি কর্ষণ করা ও লালন-পালন করা (Oxford Dictionary)। এর আর একটি অর্থ লেখা হয়েছে ঃ Intellectual Development, Improvement by (mental or pysical) Training : অর্থাৎ (মানসিক বা দৈহিক) ট্রেনিং-এর সাহায্যে মানসিক উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন।

এ তিনটি শব্দেই ঠিকঠাক করা ও সংশোধন করার অর্থ নিহিত রয়েছে। এর পারিভাষিক সংজ্ঞাতেও এই অর্থটি পুরাপুরি রক্ষিত হয়েছে।

রাগেব আলী বৈরুতী তাঁর *আস-সাক্বাফাহ* নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'সাক্বাফাহ' মানে মানসিকতার সঠিক ও পূর্ণ সংশোধন এমনভাবে যে, সংস্কৃতিবান ব্যক্তির সত্তা পরিপূর্ণতা ও অধিক গুণ-বৈশিষ্ট্যের দর্পণ হবে। ....খারাবীর সংশোধন এবং বক্রতাকে সোজা করাই হল 'সাক্বাফাত' বা সংস্কৃতি।

ইংরেজী 'কালচার' শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য পুরোপুরি সুনির্ধারিত হতে পারেনি। বিশেজ্ঞরা নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। সে সংজ্ঞাগুলো পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যশীল যেমন, তেমনি পরস্পর-বিরোধীও।

Philip Banghy তাঁর *Culture and History* নামক গ্রন্থে *Concept of culture* শীর্ষক এক নিবন্ধে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ সর্বপ্রথম ফরাসী লেখক ভলটেয়ার ও ভ্যানভেনার্গাস (Voltair and Vanvenargues) এ শব্দটির ব্যবহার করেছেন। এদের মতে, মানসিক লালন ও পরিশুদ্ধকরণেরই নাম হচ্ছে কালচার। অনতিবিলম্বে উন্নত সমাজের চাল-চলন, রীতি-নীতি, শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান শিক্ষা ইত্যাদিও এ শব্দের আওতায় গণ্য হতে লাগল। অক্সফোর্ড ডিকশনারীর সংজ্ঞা মতে বলা যায়, ১৮০৫ সন পর্যন্ত ইংরেজী ভাষায় এ শব্দটির কোন ব্যবহার দেখা যায় না।

www.pathagar.com

সম্ভবত ম্যাথু আর্নল্ড তাঁর *Culture and Anarchy* গ্রন্থে 'কালচার' পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেছেন। ....সে সময় থেকে এখন পর্যন্ত এ শব্দটি অস্পষ্টই রয়ে গেছে। এর অনেকগুলো সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থকার A. L Krochs and Kluck Halm-এর সূত্র উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, এর একশত একষট্টিটি সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। এই গ্রন্থকারের মতে এ শব্দটির এমন সংজ্ঞা হওয়া উচিত, যা মানব জীবনের সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত হবে। ধর্ম, রাজনীতি, রাষ্ট্রক্ষমতা, শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রকৌশলবিদ্যা, ভাষা, প্রথা-প্রচলন ইত্যাদিকে এর মধ্যে শামিল মনে করতে হবে; এবং মানবীয় বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা তো মতাদর্শ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মীয় বিশ্বাস, ক্ষমতা এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিসকেও এর মধ্যে শামিল মনে করেছেন। টিএস ইলিয়ট কালচার শব্দটির তাৎপর্য এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ চালচলন ও আদব-কায়দার পরিশুদ্ধতাকেই 'কালচার' বা 'সংস্কৃতি' বলে, একটু পরে তিনি বিষয়টির আরো বিশ্লেষণ করেছেন এ ভাষায় ঃ 'কালচার (সংস্কৃতি) বলতে আমি সর্বপ্রথম তা-ই বুঝি যা ভাষা-বিশেষজ্ঞরা বর্ণনা করেন; অর্থাৎ এক বিশেষ স্থানে বসবাসকারী বিশেষ লোকদের জীবনধারা ও পদ্ধতি।'

ম্যাথু আর্নল্ড তাঁর *Culture and Anarchy* গ্রন্থে শব্দটির অর্থ লিখেছেন এভাবে ঃ কালচার হল মানুষকে পূর্ণ বানাবার নির্মল প্রচেষ্টা। অন্যকথায় কালচার হল পূর্ণত্ব অর্জন। কালচার শব্দের বিভিন্ন সংজ্ঞার সমালোচনা করে তিনি বলেন যে, এগুলোকে ভালো ও চমৎকার শব্দ তো বলা যায়; কিন্তু এগুলো কালচার বা সংস্কৃতির ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্যকে যথার্থভাবে ব্যক্ত করতে পারে না। তবে তিনি Montesqueu এবং B. Wilson-এর দেয়া সংজ্ঞাকে অতীব উত্তম বলে মনে করেন আর তা হল ঃ এক বুদ্ধিমান ও সচেতন মানুষকে অধিকতর বুদ্ধিমান ও সচেতন বানানো এবং সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির উৎকর্ষ ও আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্যে অব্যাহত চেষ্টা করা। কিন্তু তাঁর মতে কালচারের এ সংজ্ঞা সঠিক নয়। তিনি মনে করেন, কালচার ধর্ম হতেও ব্যাপক অর্থবোধক। তাঁর গ্রন্থের বিশেষ ভূমিকা লেখক মুহসিন মেহদী 'কালচার' শব্দের উল্লেখ করেছেন এভাবে ঃ এ কালচার মানুষের সাধারণ জীবনধারা থেকে উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠে। কালচারের অর্থ হল মানবীয় আত্মার সাধারণ জমিনকে পরিচ্ছন্ন করা, তাকে কর্ষণের যোগ্য করে তোলা।

মুহসিন মেহদী কালচার শব্দ সম্পর্কে এমনিতর আরো বলেছেন ঃ সংস্কৃতি না যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতাকে বলা যায়, না মানুষের সত্তার অন্তর্নিহিত কামনা-বাসনাকে; বরং সত্যি কথা এই যে, তাহল সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও বৈষয়িক সৃজনশীলতার অভ্যস্ত ও প্রচলিত রূপ।

চিন্তাবিদ ফায়জী কালচার শব্দের দুটো সংজ্ঞা দিয়েছেন ঃ একটি সমাজকেন্দ্রিক, অপরটি মানবিক। একটি সংজ্ঞার দৃষ্টিতে কালচার 'তামাদ্দুন' শব্দ থেকেও ব্যাপকতর আর অপরটির দৃষ্টিতে কালচার হচ্ছে মানবীয় আত্মার পূর্ণতা বিধান।

তিনি লিখেছেন ঃ কালচার-এর দুটি অর্থঃ সমাজতাত্ত্বিক ও মানবিক।

১. কালচার হচ্ছে এমন একটা পূর্ণরূপ- যাতে জ্ঞান-বিশ্বাস, শিল্প-কলা, নৈতিক আইন-বিধান, রসম-রেওয়াজ এবং আরো অনেক যোগ্যতা ও অভ্যাস-যা মানুষ সমাজের একজন হিসেবে অর্জন করেছে-শামিল হয়েছে।
২. 'মানবীয় কালচার' হচ্ছে মানবাত্মার পরিপূর্ণ মুক্তির দিকে ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন।

www.pathagar.com

কালচার শব্দের এ নানা সংজ্ঞাকে সামনে রেখে আমরা বলতে পারি, ফিলিপ বেগবী (Philip Bagby) প্রদত্ত সংজ্ঞা অপেক্ষাকৃত উত্তম। তিনি 'কালচার'-এর সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

আসুন আমরা এ বিষয়ে একমত হই যে, 'কালচার' বলতে যেমন চিন্তা ও অনুভূতির সবগুলো দিক বুঝায়, তেমনি তা কর্মনীতি-পদ্ধতি ও চরিত্রের সবগুলো দিককেও পরিব্যাপ্ত করে।

গ্রন্থকার সমাজ জীবন, মনস্তত্ত্ব ও তামাদ্দুনকে সামনে রেখে 'কালচার' শব্দের খুবই ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন ঃ সমাজ সদস্যদের আভ্যন্তরীণ ও স্থায়ী কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতির নিয়মানুবর্তিতা ও নিরবিচ্ছিন্নতাকে বলা হয় সংস্কৃতি। সুস্পষ্ট বংশাণুক্রমের ভিত্তিতে যে ধারাবাহিকতা তা-ও এর মধ্যে শামিল।

তিনি আরো বলেছেন ঃ কোন বিশেষ কাল বা দেশের সাধারণ জ্ঞান-উপযোগী মানকেই বলা হয় কালচার বা সংস্কৃতি।

কালচার শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করায় সবচাইতে বেশী অসুবিধে দেখা দেয় এই যে, তার পূর্ণ চিত্রটা উদঘাটিত করার জন্যে মন ঐকান্তিক বাসনা বোধ করে বটে কিন্তু তার বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যে বিশেষজ্ঞরা খুব বেশী ডিগবাজি খেয়েছেন। এ কারণে অনেক স্থানেই সংস্কৃতির বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতাকে নাম দেয়া হয়েছে 'কালচার' বা সংস্কৃতি। টি. এস. এলিয়ট যথার্থ বলেছেন ঃ লোকেরা শিল্পকলা, সামাজিক ব্যবস্থা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিকে কালচার মনে করে, অথচ এ জিনিসগুলো কালচার নয়; বরং তা এমন জিনিস যা থেকে কালচার সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায় মাত্র।

সংস্কৃতি ও তামাদ্দুন

সংস্কৃতির অর্থ ও তাৎপর্যে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়ে গেছে এজন্যে যে, তাকে অপর কয়েকটি শব্দের সাথে মিলিয়ে একাকার করে দেয়া হয়েছে। যেমন তামাদ্দুন, Civilization বা সভ্যতা, সমাজ সংগঠন বা সংস্থা (Social Structure) ও ধর্মমত (Religion)। এ তিনটির প্রতিটিই যেহেতু মানুষের জীবন ও সত্তার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত, এ জন্যে অনেক সময় সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ধারণে সভ্যতা, সমাজ সংগঠন বা ধর্মের প্রভাব, ফলাফল ও কর্মনীতির প্রভাব প্রতিফলিত হয়ে থাকে। সবচাইতে বেশী গোলক-ধাঁধাঁর সৃষ্টি করেছে 'তামাদ্দুন' শব্দ। কেননা সাধারণত তামাদ্দুন ও সংস্কৃতি- এ দুটি শব্দকে একই অর্থবোধক মনে করা হয়। আর একটি বলে অপরটিকে মনে করে নেয়া হয়- একটির প্রভাবকে অপরটির ফলাফল গণ্য করা হয়। এ জন্যে সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে পৃথক করে প্রতিটির স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দান করার জন্যে প্রতিটির সীমা নির্ধারণ করা লোকদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। টি.এস. এলিয়ট এ দুঃখই প্রকাশ করেছেন। তিনি তার গ্রন্থের সূচনায় স্বীয় অক্ষমতার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন।

চিন্তাবিদ ফায়জী তামাদ্দুন-এর যে-সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাতেও সংস্কৃতি বা কালচার-এর সংজ্ঞা স্পষ্টতার হয়ে ওঠে। তিনি বলেছেন ঃ তামাদ্দুন' বলতে দুটির একটি বুঝাবে , একটি হল সুসভ্য হওয়ার পদ্ধতি আর দ্বিতীয়টি মানব সমাজের পূর্ণাঙ্গ উৎকর্ষপ্রাপ্ত রূপ।

আন্তর্জাতিক ইসলামিক কলোকিন-এর নিবন্ধকারদের মধ্যে কেবলমাত্র এম. জেড. সিদিকী কালচার-এর সংজ্ঞাদান প্রসঙ্গে সঠিক কথা বলেছেন। তিনি কালচার-এর কেবল

www.pathagar.com

সংজ্ঞাই দেননি, সেই সঙ্গে তামাদ্দুন-এর সাথে তার তুলনাও করেছেন। এ তুলনা নির্ভুল এবং এতে করে উভয়েরই সত্যিকার রূপ নির্ধারিত হতে পারে। তিনি বলেছেন ঃ 'সাক্বাফাত' বা সংস্কৃতি পরিভাষাটি দ্বারা চিন্তার বিকাশ ও উন্নয়ন বুঝায় আর তামাদ্দুন বা সভ্যতা সামাজিক উন্নতির উচ্চতম পর্যায়কে প্রকাশ করে। কাজেই বলা যায়, সংস্কৃতি মানসিক অবস্থাকে প্রকাশ করে আর সভ্যতা বা তামাদ্দুন তারই সমান প্রকাশ ক্ষেত্রকে তুলে ধরে। প্রথমটির সম্পর্ক চিন্তাগত কর্মের সাথে আর দ্বিতীয়টির সম্পর্ক বৈষয়িক ও বস্তুকেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে। প্রথমটি একটি আভ্যন্তরীণ ভাবধারাগত অবস্থা আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে বাহ্যিক জগতে তার কার্যকারিতার নাম।

ফায়জী সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা সংক্ষিপ্ত হলেও নির্ভুল। তিনি বলেছেন ঃ 'সংস্কৃতি আভ্যন্তরীণ ভাবধারার নাম আর তামাদ্দুন বা সভ্যতা হল বাহ্য প্রকাশ।'

এ পর্যায়ে মাওলানা মওদূদী যা কিছু লিখেছেন তার সারকথা হল ঃ 'সংস্কৃতি কাকে বলে তা-ই সর্বপ্রথম বিচার্য। লোকেরা মনে করে, জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, নিয়ম-নীতি, শিল্প-কলা, ভাস্কর্য ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনী, সামাজিক রীতি-নীতি, সভ্যতার ধরণ-বৈশিষ্ট্য ও রাষ্ট্র-নীতিই হল সংস্কৃতি। কিন্তু আসলে এসব সংস্কৃতি নয়, এসব হচ্ছে সংস্কৃতির ফল ও প্রকাশ। এসব সংস্কৃতির মূল নয়, সংস্কৃতি বৃক্ষের পত্র-পল্লব মাত্র। এসব বাহ্যিক রূপ ও প্রদর্শনীমূলক পোশাক দেখে কোন সংস্কৃতির মূল্যায়ন করা যেতে পারে বটে; কিন্তু আসল জিনিস হল এসবের অন্তর্নিহিত মৌল ভাবধারা। তার ভিত্তি ও মৌলনীতির সন্ধান করাই আমাদের কর্তব্য।'

টি. এস. ইলিয়ট, এম. জেড. সিদ্দীকী এবং মাওলানা মওদূদীর পূর্বোদ্ধৃত ব্যাখ্যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি হচ্ছে চিন্তা ও মতাদর্শের পরিশুদ্ধি, পরিপক্কতা ও পারস্পরিক সংযোজন, যার কারণে মানুষের বাস্তব জীবন সর্বোত্তম ভিত্তিতে গড়ে ওঠতে এবং পরিচালিত হতে পারে।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার পার্থক্য

সভ্যতা ও সংস্কৃতির মাঝে যে পার্থক্য, তা-ও এখানে সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া দরকার। গিস্‌বার্ট (Gisbert) সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রভেদ নিরূপণ করেছেন, যথা ঃ

ক. দক্ষতার ভিত্তিতে সভ্যতার পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে; কিন্তু সংস্কৃতির বিচার হয় মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক উৎকর্ষের মানদণ্ডে। সভ্যতার পরিমাণ করতে গিয়ে আমরা বাইরের উন্নতি লক্ষ্য করি, যেমন- হাতেবোনা তাঁতের তুলনায় যান্ত্রিক তাঁতের ক্ষমতা অনেক বেশী। আর শিল্পকলার ক্ষেত্রে মতভেদের কারণে কোন ভাল চিত্র কারোর দৃষ্টিতে সুন্দর, কারোর চোখে তা অসুন্দর-নিন্দনীয়।

খ. সভ্যতার অবদানগুলোকে সহজেই বোঝা যায়- উপলব্ধি করা যায়। সংস্কৃতির অবদান সাধারণ মানুষ অতো সহজে উপলব্ধি করতে পারে না। সাধারণ লোক সামান্য শিক্ষা পেলেই আধুনিক যন্ত্রপাতির কলাকৌশল ও ব্যবহার পদ্ধতি বুঝে নিতে পারে; কিন্তু কোন লোককে কবিতা বা ছবি আঁকা ভালোভাবে শেখালেই যে ঐ বিষয়ে সে দক্ষতা লাভ করবে, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

গ. সভ্যতার গতি যেমন দ্রুত, সংস্কৃতির গতি তেমন দ্রুত নয়। সংস্কৃতির গতি অনেক বাধাপ্রাপ্ত হয়; ফলে একটা থমথমে নিশ্চল ভাব দেখা যায়। কখনো বা সংস্কৃতি হয় পশ্চাদগামী।

www.pathagar.com

ঘ. সভ্যতার ক্ষেত্রে পরিণতি বা ফলাফল হল বড় কথা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিণতির বদলে কাজটা হল বড়- সেটাই হল লক্ষ্য। তাছাড়া সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা যত তীব্র, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা তত তীব্র নয়। মানুষ সৌন্দর্যকে নানাভাবে উপভোগ করতে পারে- বুদ্ধির সাধনায় নানাভাবে আত্মনিমগ্ন হতে পারে; কিন্তু সভ্যতার ক্ষেত্রে দেখি, আধুনিকতম সভ্যতার অবদান প্রাচীন আবিষ্কারকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছে।

বস্তুত ব্যক্তির সুস্থতা, সঠিক লালন ও বর্ধন লাভের জন্যে যেমন দেহ ও প্রাণের পারস্পরিক উন্নতিশীল হওয়া আবশ্যক, ঠিক তেমনি একটি জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার পুরোপুরি সংরক্ষণ একান্তই জরুরী সে জাতির সঠিক উন্নতির জন্যে। বলা যায়, সংস্কৃতি হচ্ছে জীবন বা প্রাণ আর সভ্যতা হচ্ছে তার জন্যে দেহতুল্য।

মানব জীবনের দুটি দিক। একটি বস্তুগত আর দ্বিতীয়টি আত্মিক বা প্রাণগত। এ দুটি দিকেরই নিজস্ব কিছু দাবি-দাওয়া রয়েছে- দেহেরও দাবি আছে, মনেরও দাবি আছে। মানুষ এ উভয় ধরনের দাবি-দাওয়া পূরণের কাজে সব সময়ই মশগুল হয়ে থাকে। কোথাও আর্থিক ও দৈহিক প্রয়োজন তাকে নিরন্তর টানছে; জীবিকার সন্ধানে তাকে নিরুদ্দেশ ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। কোথাও রয়েছে আত্মার দাবি- আধ্যাত্মিকতার আকুল আবেদন। সে দাবির পরিতৃপ্তির জন্যে তার মন ও মগজকে সব সময় চিন্তা-ভারাক্রান্ত ও ব্যতিব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। মানুষের বস্তুগত ও জৈবিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনার কাজ করে আর ধর্ম, শিল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন তার মনের ক্ষুধা মেটায়। বস্তুত যেসব উপায়-উপকরণ একটি জাতির ব্যক্তিদের সূক্ষ্ম অনুভূতির ও আবেগময় ভাবধারা এবং মন আত্মার দাবি পূরণ করে, তা-ই হচ্ছে সংস্কৃতি। নৃত্য ও সংগীত, কাব্য ও কবিতা, ছবি আঁকা, প্রতিকৃতি নির্মাণ, সাহিত্য চর্চা, ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস এবং দার্শনিকের চিন্তা-গবেষণা একটি জাতির সংস্কৃতির বাহ্যিক প্রকাশ-মাধ্যম। মানুষ তার অন্তরের ডাকে সাড়া দিতে গিয়েই এসব কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এগুলো থেকে তৃপ্তি-আনন্দ, স্ফূর্তি ও প্রফুল্লতা লাভ করে। দার্শনিকের চিন্তা-গবেষণা, কবিদের রচিত কাব্য ও গান, সুরকারের সংগীত- এসবই মানুষের অন্তর্নিহিত ভাবধারারই প্রকাশ করে। এসব থেকে মানুষের মন তৃপ্তি পায়, আত্মার সন্তোষ ঘটে আর এই মূল্যমান, অনুভূতি ও আবেগ উচ্ছ্বাসই জাতীয় সংস্কৃতির রূপায়ন করে।

এখানেই শেষ নয়। এই মূল্যমান, অনুভূতি-হৃদয়াবেগ এমন, যা এক-একটি জাতিকে সাংস্কৃতিক প্রকাশ মাধ্যম গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপক ছাঁটাই-বাছাই চালানোর কাজে উদ্বুদ্ধ করে। যা মূল্যমান ও মানদন্ডের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হয়, তা-ই সে গ্রহণ করে আর যা তাতে উত্তীর্ণ হতে পারে না তা সর্বশক্তি দিয়ে প্রত্যাখ্যান করে- এগিয়ে চলে। একারণে দেখতে পাই, পুঁজিবাদী সমাজ সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে না। অনুরূপভাবে সমাজতন্ত্রীরা পুঁজিবাদী ও বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা পোষণ করে তাকে নির্মূল করতে চায়। ইসলামী আদর্শবাদীদের নিকট একারণেই ইসলামী সংস্কৃতির প্রশ্ন অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

সংস্কৃতি ও ধর্ম

একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে যে,ধর্মকে যতই অস্বীকার করা হোকনা কেন, ধর্ম ও ধর্মীয় ভাবধারা মানুষের রক্ত- মাংসের সাথে ওতপ্রোত জড়িয়ে রয়েছে - গভীরভাবে

www.pathagar.com

মিলে- মিশে একাকার হয়ে আছে, থাকবেও চিরকাল। এ থেকে মানুষের মুক্তি নেই। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞান-গবেষণা এবং চিন্তা ও কল্পনার চরমোৎকর্ষ সত্ত্বেও তাকে এমন সব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, যখন ধর্মের প্রভাব অকপটে স্বীকার না করে কোনই উপায় থাকে না। এমনকি, কট্টর নাস্তিকও এমন সব অবস্থায় ধর্ম ও ধর্মীয় ভাবধারাকেই একমাত্র আশ্রয় রূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। প্রসঙ্গত একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে, যা কয়েক বছর পূর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। খবরটি ছিল এইরূপঃ একটি রুশ সামুদ্রিক জাহাজ আমেরিকার দূর-প্রাচ্যের সমুদ্র-বক্ষে ঝড়ের দাপটে টালমাটাল। এক্ষুণি বুঝি সব শেষ হয়ে যাবে। কোথাও আশার আলো চোখে পড়ছে না। এই দূরপ্রাচ্যের সমুদ্র উপকূলের কোথাও যে কোন উপসাগরের অস্তিত্ব আছে, তারও কোন প্রমাণ ছিল না। সহসা মাতাল ঝড়ে নাস্তানাবুদ জাহাজখানি বাত্যাতাড়িত হয়ে এক শান্ত পোতাশ্রয়ে ঢুকে পড়ল। সমুদ্র-বক্ষের দূরন্ত বাতাস ও উন্মত্ত গর্জন যেন কোন জাদুমন্ত্রবলে এখানে শান্ত হয়ে পড়ে আছে। ধড়ে ফিরে পাওয়া প্রাণ নাবিকেরা সোল্লাসে চীৎকার করে উঠলঃ না- খোদা (রুশ ভাষায় এ শব্দটির মানে দাঁড়ায় খোদা- প্রেরিত)। এ ঘটনাটি যেন কুরআনেরই প্রতিধ্বনি-

> উত্তাল তরঙ্গমালা যখন চারদিক থেকে তাদের পরিবেষ্টিত করে ফেলে সমাচ্ছন্ন মেঘের মত তখন তারা অতীব আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে আল্লাহকে ডাকে, তাঁরই জন্যে আনুগত্য একান্ত করে দেয়। তার পরে যখন তারা মুক্তি পেয়ে সমুদ্র কিনারে পৌঁছায় তখন তারা ভিন্ন পথে চলতে শুরু করে। *(সূরা লুকমান ঃ ৩২)*

মানুষ সমুদ্র সফরের জন্যে বড় বড় জাহাজ নির্মাণ করে মহাসাগরে অথৈ পানিতে ভাসিয়ে দেয়। তাকে চালাবার ও থামিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ শক্তিমান। কিন্তু প্রচন্ড ঝড়–তুফানের মুখে মানুষ একেবারে অক্ষম ও অসহায়। তাকে সকল শক্তি- ক্ষমতার অপারগতা ও সীমাবদ্ধতা অনিবার্যভাবে স্বীকার করে নিতে হয়। যুদ্ধ-সংগ্রামে মানুষ পূর্ণ সজ্জিত ও সশস্ত্র হয়ে ময়দানে উপস্থিত হয়। সেখানে সে তার অতুলনীয় সাহস ও বিক্রমের ওপর নির্ভর করে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার সঙ্গী-সাথী সৈনিকদের সংখ্যাও প্রতিপক্ষের তুলনায় হয় অনেক বেশী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করতে হয়। .... কিন্তু কেন? এর জবাব তালাশ করেও সে ব্যর্থ হয়। কোন সত্যিকার জবাবই সে খুঁজে পায় না। মানুষ ক্ষেতে-খামারে ও ফলের বাগানে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে রক্তকে পানি করে দেয়। সমস্ত ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা সবুজ শ্যামলে ও রসটলমল ফলের গুচ্ছে একাকার হয়ে যায়। তা দেখে তার চোখ জুড়ায়, ধড়ে পানি আসে সোনালী ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশায় বুক ভরে উঠে। কিন্তু হঠাৎ এমন ঘটনা ঘটে যায়, যার ফলে সমস্ত ক্ষেত খামার আর বাগ-বাগিচা হয় জ্বলে-পুড়ে শূন্য মাঠে পরিণত হয় কিংবা বন্যার পানিতে সব ডুবে পচে নষ্ট হয়ে যায়, ফলে তার সব আশা মাটি হয়ে যায়। কিন্তু কেন ঘটল এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা, এমন অভাবিতপূর্ব দুরবস্থা? মানুষ নিজ থেকে এর কোন জবাবই পেতে পারে না। বাহ্যিক কার্যকারণ যাই থাকনা কেন এ দুরবস্থার মূলে অন্তর্নিহিত আসল কারণ- মনের সেই আসল প্রশ্নের জবাব- মানুষ ধর্মের কাছ থেকেই জানতে পারে। তাই ধর্ম মানুষের প্রকৃত আশ্রয় জীবনের তিক্ত বাস্তবতা এবং তার রঙীন স্বপ্নের মাঝে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে, তখন ধর্ম এসে তাকে দেয় সান্ত্বনা, অসহায়ের সহায় হয়ে দাঁড়ায় এই ধর্মবিশ্বাস। বস্তুত জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সব আবেগ-

www.pathagar.com

অনভূতি ব্যথা বেদনা ও দাবি দাওয়ার সত্যিকার জবাব হচ্ছে এই ধর্ম। জীবনের গতিধারাকে ধর্ম ও নৈতিকতার নিয়ম-বিধি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করতে মানুষ বাধ্য হয়। মানুষের সমস্ত চাল-চলনকে নিয়ন্ত্রিত ও সুষ্ঠু পথে পরিচালিত করার ব্যাপারে ধর্ম একটি সক্রিয় উদ্বোধক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এ উদ্বোধক শক্তিই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করে তোলে। আর এভাবেই সংস্কৃতির প্রশ্নে ধর্মের গুরুত্ব অনস্বীকার্য হয়ে উঠে। সমাজকে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক জীবনকে সুসংহত, সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করে, তার মধ্যে জাগিয়ে দেয় এক গভীর ও সূক্ষ্ম আবেগ। এ হৃদয়াবেগই হল সংস্কৃতির উৎসমূল আর এ কারণেই মানব জীবনে ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি কিংবা সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের আলোচনা অপরিহার্য হয়ে ওঠে: বরং ধর্মের প্রেরণায় যে সংস্কৃতি পরিপুষ্ট তা যেমন হয় সুদৃঢ়ভিত্তিক, তেমনি হয় স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন ও মলিনতাহীন-জঘন্যতা, অশ্লীলতা ও বীভৎসতামুক্ত। তার শিকড় হয় মানুষের মন-মগজ, স্বভাব-চরিত্র ও আচরণের গভীরে বিস্তৃত ও প্রসারিত।

ম্যাথু আর্ণল্ডের মতে, সংস্কৃতি ধর্ম হতেও ব্যাপকতর অর্থবোধক; বরং তাঁর মতে, ধর্ম সংস্কৃতিরই একটা অংশ। অধিকাংশ মনীষীর মতে, সংস্কৃতি ও ধর্ম পর্যায়ে এ-ই হল একমাত্র কথা। ফায়জী *'ইসলামিক কালচার'* গ্রন্থে এ মতটি প্রকাশ করেছেন এ ভাষায়: 'ধর্ম,ভাষা, বংশ, দেশ এসবের ভিত্তিতে সংস্কৃতির রকমারি আঙ্গিকতা গড়ে ওঠে'।

আর এ কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠতে পারে, যদি সংস্কৃতির সংজ্ঞার সাথে সাথে ধর্মের সংজ্ঞাও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং এ দুয়ের প্রভাব-সীমা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দেয়া হয়। কিন্তু তবু সংস্কৃতি ও ধর্মের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে একটা অসুবিধে থেকে যাবে।কেননা সংস্কৃতির সংজ্ঞা দেয়া একটা কঠিন ব্যাপার, এ থেকে মুক্তি পাওয়া খুব সহজসাধ্য নয়। *'ইন্সাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ান এ্যান্ড এথিক্'*-এর প্রবন্ধকার ধর্মের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের বিবিধ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এখানে আমরা কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করবো। কিন্তু তার পূর্বে উক্ত প্রবন্ধকারের একটা কথা পেশ করা আবশ্যক। সি. সি. জে. ওয়েব (C.C.J. Webb) ধর্মের সংজ্ঞাদান প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

ধর্মের কোনো সংজ্ঞা দেয়া যেতে পারে, ব্যক্তিগতভাবে আমি তা মনে করি না। তা সত্ত্বেও ধর্মের অনেক সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে।

১. Religion is a belief in super-natural being (E.R Tylor)[ধর্ম হল অতি-প্রাকৃতিক সত্তাকে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা।]
২. A Religion is a unified system of belief and practices relatives to sacred things that is to say, things set apart, and forbidden-believes and practices while unite into one single moral community called a church. (Durkhem) [ধর্ম আকীদা ও আমলের এমন এক সমন্বিত ব্যবস্থা, যার সম্পর্ক হচ্ছে পবিত্র জিনিসগুলোর সঙ্গে-সেসব জিনিস, যেসবকে বিশিষ্ট গণ্য করা হয়েছে আর যা নিষিদ্ধ। আকীদা ও আমল, যা নৈতিক দিক দিয়ে একটি সুসংগঠিত কেন্দ্রিকতার সৃষ্টি করতে পারে-যাকে 'উপাসনালয়' বলা হয়।]
৩. Religion is man's faith in a power beyond himself whereby he seeks to satisfy his emotional needs and gains stability of life and which he expresses in acts of worship and service. (ধর্ম অর্থ

www.pathagar.com

ব্যক্তির অলৌকিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, এমন শক্তি যার কাছ থেকে সে তার আবেগ-কেন্দ্রিক মুখাপেক্ষিতা ও ফায়দা লাভের প্রয়োজন পূরণ করতে চায় আর জীবনের স্থায়িত্ব, যাকে সে পূজা-উপাসনা ও সেবামূলক কাজ রূপে প্রকাশ করে।)

W.D. Gudry তার *Religion* নামক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ধর্মকে সুনির্দিষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেনঃ ধর্ম যেহেতু মানবজীবনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে, এ কারণে প্রতিটি মানুষ স্বীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধর্মের সংজ্ঞা দিয়েছে। যেমনঃ ধর্ম হল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ভালোভাবে জীবন যাপন করাই ধর্ম, আভ্যন্তরীণ গভীর অভিজ্ঞতারই একটা বিভাগ ধর্ম ইত্যাদি।

এ অধ্যায়ে ধর্ম সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে বলতে হবে, ধর্ম হচ্ছে ঃ

১. বিশ্বলোক সম্পর্কে একটা চিন্তা-পদ্ধতি, মানুষও তার মধ্যে গণ্য।
২. ধর্ম হচ্ছে একটা কর্ম-পদ্ধতি।
৩. ধর্ম হচ্ছে অনুভূতির একটা পন্থা।

'আমরা বলতে পারি, ধর্মে একটা চিন্তা, নৈতিকতা ও অভিজ্ঞতার দিক রয়েছে; বরং বিষয়গতভাবে বলতে গেলে প্রতিটি ধর্মেরই একটা আকীদা, একটা নৈতিক বিধান ও একটা নিয়ম-শৃংখলা রয়েছে।' (উক্ত বইয়ের ৬ পৃ.)

ধর্মীয় ভাবধারার বিশ্লেষণ করে এ গ্রন্থকার লিখেছেন:

ধর্মে সাধারণত এ তিনটি বিষয় আলোচিত হয়:

১. দুনিয়ার অস্তিত্ব কেমন করে হল, কোথায় এর পরিণতি? এ দুনিয়ায় মানুষের স্থান কোথায়, মর্যাদা কি? এবং মৃত্যুর পর কি হবে?
২. কথাবার্তা ও কর্মনীতি সম্পর্কে সেসব জরুরী আইন-বিধান, যা না হলে কোন সমাজই মজবুত ও সুদৃঢ় হতে পারে না।
৩. আরাধনা-উপাসনা, যা ছাড়া আল্লাহ ও বান্দাহর মাঝে কোন সম্পর্ক স্থাপিত হতে ও রক্ষা পেতে পারে না।

গ্রন্থকারের মতে, অনেক সময় এ তিনটির সমন্বিত নামই ধর্ম আবার অনেক সময় এর একটিমাত্র দিককেই ধর্ম বলা হয়। এতে একথা সুস্পষ্ট যে, গ্রন্থকারের মতে ধর্ম অত্যন্ত ব্যাপক বিষয়, তিনি অকুণ্ঠিতভাবে এটা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন ঃ ধর্ম মানব জীবনের একটা বিভাগমাত্র নয়; বরং তা সমগ্র জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে।

ধর্মের এ বিভিন্ন সংজ্ঞার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এর সংজ্ঞাদান পর্যায়ে কোন স্থায়ী ও চূড়ান্ত কথা বলা যেতে পারে না। কেউ কেউ একে জীবনের সমগ্র দিকব্যাপী বিস্তৃত মনে করে, আবার কেউ মনে করে জীবনের একটা দিক মাত্র।

ক. ধর্ম জীবনের একটি দিকমাত্র হলে তা সংস্কৃতির সমার্থবোধক হয়ে যায় আর তার একটা অংশও।

খ. ধর্ম যদি মানুষের সমগ্র জীবনকে শামিল করে, তাহলে সংস্কৃতি ধর্মের একটা অংশ হবে। কেননা ধর্ম মানুষের চিন্তা ও কর্ম উভয় দিকব্যাপী বিস্তৃত হয়ে থাকে আর সংস্কৃতির আওতা হচ্ছে শুধু চিন্তাগত বিকাশ ও উৎকর্ষ। ধর্মের এ ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা অপর কোন ধর্ম সম্পর্কে সত্য হোক আর না-ই হোক, ইসলাম সম্পর্কে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এজন্যে কুরআন মজীদে ইসলামকে 'দ্বীন' বলা হয়েছে। আর 'দ্বীন' হচ্ছে সমগ্র জীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ বিধান। মানব জীবনের সবকিছুই

www.pathagar.com

> তার মধ্যে শামিল রয়েছে; জীবনের কোন একটি দিকও- কোন একটি ব্যাপারও- তার বাইরে নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ
> আল্লাহর নিকট সত্য ও গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে একমাত্র ইসলাম।
>
> তা এক মজবুত ও সুদৃঢ় জীবন ব্যবস্থা– ইব্রাহীমের অনুসৃত জীবন আদর্শ। তাতে একবিন্দু বক্রতা নেই আর ইব্রাহীম মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।
> *(সূরা আন'আম ঃ ১৬১)*

বস্তুত ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানব জীবনের এ বিশাল ও বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে পথ-প্রদর্শনের জন্যে চিন্তার দিক হল সংস্কৃতি। ইসলাম সভ্যতা ও সংস্কৃতি -তাহ্‌জীব ও তামাদ্দুন– উভয় দিকেরই সমন্বয়। এ কারণেই ইসলামের মনীষীগণ ইসলামী সংস্কৃতি ও ইসলামী সভ্যতা– এ দুটি পরিভাষাই ব্যবহার করেছেন; কেননা এ দুটি দিকই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত।

ধর্ম ও শিল্পকলা

সংস্কৃতি পর্যায়ের আলোচনায় শিল্পকলার প্রশ্নটিও সামনে ভেসে ওঠে। মানুষ দুনিয়ার জীবনে অতি-প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য হয়। প্রতিমা, প্রতিকৃতি, কারুকার্যখচিত চিত্রকলা, আনন্দ-উৎসবের অনুষ্ঠানাদি, জন্ম-মৃত্যু, কুরবানী ইত্যাদি সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি মানুষকে অতি-প্রাকৃতিক শক্তির অতি নিকেটে পৌঁছে দেয় : তার হৃদয়াবেগকে সঞ্জীবিত ও প্রাণচঞ্চল করে তোলে। মৃত্যুর শেষ ক্রিয়াদিতে মাতম করা, গীত গাওয়া, মর্সীয়া, কবিতা ও শোক-গাঁথা পাঠ করা প্রভৃতির মাধ্যমে মৃতকে পরকাল যাত্রায় প্রস্তুত করে দেয়া হয়। প্রাচীন মিশরে লাশগুলোকে মমি বানিয়ে রাখা এবং লাশের চারপাশে নানা চিত্র অংকন করা হতো আর এভাবে সম্পন্ন করা হতো এক জগত থেকে অন্য জগতের মহাযাত্রা। অনুরূপভাবে বড় বড় সমাবেশে নৃত্য ও সঙ্গীতের সাহায্যে ধর্ম প্রচার করা হতো। বর্তমানে খৃস্টান গীর্জায় সঙ্গীত গেয়ে এবং হিন্দু ও শিখ ধর্মে বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে পূজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। এভাবে নানারূপ শৈল্পিক প্রকাশনার মাধ্যমে বহু মানুষের সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলা হয় : মানুষ একাত্ম হয়ে ওঠে এসবের প্রভাবে। কাজেই সংস্কৃতির সাথে শিল্পের যে নিবিড় সংযোগ রয়েছে, তা মানতেই হবে। তবু তাতেও ধর্মের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় ও বর্জনীয় ছাঁটাই-বাছাই চলা একান্তই বাঞ্ছনীয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা

জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চায় সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শনের গুরুত্বও অনস্বীকার্য। শিল্পদৃষ্টি মানুষের মাঝে পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং পরিবেশ অধ্যয়নের উদ্বোধন জাগায়। বৈজ্ঞানিক চেতনার রূপায়নে শিল্পের সাহায্যে প্রত্যক্ষ। এমনিভাবে বিজ্ঞানের উৎকর্ষে পরোক্ষভাবে শিল্পের উন্নতির পথও সুগম হয়। যে কোন জিনিস সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলে সাংস্কৃতিক বন্ধনের কথা অবশ্যই সামনে রাখতে হবে।

সংস্কৃতির মূল্যায়ন

মানুষের পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের মধ্যেই নিহিত আছে মানব জীবনের পরম কল্যাণ। মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে যখন কামনা-বাসনা, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি ইত্যাদি নিম্নতর বৃত্তিগুলোকে

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রিত করে, তখনই তার আত্মবিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি মানব জীবনের পরম কল্যাণ লাভের পক্ষে সহায়ক। যে ব্যক্তি সংস্কৃতিবান সে তার প্রকৃতি বা স্বভাবকে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করার জন্যে যত্নবান হয়। জ্ঞানের অধিকারী হওয়া বা সুন্দর গুণের অধিকারী হওয়াই সংস্কৃতি নয়; সত্য মহান ও সুন্দরের প্রতি যে ব্যক্তি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ অর্জন করেছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতিবান ব্যক্তি। প্রকৃতি ও মানুষের জীবনে যা কিছু সুন্দর, তার প্রকৃত তাৎপর্য বা মূল্য উপলব্ধি করতে তিনিই সক্ষম। কাজেই পার্থিব জগতের মাপকাঠিতে তিনি যদি দীন ও নিঃস্বও হন, তবু প্রকৃতপক্ষে তিনি এক মহান সম্পদের এক অতুল বৈভবের অধিকারী।

বস্তুত জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয় মূল্যবোধের সৃষ্টি ও মূল্যাবধারণের প্রচেষ্টা থেকেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোর উৎপত্তি ঘটে থাকে। বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিকতা ও সৌন্দর্য সম্পর্কীয় মূল্যগুলোর সমন্বয় থেকেই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর উদ্ভব হয়। অবশ্য সমাজ ও সমাজ-আদর্শ ভেদে এই মূল্যের যে পার্থক্য ঘটে, সংস্কৃতির মূল্যায়নে একথা স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে।

সংস্কৃতির সামাজিক মূল্যায়ন মানুষ ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেকে মানুষের তুলনায় সমাজকেই বড় করে দেখেন। কিন্তু এ সত্য কোনক্রমেই ভুলে যাওয়া চলে না যে মানুষ নিয়েই সমাজ, মানুষকে বাদ দিয়ে সমাজের কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই। মানুষের প্রকৃতিকে উন্নত করাই সমাজের লক্ষ্য। ম্যাকেঞ্জী (Mackenzie) Culture বলতে এই ব্যষ্টিগত ব্যক্তিত্বের (Individual Personality) অনুশীলনকেই বুঝেছেন। শিক্ষার ব্যাপকতর এবং সংকীর্ণতর দু'ধরনের তাৎপর্য আছে। ব্যাপকতর অর্থে শিক্ষা বলতে যা বুঝায়, তা-ই হল সংস্কৃতি। ম্যাকেঞ্জী বলেন ঃ সংকীর্ণ অর্থে এ হল জন-সমাজের জীবনে দীক্ষা লাভ করা আর ব্যাপকতর অর্থে এ হল মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে উন্নত করা, যার জন্য সমাজ জীবন হল একটি উপায় মাত্র।

বস্তুত সংস্কৃতি এমন একটা কর্মোপযোগী সত্য যা মানুষের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট সাহায্য করে। সংস্কৃতি মানুষকে এক আপেক্ষিক দৈহিক প্রশস্ততা দান করে। তার ফলে মানুষের ব্যক্তিত্বে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুভূতি জাগে। ব্যক্তিত্বের একটা সম্প্রসারণ-যাতে রয়েছে চাঞ্চল্য ও গতিশীলতা–মানুষকে এমন অবস্থায় সাহায্য করে, যখন নিছক একটা রক্ত-মাংসের দেহ কোন কাজেই আসে না।

সংস্কৃতি সমাজবদ্ধ মানুষের ফল। মানুষের ব্যক্তিগত সত্তা ও কর্মশক্তিকে তা ব্যাপক, গভীর ও প্রশস্ত করে দেয়। তা চিন্তার ক্ষেত্রে এনে দেয় গাম্ভীর্য, শালীনতা ও সুসংবদ্ধতা, দৃষ্টিকে বানিয়ে দেয় উদার, বিশাল ও সুদূরপ্রসারী। অন্যান্য জীবজন্তু এ গুণ-বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত। মানুষের ব্যক্তিগত যোগ্যতা-ক্ষমতা-প্রতিভার সামাজিক ও সামষ্টিক রূপ এবং পারস্পরিক চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তিই হয় এসব অবস্থার উৎসমূল।

সংস্কৃতি ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সুসংগঠিত সমাজ গড়ে তোলে আর সে সমাজগুলোকে এক অন্তহীন জীবন-ধারাবাহিকতা প্রদান করে। সংগঠন ও সুসংবদ্ধ সমাজ-কর্ম হচ্ছে ক্রমিক ও ধারাবাহিক ঐতিহ্যের ফসল আর তা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকে। সংস্কৃতি মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতেও বহু তাৎপর্য পরিবর্তন সূচিত করে। তা মানুষের প্রতি কেবল দয়াই করে না, সেই সঙ্গে তার ওপর অনেক বড় বড় দায়িত্বও চাপিয়ে দেয়। এসব দায়িত্ব পালনের জন্যে ব্যক্তিকে তার নিজের অনেক স্বাধীনতাও কুরবানী দিতে

www.pathagar.com

হয়; সে আত্মস্বার্থ বিসর্জন দেয় নিজের ভিতর থেকে পাওয়া প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয় আর তারই ফলে সম্পাদিত হতে পারে সামগ্রিক কল্যাণ।

মানুষকে নিয়ম-শৃঙ্খলা, আইন-কানুন ও ঐতিহ্যের প্রতি অবশ্যই সম্মান দেখাতে হয়; নিজের স্বভাব-চরিত্র ও কথাবার্তার ধরন-ধারণ এক বিশেষ ছাঁচে ঢেলে গড়ে নিতে হয়। তাকে এমন অনেক কাজই আঞ্জাম দিতে হয় যা থেকে সে নিজে নয়–পুরোপুরি অন্যরাই ফায়দা লাভ করে আর তাকে নিজের প্রয়োজনের জন্য হতে হয় অন্যের দারস্থ।

মানুষের দূরদৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ শক্তি তার মনের মাঝে অনেক প্রকার কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেয়। ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এবং সাহিত্য ও শিল্পকলা তাকে করে প্রশমিত–পরিতৃপ্ত।

সংস্কৃতি প্রকৃতপক্ষে মানব আত্মারই পরিতৃপ্তির উপকরণ আর তারই দরুন মানুষ পশুর স্তর থেকে অনেক উর্ধে ওঠে এক উন্নত মানের বিশিষ্ট সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করে।

মানবীয় ব্যক্তিত্বের অনেকগুলো দিক। একদিকে সে এক ব্যক্তি, একটা সমাজের অঙ্গ বা অংশ আর সমাজ গড়ে ওঠে মানুষের পারস্পরিক মেলা-মেশা, আদান-প্রদান ও সম্পর্ক-সম্বন্ধের বন্ধনের ফলে। এরূপ একটি পারস্পরিক সহযোগিতা-ভিত্তিক সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা সংরক্ষণের জন্যে দায়ী হয়, অতীতের স্মৃতি তার মনে-মগজে ও হাড়ে-মজ্জায় মিশে একাকার হয়ে থাকে। সে স্মৃতির প্রতি তার হৃদয়ে থাকে অটুট মমতা। কিন্তু সেই সঙ্গে সে ভবিষ্যতকে ভুলে যেতে পারে না। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আলোই তার মনে আশা-আকাঙ্ক্ষার বিচ্ছুরণ ঘটায়। শ্রমের বন্টন ও ভবিষ্যতের অপরিসীম সম্ভাবনা তার সামনে এমন সব সুযোগ এনে দেয়, যার দরুন সে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ, সুর ও ধ্বনি থেকে আনন্দ লাভ করতে ও পরিতৃপ্ত হতে পারে।

মোটকথা, মানুষের জীবনকে বাদ দিয়ে কোন সংস্কৃতির ধারণা করা যায় না আর ধর্ম ও সংস্কৃতি দুটিই জীবন-কেন্দ্রিক। জীবন-নিরপেক্ষ সংস্কৃতি অচিন্তনীয়। অন্যদিকে সমাজ-জীবনকে জড়িয়ে নিয়েই ঘটে সংস্কৃতির বিকাশ ও রূপান্তর। তাই সামাজিক আদর্শ ভিন্ন হলে সমাজ-সংস্কৃতিও ভিন্ন হতে বাধ্য।

সংস্কৃতির মৌল উপাদান

সংস্কৃতির সংজ্ঞাদান যেমন কঠিন, তেমনি কঠিন তার মৌল উপাদান নির্ধারণ। কেননা কোন জিনিসের মৌল উপাদান নির্ধারণ তার মৌলিক ধারণা ও তাৎপর্যের ওপর নির্ভরশীল। সংস্কৃতি বলতে যদি মানব জীবনের যাবতীয় কাজ বুঝায়, তা হলে শিল্প-কলা, সমাজ-সংস্থা, আদত-অভ্যাস, রসম-রেওয়াজ এবং ধর্মচর্চা প্রভৃতি সবই তার মৌল উপাদানের মধ্যে শামিল মনে করতে হবে। আর তার অর্থ যদি হয় বিবেক-বুদ্ধি ও মানসিকতার পরিচ্ছন্নতা বিধান এবং তার লালন ও বিকাশদান, তাহলে তার মৌল উপাদান হবে মতাদর্শিক ও চিন্তামূলক। ওপরে সংস্কৃতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা এই শেষোক্ত দৃষ্টিকোণকে গুরুত্ব দিয়েছি। একারণে আমাদের মতে সংস্কৃতির মৌল উপাদান হবে মানসিক ও বিবেক-বুদ্ধি সংক্রান্ত। এক কথায় বলা যায়, নিম্নলিখিত বিষয়গুলোই সংস্কৃতির মৌল উপাদান হতে পারে ঃ

১. মানুষের জীবন ও জগত সম্পর্কিত ধারণা-দুনিয়া কি, মানুষ কি এবং এ দুয়ের মাঝে সম্পর্ক কি? দুনিয়ার জীবন কিভাবে যাপন করতে হবে?

www.pathagar.com

২. মানব জীবনের লক্ষ্য কি, কোন্ উদ্দেশ্যকে সামনের রেখে মানুষ চেষ্টা-সাধনা করবে, কি তার কর্তব্য?
৩. মানুষের জীবন ও চরিত্র কোন্ সব বিশ্বাস ও চিন্তার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে? মানুষের মানসিকতাকে কোন্ ছাচে ঢেলে গড়তে হবে? উদ্দেশ্য লাভের জন্য মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা ও সাধানা করবে কোন্ কারণে, কে তাকে উদ্বুদ্ধ করবে এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে?
৪. মানুষকে কোন্ সব গুণ-বৈশিষ্ট্যের ধারক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে? মানুষের আভ্যন্তরীণ গুন-গরিমা কিরূপ হওয়া উচিত?
৫. মানুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক কিরূপ হবে? পারস্পরিক এ সম্পর্ককে বিভিন্ন দিক দিয়ে কিভাবে রক্ষা করতে হবে?

এ ক'টি মৌল উপাদানের দৃষ্টিতে আমরা-এক-একটি সংস্কৃতির ভাল-মন্দ বিচার করতে পারি-বুঝতে পারি তা সুসংবদ্ধ, না অবক্ষয়মান।

আর এ ক'টি মৌল উপাদানই হচ্ছে সংস্কৃতির চিন্তাগত ভিত্তি, মৌল নীতি-ভঙ্গি এবং চিন্তার উপকরণ। এ ক'টির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণই সংস্কৃতির কাঠামো গড়ে ওঠে এবং এ ক'টির ভিত্তিতে যে বাস্তব রূপ গড়ে ওঠে, তা-ই হল সভ্যতা বা তামাদ্দুন (Civilization)। মানুষের জীবনের দুটি দিক প্রধান। একটি চিন্তা, অপরটি বাস্তব কাজ। চিন্তা হল তার সংস্কৃতি আর তার বাস্তব প্রকাশ হল তার তামাদ্দুন। পরন্তু চিন্তা যেমন ভালও হতে পারে, মন্দও হতে পারে, তেমনি সংস্কৃতিও হতে পারে ভাল এবং মন্দ; বরং আরেকটু স্পষ্টভাবে বলতে পারি, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি যেমন স্থুল হতে পারে. তেমনি হতে পারে গভীরতাপূর্ণ। অনুরূপভাবে সংস্কৃতিও হতে পারে স্থুল ও গভীরতাপূর্ণ। ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুনের ভাষায় বলা যায়, মানুষের প্রকৃতির সাথে মানবীয় সংস্কৃতির সেই সম্পর্ক, যা মানুষের আদত-অভ্যাস, রসম রেওয়াজ ও সৃজনশীল গুণপনার রয়েছে মানুষের প্রকৃতির সাথে। এ কারণে সংস্কৃতি যেমন স্বভাবসিদ্ধ হতে পারে, তেমনি হতে পারে কৃত্রিম।

ইসলামী সংস্কৃতি কি?

সংস্কৃতি সম্পর্কে এ তত্ত্বমূলক আলোচনার পর আমার বক্তব্য হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে। প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামেরও কি কোন সংস্কৃতি আছে? থাকলে কি তার দৃষ্টিকোণ? কি তার রূপরেখা?

ইসলামের কোন সংস্কৃতি আছে কিনা কিংবা সংস্কৃতি সম্পর্কে ইসলাম কোন সুস্পষ্ট ধারণা দেয় কি-না, সে আলোচনা পরে করা হচ্ছে। তার আগে বলে রাখা দরকার যে, দুনিয়ার প্রখ্যাত কয়েকজন মনীষী 'ইসলামী সংস্কৃতি" বলতে কোন জিনিসকে মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, ইসলামী সংস্কৃতি আবার কি? কেউ কেউ বলেন, ইসলামের কোন সংস্কৃতি আছে না-কি? থাকলেও গ্রীক, রোমান, প্রাচীন মিশরীয়, পারসিক বা ভারতীয় সংস্কৃতিকেই ইসলামী সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু তাঁর আত্মচরিতে 'ইসলামী সংস্কৃতি' কথাটির ওপর বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি এ পর্যায়ের আলোচনায় উপমহাদেশীয় মুসলিম সমাজের কতিপয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিদ্রুপ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ 'মুসলিম সংস্কৃতিকে বুঝতে আমি যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। শেষ পর্যন্ত আমি এ সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, উত্তর ভারতের মধ্যম শ্রেণীর মুসলমান

www.pathagar.com

ও হিন্দু ফারসী ভাষা ও কিংবদন্তীতে খুবই প্রভাবিত হয়েছিল। তাদের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে জানতে পারা যায় যে, এক বিশেষ ধরনের পাজামা-না লম্বা না খাটো- বিশেষ ধরনের গোঁফ মুণ্ডন করা, দাড়ি রাখা এবং এক বিশেষ ধরনের লোটা-যার বিশেষ ধরনের থুথনি হবে, এগুলোই হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতি'। মুসলিম সংস্কৃতি তথা ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে মিঃ নেহেরুর এ উক্তি শুনে হাসবো কি কাঁদবো, ঠিক করা যাচ্ছে না।

ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদরাও (Orientalists) মিঃ নেহেরুর চাইতে কোন অংশে কম যান না। জার্মান পণ্ডিত ভন ক্রেমার ও লেবাননী পণ্ডিত ফিলিপ হিট্টিও ইসলামী সংস্কৃতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। তাদের মতে মুসলমানরা যখন পারস্য ও মিশর জয় করে, তখন তারা প্রাচীন সভ্যতার ধারক লোকদের সম্মুখীন হয় এবং তারা সবকিছু এদের কাছ থেকে শিখে নেয়। আরো বলা হয়, আরব মুসলমানদের নিজস্ব সংস্কৃতি বলতে কিছুই ছিল না। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, স্থাপত্যবিদ্যা, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাজ্য-শাসন এ সবের কিছুই জানত না মুসলমানরা। তবে এসব কিছু জানবার ও শেখবার বড় অসাধারণ যোগ্যতা ও প্রতিভা মুসলমানদের মাঝে ছিল। এ পর্যায়ে প্রাচ্যবিদরা বলেন ঃ গ্রীক, পারসিক ও আর্মেনিয়ান শিল্পকলা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পুনর্জীবন দান করে প্রথমে আরব মুসলমানরা এবং পরে দুনিয়ায় বিভিন্ন জায়গার মুসলমানরা।

পণ্ডিত নেহেরুই হোক আর প্রাচ্যবিদ এসব বড় বড় পণ্ডিতরা, এরা কেউ-ই যে ইসলামী সংস্কৃতিকে বুঝতে পারেননি, তা বলাই বাহুল্য। আর ইসলামী সংস্কৃতিকে বুঝতে না পারার মূল কারণ যে ইসলামের প্রকৃত ভাবধারাকে বুঝতে না পারা, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। অথবা বলা যায়, তারা জেনে শুনেই ইসলামী সংস্কৃতিকে বিদ্রুপ করেছেন, তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন কিংবা এ -ও হতে পারে যে, তারা একটি ছিদ্র দিয়ে ইসলামকে দেখার চেষ্টা করেছেন বলেই তাদের ধারণা এতদূর বাঁকা ও অর্থহীন হয়ে গেছে যে, তাঁরা টেরই পাননি।

কেবল প্রাচ্যবিদরাই নন-নয় কেবল প্রাচীন পণ্ডিতদের কথা, ইসলামী সংস্কৃতিকে অস্বীকৃতি জানাতে কসুর করেননি এ যুগের এবং এ দেশের প্রতিবেশী অমুসলিম জাতিও। শুধু তা-ই নয়, তাদের ধ্যান-ধারণায় প্রভাবিত ও ইউরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞানে পারদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তিরা এবং তথাকথিত মুসলিম নামধারী লেখকরাও ইসলামী সংস্কৃতিকে- সংস্কৃতির ইসলামী ধ্যান-ধারণাকে তথা ইসলামী রূপরেখাকে বুঝতে পারেননি; হয়ত বা বুঝতে চেষ্টাই করেননি অথবা বুঝতে চাননি কিংবা বলা যায় বুঝতে পেরেও তাকে অস্বীকারই করতে চেয়েছেন। কেননা অস্বীকার না করলে কিংবা তাকে সংস্কৃতি বলে স্বীকৃতি দিলে সংস্কৃতির নামে চলমান বর্তমানের আবর্জনা, অশ্লীলতা ও জঘন্যতাকে পরিহার করতে হয়। আর তাকে পরিহার করলে জীবনের আনন্দ-স্ফূর্তির উৎসই যে বন্ধ হয়ে যাবে-মৌচাক যাবে শুকিয়ে। তখন জীবন যে যাবে মরু আরবের মত ঊষর-ধূসর-রুক্ষ -নিরস হয়ে। তখন বেঁচে থাকার স্বাদটুকুও যে নিঃশেষ হয়ে যাবে; ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, ইসলামের জীবন-স্রোতে ভাসতে হবে, জীবনের গতি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে, বইতে হবে ভিন্ন স্রোত-বেগে আর তা তাদের পক্ষে সহ্য করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। অতএব তাদের বলতে হয়েছে ঃ

'স্থূলভাবে যারা ধর্মাচরণ এবং ধর্মভিত্তিক ধ্যান-ধারণার সমষ্টিকে সংস্কৃতি বা তামাদ্দুন মনে করেন অথবা আরব-পারস্যের জ্ঞান-চর্চা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকেই যারা

www.pathagar.com

মুসলিম জাহানের সংস্কৃতি বলতে চান, তাদের সঙ্গে তর্ক দুঃসাধ্য। (দৈনিক সংবাদ)
হ্যাঁ, দুঃসাধ্যই বটে! দুনিয়ার মনীষীদের মত অনুযায়ী 'ধর্মকে সংস্কৃতির উৎস', রূপের স্বীকার করে নিলে যে ধর্মকে মানতে হয়, মেনে নিতে হয় ধর্মীয় অনুশাসন, সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হয় বর্তমানে সংস্কৃতির নামে চলমান অনেক অশ্লীলতা, জঘন্যতা ও বীভৎসতার আবর্জনাকে। আর এক শ্রেণীর পোকা যে ময়লার স্তুপ ত্যাগ করলে মরে যায়, তাতো সকলেরই জানা কথা।

সংস্কৃতি ও ইসলাম

ইসলাম দুনিয়ার সকল জনগোষ্ঠীর সকল মৌল সত্যের সমষ্টি। তার সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন, সার্বজনীন ও সুদূরপ্রসারী। দুনিয়ার অন্য যেসব সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক উপাদান তার মৌল ভাবধারার অনুকূল, তা সবই সে গ্রহণ করে নেয়। বস্তুত যে সংস্কৃতিতে ইসলাম-বিরোধী উপাদান ও উপকরণ রয়েছে, তা-ই সুস্পষ্টভাবে মানবতা বিরোধী, তার সাথে ইসলামের রয়েছে চিরন্তন সংঘর্ষ। ইসলামী সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ দান কোন সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের সংরক্ষণ নয়। তাতে বরং সমগ্র মানব কল্যাণকর সংস্কৃতিই সংরক্ষিত হয় এবং তাতে করেই সমস্ত তামাদ্দুনিক সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সম্ভব হতে পারে। ইসলামী সংস্কৃতি গ্রীক সংস্কৃতি নয়- নয় তা পারসিক সংস্কৃতি। কাজেই গ্রীক বা পারসিক সংস্কৃতিকে ইসলামী সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দেয়া যেতে পারে না। ইসলামী সংস্কৃতি ইসলামী মতাদর্শের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠেছে। আল্লাহর কালাম কুরআন মজীদেই এ মতাদর্শের বিস্তারিত রূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেছে এবং নবী করীম (সঃ) এর মহান জীবন ও শিক্ষায় তা পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়েছে।

ইসলামী সংস্কৃতির গোড়ার কথা

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা আর এ জীবন ব্যবস্থার চিন্তামূলক দিকই হল ইসলামী সংস্কৃতি। তাই ইসলামী সংস্কৃতি বলতে নিম্নোক্ত তিনটি জিনিস বুঝায় ঃ

১. উন্নতর চিন্তার মান, যা ইসলামী রাষ্ট্রের কোন এক যুগে বাস্তবায়িত হয়েছিল।
২. ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান এবং শিল্পের ক্ষেত্রে ইসলামের অর্জিত সাফল্য।
৩. মুসলমানদের জীবনধারা, ধর্মীয় কাজকর্ম, ভাষার ব্যবহার ও সামাজিক নিয়ম-প্রথার বিশেষ সংযোজন।

অপর একটি চিন্তাবিদদের দৃষ্টিতে ইসলামী সংস্কৃতির দুটি অর্থ ঃ একটি তার চিন্তার দিক আর অপরটি হল সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভাষা ও সমাজ-সংস্থা। কিন্তু আমরা প্রথমটিকেই সংস্কৃতি মনে করি বলে বলা যায়, সংস্কৃতি হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের মানসিক অবস্থা, যা ইসলামের মৌল শিক্ষার প্রভাবে গড়ে ওঠে; যেমন আল্লাহর একত্ব, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মানব বংশের ঐক্য ও সাম্য সংক্রান্ত বিশ্বাস।

মানুষের চিন্তাগত জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গিতেই আলোক-উদ্ভাসিত হয় এবং গোটা মানববংশ প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে এ আলোকচ্ছটায়। আসলে ইসলামী সংস্কৃতি আলোর এক সুউচ্চ মীনার; এ থেকেই ইসলামী সভ্যতা রূপায়িত হয়। এ মীনারই সমগ্র জগতের সংস্কৃতিসমূহকে প্রভাবান্বিত করেছে, আপনও বানিয়ে নিয়েছে। #

www.pathagar.com

বুদ্ধিবৃত্তি স্বনির্ভরতা অর্জন বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রঃ)

মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলীর তাকিয়াকেলা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। ৯ বছর বয়সে নাজেমে নদওয়াতুল ইলামা তাঁর পিতা হযরত মাওলানা আব্দুল হাই ইন্তেকাল করলে তিনি তাঁর বিদূষী মাতা খায়রুননেসা এবং যোগ্য বড় ভাই ডাঃ আব্দুল আলী সাহেবের তত্ত্বাবধানে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায়ে লেখাপড়া শেষ করেন।
ছাত্রজীবনে তিনি আরবী উস্তাদগণের সাহচর্যে আরবী ভাষা এবং সাহিত্যের ময়দানে যথেষ্ট বুৎপত্তি হাসেল করেন এবং তার চিন্তাধারাকে আরব বিশ্বে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হন। শিক্ষাজীবন শেষ হওয়ার পর নদুয়ায় অধ্যাপনা শুরু করেন এবং সাথে সাথে দেশের বরণীয় উলামাদের সাহচর্য লাভে ধন্য হন। তিনি দেশের মাশায়েখ এবং বিশেষ করে হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের নেক দৃষ্টি লাভে ধন্য হয়ে দাওয়াতী ময়দানে দেশে এবং বিদেশে অনেক কাজ করেন। তিনি হযরত মাওলানা আহমাদ আলী এবং মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী (রহঃ) এর নিকট হতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন।
হযরত মাওলানা জীবনে বহু কাজ করে গেছেন। বেশ কিছু দেশী এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কারেও তিনি ভূষিত হয়েছেন। তিনি নামকরা লেখক ছিলেন। তার রচনাবলী সারা দুনিয়ায় সমাদৃত হয়েছে। তিনি ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর রায়বেরেলীতে ইন্তেকাল করেন। ১৯৮৪ সালে মাওলানা বাংলাদেশ সফর করেন। সেই সময় তিনি বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।
[১৯৮৪ সালের ১৯ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আয়োজিত দেশের বুদ্ধিজীবী ও গবেষণা কাজে নিয়োজিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণ]

এই মুহূর্তে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও আবেগাপ্লুত। আল্লাহর দরবারে লাখো শোকর যে, আজকের এই মুবারক মজলিসের মাধ্যমে আমার দশ দিনব্যাপী বাংলাদেশের সফরের শুভ পরিসমাপ্তি ঘটছে। সেই সাথে আজকের এই মজলিসে 'খিদমতে খালক' প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে।
প্রথমে আমি উপস্থিত লেখক বুদ্ধিজীবীদের, আমার সহকর্মী ও স্বগোত্রীয় বন্ধুদের খিদমতে একটি কথা আরয করতে চাই। সমগোত্রীয় এ জন্য যে, আমিও আপনাদের মতো লেখাপড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট।
আপনাদের সামনে একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন কিংবা একটি ধাঁধাঁ তুলে ধরতে চাই। আপনারা অবশ্যই জানেন হিজরি সাত শতকের

www.pathagar.com

মাঝামাঝি সময়ে একটি নতুন শক্তিরূপে তাতারীদের অভ্যুদয় ঘটেছিল। বর্বর তাতারীরা মধ্য এশিয়ার এক বিস্তীর্ণ এলাকায় বসবাস করতো। তাদের চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিমন্ডল ছিল খুবই সংকীর্ণ। হাজার বছর ধরে বদ্ধ জলাশয়ের মাছের মতো বিছিন্ন জীবনে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তারপর এক সময়ে আল্লাহর কুদরতের প্রকাশ ঘটলো। বর্বর তাতার জাতি তাদের সংকীর্ণ পরিবেষ্টন ভেঙে-চুরে এক দুর্বার গতিতে বেরিয়ে এলো। তখনকার ইসলামী সালতানাত বা মুসলিম সাম্রাজ্য ছিল সুদূর বিস্তৃত। বিশেষতঃ তুর্কিস্তানের খাওয়ারিজম শাহের সালতানাত ছিল তৎকালীন আলমে ইসলামীর বিশালতম সালতানাত। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর সামাজিক ও নৈতিক ভিত্তি মূলে পচন ধরে গিয়েছিল। সমাজের অধিকাংশ লোক অপরাধে আসক্ত হয়ে পড়েছিল। সম্পদ ও ক্ষমতা এবং বস্তুসভ্যতা ও সংস্কৃতির চোরা পথে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তাদের মধ্যে। পক্ষান্তরে সভ্যতার আলো বঞ্চিত তাতারীরা ছিল একটি প্রাণবন্ত জাতি। নবুয়তী পথ নির্দেশনা ও আসমানী শিক্ষার সাথে তাদের কোনো পরিচয় ছিল না সত্য, তবে তাদের জাতীয় চরিত্রে এমন কোনো ব্যাধিও ছিল না যা তাদের জাতীয় শক্তি ও উদ্যমে অবক্ষয় সৃষ্টি করতে পারে কিংবা অলস ও বিলাসী জীবনের প্রতি আসক্ত করে তুলতে পারে।

এমন একটি প্রাণবন্ত জাতি যখন খাওয়ারিজম সালতানাতের উপর আক্রমণ চালায় তখন খাওয়ারিজম শাহের সুশিক্ষিত বিশাল সেনাবাহিনী সে আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করতে পারলনা। মোট কথা তাতারীদের মুকাবিলা ছিল এক জরাগ্রস্ত সালতানাত ও অপরাধাসক্ত জাতির সাথে। ফল এই দাঁড়ালো যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সমন্বয়ে যে সালতানাত আলমে ইসলামের বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত হয়েছিল তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। খাওয়ারিজম সালতানাতের পতনের পর আলমে ইসলামীতে এমন কোনো শক্তি আর অবশিষ্ট ছিল না যারা তাতারীদের কিছুক্ষণের জন্য হলেও রুখে দাঁড়াতে পারে। মুসলিম উম্মাহ তখন এমন হীনবল ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, তাতারীদের মনে করা হতো আসমানী মুসীবত এবং প্রায় প্রবাদ বাক্যের মতো একথা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, "সব কিছুই বিশ্বাস করতে পারো, তবে কেউ যদি বলে যে তাতারীরা মার খেয়েছে, তবে সে কথা কিছুতেই বিশ্বাস করোনা। কেননা আকাশ ভেঙে পড়া সম্ভব কিন্তু তাতারীদের পরাজিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব।" এই ছিল সমসাময়িক আলমে ইসলামীর বাস্তব চিত্র।

বন্ধুগণ, হয়তো কিছুটা বিরক্তি বোধ করছেন যে আলেম ও বিজ্ঞজনদের এই ভাবগম্ভীর মজলিসে অসভ্য তাতারীদের প্রসঙ্গ টেনে আনার কী প্রয়োজন ছিল? বন্ধুগণ, একটি বিশেষ প্রয়োজনেই তাতারীদের প্রসঙ্গ আমি এখানে টেনে এনেছি। অনুগ্রহ করে আমাকে একটুখানি সময় দিন।

ইতিহাসের এক বড় জিজ্ঞাসা এই যে, যে তাতারী জাতি এক সময়ে গোটা আলমে ইসলামীকে পিষে মেরেছিল, সুদীর্ঘ ছয়শ বছরের ঐতিহ্যবাহী হারুনুর রশীদের বাগদাদকে বর্বরতায় কবরে পরিণত করেছিল, দজলা নদীর পানি একবার মুসলমানদের রক্তে লাল আর একবার লক্ষ-লক্ষ গ্রন্থের কালিতে নীল হয়ে গিয়েছিল, সেই জাতি কোন আশ্চর্য উপায়ে অকস্মাৎ জাতীয়ভাবে ইসলাম গ্রহণ করে বসলো। এক সময়ে আলমে ইসলামীতে জন্য যারা ছিল মূর্তিমান অভিশাপ, পরবর্তী কালে তারাই হলো ইসলামের (মুহাফিজ) রক্ষক। কীভাবে এটা সম্ভব হলো? কি কি কার্যকারণ এর পিছনে সক্রিয় ছিল? কোন উর্ধ্ব

www.pathagar.com

শক্তি ইসলামের সামনে এমন একটি নিষ্ঠুর ও শক্তি মদ-মত্ত জাতির মাথা নত করে দিয়েছিল? ইতিহাসের এটা একটা প্রশ্ন যার বস্তুনিষ্ঠ উত্তর আমাদের খুঁজে পেতে হবে। এ অভাবনীয় ঐতিহাসিক ঘটনার পিছনে মূল কারণ ছিলো দু'টি ঃ

প্রথমতঃ ইসলামী উম্মাহর অলী ও আধ্যাত্মিক বুযুর্গগণ তাতার জাতির প্রতি তাদের তাওয়াজ্জুহ ও মনযোগ নিবদ্ধ করলেন । আল্লাহর দরবারে তারা প্রার্থনার হাত তুললেন। শেষ রাতে ব্যথিত ও হৃদয়ের আহাজারিতে আল্লাহর আরশ কাঁপিয়ে দিলেন। হিকমত ও মহব্বত এবং প্রেম ও প্রজ্ঞার সাথে ইসলামের দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। আহ্‌লুল্লাহ ও আল্লাহর ওলীদের উপরোক্ত কর্ম তৎপরতার একটি দৃষ্টান্ত জনৈক ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিক তার *The preaching of Islam* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আমি আমার *তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত* গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে তা বিবৃত করেছি । অন্য একটি কার্যকারণও এর পিছনে সক্রিয় ছিল। সেই কার্যকারণটির সাথেই আজকের মজলিসের সম্পর্ক, আর এজন্যই শুধু এ মজলিসে এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি।

দ্বিতীয়তঃ শক্তির সব কয়টি উপায় উপকরণই তাতারীদের কাছে মজুদ ছিল। সামরিক শক্তি তথা মার্শাল স্পিরিটের কোনো কমতি ছিল না। শৌর্য বীর্য ও রণকৌশলেও তারা অভ্যস্ত ছিল পুরোমাত্রায়। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে তাদের দৈন্য ছিল চরম। কোনো লিটারেচার বা সাহিত্য ছিল না তাদের কাছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও কোনো ধারণা ছিল না তাদের। ছিল না কোনো উন্নত আইন ব্যবস্থা। যাযাবর জাতির মত গুটিকতক উদ্ভট আইন কানুন ছিল তাদের সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ। এমন কি যে ভাষায় তারা কথা বলতো সে ভাষার কোনো হস্তাক্ষর পর্যন্ত ছিল না তাদের কাছে । এক কথায় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উদার উপহারে সমৃদ্ধ মুসলিম ভুখন্ডের উপর যখন তাতারীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তারা একেবারেই শূন্যহস্ত ছিল। তাদের কাছে না ছিল ভাষা ও সাহিত্য, না ছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতি, আর না ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ন্যূনতম অনুশীলন।

মুসলিম লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়কগণ এ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন। তারা তাদেরকে সাহিত্য দিলেন, কাব্য দিলেন, সভ্যতা সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করালেন, আর শিখালেন জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলন। এভাবে গোটা তাতার জাতির ভেতর মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হলো। ফলে ধীরে ধীরে গোটা জাতি ইসলামের ছায়াতলে এসে আশ্রয় নিল। অর্থাৎ একদিকে আল্লাহর ওলী ও প্রিয় বান্দাগণ প্রেম ও ভালোবাসা এবং ইখলাস ও নিঃস্বার্থতা দিয়ে তাতার জাতির হৃদয় জয় করলেন, অন্যদিকে মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও চিন্তা নায়কগণ তাদের মস্তিষ্ক জয় করে নিলেন। এর অর্থ এই দাঁড়ালো যে, তলোয়ার কিংবা অস্ত্রের ধারই কোনো জাতির উপর, কোনো জাতির জন্য বিজয় লাভের একমাত্র পথ নয়। সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রধান্য লাভের মাধ্যমে একটি জাতিকে অতি সহজেই গোলাম বানানো যেতে পারে। আর রাজনৈতিক গোলামীর চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক গোলাম কোনো অংশেই কম নয়।

আমি আপনাদের একথাই বলতে চাই যে, সাংস্কৃতিক ও বৃদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে যে জাতি অন্য কারো দ্বারা প্রভাবিত সে জাতির অস্তিত্ব সর্বদাই বিপদ ও হুমকির সম্মুখীন। বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে দেউলিয়া জাতি কোনোদিন সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে দেউলিয়া জাতি অন্যের আদর্শ ও মূল্যবোধই জীবনের সকল ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

গ্রহণ করবে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাদের ধর্মমতও গ্রহণ করে বসবে। মানব জাতির ইতিহাসে এমন উত্থান পতনের ভুরি ভুরি নযীর রয়েছে।

আপনাদের খিদমতে আমি আরয করতে চাই যে, আল্লাহ পাক আপনাদেরকে দেয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য করেননি। নয় দশদিনের এ সংক্ষিপ্ত সফরে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ ভ্রমণকারী একজন সচেতন পর্যটকের দৃষ্টি নিয়ে এ জাতিকে আমি যতটুকু বুঝেছি তাতে আমার এ প্রতীতি জন্মেছে যে, মেধা ও বুদ্ধিমত্তা, সরলতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং প্রেম ও হৃদয়ের উষ্ণতার দিক থেকে এ জাতি পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির চেয়ে পিছিয়ে নেই। এ জাতির মেধা ও বুদ্ধিমত্তা যেমন স্বচ্ছ, প্রেম ও ভালোবাসাও তেমনি গভীর ও নিখাদ। কিন্তু সেই সাথে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, যদি সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে আপনারা কোনো জাতি কিংবা শ্রেণীর প্রভাবাধীন হয়ে পড়েন তবে অত্যন্ত দুঃখের সাথেই আমাকে এ কথা বলতে হবে যে, জাতি হিসাবে যে কোনো মুহূর্তে আপনাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যেতে পারে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা অর্জনও অপরিহার্য। এ ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতাও অর্থহীন হয়ে পড়ে। নিজেদের নেতৃত্ব নিজেদের হাতেই থাকা উচিত। আমি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলছি অন্য কোনো দেশের, এমন কি আপনাদের স্বভাষী, যারা কোনো প্রতিবেশী দেশে বাস করে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক গোলামী করা উচিত নয়। সর্বক্ষেত্রে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন সত্তা সমুন্নত রাখুন। আর্থিক মাশুলের মত বুদ্ধিবৃত্তিক মাশুলও মানুষকে আদায় করতে হয়। আর তা আর্থিক মাশুলের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকর ও বেদনাদায়ক।

অতএব নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক মাশুল নিজেদের দেশেই আদায় করুন। নিকটতম দেশ কিংবা শহরেও তা পাচার হতে দেয়া উচিত নয়। এদেশের অর্থ-সম্পদ বাইরে পাচার হয়ে যাওয়া যেমন ক্ষতিকর, বাইরের কোনো সমাজ থেকে চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা পাচার হয়ে আসাও তেমনি ক্ষতিকর। হ্যাঁ একমাত্র ইসলামের প্রাণকেন্দ্র হারামাইন শরীফাইন থেকে ভাব, চিন্তা ও পথ নির্দেশনা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রয়োজন হলে উপমহাদেশীয় আধ্যাত্মিক ও শিক্ষা কেন্দ্রগুলো থেকেও চিন্তা ও বৃদ্ধিভিত্তিক পাথেয় সংগ্রহ করা যেতে পারে। কিন্তু চিন্তা, বিশ্বাস এবং ঈমান ও আকীদার ক্ষেত্রে যাদের সাথে মৌলিক বিরোধ রয়েছে, সাহিত্য, কাব্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ খুবই মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনবে।

দু'টি পথে তাতারী জাতি ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। প্রথমতঃ অধ্যাত্মিক, দ্বিতীয়ঃ বুদ্ধিবৃত্তিক। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানরা ছিল তখন শীর্ষ জাতি। মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তারা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আজকের ইউরোপ তখন ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। একাডেমিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব তখন এককভাবে মুসলমানদের হাতেই ছিল। সামরিক ও রাজনৈতিক বিচারে যদিও তারা ছিল বিজিত, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে তারাই ছিল বিজেতা আর তাতারীরা ছিল বিজিত। ফলে ইতিহাসের আমোঘ নিয়মে বিজয়ী জাতিকে মাথা নত করতে হয়েছিল বিজিত জাতির কাছে। মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে আজ আমার সে আশঙ্কাই হচ্ছে। এক হিতাকাংখী ও কল্যাণকামী বন্ধু হিসাবে আপনাদের জন্য আমার পরামর্শ এই যে, নিজেদের সাহিত্য কাব্য নিজেরাই গড়ে তলুন। সংস্কৃতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে নিজস্ব স্টাইল ও রীতি গ্রহণ করুন এবং তার উৎকর্ষ সাধনে

www.pathagar.com

একনিষ্ঠ ও নিবেদিত হোন। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলছি, জাতীয় কবি হিসাবে কবি নজরুল ইসলামকেই আপনাদের তুলে ধরা উচিত। নজরুলের কাব্য ও সাহিত্যকর্ম বিশ্ব-সাহিত্য সভায় তুলে ধরুন এবং নজরুলকে নিয়ে গর্ব করুন। আপনাদের নিজেদের ভিতরেও অনেক প্রতিভা লুকিয়ে আছে সেসব প্রতিভা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করুন। নিজেদের ভিতর থেকেই স্টাইলের জন্ম দিন। নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করুন। মনে রাখবেন, এটা খুবই সংবেদনশীল ক্ষেত্র। এখানে অন্য কারো হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়। সংস্কৃতির জগতে আপনাদেরকে পূর্ণ স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। ইতিহাসের একজন সাধারণ ছাত্র হিসাবে বলছি, এ ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটলে ইতিহাস ক্ষমা করবে না। আর ইতিহাসের প্রতিশোধ বড় নির্মম।

যে কারণে আপনাদেরকে দেশ থেকে আমি আনন্দ ও আশাবাদ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি তা হচ্ছে, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপস্থিতি। বস্তুতঃপক্ষে এটা হচ্ছে সঠিক সময়ে সঠিক দিকে একটি সঠিক পদক্ষেপ। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতির জন্য নিজস্ব একাডেমি থাকা একান্তই অপরিহার্য। চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির উৎস স্বদেশের মাটিতে থাকাই উচিত, এটা নিজেদের জন্য মর্যাদাজনক ও কল্যাণকর হয়। হিন্দুস্থান ও মিশরের মুসলমানগণ পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এবং ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ শুধু এই যে, তাদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার উৎস ছিল ইউরোপ, কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড কিংবা আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ। বাইরে থেকে আপনারা যা খুশি আমদানি করুন। খাদ্য আমদানি করুন, বৈজ্ঞানিক উপকরণ, কলকব্জা ও কারিগরিবিদ্যা আমদানি করুন। কিন্তু সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন ও আদর্শ আমদানি করা বন্ধ করুন। বাংলাদেশের মত স্বাধীনচেতা জাতির জন্য নিজস্ব স্টাইল থাকা উচিত। সর্বক্ষেত্রে নিজস্ব স্টাইল ও রীতির প্রচলন হওয়া উচিত। কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ আপনাদের অনুসরণ করুক। আপনারা তাদের অনুকরণ করতে যাবেন না। সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে আপনারা ইমাম হোন। সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের অধিকারী কোনো স্বাধীন জাতির জন্য মুকতাদী হওয়া গর্বের কথা নয়। আপনাদের রয়েছে নিজস্ব ঐতিহ্য, নিজস্ব ইতিহাস। আপনাদের পক্ষে অন্য কোনো জাতির দুয়ারে, আয়তন ও সংখ্যায় তারা যত বড়ই হোক, ধর্ণা দেয়া শোভনীয় নয়। প্রথম কাতারে নিজেদের অবস্থান মজবুদ করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় স্থান আপনাদের জন্য নয়। শিক্ষা, দীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্প-কাব্য, এক কথায় বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে যতদিন আপনারা আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন না করবেন, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অবস্থান মজবুত করতে সক্ষম না হবেন, ততদিন আশ্বস্ত হওয়ার কোনো উপায় নেই। একটি স্বাধীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় আশা-আকাংখা ও মূল্যবোধের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

আরেকটি কারণেও আমার মনে আজ আনন্দ ও আশাবাদের সঞ্চার হয়েছে। সেটি এই যে, বিলম্বে হলেও খিদমতে খালক বা আর্তমানবতার সেবার গুরুত্ব আপনারা অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং সেজন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। গতকাল সোনারগাঁয়ে গিয়েছিলাম। সেখানকার সেবা, কার্যক্রম ও যাবতীয় ব্যবস্থা অবলোকন করে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। স্টাফ ও স্থানীয় লোকজনদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমি আলাপ করেছি। গড়ে প্রতিদিন কতজন রুগী আসে, কতজন রুগীকে ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়, কী পরিমাণ ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সত্যি এটা আল্লাহর বিরাট মেহেরবানী। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল

www.pathagar.com

ক্ষেত্রের দিকে বিলম্বে হলেও আপনারা মনোযোগ দিয়েছেন, যা এতোদিন খৃষ্টান মিশনারীদের একচেটিয়া ময়দান মনে করা হতো।

বস্তুত আর্তমানবতা সেবার ছদ্মাবরণেই তারা এদেশের সাধারণ মানুষের সহানুভূতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সর্বত্র আজ এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, মিশনারী হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো অন্যান্য হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রের তুলনায় অধিক উন্নত ও সেবাধর্মী। যেহেতু তাদের মধ্যে মিশনারী মনোভাব থাকে সেহেতু চিকিৎসা প্রার্থীদের সাথে তারা অত্যন্ত কোমল ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করে থাকে। ফল এই দাঁড়ায় যে, মানুষ সেখানে শারীরিক সুস্থতা লাভ করলেও তার আত্মা হয়ে পড়ে অসুস্থ ও রোগগ্রস্ত। অন্তত এ ধারণা নিয়ে তাকে ফিরে আসতে হয় যে, আমাদের চেয়ে এরা অনেক ভালো লোক। এদের মধ্যে মানবতাবোধ আছে। আছে সহানুভূতিপূর্ণ কোমল হৃদয়। এটাই এক ধরণের রোগ। একটি রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে আরো মারাত্মক ও ক্ষতিকর আরেকটি রোগ নিয়ে সে বাড়িতে ফিরে আসে। তাই আমি মনে করি যে, এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো আর্তমানবতার সেবায় গোটা জাতির আত্মনিয়োগ করা। যাতে মানুষ নিজের ঈমান ও বিশ্বাসের হিফাজত করে সহজ উপায়ে সঠিক চিকিৎসা কিংবা অন্ততপক্ষে সহৃদয় পরামর্শ লাভ করতে পারে। এই মহান প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি ও আমার সফর সঙ্গীরা নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

শুধু এ কথাই আমি আপনাদের বলবো যে, প্রথমতঃ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি লাভই যেন হয় আপনাদের যাবতীয় উদ্যোগ আয়োজন ও কর্মকান্ডের মূল উদ্দেশ্য হয়। এ বিশ্বাস রাখবেন যে, আপনারা ইবাদতে নিয়োজিত আছেন। আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি বরং আমার ফতোয়া এই যে, আপনারা ইবাদতে এবং সর্বোত্তম ইবাদতে নিয়োজিত আছেন।

কেননা হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ *দুনিয়াতে যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের কষ্ট লাঘব করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তার কষ্ট লাঘব করে দিবেন।* আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ *আল্লাহ পাক ততক্ষণ বান্দার সাহায্যরত থাকে না যতক্ষণ না বান্দা তার মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যরত থাকে।* হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছে ঃ *কিয়ামতে আল্লাহ পাক একদল লোককে লক্ষ্য করে বলেন; আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে আসনি।" তারা বলবে ঃ হে মহামহিম আল্লাহ! আপনি কিভাবে অসুস্থ হতে পারেন? ইরশাদ হবেঃ আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। যদি তাকে দেখতে যেতে তবে আমাকেও সেখানে দেখতে পেতে।* বলুন এর চেয়ে বড় মর্যাদার বিষয় আর কী হতে পারে!

দ্বিতীয়তঃ সেবা ও চিকিৎসার সাথে প্রেম ও সহানুভূতিও যোগ করতে হবে। তবেই এ বিরাট পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করবে। এই দুর্বল মুহূর্তে মানুষের হৃদয়ের কোমল মাটিতে ঈমান ও কল্যাণের বীজ বপন করে দিন। ইনশাআল্লাহ্ কোনো একদিন তা ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠবে। অন্ততপক্ষে এ বিশ্বাস তাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দিতে হবে যে, আল্লাহই হচ্ছেন শেফাদানকারী। ওষুধ ও চিকিৎসক উপলক্ষ মাত্র। আল্লাহর নির্দেশেই ওষুধ তার ক্রিয়া করে। ওষুধের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। এর পর যখন রোগী শেফা লাভ করবে তখন তার অন্তরে নূর সৃষ্টি হবে। তার বিশ্বাসের ভিত মজবুত হবে।

আপনাদের সকলকে বিশেষ করে সভাপতি সাহেব ও ফাউন্ডেশন কর্মকর্তাদেরকে আমার আন্তরিক মুবাবরকবাদ। একটি সঠিক ও নির্ভুল ক্ষেত্র আপনারা নির্বাচন করতে সক্ষম

www.pathagar.com

হয়েছেন। আপনাদের এ দূরদর্শিতা দেশ ও জাতির জন্য প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনবে। এটা শুধু দেশের খিদমত নয় দ্বীনেরও এক বিরাট খিদমত। আল্লাহ পাক এ প্রকল্পটিকে স্থায়িত্ব ও পূর্ণতা দান করুন।

সাথে সাথে আপনাদেরকে একথাও বলবো যে, অমুসলিম ভাইদের সাথেও সমান আচরণ করুন। এ ক্ষেত্রে ধর্ম বিশ্বাসের প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। মনে রাখতে হবে যে, এরাও আল্লাহর বান্দাহ্, আল্লাহই এদের সৃষ্টি করেছেন। এদের কোনোরূপ কষ্ট লাঘব করতে পারলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন এবং আমরা উত্তম বিনিময় লাভ করবো। সেবার ক্ষেত্রে মুসলমান অমুসলমানের পার্থক্য করা উচিত হবে না। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে অমুসলিম ভাইকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মোট কথা, আপনার চিকিৎসা সহায়তা নিতে এসে তারা যেন কোনো রকম দ্বৈত আচরণ অনুভব করতে না পারে। আমাদের বোনেরাও সেবার ময়দানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাদের কোমল হৃদয় এক মূল্যবান সম্পদ। এমন কিছু তারা করতে পারেন যা পুরুষের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের হিন্দুস্থানে এবং এখানেও সচেতনতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আমার বোনেরাও পর্দার পিছনে থেকে আমার কথাগুলো শুনছেন জানতে পেরে আমি আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহপাক তাদেরকে সমাজ সেবায় যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করার তাওফীক দান করুন।

শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ, আরেকটি বিষয় আরয করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি আপনাদেরকে মিশর বিজয়ী সাহাবী হযরত আমর ইবন আসের একটি ঐতিহাসিক বাণী স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তখনকার দুনিয়ায় মিশরের অবস্থান ছিলো তাহযীব তামাদ্দুন ও সভ্যতার স্বর্ণ শিখরে। নীল নদী বিধৌত মিশর ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে সুজলা শস্য শ্যামল ভূখন্ড। এমন একটি সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত দেশ জয় করার পরও কেন জানি হযরত আমর ইবন আস স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। একজন বিজয়ী সেনাপতির মনে যে স্বাভাবিক পুলক অনুভূত হয় তার লেশ মাত্রও ছিল না তার অন্তরে।

কেননা তিনি ছিলেন নবীর সান্নিধ্য প্রাপ্ত এক সাহাবী। কুরআনের শিক্ষা এবং নবুয়তের দীক্ষায় তার অন্তর ছিল আলোক উদ্ভাসিত। তিনি ছিলেন যুগপৎ ঈমানী প্রজ্ঞা এবং সাহাবী সুলভ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। তাই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সুদূর ভবিষ্যত পানে। বিজয়ী আরব মুসলমানদের ডেকে তিনি ঘোষণা করলেন তার সেই ঐতিহাসিক বাণী; যা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য । আরব বিজয়ীদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন : "মনে রেখো, মিশরের সবুজ শ্যামল উর্বর মাটি, মিশরের সম্পদ ভান্ডার ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং এদেশের তাহযীব তামাদ্দুন তোমাদের মনে যেন মোহ সৃষ্টি করতে না পারে। এদেশের প্রাকৃতিক রূপ ও জৌলুসে তোমরা যেন আত্ম-বিমোহিত হয়ে না পড়। এখানে তোমাদের সঠিক অবস্থান ও দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বক্ষণ সজাগ থেকো। মনে রেখো, তোমরা এখানে সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত আছ। এক গুরুত্বপূর্ণ চৌকিতে তোমরা অবস্থান করছো। একথা ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করোনা যে, তোমরা কিবতীদের উপর বিজয় লাভ করেছ। কিংবা রোম সাম্র্যাজের শস্যভাণ্ডার দখল করে নিয়েছো। একথাও মনে করোনা যে, আরব উপদ্বীপ খুব নিকটে। কোনো অবস্থাতেই আত্মপ্রতারণার শিকার হয়োনা। এমন এক নাজুক জায়গায় তোমরা আছ যে, মুহূর্তের অসাবধানতায় তোমাদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। প্রতিটি মুহূর্ত তোমাদেরকে সজাগ সতর্ক থাকতে হবে। এক ঐশী বাণীর ধারক, বাহক ও প্রচারক হয়ে তোমরা এদেশে এসেছ। মুহূর্তের গাফিলতি ও দায়িত্ব বিচ্যুতি তোমাদের এ বিজয়কে

www.pathagar.com

ধুলি লুণ্ঠিত করে দিতে পারে। সেই জীবন দর্শন থেকে চুল পরিমাণও যদি বিচ্যুত হও, যা তোমরা মদীনার পূণ্য মাটিতে নবুয়তের পবিত্র সাহচর্যে লাভ করেছ তবে তোমাদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হবে এবং মিশরে যারা আজ তোমাদের এ বিজয়কে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাগত জানিয়েছে তারাই সেদিন তোমাদের বুক লক্ষ্য করে তরবারি উঁচিয়ে ধরবে। এদেশবাসী তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র করুণা করবে না। একটি প্রাণীও সহী সালামতে ফিরে যেতে পারবেনা।"

প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে এক আরব সৈনিক, যিনি কোনো ইউনিভার্সিটির স্কলার ছিলেন না, বিজয়ী আরবদের লক্ষ্য করে যা বলেছিলেন তা আজ এই মুহূর্তে ইসলামী বিশ্বের বিশেষত আপনাদের এদেশের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

বন্ধুগণ, আপনাদেরও মনে রাখতে হবে, আপনারা সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত আছেন। মুহূর্তের অসাবধানতা আপনাদের ঈমান, বিশ্বাস ও স্বাধীনতা বিপন্ন করে দিতে পারে।

বাংলা ভাষার নেতৃত্ব গ্রহণ করা
উলামায়ে কেরামের কর্তব্য

১৯৮৪ সালের ১৪ মার্চ কিশোরগঞ্জের জামিয়া ইমদাদিয়া প্রাঙ্গনে বিশিষ্ট আলেম, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র শিক্ষক সমাবেশে মাওলানা নদভীর প্রদত্ত ভাষণ।

উপস্থিত উলামায়ে কেরাম, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও আমার প্রিয় বন্ধুগণ,

আপনাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে দেশ জাতির প্রতিটি মুহূর্তের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা। আপনারা এ জাতির ঈমান ও বিশ্বাসের অতন্দ্র প্রহরী, ইসলামের সাথে এ দেশের সম্পর্ক কোনো অবস্থাতেই যেন বিন্দুমাত্র শিথিল না হয় সে ব্যাপারে আপনাদেরকে পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে। যে দেশ এবং যে জাতির জন্য আল্লাহপাক আপনাদের নির্বাচিত করেছেন তাদের ব্যাপারে অবশ্যই আপনাদেরকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। ইসলামের সাথে এ দেশের সম্পর্ক যদি বিন্দুমাত্র শিথিল হয় কিংবা অনৈসলামী কার্যকলাপ ও ইসলাম বিরোধী তৎপরতা শুরু হয় তবে মনে রাখবেন, রাসূলের ওয়ারিছ ও উত্তরাধিকারী হিসাবে আপনাদেরকেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে। রাজনৈতিক কর্ণধাররা জিজ্ঞাসিত হবে কিনা এ প্রশ্ন এখানে নয়। কিন্তু এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, সর্বপ্রথম আলেমদের কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হবে। তোমাদের চোখের সামনে আমার রেখে আসা দ্বীনের এমন অসহায় অবস্থা কিভাবে হতে পারলো? কোন মুখ নিয়ে আজ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছ? প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিআল্লাহ বলেছিলেন- আমি বেঁচে থাকতে দ্বীনের কোনো অঙ্গহানী ঘটবে এটা কী করে হতে পারে?

এই মূহুর্তে আপনাদেরকে খুঁটিনাটি মত পার্থক্য সিকায় তুলে রেখে এক বৃহত্তর ও মৌলিক লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তিক সংকটে নিপতিত জাতির এই মুহূর্তে আপনাদের ঐক্যবদ্ধ পথ নির্দেশনার বড় প্রয়োজন। ইখলাছ ও আত্মত্যাগ এবং প্রেম ও নিঃস্বার্থতা দিয়ে জাতির সেই অংশটিকে প্রভাবিত করুন যাদের হাতে দেশ শাসনের ভার অর্পিত হয়েছে কিংবা অদূর ভবিষ্যতে যাদের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হতে যাচ্ছে। এ যুগে শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য অপরিহার্য জ্ঞান, দক্ষতা ও উপকরণ যাদের হাতে রয়েছে, জাতির সে অংশটির সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা

www.pathagar.com

আপনাদের অপরিহার্য কর্তব্য। তাদেরকে তাদের ভাষায় বোঝাতে হবে। আপনাদের সম্পর্কে তাদের মনে এ বিশ্বাস যেন থাকে যে, আপনারা নিঃস্বার্থ এবং প্রকৃতই কল্যাণকামী। তাদের কাছে যেন আপনাদের কোনো প্রত্যাশা না থাকে, বিভিন্ন প্রলোভন ও সুযোগ-সুবিধার কথা হয়ত বলা হবে। এ এক কঠিন অগ্নি-পরীক্ষা। নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর তখন অটল-অবিচল থাকতে হবে। কেননা আপনাদের বিনিময় আল্লাহর হাতে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টির দিকে আমি আপনাদের সযত্ন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো, এদেশের ভাষাকে (বাংলা ভাষা) আপনারা অস্পৃশ্য মনে করবেন না। বাংলা ভাষা ও তার সাহিত্য চর্চায় কোনো পূণ্য নেই, যত পূণ্য সব আরবী আর উর্দুতে-এ ধারণা বর্জন করুন। এটা নিছক মূর্খতা। আপনারা নিজেদেরকে বাংলা ভাষার বিরল প্রতিভারূপে গড়ে তুলুন। আপনাদের প্রত্যেককে হতে হবে আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক, সাহিত্যিক, সুবক্তা। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় আপনাদের থাকতে হবে দৃপ্ত পদচারণা, লেখনী হতে হবে রস-সিক্ত ও সম্মোহনী শক্তির অধিকারী। যেন আজকের ধর্ম বিমুখ শিক্ষিত তরুণ সমাজও অমুসলিম লেখক সাহিত্যিকদের লেখনী ছেড়ে আপনাদের সাহিত্য কর্ম নিয়েই মেতে ওঠে, বিভোর হয়ে থাকে।

দেখুন, একথা আপনারা লাখনৌর অধিবাসী, উর্দু ভাষার প্রতিষ্ঠিত লেখক এবং আরবী ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গকারী এক ব্যক্তির মুখ থেকে শুনছেন। আল-হামদুলিল্লাহ! আমার বিগত জীবন আরবী ভাষার সেবায় কেটেছে এবং আল্লাহ চাহেন বাকি জীবনও আরবী ভাষার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখবো। আরবী ভাষা আমাদের নিজেদের ভাষা। বরং আমি মনে করি যে, আরবী আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের কথা থাকুক, আল্লাহর শোকর আমার বংশের অনেক সদস্য এবং আমাদের অনেক ছাত্রের সাহিত্য প্রতিভাও খোদ আরবী সাহিত্যিকদের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়।

বন্ধুগণ,

উর্দু ভাষার পরিবেশে যে চোখ মেলেছে, আরবী সাহিত্যের খিদমতে যে তার যৌবন নিঃশেষ করেছে সে আজ আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে পূর্ণ দায়িত্ব সচেতনতার সাথে বলছে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ইসলাম বিরোধী শক্তির রহম করমের উপর ছেড়ে দেবেন না। "ওরা লিখবে আর আপনার পড়বেন" এ অবস্থা কিছুতেই বরদাস্ত করা উচিত নয়। মনে রাখবেন, লেখনীর এক অদ্ভূত প্রভাব সৃষ্টিকারী শক্তি আছে। লেখনীর মাধ্যমে লেখকের ভাব-অনুভূতি, এমনকি তার হৃদয়ের স্পন্দনও পাঠকের মধ্যে সংক্রমিত হয়। অনেক সময় পাঠক হয়ত তা-অনুধাবনও করতে পারেনা। ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান লেখকের লেখনী পাঠকের অন্তরেও সৃষ্টি করে ঈমানের বিদ্যুৎ প্রবাহ। হযরত থানভী (রহঃ) বলতেন, পত্র যোগেও মুরীদের প্রতি তাওয়াজ্জুহ বা মনোযোগ নিবদ্ধ করা যায়। শায়খ বা পীর তাওয়াজ্জুহ সহকারে মুরীদকে লক্ষ্য করে যখন পত্র লিখেন তখন সে পত্রের অক্ষরে অক্ষরে থাকে এক অত্যাশ্চর্য প্রভাব শক্তি।

এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও রয়েছে। পূর্ববর্তী পুণ্যাত্মাদের রচনা-সম্ভার আজও মওজুদ রয়েছে। পড়ে দেখুন, আপনার সালাতের প্রকৃতি বদলে যাবে। হয়ত পঠিত বইটির বিষয়বস্তুর সাথে সালাতের কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু তিনি যখন লিখছিলেন তখন তাঁর তাওয়াজ্জুহ ও মনোযোগ সেদিকে নিবদ্ধ ছিল। এখন আপনি তাদের লেখনী পড়ে তারপর

www.pathagar.com

গিয়ে সালাত আদায় করুন। হৃদয় জাগ্রত এবং অনুভূতি সচেতন হলে অবশ্যই আপনি উপলব্ধি করবেন যে, আপনার সালাতের অবস্থা ও প্রকৃতি বদলে গেছে। অনেকবারই আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। আপনি অমুসলমানদের লেখনী পড়বেন, তাদের রচিত গল্প, উপন্যাস ও কাব্যের রস-উপভোগ করবেন এবং তাদের লিখিত ইতিহাস নির্দ্ধিধায় গলাধকরণ করবেন অথচ আপনার হৃদয়ে তার কোনো দাগ কাটবেনা, এটা কী করে হতে পারে? আপনার অবচেতন মনে হলেও 'লেখনী' তার নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করবেই। আমি মনে করি, আপনাদের জন্য এটা বড় লজ্জার কথা। বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত না হলে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না যে, এই সে দেশ যে দেশে এ পর্যন্ত লক্ষাধিক আলেমের জন্ম হয়েছে, সেখানে বাংলায় কোরআনের প্রথম তরজমাকারী হচ্ছেন একজন হিন্দু সাহিত্যিক। এদেশের মুসলিম সাহিত্যিকদেরকে বিশ্বের দরবারে আপনারা তুলে ধরুন, নজরুল ও ফররুখকে তুলে ধরুন, তাদের অনবদ্য সাহিত্যকর্মের কথা বিশ্বকে অবহিত করুন। নিবিষ্ট মন ও গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে তাদের সাহিত্য পড়ুন, অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করুন এবং আল্লাহ তাওফীক দিলে আরবী ভাষায়ও তাদের সাহিত্য পেশ করুন। কত শত আলোড়ন সৃষ্টিকারী সাহিত্য প্রতিভার জন্ম এদেশে হয়েছে, তাদের কথা লিখুন, বিশ্বের কাছে তাদেরকে তুলে ধরুন। আল্লাহর রহমতে এমন কোনো যোগ্যতা বাকি নেই যা আপনাদের দেয়া হয়নি। আমাদের মাদরাসাগুলোতে এমন অনেক বাঙালি ছাত্র আমি দেখেছি যাদের মেধা ও প্রতিভার কথা মনে হলে এখনো ঈর্ষা জাগে। প্রতিযোগিতা ও পরীক্ষার সময় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্ররা তাদের মুকাবিলায় একেবারেই চুপসে যেতো। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাকে মানপত্র দেওয়া হয়েছে। আমার এ ধারণাই ছিল না যে, এতো সুন্দর আরবী লেখার লোকও এখানে রয়েছেন। কখনো হীনমন্যতার শিকার হবেন না। সব রকম যোগ্যতাই আল্লাহ আপনাদের দান করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এগুলোর সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না।

আমার কথা মনে রাখবেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে নিতে হবে। দু'টি শক্তির হাত থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে আনতে হবে। অমুসলিম শক্তির হাত থেকে এবং অনৈসলামী শক্তির হাত থেকে। অনৈসলামী শক্তি বলতে সেইসব নামধারী মুসলিম লেখক সাহিত্যিকদের কথাই আমি বোঝাতে চাচ্ছি যাদের মন-মগজ এবং চিন্তা ও কর্ম ইসলামী নয়। মোটকথা, এ উভয় শক্তির হাত থেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব ছিনিয়ে আনতে হবে। এমন অনবদ্য সাহিত্য গড়ে তুলুন যেন অন্যদিকে কেউ আর ফিরেও না তাকায়। আল-হামদুলিল্লাহ! আমাদের হিন্দুস্তানী আলিমগণ প্রথম থেকেই এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। ফলে সাহিত্য, কাব্য, সমালোচনা ও ইতিহাসসহ সর্বত্র আজ আলেম সমাজের দৃপ্ত পদচারণা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাদের উজ্জ্বল প্রতিভার সামনে সাহিত্যের বড় বড় দাবীদাররা একেবারেই নিষ্প্রভ।

একবার একটি প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় উর্দু সাহিত্য সাময়িকীর তরফ থেকে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগীদের দায়িত্ব ছিল উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নির্বাচন। বিচারকদের দৃষ্টিতে পুরস্কার তারাই লাভ করলেন-যারা মাওলানা শিবলী নো'মানীকে উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে প্রমাণ করেছিলেন। উর্দু সাহিত্যের উপর কোনো গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন কিংবা সেমিনার হলে সভাপতিত্বের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হতো মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, মাওলানা আব্দুস সালাম নদভী, মাওলানা হাবীবুর

www.pathagar.com

রহমান খান কিংবা মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীকে। উর্দু কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসের উপর দু'টি পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত। সে দুটি হচ্ছে মওলভী মুহাম্মদ হুসাইন আযাদ কর্তৃক লিখিত "আবে হায়াত" এবং আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম মাওলানা সাইয়্যেদ আব্দুল হাই এর লেখা "গুলে রা'না" (কোমল গোলাপ)।
মোটকথা, হিন্দুস্তানে উর্দু সাহিত্যকে আমরা অন্যের নিয়ন্ত্রণে যেতে দেইনি। ফলে আল্লাহর রহমতে সেখানে একথা কেউ বলতে পারে না যে, মাওলানারা উর্দু জানেনা কিংবা টাকশালী উর্দুতে তাদের হাত নেই। এখনও হিন্দুস্তানী আলেমদের মধ্যে এমন লেখক, সাহিত্যিক ও অনলবর্ষী বক্তা রয়েছেন, যাদের সামনে দাঁড়াতেও অন্যদের সংকোচ বোধ হবে। বাংলাদেশে আপনাদের তাই করা উচিত। আমার কথা আপনারা লিখে রাখুন। দীর্ঘ জীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন কিংবা বিমাতাসুলভ আচরণ এ দেশের আলেম সমাজের জন্য জাতি হত্যারই নামান্তর।

প্রিয় বন্ধুগণ,
আমার এ দুটি কথা মনে রাখবেন। এর বেশি কিছু আমি বলতে চাই না। প্রথম কথা হলো, এই দেশ ও জাতির হিফাযতের দায়িত্ব আপনাদের। ইসলামের সাথে এদেশের সম্পর্ক কোনো অবস্থাতেই যেন শিথিল হতে না পারে। অন্যথায় আপনাদের এই শত শত মকতব মাদরাসা মূল্যহীন হয়ে পড়বে। আমি সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, আমার কথায় দোষ ধরবেন না। আমি মাদরাসারই মানুষ, মাদরাসার চৌহদ্দীতেই কেটেছে আমার জীবন। আমি বলছি, আল্লাহ না করুন ইসলামই যদি এদেশে বিপন্ন হলো, তবে মকতব মাদরাসার কোনোই যৌক্তিকতা নেই। আপনাদের পয়লা নম্বরের কাজ হচ্ছে এদেশে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করা। ইসলামের সাথে জাতির সম্পর্ক অটুট রাখা।
দ্বিতীয় কথা হলো, যে কোনো দেশ ও জাতির নেতৃত্ব এবং সঠিক পথ নির্দেশনা নিজেদের হাতে নিতে হবে। আর তা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধি-বৃত্তিক প্রাধান্য অর্জন ছাড়া কখনো সম্ভব নয়। গতকালও আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় বলেছি যে, আমার খুবই আফসোস হচ্ছে- আমি আপনাদের সাথে বাংলা ভাষায় কথা বলতে সক্ষম নই। আপনাদের ভাষায় আপনাদের সম্বোধন করতে পারলে আজ আমার আনন্দের সীমা থাকতো না। ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো ভাষাই বিদেশী কিংবা পর নয়। পৃথিবীর সকল ভাষাই আল্লাহর সৃষ্টি এবং প্রত্যেক ভাষারই রয়েছে নিজস্ব কতগুলো বৈশিষ্ট্য। ভাষা বিদ্বেষ হলো জাহেলিয়াতেরই উত্তরাধিকার। কোনো ভাষা যেমন পূজনীয় নয়, ঘৃণ্যও নয়। একমাত্র আরবী ভাষাই পেতে পারে পবিত্র ভাষার মর্যাদা। এ ছাড়া পৃথিবীর আর সব ভাষাই সম মর্যাদার অধিকারী। মানুষকে আল্লাহ পাক বাকশক্তি দিয়েছেন এবং যুগে যুগে মানুষের মুখের ভাষা উন্নতি ও সমৃদ্ধির বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করে বর্তমান রূপ ও আকৃতি নিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। মুসলমান প্রতিটি ভাষাকেই মর্যাদা ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে। কেননা মনের ভাব ফুটিয়ে তুলতে পৃথিবীর সকল ভাষাই আমাদেরকে সাহায্য করে। প্রয়োজনে যে কোনো ভাষা শিক্ষা ইসলামেরই নির্দেশ। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ বিন সাবিতকে (রাঃ) হিব্রু ভাষা শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ হিব্রু হচ্ছে নির্ভেজাল ইহুদী ভাষা। দেশের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আমরা যদি উদাসীন ও নির্লিপ্ত থাকি তবে তা স্বাভাবিকভাবেই অনৈসলামিক শক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। ফলে যে ভাষা

www.pathagar.com

ও সাহিত্য হতে পারতো ইসলাম প্রচারের কার্যকর মাধ্যম তাই হয়ে দাঁড়াবে শয়তানের শক্তিশালী বাহন। আপনাদের এখানে কলকাতা থেকে অশ্লীল সাহিত্য আসছে। সাহিত্যের ছদ্মাবরণে কমিউনিজমের প্রচার চলছে। ইসলামী মূল্যবোধ ধ্বংসের মাল-মশলা তাতে মিশানো হচ্ছে। আর সরলমনা তরুণ সমাজ গোগ্রাসে তা গিলছে। এর পরিণতি কখনো শুভ হতে পারে না।

ভাইসব,

আপনারা তিরমিযী, মিশকাত কিংবা মিযানের শরাহ্ লিখতে চাইলে তা আরবী উর্দুতে লিখুন, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু জনগণকে বোঝাতে হলে জনগণের ভাষাতেই কথা বলতে হবে। আমি আপনাদের খিদমতে পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই পাক ভারতে হাদীছ, তাফসীর ও ফিকাহ শাস্ত্রের উপর এ পর্যন্ত অনেক কাজ হয়েছে, পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যাখ্যা গ্রন্থও লেখা হয়ে গেছে। সেখানে নতুন সংযোজনের বিশেষ কিছুই নেই। আপনাদের সামনে এখন পড়ে আছে কর্মের এক নতুন বিস্তৃত ময়দান। দেশ ও জাতির উপর আপনাদের নিয়ন্ত্রণ যেন শিথিল হতে না পারে, আপনাদের দেশের মানুষ যেন মনে না করে যে, দেশে থেকেও আপনারা বিদেশী। স্বদেশের মাটিতে এই প্রবাস জীবন অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। মনে রাখবেন, এদেশের মাটিতেই আপনাদের থাকতে হবে এবং এদেশের জনগণের মাঝেই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিতে হবে। এদেশের সাথেই আপনাদের ভাগ্য, আপনাদের ভবিষ্যত জড়িত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "হে মুসলমানগণ! তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের আবরু ইজ্জত পরস্পরের জন্য হারাম। ভাষাগত পার্থক্যের কারণে কোনো মুসলমান ভাইকে অপমান করা, তার ইজ্জত আবরু লুণ্ঠন করা কিংবা তাকে হত্যা করা সম্পূর্ণ হারাম ও জুলুম।"

'প্রতিটি বস্তুর জন্য আল্লাহ পাক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ও স্তর নির্ধারণ করে দিয়েছেন।' কোনো মুসলমানের জন্য সে সীমা লংঘন করা বৈধ নয়। সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটান ও কাব্যের রস উপভোগ করুন। কিন্তু অতিরঞ্জন করবেন না। কোরআন শরীফকেও যদি কেউ পূজা করা শুরু করে, উপাস্য জ্ঞানে তাকে সিজদা করে তবে সে মুশরিক হয়ে যাবে, কেননা ইবাদত শুধু আল্লাহরই প্রাপ্য। তবে সব ভাষাকে স্ব-স্ব মর্যাদায় রেখে মাতৃভাষাকে ভালোবাসা, স্বীয় অবদানে তাকে সমৃদ্ধ করে তোলা শুধু প্রশংসনীয়ই নয় অপরিহার্যও বটে।

বন্ধুগণ,

পরদেশী মুসাফির ভাইয়ের এ কথাগুলো যদি স্মরণ থাকে তবে একদিন না একদিন তার গুরুত্ব আপনারা অবশ্যই উপলব্ধি করবেন। "আপনাদেরকে যে কথাগুলো বলছি তা অদূর ভবিষ্যতে আপনারা স্মরণ করবেন; আমি আমার যাবতীয় বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ তার বান্দাদের সব কিছু দেখেন।"

আকাশের ফিরিশতারা শুনে রাখুক এবং "কিরামান কাতিবীন" লিখে রাখুক যে, প্রতিবেশী ভাইদের প্রতি আমি আমার দায়িত্ব পূর্ণ করেছি। আমি আবার বলছি, শেষ বারের মত বলছি, যদি আপনারা এদেশের মাটিতে বাঁচতে চান, ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করতে চান, তবে এটাই হচ্ছে তার বিকল্প উপায়। আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন। #

অনুবাদ - মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ

www.pathagar.com

ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা

মূল ঃ মোহাম্মদ মার্মেডিউক পিকথল
ভাষান্তর ঃ সানাউল্লাহ্ নূরী

জনাব মোহাম্মদ মার্মেডিউক পিকথলের জন্ম ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে, ইংল্যান্ডের এক সম্ভ্রান্ত খৃষ্টান পরিবারে। বাল্যে 'হ্যারো'তে এবং পরে ইউরোপের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত করে জনাব পিকথল ৩ বৎসর কাল নিকট-প্রাচ্যের কতিপয় দেশে অবস্থান করেন। এ সময়েই তিনি ইসলামী জীবন-বিধানের মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হন। লেবানন পর্বতের দ্রুজ অঞ্চলেও তিনি এক বৎসরকাল অতিবাহিত করেন। ১৯২০ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত তিনি বোম্বাই হতে প্রকাশিত Bombay Chronicle পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। অতঃপর হায়দারাবাদের নিজাম তাঁকে স্বীয় সরকারের শিক্ষা দফতরে নিয়োগ করেন। এ সময়ে তিনি Hyderabad Quarterly ও Islamic Culture পত্রিকাদ্বয় সম্পাদনা করেন। ইংরেজিতে আল-কুরআনের পূর্ণাঙ্গ তরজমা ছাড়াও জনাব পিথকল কয়েকখানি উপন্যাসসহ ২০ খানিরও অধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের প্রণেতা। জনাব পিকথল ১৯৩৬ সালের ১৯শে মে তারিখে ইন্তেকাল করেন। ১৯২৭ সালে হায়দারাবাদে এক সুধী সম্মেলনে জনাব পিকথল ইসলামের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করে কতিপয় বক্তৃতা দান করেন। Islamic Culture নামে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত সে বক্তৃতামালা থেকে Islamic Culture শীর্ষক প্রবন্ধটির বাংলা অনুবাদ এখানে প্রকাশ করা হল।

সংস্কৃতির অর্থ উৎকর্ষ বা অনুশীলন। আধুনাতন ও সাধারণভাবে একক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির বিশেষ অর্থ হচ্ছে মানব-মনের উৎকর্ষ। অন্যান্য সংস্কৃতি হতে ইসলামী সংস্কৃতির সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। কেননা ইসলামী সংস্কৃতি কখনো কেবলমাত্র কোনো সংস্কৃতিবান ব্যক্তি-বিশেষ মাত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপূরক হতে পারে না। আরো পরিষ্কার ভাষায় বলতে গেলে, ইসলামী সংস্কৃতি শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অগ্রসর ব্যক্তি- বিশেষ মাত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিপূরণের বাহন হতে পারে না; এবং এখানেই বিভিন্ন সংস্কৃতির সংগে তার পার্থক্য। এটা সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত সত্য যে, ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য সীমিত পর্যায়ে কোনো ব্যক্তি বিশেষ কিংবা ব্যক্তি-সমষ্টির বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন নয়-বস্তুতঃ সামগ্রিকভাবে গোটা মানবজাতির অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধন। অন্যায়, অবিচার ও

www.pathagar.com

অসহিষ্ণুতা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত কোনো দেশে শিল্প ও সাহিত্য-সাধনার কোনো পরিসরের কাজই ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায়ানুগত হতে পারে না। যত বিরাট ও কীর্তিময় হোক না কেন, কোনো যুদ্ধ কিংবা সন্ধি-চুক্তির সাফল্যকে ইসলামের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সাফল্যের ফল-শ্রুতি বলে অভিহিত করা যেতে পারে না। ইসলামের লক্ষ্য আরো প্রশস্ততর এবং এর দৃষ্টি-দিগন্ত আরো দূর-বিসারী। প্রকৃতপক্ষে, সার্বজনীন মানবিক ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য– ইসলামে বিরামহীন অভিযাত্রা এই আদর্শের লক্ষ্যভূমির পথে অগ্রসরমান। ধর্ম হিসেবে ইসলাম নিজস্ব পরিসরেও নিজের শ্রেণীগত অগ্রগতির পর অন্য যে কোনো ধর্মের চেয়ে অধিকতর ও ব্যাপক পর্যায়ে মানবীয় প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে থাকে। শক্তি হিসেবে বিশ্বে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের পর ইসলাম যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্ম দিয়েছে, অন্য সব ধর্ম, সভ্যতা ও দর্শনের সম্মিলিত সাফলের সংগে তার তুলনা করা যেতে পারে। মানে, ইসলামের সাংস্কৃতিক অবদানকে বিশ্বের সমস্ত ধর্ম, সভ্যতা ও কৃষ্টির সামগ্রিক অবদানের সংগে এক পাল্লায় ওজন করা যেতে পারে।

প্রতীচ্যে শিল্প ও সাহিত্য চর্চাকে–যাকে সংস্কৃতির একটা প্রাসংগিক বা গৌন দিক বলা যেতে পারে–প্রায় উপাসনার অনুরূপ যে অপরিসীম গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে, একজন মুসলমান তাতে অবাক না হয়ে পারে না। কেননা, মনে করা হয়, এ-ই যেন ঠিক – এ-ই যেন বিরাট এক সত্য এবং এর সৃষ্টিই মানবজাতির সর্বোচ্চ লক্ষ্য। মুসলমানরা সাহিত্যিক, শৈল্পিক ও বৈজ্ঞানিক সাফল্যকে উপেক্ষা করে না– কখনো অবজ্ঞার চোখে দেখে না। কিন্তু এটা সত্য যে, তারা এগুলোকে অনেকখানি চলার পথে পাওয়া আশীর্বাদের আলোকে বিচার করে– তাদের চোখে এ হচ্ছে লক্ষ্যপথের একটা সহায়ক উপকরণ কিংবা পথযাত্রীর শ্রান্তি অপনোদনের মতো। তারা এই সহায়ক বস্তু এবং শ্রান্তি অপনোদনের মাধ্যমকে পূজা বা প্রতীক আশ্রয়িতার পর্যায়ভুক্ত করে না।

বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যে ইসলামের সামগ্রিক অবদান এই সহায়ক উপকরণ ও শ্রান্তি অপনোদনের ভিত্তিতেই সম্প্রসারিত হয়েছে। সূক্ষ্মতম কাব্য-সাহিত্য ও ভাস্কর্য এগুলোর অন্যতম এবং এ দুই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত এর সবকিছুই এক নেতাকে স্বীকৃতি দান করে, এক পথ নির্দেশের অনুসরণ করে, এক কেবলা বা লক্ষ্যাভিমুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। নেতা হচ্ছেন মহানবী (সঃ)। পথ নির্দেশ হচ্ছে আল-কুরআন, আর মঞ্জিল-মোকসাদ বা অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ।

ইসলামী সংস্কৃতি বলতে–তা যে কোনো সূত্র হতেই উদ্‌গত হোক না কেন-আমি ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের লব্ধ সংস্কৃতি বোঝাতে চাইনি। আর যে কোনো উৎস থেকেই এর বিকাশ হোক না কেন, তা-ও বড় কথা নয়। বস্তুতঃ ইসলামী সংস্কৃতি বলতে আমি এমনি একটি ধর্মমত কর্তৃক স্বীকৃত সংস্কৃতির কথা বোঝাতে চাইছি, যাতে মানবিক অগ্রগতিই একটা নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য।

যে-সব মানুষ আল-কুরআনের পথ-নির্দেশ অনুসরণ করে এবং তার বিধানসমূহ মেনে চলে, তাদের প্রতি মহাগ্রন্থ এ জগতে ও পরলোক সাফল্যের যে প্রতিশ্রুতি দান করেছে–আল কুরআনের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত কোনো ব্যক্তিই তা অস্বীকার করতে পারেন না। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সামগ্রিকভাবে গোটা মানব জাতির জন্য সাফল্য অর্জন। আর মানুষের সৃজনধর্মী অবদান ও মৌলিক গুণগুলোর বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের উপরই এ সাফল্য নির্ভরশীল।

www.pathagar.com

উন্মেষশীল মুসলিম সমাজের কোনো প্রসারণ-ব্যবস্থা আল-কুরআন কিংবা মহানবীর কোনো নির্দেশ বা আল হাদীসে অনুমোদিত না হলে বুঝতে হবে, তা ইসলাম বহির্ভূত এবং ইসলামী বিধি-ব্যবস্থার বাইরেই তার অনৈসলামিক মূলানুসন্ধান করতে হবে। সাফল্যের পরিপন্থী হওয়ার কোনো কারণ না ঘটলেও মুসলমানরা তাদের সমাজ জীবনে এগুলোর সংযোজন বা ফল গ্রহণ দ্বারা কোনোরূপ সুফল আশা করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, কোনো কর্মপন্থা আল-কুরআনের সুস্পষ্ট কোনো বিধির পরিপন্থী হলে বুঝতে হবে তা ইসলাম বিরোধী, আর এটা নিশ্চিতভাবে সাফল্য ও অগ্রগতিরও পরিপন্থী এবং একে গ্রহণ করলে মুসলমানরা নিঃসন্দেহে এক অনিবার্য ধ্বংসের শিকার হবে।

গোড়ার দিকে পৌত্তলিক আরবদের প্রতীক-পূজা এবং এর পংকিলতা ও মত্ততাময় রূপ-বৈচিত্র্যের সংগে সম্পৃক্ত ছিল বলে কতিপয় শিল্পকলাকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করে। কারণ, সমাজের এই প্রতীকবাদিতা ও এর পাপসর্বস্ব বৈশিষ্ট্যের মূলোৎপাটনের প্রয়োজন অনিবার্য ছিল। তবে সুকুমার বৃত্তিজাত কাজগুলোর অনুরূপ এক জাতীয় শিল্প-পদ্ধতির অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত ও অন্যবিধ শিল্প-পদ্ধতির পৃষ্ঠপোষকতা-উভয়েরই গুরুত্ব অধস্তন বা গৌনধর্মী ছিল। কেননা, ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য মানবজীবনের বাড়তি উপকরণগুলোর সৌন্দর্য বর্ধন, পরিমার্জন ও পরিশীলন নয়- বস্তুত সামগ্রিক মানব-জীবনকে সুন্দরতম, মহত্তর, মহিমাময় করে তোলাই ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য। অধুনা পাশ্চাত্য বিশ্বে এক বিরাট বুদ্ধিজীবীমহল এই অভিমত পোষণ করেন যে, কোনো সমাজ শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের একটি মুষ্টিমেয় অংশের শিল্প-সংস্কৃতির অনুশীলন সেই সমাজ ও সম্প্রদায়ের কৃষ্টি সংস্কৃতির দাবীর পক্ষে বিরাট কারণ হয়ে দাঁড়ায়; যদিও প্রচলিত সমাজ-আওতায় বাধ্য হয়েই এই সমাজের বেশির ভাগ মানুষকে কুৎসিত ও অধঃপতিত জীবন যাপন করতে হয়। শুধু তাই নয়- সেখানকার অপর একটি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর অভিমত হচ্ছে, কোনো জাতির সংখ্যালঘু অংশের সাহিত্য ও শিল্প-সাধনার প্রয়াসই সে জাতির বৃহত্তম অংশের কদর্য জীবন ও দাসবৃত্তির চরম গ্লানির যৌক্তিক প্রমাণ করে।

কয়েক বছর আগে ইংল্যান্ডের সংবাদপত্র মহলের একটি আলোচনার কথা আপনাদের কারো কারো নিশ্চয়ই স্মরণ আছে। প্রশ্নটি ছিল এই- মনে করুন, একটি কক্ষে একটি জীবন্ত শিশুর সংগে একটি সুবিখ্যাত ও অনুপম সুন্দর গ্রীক ভাস্কর মূর্তি রয়েছে; সম পর্যায়ের মূর্তির মধ্যে এ মূর্তিটি অসাধারণ ও অতুলনীয়; সুতরাং এর স্থান পূরণ অসম্ভব। এখন ধরুন, কক্ষটিতে আগুন লেগেছে, আর মূর্তি ও শিশুটির মধ্যে কেবল একটিকেই বাঁচানো সম্ভব; এ অবস্থায় কাকে বাঁচাতে হবে? আমার মনে আছে, প্রায় অধিকাংশ সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও পদস্থ ব্যক্তি হতভ্যাগ্য শিশুটির সামনে মৃত্যুর দ্বার উন্মুক্ত করে সেই অনুপম গ্রীক ভাস্কর্য মূর্তিটি রক্ষার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, প্রতিদিন লাখ লাখ শিশুর জন্ম হয়; পক্ষান্তরে প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য শিল্পের সেই শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনটির স্থান পূরণ কখনো সম্ভব হবে না। কোনো মুসলমান কখনো এই অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত অভিমত গ্রহণ করতে পারে না, কিংবা এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপোষক হতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে প্রতীকবাদিতা তথা প্রতিমাপূজার সর্বশেষ মার্জিত রূপ।

দূরদৃষ্টি ও পরিণামদর্শিতা ইসলামের বৈশিষ্ট্য। আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে, পূর্বাহ্নেই ফলাফলের কল্পরূপ সামনে রেখেই ইসলাম কর্মব্রতী হয় এবং গোটা মানবজাতির জন্য একটা উজ্জ্বলতম ভবিষ্যত গড়ে তোলার উদ্দেশ্য সামনে রেখে কাজ করে যায়। অবশ্যি,

www.pathagar.com

প্রতিটি মুসলিম আল্লাহর কাজে তার নিজস্ব জীবনকে উৎসর্গীকৃত মনে করে– আর আল্লাহর কাজকে সে মানবতার কাজ বলেই মনে করে। কিন্তু যত নগণ্য বলে মনে হোক না কেন, কোনো মানুষের জীবনকেই সে কখনো মানুষের হাতে তৈরি কোনো জিনিসের জন্যে উৎসর্গ করার কথা কল্পনাও করতে পারে না। আল্লাহর পথ-নির্দেশ এবং মানবজাতি সম্পর্কে তাঁর উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসহীনতাই শিল্প-কীর্তিকে উপাসনার সমপর্যায়ে বা পূজার বেদীতে অধিষ্ঠিত করার পেছনে কারণ যুগিয়েছে। বিতর্কের বিষয় হচ্ছে ঃ বহু শতাব্দী ব্যাপী মানুষের সৃষ্টি-সাধনার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হচ্ছে এই জিনসগুলো; সৌন্দর্য ক্রমে লোপ পেয়ে যাচ্ছে–আর মানুষেরও দিন দিন অবনতি হচ্ছে; সুতরাং আমাদের সামনে একটি আদর্শ হিসাবে অতীতের এই সুন্দরতম সৃষ্টিগুলোর প্রতি অবশ্যই আমাদের মর্যাদা আরোপ করতে হবে। এ যুক্তি হচ্ছে নৈরাশ্যবাদিতার নামান্তর মাত্র। আর ইসলাম হচ্ছে আশাবাদী। তবে ইসলামের এই আশাবাদীরূপ ভলটেয়ারের ব্যঙ্গাত্মক চরিত্র সেই অদ্ভুত দার্শনিক ডাক্তার প্যাংলোস-এর আশাবাদিতার অনুরূপ নয়। ডাঃ প্যাংলোস প্রায়ই অভিভূত কণ্ঠে বলতেন ঃ "সম্ভাব্য বিশ্বসমূহের মধ্যে উৎকৃষ্টতম এই বিশ্বে সবকিছুই উৎকৃষ্টতম কোনো কিছুর জন্যে।" এ হচ্ছে এমন একটি মন্তব্য, যা চিন্তাহীনের কাছে আশাবাদিতার স্বর্গকল্পনা বয়ে বেড়ায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে অদৃষ্টবাদিতা, যা নৈরাশ্যবাদেরই আর একটি রূপ। ইসলাম অদৃষ্টবাদী নয়। হ্যাঁ, আমি সে কথারই পুনরাবৃত্তি করছি। মুসলমানের অদৃষ্টবাদিতা সম্পর্কে যত কথা বলা হয়েছে এবং যত কিছু লেখা হয়েছে, তা সত্ত্বেও এই শব্দটির সাধারণ স্বীকৃত অর্থের দিক থেকে ইসলাম অদৃষ্টবাদী নয়। ইসলাম প্রচলিত অবস্থাকে অপরিহার্য অশুভ অবস্থা কিংবা মন্দভাগ্য হিসাবে গ্রহণ করতে মানুষকে নির্দেশ দেয় না. বস্তুতঃ ইসলাম অগ্রগতির তাগিদে বিরামহীন কর্মসাধনায় ব্রতী হতে মানুষকে নির্দেশ দেয়।

ইসলামের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে মানবিক প্রগতিমুখী। নানাবিধ অবজ্ঞা ও নিষেধাজ্ঞার মধ্য দিয়ে একদিকে মানুষের দৈনন্দিন, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে– অন্যদিকে সে-সংগে তার প্রতিটি মনোভঙ্গি তথা তার মন ও আত্মার প্রতিটি আবেগ অনুভূতির ক্ষেত্রে ইসলাম এই মানবিক প্রগতির সঠিক পথ প্রদর্শন করেছে। এই অনুজ্ঞা নিষেধাজ্ঞাগুলো একটি পূর্ণাংগ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন-ব্যবস্থার বিধিভুক্ত হয়েছে। এ হচ্ছে একটি কার্যকরী বা বাস্তবানুগ ব্যবস্থা। কেননা, এমন এক সাফল্যের সংগে এ ব্যবস্থার প্রয়োগ হয়ে এসেছে, যা ইতিহাসের এক পরম বিস্ময়। অনেক লেখক ইসলামের এই বিস্ময়কর সাফল্যের পেছনে বাইরের কতগুলো কারণ নির্দেশের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের এ স্বকপোলকল্পিত কারণগুলোর মধ্যে আশপাশের জাতিগুলোর দুর্বলতা, বেপরোয়াভাবে তরবারি ব্যবহার আর সময়ের সুযোগ গ্রহণ প্রভৃতি অন্যতম।

কিন্তু তাঁরা কি করে এর ব্যাখ্যা করবেন যে, মুসলমানরা যে পর্যন্ত পবিত্র বিধানের বিশেষ একটি অনুজ্ঞাকে নিষ্ঠার সংগে পালন করেছেন, সে পর্যন্ত তাঁরা সেই অনুজ্ঞার পরিসীমায় সফলকাম হয়েছেন এবং যখনি তারা এর অনুসরণে উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে, তখনি তাদের নিশ্চিত ব্যর্থতাকে বরণ করতে হয়েছে; আর কিভাবেই বা এর ব্যাখ্যা করবেন যে, আল-কুরআন ও ইসলামের মহিমান্বিত নবীর নির্দেশিত বিধান যে সমগ্র মানবজাতির জন্য কিংবা সমগ্র মানবজাতির অনুকরণীয় স্বাভাবিক বিধান– এ ধারণা ব্যতিরেকেও মুসলমানদের ওপর বিধিবদ্ধ কর্মপন্থা অনুসরণ করে কোনো অমুসলমানও সব সময়েই সেই কর্মের পরিসরে সফলতা অর্জন করেছেন?

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে এই বিধানগুলো হচ্ছে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক আইন। মানুষ তার চরম দুর্ভোগের দিনে–অথবা বলা যায়, জাতি তার দুর্দিনেই এই বিধান লংঘন করে থাকে। কোনো ব্যক্তি বিশেষের গবেষণা বা নিরীক্ষায় এই বিধানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে ইতিহাসের সুদীর্ঘ কাল-পরিক্রমায় কোনো জ্ঞানব্রতী ছাত্র ও চিন্তাবিদ শুধু বিক্ষিপ্তভাবে এর অংশ বিশেষের সন্ধান পেতে পারেন। নবী বা প্রেরিত পুরুষগণই এই সার্বজনীন বিধানের উদ্‌গাতা। অর্থাৎ কোনো নবীর মাধ্যমেই এই বিধান প্রকাশিত হতে হবে। শুধু এইটুকু ছাড়া এই বিধানগুলো আমাদের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ নিয়ামক প্রাকৃতিক আইনের মতই স্বাভাবিক যার বিরুদ্ধবাদিতার কথা কেউ ভাবতেও পারে না।

অন্যান্য ধর্মমত পরলোকে তার সে সব অনুগামীদের সাফল্য লাভের প্রতিশ্রুতি দান করে, যারা এই পৃথিবীতে দুঃখ, দৈন্য ও কৃচ্ছতা বরণ করে এর যোগ্যতা অর্জন করে। ইসলাম সকল মানুষকে যথাক্রমে ইহলোক ও পরলোকে সাফল্য ও ফলভোগের প্রতিশ্রুতি দান করে। এ সাফল্যের জন্য তাদের কেবলমাত্র কয়েকটি সাধারণ আইন ও সহজ সরল জীবন-বিধান মেনে চলতে হবে। খাঁটি মুসলমানের এ জীবন ও পরজীবনের মধ্যে কোনো পার্থক্য চিহ্নিত হয়নি; কেননা, আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশমন্ডলীর তথা স্বর্গ ও মর্তের প্রভু এবং ইহজীবন ও পরজীবনের সর্বময় ক্ষমতার অধিপতি। যারা আল-কুরআনের জীবন বিধান অনুসরণ করে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর আত্মসমর্পণ করে, তাদের–মৃত্যুতে নয়–বস্তুতঃ এ পার্থিব জীবনেই পরজীবনের যাত্রা শুরু হয়। আমাদের প্রতি নির্দেশে মহানবী (সঃ) ঠিক এ কথাই ঘোষণা করেছেন ঃ *মৃত্যুর আগেই মৃত্যুবরণ কর।*

ইসলাম এই পৃথিবীতে যে সফলকামিতার প্রতিশ্রুতি দান করেছে, তা অন্য অনেকের মূল্যের বিনিময়ে কোনো একজন মানুষ বা ব্যক্তি বিশেষের সাফল্য নয়; কিংবা অন্য জাতির অধঃপতন, ক্ষতি ও নৈরাশ্যের বিনিময়ে কোনো এক জাতির সাফল্য নয়; প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের সাফল্য সামগ্রিকভাবে মানবজাতির সাফল্য। বিশ্বের সর্বত্র প্রতিটি মসজিদ থেকে দিনে পাঁচবার এই আহ্বানই ঘোষিত হয় ঃ *এসো, ফালাহ্‌তে শরীক হও! এসো, ফালাহতে শরীক হও।* অথবা *কল্যাণ-অভিসারের পথে এসো! কল্যাণ-অভিসারের পথে এসো!*

আরবী শব্দ ফালাহ্ কথাটির অর্থ কল্যাণ-অভিসার বা অনুশীলনের মাধ্যমে সাফল্য লাভ। মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে ব্যবহৃত ঠিক অনুরূপ আর একটি আরবী শব্দ রয়েছে, পারিভাষিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর মৌলিক বা অন্তর্নিহিত অর্থটি আমরা প্রায়ই বিস্মৃত হই। সে শব্দটি হচ্ছে ঃ যাকাত বা "অতিরিক্ত ভাগ যা অনুশীলন কিংবা সরাসরি ছাঁটাই বা বন্টনের মাধ্যমে ফলন বা বৃদ্ধির কারণ ঘটায়।" এই নামেই ইসলামী দরিদ্র-করের নামকরণ করা হয়েছে। আল-কুরআনে 'সালাত' বা উপাসনার সমপর্যায়ে কর্তব্য হিসেবে বারবার যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ যাকাত সমাজের উৎকর্ষ-লব্ধ ক্রম-উন্নয়নশীল অগ্রগতির একটি প্রধান কারণ। মহানবী (তাঁর ওপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক) বলেছেন ঃ *ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করতে হবে এবং গরীবদের মধ্যে তা বন্টন করতে হবে।* এ দরিদ্র-কর নিয়মিত ও সঠিকভাবে সংগ্রহ করার সময় মুসলিম সমাজের অবস্থা অগ্রগতির এমন এক উচ্চতম পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল যে, বহু দূর দূরান্ত পর্যন্ত বন্টনকারীদের ব্যাপক অনুসন্ধানের পরও যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত কোনো দুঃস্থ ও বঞ্চিত মুসলমানকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হতো না।

www.pathagar.com

সুতরাং যাকাতের সংগৃহীত অর্থ সাধারণ জনকল্যাণের কাজে ব্যয় করা হতো। আল কুরআনের ভাষায় ঃ

> সে সত্যি সফলকাম, যে মানবতার বিবর্তন ও বিকাশ সাধনে সহায়ক হয়েছে। আর সে সত্যি ব্যর্থকাম, যে এর বিকাশ রোধ করেছে এবং একে অনশনে রেখেছে।

আল-কুরআনের আর এক জায়গায় বলা হয়েছে :

> সে সফলকাম হয়েছে, যে আত্মবিকাশ সাধন করেছে (এবং পবিত্রতা লাভ করেছে); আর যে তার স্রষ্টা প্রভুর নাম স্মরণ করে এবং সালাত কায়েম করে।

অনেকে ভাবতে পারেন যে, এগুলো হচ্ছে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কতকগুলো ভাবময় ধর্মীয় অভিব্যক্তি মাত্র। কিন্তু আসলে, বাস্তবভিত্তিক না হলে ইসলাম সম্পূর্ণ অর্থহীন। আরো সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে, বাস্তব মূলবোধ না থাকলে ইসলামের কোনো মানেই হতো না এবং এই সব অভিব্যক্তি ইসলামে কেবলমাত্র নিষ্প্রাণ হরফ সমষ্টির অন্তরালে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। কেননা, এগুলোকে বৃহত্তর পর্যায়ে সাহায্য, সেবা ও দানশীলতার একটি সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা হিসেবে বাস্তবরূপ দান করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম ভিন্ন এ ধরনের বাস্তবভিত্তিক, এমন ব্যাপক ও মহত্তর প্রচেষ্টা আর কোথাও হয়নি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ ব্যবস্থা মুসলিম বিশ্বের যাবতীয় সামাজিক সমস্যার সমাধান করেছে। আল-কুরআন আমাদের বলে, খাঁটি ধর্ম বাস্তববাদী– তত্ত্ব-নির্ভর ও অনুষ্ঠান সর্বস্ব নয়।

> পূর্ব ও পশ্চিম অভিমুখে তোমাদের মুখ ফেরানোর মধ্যে কোনো সাধুতা বা ধর্মনিষ্ঠা নেই, প্রকৃতপক্ষে সেই সদাচারী ও ধর্মনিষ্ঠ, যে আল্লাহ ও শেষ বিচার দিন, ফেরেশতাগণ ও ঐশী গ্রন্থ এবং নবীদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, আর আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় তার সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, অনাথ-এতিম অভাবগ্রস্ত, গৃহহীন ও সায়েলদের সাহায্যে এবং দাসদের মুক্তি সাধনে দান করে; আর তারা, যারা নিয়মিতভাবে আল্লাহর উপাসনা করে, দরিদ্রদেরকে (তাদের) ন্যায়ানুগ হিস্যা (অংশ) দান করে এবং যারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে তা পালন করে–আর যারা আপদে ও দুর্দশায় ধৈর্য ধারণ করে। এরাই হচ্ছে তারা যারা অকপট ও সত্যনিষ্ঠ। এরাই হচ্ছে তারা, যারা প্রকৃত শুদ্ধাচারী – যারা আত্মাকে দুষ্কৃতিমুক্ত রাখে। *(সূরা বাকারা)*

আল-কুরআনে অনেক জায়গা এ কথাটি আছে :

> যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকাজ করে;

অর্থাৎ যারা আস্থাবাদী ও সৎকর্মশীল।

পবিত্র কুরআনে কতবার এ উক্তি উচ্চারিত হয়েছে!

> যারা বিশ্বাস করে এবং আর কোনো কিছুই করে না।

মানে যারা বিশ্বাসী, কিন্তু কর্মবিমুখ, ইসলামে তাদের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। "যারা বিশ্বাসী, কিন্তু দুষ্কৃতিকারী" তাদের কথা ধারণাই করা যায় না– তারা সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। কেননা, ইসলামের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর ইচ্ছার ওপর মানুষের আত্মসমর্পণ। সুতরাং, আল্লাহর বিধান বা আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনও এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর আইন হচ্ছে নিরন্তর উদ্যমময় ও গতিশীল–অলসতা বা কর্মবিমুখতার স্থান এতে নেই।

ইসলামের স্বর্ণযুগে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে কোনো পার্থক্য চিহ্নিত হয়নি। সব রকমের শিক্ষাকেই ধর্মীয় অঙ্গনে স্থান দেয়া হয়। এ সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালে জনৈক ইউরোপীয় লেখকের একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। এতে বলা হয়েছে ঃ ইসলামের

www.pathagar.com

এক গৌরবময় কীর্তি হচ্ছে, ইসলাম কুরআন, হাদীস ও মুসলিম বিধান-শাস্ত্র ফিকাহ্‌র অধ্যয়ন ও অনুশীলনের অনুরূপ অন্য সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনাকেও সমান আসন ও মর্যাদা দান করেছে এবং মসজিদে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মসজিদে কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ্‌র ওপর আলোচনার সংগে একই ভাবে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভেষজ বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপরও আলোচনা করা হতো। কেননা, স্বর্ণযুগে মসজিদই ছিল ইসলামের বিশ্ববিদ্যালয়। দেশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের প্রতি ক্ষেত্র প্রতি প্রান্ত থেকে লব্ধ যুগের সমস্ত জ্ঞানধারাকে সেদিন মসজিদের অঙ্গনে সাদরে বরণ করা হতো। এই আশ্চর্য বৈচিত্র্যময় সম্মিলন আর সর্বজ্ঞানের চরম উৎকর্ষই প্রাচীন মুসলিম মনীষীদের চিন্তাধারায় এক অনুপম বৈশিষ্ট্য দান করেছে– যা তাঁদের প্রতিটি পাঠকের মনেই রেখাপাত করে; এ হচ্ছে বিদগ্ধ মনের এক শান্ত স্থিত মহিমাময় রূপ।

ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং ধর্মবাদের মতো কোনো মতবাদের অস্তিত্ব নেই। কেননা, খাঁটি ধর্ম মানুষের উদ্যম ও কর্মধারার সমগ্র পরিসরকেই তার আওতাভুক্ত করে। পবিত্র কুরআনে ভালো ও মন্দ তথা সুকৃতি ও দুষ্কৃতির মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করা হয়েছে। সুকৃতি মানুষের বিকাশ ও উন্নয়নের সহায়ক, আর দুষ্কৃতি এর পক্ষে চরম হানিকর। ইসলাম মুক্তবুদ্ধিবাদী ধর্ম। এ ধর্মে সে মানুষের স্থান নেই, যে সেন্ট অগাস্টিনের সংগে স্বর মিলিয়ে বলে ঃ Credo quia absurdum est "আমি বিশ্বাস করি, যেহেতু এটা অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য"। আল-কুরআন বারবার অযৌক্তিক বা মুক্তবুদ্ধিবর্জিত ধর্মকে বাতিল ঘোষণা করেছে। কেননা, কুরআনের দৃষ্টিতে যুক্তিহীন ধর্মমত ধর্ম হিসেবে সম্পূর্ণ বাতিল ও অন্তঃসারশূন্য। বারবার কুরআন ধর্মীয় ক্ষেত্রে যুক্তি ও সাধারণ বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের জন্যে মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। সমস্ত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এটা প্রমাণ করে যে, মানবিক অগ্রগতির জন্যে অপরিহার্যভাবে ব্যাপক মুক্তবুদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। এবং সে সংগে ইতিহাস একথাও প্রমাণ করে, যে-সব জাতি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হারায়, তাদের অধঃপতন অনিবার্য। আল্লাহর প্রতি জাগ্রত বিশ্বাস এবং প্রশস্ত মুক্তবুদ্ধি- এ দুটো কি সংগতিহীন? পাশ্চাত্যের এক শ্রেণীর বেশ কিছুসংখ্যক চিন্তাবিদ মনে করেন, এ দু'য়ের মধ্যে কোনো সংগতি থাকতে পারে না। কিন্তু ইসলাম প্রমাণ করেছে, এ দুটো বিষয় সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সমন্বয়শীল।

সাফল্যের ফলশ্রুতিবাহী ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোতে প্রতিটি বৈষয়িক ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি অবিমিশ্র বিশ্বাসের সংগে মুক্তবুদ্ধির সমন্বয় সাধন করা হয়েছিল। কারণ, ইসলাম পৃথিবীর ওপরে এমন কোনো কিছুকেই এত পবিত্র মনে করে না, যা সমালোচনামুক্ত বা সমালোচনার নাগালের বাইরে। কেবল অসীম অলৌকিক শক্তিময় একজন মাত্র আছেন অকল্পনীয় অদ্বিতীয় সত্তাময় এমন একজন, যাঁর একত্বে একবার বিশ্বাস স্থাপনের পর আর কোনো আলোচনার অবকাশ থাকে না। তিনি সকলের জন্যে সার্বজনীনভাবে মঙ্গলময় ও দয়ালু। তিনি মানুষকে যুক্তি, প্রজ্ঞা ও কার্যকারণ নিরূপণের প্রতিভা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মুসলিম মনীষী লেখকরা মানুষের প্রতি আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম দান হিসেবে এ কার্যকারণ জ্ঞানকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। যা শুভ ও কল্যাণকর তার অনুরসণ এবং যা মন্দ ও অকল্যাণকর তার পথ বর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ যাতে সম্পূর্ণ অবাধে আল্লাহর নামে তার এই বিচারবুদ্ধি ও কার্যকারণজ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে, সে জন্যেই আল্লাহ তাকে এ ক্ষমতা দান করেছেন। আর এ

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যের অনুগমনের ক্ষেত্রে পবিত্র সংবিধানে পথ নির্দেশ ও রক্ষা কবচের ব্যবস্থা রয়েছে। ইসলামে কোনো পৌরোহিত্যবাদ নেই। অন্যান্য ধর্মে সব রকম অধিকার ও কার্যক্রম অস্বাভাবিকভাবে পুরোহিত সম্প্রদায়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামের সমাজ-ব্যবস্থায় এসব অধিকার ও দায়িত্ব প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষের ওপর আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং এ প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ স্বাভাবিকভাবেই নেতৃত্বপদ লাভ করেন।

কোনো নর-নারীর জীবনের চলার পথে আলোক-সঞ্চারের পক্ষে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হচ্ছে তৈলবিহীন একটি প্রদীপের মতো। তাই এই যুক্তি-জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধনের সংগে সার্বজনীন শিক্ষার নির্দেশ বিধৃত হয়েছে। মহানবী বলেছেন : *জ্ঞানানুশীলন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্যে অবশ্য কর্তব্য বা ফরজ।*

এভাবে তেরশ' বছর আগে নর ও নারী উভয়ের জন্যেই সার্বজনীন শিক্ষা ইসলামের পবিত্র সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে পাশ্চাত্য সভ্যতা একে সাদরে বরণ করে নেয়। মহানবী একথাও বলেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে : *জ্ঞানার্জনের সন্ধান কর, যদি সে জ্ঞান চীনেও থেকে থাকে।*

নিম্নোক্ত নির্ভরযোগ্য হাদীসটি থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, জ্ঞানানুশীলনের ওপরই কেবলমাত্র গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি–জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের ওপরও সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে : *নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছে থেকে জ্ঞানকে ছিনিয়ে নেবেন না, প্রকৃতপক্ষে, তিনি জ্ঞানসাধকদের পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে (রাজ্য) শূন্যতা সৃষ্টি করবেন। এর ফলে এমন অবস্থার উদ্ভব হবে যে, কোথাও কোনো খাঁটি জ্ঞানী ব্যক্তি বা আলেম অবশিষ্ট থাকবে না। তখন মানুষ মূর্খদেরকে তাদের নেতা বা পথপ্রদর্শক হিসেবে বরণ করবে এবং তাদের নানা বিষয়ে প্রশ্ন করবে (নানা বিষয় সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে চাইবে)। এবং তারা (সেই মূর্খ নেতাগণ) কোনোরূপ জ্ঞান ব্যাতিরিকেই ফতোয়া দান করবে। (এরফলে) তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে।*

এ উক্তিতে ইসলামের বর্তমান অবস্থা সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। আমাদের মধ্যে এখন এমন বহু সংকীর্ণচিত্ত গোঁড়া আলেম দেখা যায়, যাঁদের জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহের কারণ রয়েছে। তবে এখানে জ্ঞান শব্দটি যে অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে যে জ্ঞান রয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রশস্ততর এবং অধিকতর মানবীয়।

এছাড়াও মহানবী বলেছে : *জ্ঞান-সাধকের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্রতর।* তিনি আরো বলেন, *আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে এক ঘন্টার নীরব চিন্তা ও গবেষণা এক বছরের উপাসনার চেয়েও উত্তম।*

তাঁর আর সব উক্তিতে আছে ঃ *"যে জ্ঞান সাধনা করে, তার মৃত্যু নেই– সে অমর।" "যে জ্ঞান-সাধকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, সে আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।" "প্রথম যে জিনিস সৃষ্টি করা হয়েছিল তা হলো-বিচার বুদ্ধি বা কার্যকারণজ্ঞান।" "আল্লাহ বিচার বুদ্ধির চেয়ে উৎকৃষ্ট কোনো কিছুই সৃষ্টি করেননি। এর দ্বারাই আল্লাহ আমাদের কল্যাণবিধি করেছেন, এবং এর সাহায্যেই আমরা সবকিছু বুঝি ও অনুধাবন করি, আর এর জন্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ ঘটে থাকে, এবং এর মধ্যেই পুরস্কার ও শাস্তির কারণ নিহিত*

www.pathagar.com

রয়েছে।" তিনি বলেন ঃ "জ্ঞানসাধকের কথা শোনা এবং অন্যদের মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রেরণা সৃষ্টি ধর্মীয় উপাসনা-অনুশীলনের চেয়েও মহত্তর।" "যে জ্ঞান-সাধনার উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করে, সে আল্লাহর রাস্তায় পদচারণা করে।" "জ্ঞান তার অধিকারীকে মন্দ থেকে ভালো কিংবা দুষ্কৃতি থেকে সুকৃতির পার্থক্য নিরূপণে সাহায্য করে; জ্ঞান বেহেশ্‌তগামী পথকে আলোকিত করে। ঊষর মরুতে এ আমাদের বন্ধু, নিভৃতবাসে আমাদের সমাজ, আর বন্ধুহীন অবস্থায় আমাদের সহচর। এ সুখের পথের সন্ধান দেয় এবং দুঃখের গুরুভার বহনের শক্তি দান করে। বন্ধুদের মধ্যে এ হচ্ছে একটি ভূষণ, এবং দুশমনদের বিরুদ্ধে এ হচ্ছে এক দুর্ভেদ্য বর্ম।' "দেখ! ফেরেশতাগণ জ্ঞান-সাধকের ওপর তাদের আলোর পাখা বিস্তার করেছে।" "যাদের জ্ঞান আছে, আর যাদের নেই তারা কি সমপর্যায়ভুক্ত?" "জ্ঞানী ব্যক্তির স্থান ধর্মব্রতীর ওপরে; আর আমার স্থান তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে অধস্তন ব্যক্তির ওপরে।"

তিনি বলেন, একজন মানুষ নামাজ, রোজা, যাকাত, দান-খয়রাত ও হজ্বব্রত অনুষ্ঠান এবং অন্যসব ধর্মীয় কর্তব্য পালন করতে পারে। কিন্তু জীবনে যে পরিমাণ সাধারণ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে সে পরিচালিত হয়েছে, ঠিক সে অনুপাতেই তাকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনি আরো বলেন, জ্ঞান আছে–অথচ যে তা জীবনে চলার পথে প্রয়োগ করতে জানে না, সে 'বইয়ের বোঝাবাহী একটি গাধার মত'।

ইসলামে কোনো অজ্ঞ মুসলমানের অস্তিত্বের কথা পবিত্র কুরআনে কখনো ধারণা করাও হয়নি এবং মহানবী হযরত মোহাম্মদও (সঃ) তা কখনো কল্পনা করতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে, 'অজ্ঞ মুসলমান' কথাটি 'মুসলমান' পদবাচক সংজ্ঞার পরিপন্থী বা বিপরীতার্থক। ইসলামের গৌরবময় দিনে একজন 'দরিদ্র মুসলমানের' মতো একজন অজ্ঞ মুসলমানকেও খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর হতো।

ইসলাম ধর্মকে তার যথার্থ কর্মাংগন দৈনন্দিন জীবনে ঠাঁই দিয়েছে। কুরআনে আল্লাহর যে 'নূর' বা আলোর কথা বলা হয়েছে, আল্লাহর পথ-নির্দেশ অনুসরণকারীদের প্রত্যেকের কাছে তার অর্থ সুস্পষ্ট। কেননা, এ হচ্ছে এমনি এক নিত্যদিনকার আলো, যা আল্লাহর স্বতঃনিসৃত শুদ্ধ পুত জ্ঞান দ্বারা রূপান্তরিত, উদ্ভাসিত এবং মহিমান্বিত হয়। ধর্মের লক্ষ্য ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত কোনো দীর্ঘ-বিলম্বিত সুদূর আশ্রয়ী বস্তু নয়; তা এখানে– এই প্রবাহমান বর্তমানের মধ্যেই রয়েছে; রয়েছে আমাদের সহগামীদের সুকৃতি ও নিত্যদিনকার কর্মাংগনের মাঝে। মহানবী যে সত্যের কথা বলেন, আরবের প্রতীকবাদীরা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে তাঁকে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনের জন্যে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। এই প্রতীকবাদীদের সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয় ঃ

> এবং তারা বলে ঃ একি স্বভাব-বৈশিষ্ট্য আল্লাহর প্রেরিত একজন নবীর–যিনি (সাধারণ) খাদ্য গ্রহণ করেন এবং নগর ও বাজারের পথে পদচারণ করেন? কেন তাঁর সংগে সতর্ককারী হিসেবে একজন স্বর্গীয় দূত (ফেরেস্তা) পাঠানো হয় না? অথবা (কেন) তাঁকে ঐশ্বর্যপূর্ণ একটা ধনাগার দান করা হয় না? অথবা (কেন) তাঁর এমন একটা বেহেশত নেই যা থেকে তিনি খাদ্যসামগ্রী পেতে পারেন? দুষ্কৃতিকারীরা তাই বলে ঃ তারা (বিশ্বাসীরা) যার অনুসরণ করছে সে একজন সম্মোহনকারী (যাদুকর) ছাড়া আর কিছুই নয়।

www.pathagar.com

আর আল্লাহ যে-ভাষায় দুষ্কৃতিকারীদের এই মনোভাবের জওয়াব দিয়েছেন তা থেকে অত্যন্ত সহজ ও সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় অলৌকিক ঘটনা আল্লাহর প্রেরিত নবীর প্রতি স্বীকৃতির প্রমাণ বা নিদর্শন নয়। কেননা মানুষের বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কাছেই নবীদের আবেদন জানাতে হবে—তাদের দুর্বল চেতনা বা কৌতুহলপ্রবণতার কাছে নয়। আল-কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ

> "আমরা তোমার পূর্বে এমন কোনো নবী পাঠাইনি যারা খাদ্যগ্রহণ ব্যতিরেকে ছিল এবং নগর-বাজারের পথে পদচারণা করেনি।"

এর অর্থ হচ্ছে, প্রাচীন কালের যেসব নবীকে লোকে অতিমানবিক সত্তা বলে মনে করতো, তাঁরাও সাধারণ মানুষ ছিলেন এবং তাঁরা আল্লাহর নামে অন্যদের কাছে আবেদন জানাতেন।

ইসলামের শিক্ষার দৃষ্টিতে অলৌকিকতা ঐশী শক্তির এবং ধর্মের প্রাণবস্তুর প্রমাণ-নির্দেশন বা বৈশিষ্ট্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, অলৌকিক শক্তি প্রাকৃতিক আইনের বিধানকে খুব কমই লংঘন করে থাকে। কেননা প্রাকৃতিক আইন মৌলিকভাবে ঐশী শক্তিসঞ্জাত এবং স্বয়ং আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। অলৌকিকতা বা অলৌকিক শক্তি বৈচিত্র্য হচ্ছে, লক্ষ্যের পথে চলাকালে কোনো বিশেষ স্তরে মানবিক অগ্রগতি—কিংবা বলা যায় মানুষের আত্মিক অগ্রগতির এক বিশেষ প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন। আত্মিক অগ্রগতির এই স্তরে সাধারণ মানুষের কাছে অপ্রকাশিত নিয়মাধারা বা বিধানসমূহ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। হজরত মুহম্মদ (দঃ)-এর জীবনের সংগেও বহু অলৌকিক ঘটনা জড়িয়ে আছে। কিন্তু কোনো মুসলমান এগুলোকে তাঁর নবুয়ত কিংবা তাঁর নবীসুলভ কর্মব্রতের প্রমাণ বা নিদর্শন বলে মনে করে না। আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট বাণী ও কর্মের লব্ধ সাফল্য—আল কুরআন এবং মহানবীর প্রচার, আর এ দুয়ের সামগ্রিক ফলাফল—এদের নিজস্ব সাক্ষ্য বহন করছে। আর এগুলো সমস্ত অলৌকিকতার উর্ধ্বে।

তবে এটা সত্য যে, প্রত্যাদেশবাদী মুসলমানদের বেশির ভাগই আজ অজ্ঞ, গোঁড়া ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তারা জনশ্রুতি, প্রবাদ, আজগুবী কাহিনী ও অসম্ভব বিশ্বাসকে ধর্ম-বিশ্বাসের সংগে যুক্ত করেছে। কিন্তু যেখানে মানুষের মন কঠোর বাস্তবধর্মিতা এবং সমাজের প্রচলিত অবস্থা ও প্রবাহমান বর্তমানের আলোকে উদ্ভাসিত, সেখানে সব সময়ই এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস সংশয়বাদিতা ও নাস্তিকতার অস্ত্রের হুমকীর সম্মুখীন। তবে এটাও ঠিক যে, এসব কুসংস্কার ও প্রবাদের এক বিরাট অংশই প্রাচীন কালের এক বিলুপ্ত বিজ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব বহন করছে। ইসলামের অন্তর্বাণী ও যুগধর্মী মুল্যবোধ এই স্থবির অচলায়তনের বুকে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা কামনা করে। কেননা, মুসলমানের মন পৃথিবীর সর্ব ক্ষেত্রে- সর্ব পরিস্থিতিতেই স্বাধীন ও সংস্কারমুক্ত; অবশ্য এই মুক্তিচিন্তা তখনি সম্ভব, যখন সে তার দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশ ও অগ্রগতির উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত কতগুলো বিধি বিধান যথার্থভাবে পালন করে। তার যুগের বিজ্ঞান-সাধনা ও বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির উদ্ভাবন এবং তার মন যা কিছুকে শ্রেয়তর মনে করে, সে সবকিছু গ্রহণ ও বাস্তবায়ন তার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত—এমন কি, যদিও তা মুসলমানদের মধ্যে বহু পূর্ব থেকে প্রচলিত কোনো বিশ্বাস কিংবা তাদের বিশেষ কোনো প্রবণতার পরিপন্থী হয়। কিন্তু এ তার ধর্ম-বিশ্বাসকে কখনো স্পর্শ করতে পারে না, যার প্রাণ-বাণী হচ্ছে ঃ "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো নিয়ন্তা বা প্রভু নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট নবী।" এ হচ্ছে

www.pathagar.com

সেই জীবনবাদী ধর্ম-প্রখ্যাত জড়বাদী চিন্তানায়ক গীবন যাকে একটি শাশ্বত সত্য ও একটি প্রয়োজনীয় উপাখ্যানের সমন্বয় বলে অভিহিত করেছেন। তবে ঐতিহাসিক পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি উপাখ্যান বা কাহিনীসুলভতার যৌক্তিকতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

ইসলামের বাস্তব ও কার্যকরী শিক্ষা এবং প্রবাদ ও জনশ্রুতির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের জন্য মুসলমানদের মধ্যে অধুনা এক ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এ সব জনশ্রুতি ও প্রবাদকে পুরানো জীর্ণ পোশাকের মতোই আজ ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসে জুব্বার প্রভাবের অপ্রাধান্য দেখে খৃষ্টানদের ধর্মীয় সংস্কারের বিভ্রান্ত সমালোচকগণই কেবল বিস্মিত হবেন। কেননা, তারা ধর্ম বিশ্বাসের সাথে তার বাইরের আবরণকে এক করে দেখেন- যা মুসলমানরা কখনো করেনি।

আল-কুরআনে মানুষকে প্রাকৃতিক ঘটনা-বৈচিত্র্য, দিন-রাতের পর্যায়ক্রম, মাটি, বাতাস, আগুন ও পানির উপাদান, জন্ম-মৃত্যু, বিকাশ ও বিলুপ্ত (কিংবা উত্থান ও পতন) আর প্রাকৃতিক নিয়ম ও শৃঙ্খলার ধারা পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়মশৃঙ্খলা হচ্ছে এমন এক স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবস্থা, যা মানুষের হাতে প্রণীত হয়নি এবং মানুষ যাকে এক চুল পরিমাণও অবনত, স্থানচ্যুত কিংবা পরিবর্তন করতে পারে না। মানুষ যে এই জাগতিক বিশ্বের সার্বভৌম নিয়ন্তা নয়, এর প্রমাণ হিসেবেই তাকে এই প্রাকৃতিক রহস্যসমূহ পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবনের জন্যে বলা হয়েছে। মানুষের মুক্তচিন্তা, গবেষণা ও সাফল্যজনক প্রচেষ্টার পরিসীমা একটি সার্বভৌম ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তার অধীন একটি 'আরোপিত শক্তি' ছাড়া আর কিছুই নয়। এই স্বয়ংসম্পূর্ণ সার্বভৌম সত্তা মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক এবং জগতসমূহের নিয়ন্তা মহিমান্বিত আল্লাহ। নিয়মগত ভাবেই মানুষ তার প্রাকৃতিক অবস্থার বিস্ময়কর রহস্য এবং তার চারপাশে যে শাশ্বত বিধান নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে, তা উপলব্ধি করতে পারে না। কেননা, এগুলো কখনো তাকে নিরাশ করে না। এক অসাধারণ সৃজনশীল শক্তির রহস্য চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে রেখেছে- যে শক্তি নিষ্ফল কিংবা ব্যর্থ হয় না; আর অলংঘনীয় একটি আইন ও নিয়ম ধারার অধীন করে একটি বিশ্বে তাকে অভিষিক্ত করা হয়েছে। এবং এমন প্রত্যক্ষভাবে সে এ নিয়মের অধীন যে এর বিধানসমূহ (যা সে প্রণয়ন করেনি) মান্য না করে সে একটি নিশ্বাস ফেলতে পারে না, একটি আঙ্গুল হেলাতে পারে না, একটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না এবং এতটুকু কল্পনা বা চিন্তা পর্যন্ত করতে পারে না। সাধারণভাবে মানুষ এই বিষয়গুলো নিয়ে খুব সামান্যই চিন্তা করে। কেননা, নিজকে নিয়েই সে অনুক্ষণ ব্যস্ত থাকে এবং নিজের কর্মশক্তির সীমিত জগতে যে কোনো পোকা মাকড়ের মতই স্বার্থের দ্বন্দ্বে সে নিজেকে আবদ্ধ রাখে। তার এই গণ্ডিবদ্ধ পরিসীমাকেই সে সবচেয়ে বড় মনে করে এবং শুধু তার বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্যের জন্যেই সে একজন ভাগ্যবিধাতার প্রয়োজন অনুভব করে। এই আত্মকেন্দ্রিকতার উপাসনা করতে যেয়ে সে সমগ্র সৃষ্টির প্রয়োজন এবং স্রষ্টার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একজন স্রষ্টা আর একটা উদ্দেশ্যের কথা স্বীকার করে নিলেই আমরা বিশেষ বা বিরাট কিছু আশা করতে পারি না। আমাদের অবশ্যই আল্লাহর ইচ্ছা এবং সৃষ্টির মূলে যে উদ্দেশ্য কাজ করছে, তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে; এবং একমাত্র তখনি আমরা সাফল্য আশা করতে পারি।

www.pathagar.com

সত্য সত্যই মানুষ বিদ্রোহাচরণ করে (অর্থাৎ সে তার সীমার বাইরে চলে যায়) এবং এজন্যই সে নিজকে স্বাধীন বা অমুখাপেক্ষী মনে করে। (হে শ্রোতৃবৃন্দ) তোমাদের অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

কয়েক বছর আগে স্কটল্যান্ডের জনৈক ধর্মযাজকের একখানা বইয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বইটা তেমন আকর্ষণীয় কিছু নয় এবং ইংরেজি ভাষাভাষী মানুষের কাছে তেমন কোনো সাড়া জাগাতে পারেনি। বইটার নামকরণ করা হয় ঃ 'আধ্যাত্মিক জগতের প্রাকৃতিক আইন।' কেবলমাত্র নামের জন্যেই আমি বইটার উল্লেখ করছি। কেননা, ইসলামের প্রত্যাদেশবাণীকে আরো ব্যাপকভাবে প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে এবং এই প্রশস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে এভাবে অভিহিত করা যায় ঃ 'আধ্যাত্মিক জগত, সামাজিক জগত এবং রাজনৈতিক জগতের প্রাকৃতিক আইন।' যে প্রাকৃতিক আইন মানুষের দৈহিক অস্তিত্ব নিয়ন্ত্রণ করে, ইসলাম তার কাছেই আল্লাহর প্রকৃত প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের সাক্ষ্যদানের জন্যে তথা প্রামাণ্য নির্দেশের আবেদন জানায়; এবং তারপরই প্রমাণ করে কিভাবে ঠিক একই আইন মানুষের আধ্যাত্মিক, সমবায়িক বা সামগ্রিক জীবনও নিয়ন্ত্রিত করে। সকল নবী ও সূফি-সাধকদের জীবনের সংগে সংশ্লিষ্ট সমস্ত অলৌকিক ঘটনাকে এত কম গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে যে, এগুলোর উপর বিশ্বাস স্থাপন বাধ্যতামূলক বা অপরিহার্য নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে যা কিছু বাধ্যতামূলক, তা হচ্ছে আল্লাহর সার্বজনীন সার্বভৌমত্ব এবং হজরত মুহাম্মদ (আল্লাহ তাঁর ওপর শান্তি বর্ষণ করুন) এর নবুয়ত এবং আল্লাহর মানবিক দূত হিসেবে অন্যান্য নবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন। আল-কুরআনের একটি অনুবাদ পড়ার পর ইসলামের এই স্বাভাবিক ও বাস্তবধর্মী বৈশিষ্ট্য দেখেই সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম জার্মান কবি গ্যোটে বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে বলেছিলেন ঃ "এ যদি ইসলাম হয় তবে আমাদের মধ্যে প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তিই একজন মুসলমান।"

গণতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র কিংবা ধনতন্ত্র–অথবা আধুনিক যুগে পরীক্ষিত অন্য কোনো মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে সম্পূর্ণভাবে নীতি ও আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইসলামী সংস্কৃতি আধুনিক চিন্তার ক্ষেত্রে অপাঙক্তেয়–এই অজুহাত তুলে আধুনিক বিশ্বের এক শ্রেণীর লোক–বিশেষ করে করে সবেচেয়ে সচেতন একটি শ্রেণী ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করবে। এবং কেউ একথাও যোগ করতে পারে যে, তাদের সকলেই একযোগে ইসলামী সংস্কৃতিকে ধর্মীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে ওপরের যে–কোনো মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাইবে। আরো স্পষ্ট করে বলা যায় ঃ তারা ধর্মীয় বা নৈতিক আদর্শ ছাড়া অন্য যে-কোনো মতবাদের ওপর ইসলামী সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাইবে এবং সমস্বরে এর প্রতি সমর্থন করতে দেখা যাবে।

ধর্মের পরোক্ষ আদর্শকে ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং মূল্যবোধের গণ্ডিতে সীমিত করে দেয়নি। তাই কেবল উপাসনার সময়ে ধর্মকে স্মরণ করা হয় এবং অন্য সময়ে ভুলে যাওয়া হয়– ধর্ম সম্পর্কে এই ধরনের নিরাসক্তি এবং জীবন থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখার মনোভাব ইসলামে ঠাঁই পায়নি। প্রকৃতপক্ষে, খাঁটি, কার্যকরী ও পূর্ণাংগ ধর্মীয় আদর্শবাদকেই ইসলাম স্বীকৃতি দেয় এবং সব সময়ে এই আদর্শের অনুসরণ করে। জনৈক প্রখ্যাত ইউরোপীয় রাজনীতিবিদ ধর্মীয় আদর্শবাদ সম্পর্কে এই কটাক্ষ করে বাহ্‌বা লাভ করেন যে, প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে সর্বশক্তিমানের কোনো ভূমিকা নেই। সাম্প্রতিক ইতিহাসের পাঠকদের চোখে ইউরোপীয় রাজনীতির প্রধান যে ত্রুটিগুলো সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে ঃ তারা আল্লাহর কার্যক্রম তথা কোনো অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা, যা বাস্তব পরিকল্পনাসমূহে ওলোট-পালট করে দেয়– তার প্রতি

www.pathagar.com

কোনোরূপ গুরুত্ব আরোপ করেনা। আল্লাহর পরিণামসূচক আইন এখনো কার্যকরী রয়েছে। ভালোর পরিণাম এখনো ভালো এবং মন্দের পরিণাম পরবর্তী যে কোনো অবস্থায়ই মন্দ। এ স্বাভাবিক পরিণাম সম্পর্কে যত লোকই চোখ বুঁজে থাক না কেন, এ ঘটবেই। আমাদের সময়ে যত অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা ঘটেছে, তার মধ্যে দৃষ্টান্ত হিসেবে রুশ বিপ্লব ও তুরস্কের ওপর গ্রীক হামলার ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ নিঃসন্দেহে আল্লাহর পরিণামসূচক কাজ, যা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিশ্চিত সাফল্যের সম্ভাবনাবাহী লোলুপ আকাঙ্ক্ষা প্রবণ পরিকল্পনাসমূহ এবং রাষ্ট্রনীতিবিদদের সুপরিকল্পিত চক্রান্তকে নস্যাত করে দিয়েছে।

আল্লাহর শাসন-ব্যবস্থা বা খেলাফত সম্পর্কে যা বলা হয়েছে এবং যার কিছুটা বাস্তবায়িত করতে ইসলাম সক্ষম হয়েছে, তার আলোকে বিচার করলে আমার কাছে মনে হয়, মধ্যযুগের সংগে আধুনিক বিশ্বের মোটেই কোনো পার্থক্য নেই। এ মতের বিরুদ্ধবাদীগণ শুধুমাত্র ভুয়া প্রমাণপঞ্জিকে মূলধন করে তর্ক তুলবেন। কেননা, মধ্যযুগে ইউরোপে ধর্মতন্ত্রের যে আদর্শবাদ বিদ্যমান ছিল, তা আজগুবী প্রবাদ-কাহিনী, গীর্জার স্তোত্র ও আচার-অনুষ্ঠানের সংগে একীভূত হয়ে পড়েছিল এবং ধর্মকে তখন পঙ্কিল পৃথিবী থেকে আত্মরক্ষার আশ্রয়স্থল বলে মনে করা হতো। ইউরোপীয় ধর্মীয় আদর্শের এইসব ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর প্রমাণপঞ্জি তুলে ধরে এসব তর্কবাগীশগণ স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেয় যে, সমস্ত ধর্মীয় আদর্শই অবাস্তব এবং কেবল সংসার-বিমুখ সন্ন্যাসী বা ধর্মান্ধদের স্বপ্ন মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞান অলৌকিকতাকে কক্ষচ্যুত করেছে এবং মানুষ তাদের এক মহান কর্তব্য হিসেবে এই পৃথিবীর সম্পদ ও ঐশ্বর্যের পূর্ণাংগ সদ্ব্যবহার এবং এর আওতায় তাদের অবস্থার উন্নয়ন সাধনের কথা চিন্তা করছে। এদের মধ্যে যারা মহৎ, তারা তাদের প্রতিবেশী ও দেশবাসীর অবস্থার উন্নয়নকে বড়ো করে দেখছে এবং এর তুলনায় নিজেদের অবস্থার উন্নয়নের কথা কম ভাবছে।

এভাবে বাস্তব জীবন ও মানবিক প্রয়োজন থেকে বহু দূরে নির্বাসিত অলৌকিকতা-আশ্রয়ী এবং প্রাকৃতিকভাবে নৈরাশ্যবাদী একটি ধর্মবাদী আদর্শ আধুনিক জীবন-ব্যবস্থার সংগে সংগতিবিহীন আর আধুনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই অপাঙক্তেয় হয়ে পড়েছে। আর সত্যিই এ পরিবর্তিত যুগপ্রেক্ষণায় এ জীবনবিমুখ আদর্শকে অচল এবং নব জীবন বিধানের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে। কেননা, এ আদর্শবাদ এই পৃথিবীকে শয়তানের রাজ্য বলে মনে করে এবং মুক্তিসন্ধানী মানুষকে এ পৃথিবীর পরিসীমা হতে পলায়নের নির্দেশ দেয়। এ ধরনের ধর্মীয় আদর্শবাদ কখনো স্বাভাবিক ও বাস্তব-নির্ভর হতে পারে না; এবং প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আধুনিক জীবনের আত্মঘাতি স্বার্থসর্বস্বতার প্রতিরোধের জন্যে একটি বাস্তবধর্মী জীবন-আদর্শের আজ অনিবার্য প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ হচ্ছে এমন একটি আদর্শ, যার ভিত্তি বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া কিংবা মানুষের চিন্তার ব্যাপ্তির ফলে বসে যেতে পারে না। কেননা, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনা ও মানুষের চিন্তার ফলাফল প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে; আর এ আদর্শও প্রকৃতিধর্মী। বিজ্ঞানের প্রগতিমুখী প্রচেষ্টা যত বেশি এবং ব্যাপকভাবে প্রাকৃতিক জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটন করবে, ততই আরো অধিকতর কীর্তিত হয়ে খাঁটি মুসলমানদের কাছে আল্লাহর মহিমা, তাঁর বিধান ও সার্বভৌম শক্তির নিদর্শন আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

যে পর্যন্ত প্রাকৃতিক আইনসমূহ দৃঢ়সংঘবদ্ধ থাকবে এবং ভালো কিংবা মন্দের পরিণতি কোনো বিশেষ মানুষ ও জাতির কার্যাবলীর অনুগম করবে, সে-পর্যন্ত মানুষের জীবনে তার নিজস্ব ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের চাইতে বৃহত্তর একটি ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের প্রয়োজন অবশ্যই অনুভূত হবে এবং মানুষ তার নিজের রায় ও বিচার বুদ্ধির চাইতেও উচ্চতর বিচার-বুদ্ধির প্রত্যাশা করবে। আর

www.pathagar.com

যে পর্যন্ত বৃহত্তর ইচ্ছার ও উদ্দেশ্যের নিকট মানুষের আত্মসমর্পণের প্রয়োজন অনুভূত হবে, সে পর্যন্ত মানুষ সাফল্য লাভ করবে। অর্থাৎ মানুষকে সাফল্য লাভ করতে হলে বৃহত্তর ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের নিকট তাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আর আল-কুরআনের শিক্ষার দৃষ্টিতে এই বৃহত্তর ইচ্ছা-উদ্দেশ্যের নিকট আত্মসমর্পণ হচ্ছে ইসলাম।

সমাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, শ্রমিকতন্ত্র ও বলশেভিকবাদের বিকল্প হিসেবে ইসলাম একটি পূর্ণাংগ রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক জীবন-ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দান করে। পক্ষান্তরে, অন্য সব মতবাদ বিকল্প হিসেবে এমন একটি ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দান করে যা নিশ্চিতভাবে অনিবার্য ধ্বংসের হুমকীর সম্মুখীন–অর্থাৎ অনিবার্য ধ্বংসই যার স্বাভাবিক পরিণতি। এসব অন্তঃসারশূন্য ঠুনকো মতবাদগুলোর ওপর ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার এক বিরাট প্রাধান্য রয়েছে এবং অপরিসীম সাফল্যের সংগেই এই জীবন-ব্যবস্থার অনুশীলন হয়েছে। আর সাফল্য যত বিরাট হবে, তার অনুশীলন এবং বাস্তবায়নও তত পূর্ণাংগ হবে। প্রতিটি মুসলমান বিশ্বাস করে যে পৃথিবীর সকল জাতি পারিভাষিক অর্থে মুসলমান বা অমুসলমান যে কোনো নামেই হোক না কেন, ইসলামের নির্যাস বা মর্মবাণীকে গ্রহণ করবে। কেননা, ইসলামের আইন হচ্ছে প্রাকৃতিক (কিংবা) ঐশী বা স্বাভাবিক আইন, যা মানুষের অগ্রগতিকে পরিচালিত করে। মানুষ অন্য সব পথের সন্ধান করে শেষ পর্যন্ত বেদনাদায়ক ব্যর্থতা বরণ করতে করতে অবশ্যই একদিন এই প্রাকৃতিক জীবন-বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং তার আকাঙ্ক্ষিত পথের সন্ধান খুঁজে পাবে। আমরা আজ যেখানে শ্রেণীতে শ্রেণীতে এবং জাতিতে জাতিতে বিভেদ দেখছি, আর যেখানে কোনো স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করছি না, ইসলাম সেখানে শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতিশ্রুতি দান করে। শুধুমাত্র আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি এবং আল্লাহর প্রেরিত একজন বাণীবাহকের প্রত্যাদেশ-নির্ভর মতবাদের দাবীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে এমন একটি জীবন-ব্যবস্থার ভালো-মন্দ এবং গুণাগুণ বিচার করতেও যদি কেউ অস্বীকার করে, তবে তার পক্ষে এটাকে নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না। এবং এটা হবে নাস্তিকতাসুলভ গোঁড়ামির এক চরম নামান্তর মাত্র। একথাও সত্য যে, একমাত্র ধর্মীয় আদর্শভিত্তিক বলেই মানব-সংস্কৃতির ইসলামী ব্যবস্থাকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হচ্ছে না; প্রকৃতপক্ষে, আজকের পৃথিবীতে এবং পেছনে ফেলে আসা দিনে– বহু পেছনে ফেলে আসা দিনে–মুসলমানদের অবস্থা, কার্যকলাপ ও আচার-আচরণই এ অবজ্ঞার পেছনে কারণ যুগিয়েছে। মধ্যযুগে খৃষ্টান জগত যাজক-অনুশাসনের দাসত্বের নিগড়ে বন্দী ছিল বলে ইসলাম সম্পর্কে কোনোরূপ ধারণায় আসার সুযোগ পায়নি। আজকের মত সে সময়েও এই ধর্মান্ধ যাজক-শ্রেণী মহানবী হজরত মুহাম্মদকে (আল্লাহ তার ওপর শান্তি বর্ষণ করুন) "ভুয়া নবী" বলে প্রচার করতো এবং তাঁর অনুসৃত ধর্মে যে মানব জাতির জন্যে কোনো কিছু ভালো ও কল্যাণকর থাকতে পারে; সে কথা চিন্তা করার সুযোগ পর্যন্ত কাউকে (খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী) দিতো না। তারপর উভয় ধর্মানুসারীদের মধ্যে সুদীর্ঘ যুদ্ধের ঐতিহ্য এক স্থায়ী বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে বর্তমানকাল পর্যন্ত এ-ক্ষেত্রে এক বিরাট বাঁধার প্রাচীর সৃষ্টি করে। আজকে এ প্রাচীর কার্যতঃ অপসৃত হলেও বিশ্বে মুসলমানদের অবস্থা এমন নয় যে, তারা বাইরের লোকদের মনে এ ধারণার সৃষ্টি করতে পারে যে, ঠিক এমনি মানুষরাই মানবিক অগ্রগতির পথের রহস্য জানে। আজ মুসলমানদের আচার-আচরণ ও অবস্থা ইসলামের পক্ষে অত্যন্ত খারাপ দৃষ্টান্ত। এ অবস্থা দেখে যদি কেউ তাদের থেকে মুখ ফেরায় এবং মুসলমানদের অধোগামীতার জন্যে ইসলামের ওপর দোষারোপ করার কথা চিন্তা করে, তবে তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। কথা হচ্ছে এই যে, এ জন্য ইসলামকে দায়ী করা যায়না। এ প্রসংগে এ

www.pathagar.com

কথা বলা যেতে পারে যে, খৃষ্টান জগতের বর্তমান বস্তুগত অগ্রগতির জন্যে খৃষ্টান যাজক সমাজের প্রচেষ্টা অনেকখানি প্রশংসার্হ। খৃষ্টান ধর্মে একটি যাজকতন্ত্র রয়েছে এবং এতে চিন্তার স্বাধীনতার কোনো স্বীকৃতি নেই। যে-সব শতাব্দীতে খৃষ্টান গীর্জা বা যাজকতন্ত্র সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিল, আজ সে সব শতাব্দীকে অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করা হয়। ইসলামে কোনো পৌরহিত্যবাদ বা মোল্লাতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না এবং এতে আগাগোড়া চিন্তার স্বাধীনতার স্বীকৃতি ছিল। যে যুগগুলোতে ইসলাম এর পূর্ণাংগ ও বিশুদ্ধ রূপ-বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিদ্যমান ছিল, সে-যুগগুলো বিশেষভাবে সুস্পষ্ট এবং ভাস্বর আলোকে বিদ্যমান। খাঁটি ইসলাম থেকে বিচ্যুতিই মুসলমানদের পতন ডেকে আনে। যাজকতন্ত্রের অনুরূপ এক রকমের পৌরোহিত্যবাদ বা মোল্লাতন্ত্রের প্রতি তাদের স্বীকৃতি কিংবা আল-কুরআনের ভাষায় বলা যায়, "আল্লাহ ব্যতিত অন্যদেরকে তাদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ।" পাণ্ডিত্যসুলভ বাক-বিতণ্ডার প্রতি তাদের আসক্তি, ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে যে-কোনো স্থান থেকে জ্ঞান আহরণের উপদেশের প্রতি তাদের উপেক্ষাদর্শন, মুক্ত-চিন্তার প্রতি তাদের অস্বীকৃতি এবং বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তিবাদিতার প্রতি অনাস্থাও তাদের পতনের প্রধান কারণসমূহের অন্যতম। তাদের ইতিহাসের কোনো এক পর্যায়ে তারা তাদের নির্দেশিত জীবন-ব্যবস্থার একটি অংশের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন শুরু করে এবং শরীয়তের অধিকাংশকে বাতিল করে দেয়, যাতে আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল অনুধাবন ও উপলব্ধির উদ্দেশ্যে তাদের জ্ঞান ও শিক্ষার অনুশীলনের জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এবং ঠিক সে সময়েই পাশ্চাত্যের খৃষ্টানগণ মুসলমানদের পরিত্যক্ত শরীয়তের এই অংশটির মর্মবাণীর অনুগমন শুরু করে– আর তাদের যাজকশ্রেণীর সব রকমের অভিসম্পাত সত্বেও তারা অসাধারণ সাফল্য লাভ করে। পৌরোহিত্যবাদ মানবিক অগ্রগতির দুশমন বলেই ইসলামে এর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়নি। আর মানবিক অগ্রগতির দুশমন হিসেবে এ খাঁটি ধর্মেরও পরিপন্থী। মানবতার অগ্রগতি ও মুক্তিসাধনাকেই আল-কুরআনে খাঁটি ধর্মের লক্ষ্য হিসেবে বিধৃত করা হয়েছে- মানবতার বন্ধ্যাত্ব বা দাসত্ব নয়। বিশ্বের সর্বত্র মুসলমানেরা আজ এ সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছে। তারা বুঝতে পারছে, তাদের অবমাননা ও হীনমন্যতার জন্যে তারা নিজেরাই দায়ী–কেননা এ তাদেরই কৃতকর্মের ফল। তারা আরো বুঝতে পারছে, একমাত্র ইসলামে প্রত্যাবর্তন করে তারা তাদের গৌরবময় হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পারে।

আপনারা ভাবতে পারেন যে, আমি আমার নির্ধারিত বক্তব্য বিষয় সংস্কৃতি থেকে সরে এসে ধর্মীয় আলোচনায় ব্যাপৃত হয়েছি। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী সংস্কৃতি ধর্মের সংগে এত নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত আর আল্লাহর বিশ্বজনীন সার্বভৌমত্বের ধারণার সংগে এমনভাবে সংমিশ্রিত যে, (আমার এ প্রথম ভাষণে) প্রথমেই কার্য-কারণ ও প্রসংগ নির্দেশ ছাড়া বিষয়টিকে যথার্থভাবে তুলে ধরা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। উত্থানে হোক কি পতনে হোক-বিজ্ঞান, শিল্প কিংবা সমাজ-কল্যাণের যে কোনো পরিসর এবং অংগনেই হোক না কেন, সর্বত্র সবখানে আর সব সময়ে ইসলামী সংস্কৃতির এই ধর্মীয় অনুপ্রাণতা এবং এই বিশ্বজনীন ও পূর্ণাংগ ধর্মীয় জীবন-ব্যবস্থার এক ব্যপ্তিশীল আদর্শ রয়েছে। একথা সত্য যে, এর বিভিন্ন রূপ, সৃষ্টি ও প্রকাশের মধ্যে এমন কিছু আছে, যা সাধারণ ধর্মীয় অংগন থেকে অনেক দূরে। এই দৃষ্টিভঙ্গিই আন্তর্জাতিকতার ভাব-রসে সম্পৃক্ত ইসলামী জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছে। কেননা, আল্লাহর বিশ্বজনীন সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি তার উদ্দেশ্যের পরিপূরক বিশ্বজনীন মানবিক ভ্রাতৃত্বের স্বীকৃতিই ঘোষণা করে। #

www.pathagar.com

ইসলামী সংস্কৃতি

হাসান আইউবী

ইসলামী সংস্কৃতির বিষয়টি সউদি আরবের সমস্ত কলেজ-শিক্ষায়তন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম উম্মাহর বর্তমান ক্লান্তি লগ্নে এ বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন সর্বাধিক গুরুত্বের দাবি রাখে। সে জাতি গৌরবজ্জ্বল অতীতের অধিকারী, যাদের বর্তমান সংকটাপন্ন ও অস্থিশীলতার সম্মুখীন অনিশ্চিত ও সমস্যা সংকুল তাদের জন্য। তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ ও সচেতনতা এ মুহূর্তে আরও বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

মানবজাতির কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব, পথ প্রদর্শন ও মানবীয় মূল্যবোধের সংরক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করে যে মিল্লাতকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পয়দা করেছেন, গাঢ় অমানিশার অন্ধকারের বুক ছিঁড়ে সোনালি সূর্যের প্রভা ছড়িয়ে দেয়ার মহান কাজে আল্লাহ যাদেরকে নির্বাচিত করেছিলেন, জাহেলিয়াতের অন্ধকার হতে সত্যের উজ্জ্বল রাজপথে মানব জাতিকে টেনে আনার জন্য যে জাতির সৃষ্টি, ধ্বংস বিপর্যয় থেকে হতভাগ্য মানবসমাজকে যারা মুক্তি কল্যাণ ও সৌভাগ্যের আলোকোজ্জ্বল পথের দিশা প্রদান করবে, তারা যদি নিজেরাই বিভ্রান্ত হয়ে ন্যায় ও সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, অহিভিত্তিক জীবন দর্শনের অনুসরণ থকে বিরত হয়, তবে মানব সভ্যতার এর চেয়ে বড় ক্ষতি ও লাঞ্ছনা আর কী হতে পারে? এর চেয়ে বেশি আফসোস ও দুঃখের বিষয় আর কি-ই হতে পারে?

মুসলিম উম্মাহ যে দিন এ দুঃখজনক পতন ও আল্লাহ প্রদত্ত জীবন দর্শন হতে বিচ্যুতির পথে অগ্রসর হবে, আল্লাহ প্রদত্ত রহমাতের পুঞ্জীভূত ও সঞ্চিত অফুরন্ত নিয়ামত দ্বীন ইসলামের সুমহান আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বাহ্যিক চাকচিক্যময়

www.pathagar.com

মতাদর্শের সন্ধানে ঘুরে বেড়াবে, যে মানব রচিত মতবাদের মধ্যে নিহিত রয়েছে মানব সভ্যতার সুনিশ্চিত ধ্বংস ও পতন এবং যে প্রান্তিক জড়বাদী দর্শনের ভিতর ও বাইরে মিশ্রিত রয়েছে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মারাত্মক বিষ, তার অনুসরণের পথ ধরলে মুসলিম উম্মাহর আল্লাহর সাথে যে ক্ষীণতম সম্পর্কটুকু আজও বাকি আছে তা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর রহমত ও এনায়েত হতে বঞ্চিত হবে। আল্লাহর সাহায্য ও আশ্রয় হতে কোটি কোটি কিলোমিটার দূরে সরে পড়বে। আর এমনি লাঞ্ছনা অপমান ও বিপর্যয়ে পতিত হবে যার নজির বিশ্ব ইতিহাসে বিরল।

উপরোক্ত আলোচনা হতে অবশ্যই এ সত্য উপলব্ধি করা একান্ত সহজ যে বর্তমান বিশ্বে মুসলিম মিল্লাতের এ অনিশ্চিত, অস্থিতিশীল সংকটাপন্ন অবস্থায় ইসলামী রেঁনেসার এ যুগ সন্ধিক্ষণ বিদ্যাপীঠ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী সংস্কৃতি বিষয়টি পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত রাখা কতটা জরুরী। বাহ্যিক চাকচিক্যময় ঝলসানো মানব রচিত মতবাদের বিভ্রান্তি ও ধ্বংসাত্মক পথ হতে মুসলিম মিল্লাতের যুব সমাজকে রক্ষা করতে হলে অবশ্যই তাদের ইসলামী ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পারদর্শী ও সচেতন করে তুলতে হবে।

আমাদের তরুণ ও তরুণী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত হবে যে, তাদের অভিভাবক ও মুরুব্বীগণ, কত দায়িত্ব সচেতন ও তাদের প্রতি কতটা দরদী ও স্নেহশীল। তারা এ সত্যও উপলব্ধি করবে তাদের মুরুব্বীগণ তাদের ধ্বংস, পতন ও আখেরাতে আল্লাহর আযাব থেকে মাহফুজ রাখার জন্য কতটা অস্থির ও আগ্রহী।

আমরা যদি আমাদের ভবিষ্যত বংশধরকে ইসলামী জীবনাদর্শন, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান ও দায়িত্ব সচেতন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাফল্য অর্জন করি, তাহলে অবশ্যই তারা মরীচিকার মতো ঝিলমিলে পাশ্চাত্য সভ্যতার ও সংস্কৃতির প্রভাব ও মানসিক গোলামী থেকে মুক্ত হতে পারবে। ইসলাম সম্পর্কে সমস্ত সন্দেহ ও বিভ্রান্তির ধুম্রজাল থেকে তারা নিঃসন্দেহে বেঁচে যাবে। প্রত্যয় ও অবস্থার দীপ্ত প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে তাদের হৃদয়, মস্তিষ্ক ও চরিত্র।

অনাগত ভবিষ্যতে এমন সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী বলিষ্ঠ-চরিত্রের অধিকারী যুব শক্তি গড়ে উঠবে, যারা যৌবনের তপ্ত তাজা খুনের বদৌলতে তারুণ্যের উৎসাহে উদ্দীপনা, কর্মচাঞ্চল্য, প্রেরণা ও চেতনা নিয়ে গড়ে তুলবে এক নতুন সভ্যতা ও নতুন জাতি। নবুয়াত ও খোলাফায়ে রাশেদার স্বর্ণযুগের হবে পুনুরুত্থান।

আবার তাওহীদের পতাকা উত্তোলিত হবে নওজোয়ানের বলিষ্ঠ হাতে সারা দুনিয়ায়।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা

আরবী ভাষায় 'ছিকফুন' অথবা 'ছুকফুন' শব্দটি 'লাযেম' (অকর্মক্রিয়া) ও মুতাআদ্দি (সকর্মক্রিয়া) উভয় এর পদেই ব্যবহৃত হয়। যখন 'লাযেম' অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন, অর্থ হয় - সে সভ্য বা সংস্কৃতিবান হয়েছে বুঝাতো। আর যখন মুতায়াদ্দি হয় তখন বলা হয়ে থাকে 'ছাকক্বাফতোহু, অর্থ আমি তাকে সুসভ্য সংস্কৃতিবান বা সুসজ্জিত করেছি। আবার আরবী 'ছাকাফত' শব্দ নিম্নোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয় যথা ঃ

১. দক্ষতা, নিপুণতা, কৌশল ও বুদ্ধিমত্তা অর্থে, যেমন- 'ছাকাফা ফুলানুন ছাকাফাতান' অমুক ব্যক্তি খুব বুদ্ধিমান ও কুশলী হয়েছে।

www.pathagar.com

২. প্রভাবশালী, বিজয় অর্থে 'ছাকাফাত' ব্যবহৃত হয় 'ছাকাফাতোহু ফি মাকানিন কাযা' আমি অমুক স্থানে পেয়েছি। তার উপর বিজয় লাভ করেছি। 'ইন ইয়াছ কাফ্কুম ইয়াকুনো লাকুম' "যদি তারা তোমাদের উপর বিজয়ী হয় অথবা প্রাধান্য লাভ করে তবে অবশ্য তারা তোমাদের সাথে শক্রতা করবে।"

৩. 'ছাকাফাত' শব্দটি সোজা করে অথবা যোগ্যতা সৃষ্টি করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়ে থাকে - 'ছাকিফতোর রুম্হা' আমি বর্শাকে সোজা করেছি, যাতে লক্ষ্য অর্জন করতে পারি। 'ছাকাফাত' শব্দটি যখন কোনো আচরণ বুঝাবার অর্থে ব্যবহৃত তখন তা আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে পরিভাষা ও পরোক্ষভাবে বিশেষ আচরণকে বুঝায়। আমরা বর্তমান পর্যায়ে 'ছাকাফাত' বলতে সুরুচি সম্পন্ন সংস্কৃতিবান, উৎকর্ষ সাধন এবং একটি সুষ্ঠু নৈতিক পদ্ধতি ও উন্নত মূল্যবোধের বুনিয়াদে সমাজ ও সভ্যতার পরিচালনাকে 'ছাকাফাত' বা সংস্কৃতি বলি। মানব চরিত্রে এক উন্নততর অবস্থা বা আচরণের নামই হচ্ছে- 'ছাকাফাত' বা সংস্কৃতি।

প্রখ্যাত পণ্ডিত আল্লামা "যমখশরী" আসাসআল বালাঘা গ্রন্থে লিখেছেন- 'ছাকাফাত' শব্দের পরিভাষাগত অর্থ হচ্ছে আদব-কায়দা শেখানো, সুসভ্য করে গড়ে তোলা। মানুষ বিপুল জ্ঞানের অধিকারী হয়েও যদি উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ হতে বঞ্চিত হয় তবে প্রকৃতপক্ষে তার আদৌ গুরুত্ব নেই।

প্রকৃত সংস্কৃতি ও সভ্যতার তখনই উদ্ভব ঘটে যখন মানুষ দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রস্তুতি সহকারে সভ্যতা গড়ে তোলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সামান্য শব্দগত পার্থক্য ছাড়া 'ছাকাফাত' শব্দের উপরোক্ত ব্যাখ্যা ও তাৎপর্যই "আলমুহিত" "আলক্বামুস" "মুখতারুস সিহাহ" ও "আসাস-আল বালাঘা" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

যখন "ছাকাফাত' আভিধানিক ও পরিভাষাগত অর্থ সভ্যতা, সংস্কৃতি, নৈতিক উৎকর্ষতা ও উন্নত প্রশিক্ষণ বুঝায় তখন এর প্রয়োগগত অর্থ এছাড়া আর কি হতে পারে? এ আর কিই বা তাৎপর্য্য হতে পারে? কোনো শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে মানুষের অনুভূতি ও চেতনা শক্তিই মূল উৎস হিসাবে কাজ করে। এর বিপরীত কখনও হয় না যে শব্দই মানুষের অনুভূতি ও চেতনার উদ্ভব ঘটায়।

এ কারণেই একজন গ্রন্থকার, সাহিত্যিক ও প্রভাষকের সাফল্য এরই উপর যে তার রচনাশৈলী, চিন্তা, লেখা ও ভাষণে যখন সাধারণ গণমানুষের চিন্তা, কর্ম, আচরণ, অনুভূতি ও চেতনার প্রতিফলন ও বিকাশ ঘটে। যখন তার শব্দাবলী ও বাক্যাবলী গণমানুষের অনুভূতি ও চেতনার পিরহান পরিধান করে সুশোভিত ও সুসজ্জিত হয়। তার প্রকাশিত ভাষা ও ছন্দে যখন সমাজের সাধারণ মানুষের পুঞ্জিভূত ও সঞ্চিত চিন্তা ও অনভূতির প্রকাশ ঘটে- তার কণ্ঠে যখন গণচেতনা ও অনুভূতির বিচ্ছুরণ ও সম্প্রসারণ পরিলক্ষিত হয়।

যখন মানুষের চিন্তা চেতনা ও অনুভূতিই শব্দের মূল ঝংকার তার অর্থ নির্ণয় ও প্রয়োগ পদ্ধতির ক্ষেত্রে মূল উৎস হিসবে স্বীকৃতি লাভ করে তখন এর আভিধানিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও পূর্ণ স্বাধিকার থাকা একান্ত স্বাভাবিক। পরিবেশ, পরিস্থিতি ও প্রয়োগ ক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে শব্দের আভিধানিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধন করে এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সাহিত্যিক বা গ্রন্থকারের রয়েছে। শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর বিশালতা, সংকীর্ণতা, ব্যাপকতা, কমানো ও বাড়ানোর এখতিয়ার শব্দ ব্যবহারকারীর

www.pathagar.com

রয়েছে। তবে শব্দের আভিধানিক অর্থের সাথে অবশ্যই সূক্ষ্মতম সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে। শব্দের প্রয়োগের ক্ষেত্রে লেখকের স্বাধীনতার অর্থ বাচালতা নয় এবং আভিধানিক অর্থ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতাও নয়। বস্তুতঃ শব্দ হচ্ছে অর্থেরই দেহ, আর অর্থ হচ্ছে জীবনের প্রতিফলন- মানুষের সম্মান ও মর্যাদার প্রতিরক্ষা অর্থই করে থাকে। মানুষের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার মর্যাদা শব্দ, অর্থ ও সাহিত্যই প্রদান করে। ভাষা, সাহিত্য, শব্দ ও অর্থই মানুষের মনের ভাবকে চিহ্নিত ও পরিচিত করে।

এ ভিত্তির উপরই 'ছাকাফাত' এর পরিভাষাগত অর্থ আমি সভ্যতা, সংস্কৃতি, চরিত্রগঠন, নৈতিক উৎকর্ষতা ও উন্নত প্রশিক্ষণ বলেই গ্রহণ করেছি। সংস্কৃতিবান তাকেই বলা যায় যে আচরণে ভদ্র ও সৌজন্যতাপূর্ণ, উন্নত আদব কায়দা ও ব্যবহারের অধিকারী, উত্তম চরিত্রের প্রতীক, সৎকর্মশীল জীবন যাপনকারী, আমলে সালেহ দ্বারা যার জীবন সজ্জিত ও সুশোভিত। এমনি ধরনের অতুলনীয় নৈতিক মূলবোধে উজ্জীবিত ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ব্যক্তিকেই আরবীতে বলা হয় ফুলানুন মুছাক্কাফু। অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি সংস্কৃতিবান এবং এর প্রকৃত তাৎপর্য এই যে সংস্কৃতিবান ব্যক্তি মেধা, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, সংস্কৃতি ও আচরণে সর্বাধিক রুচীশিল ও ভদ্র।

এই ব্যাখা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সংস্কৃতি হচ্ছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে সৃষ্ট উন্নত আচরণ। এ জন্যই সংস্কৃতি, সভ্যতা ও প্রশিক্ষণ কখনও কাঙ্ক্ষিত, অনিভপ্রেত, বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত, করণীয়, বর্জনীয়, গ্রহণযোগ্য ও প্রতিরোধযোগ্য কার্যাবলির সঠিক জ্ঞান ছাড়া কল্পনাই করা যেতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে প্রজ্ঞা, মারেফাত হচ্ছে সৌজন্যতারই বাস্তব ও অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি। তাই ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতি কোনো কোনো সময় জ্ঞান পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞা অর্থে ব্যবহার হয়। যুগের গতিশীলতা ও প্রগতির সাথে সংস্কৃতি শব্দ জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারতা ও উন্নতি অর্থে এমন কি জ্ঞান রাজ্যের প্রতিটি বিভাগ ও শাখাও সংস্কৃতি হিসাবে পরিচয় লাভ করে। যুগের বিবর্তনের ফলে এবং জড়বাদী প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতির সাথে বর্তমানে সংস্কৃতি বলতে প্রত্যেক ধরনের শিক্ষা লাভ চাই যে শিক্ষার্থী চরিত্রবান হোক চরিত্রহীন হোক, শিক্ষা- নৈতিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হোক অথবা নৈতিকতা বর্জিত হোক, আধ্যাত্মিক হোক অথবা বস্তুগত হোক সকল ধরনের শিক্ষাই সংস্কৃতি ও প্রগতি বলে আখ্যায়িত হয়। তাই জড়বাদী শিক্ষা দর্শনের প্রভাবে বর্তমান শতকে শিক্ষা ও জ্ঞান বলতে জড়বাদ, নাস্তিক্যবাদ, সন্দেহবাদ, সমাজবাদ, বিশ্বে অশান্তি বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ছিনতাই, হাইজ্যাক, লুণ্ঠন, দস্যুবৃত্তি প্রশিক্ষণদানকারী, ঈমান লুণ্ঠনকারী শিক্ষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা লাভ করেছে। এমন কি ঈমান ও চরিত্র ধ্বংসকারী ব্যক্তি ও সংস্কৃতিবান বলে আখ্যায়িত হচ্ছে। এমন কি নগ্নতা, বেহায়াপনা নির্লজ্জতা, বেলেল্লাপনা, নর্তন-কুর্দন, উলঙ্গনৃত্য, নৈতিকতা বিধ্বংসী গান-বাজনা, যৌন আবেদনময়ী সঙ্গীত চরিত্রহননের কলা-কৌশলও আজ "সংস্কৃতি" বলে প্রচারিত হচ্ছে। এমনকি বর্বরতা; অত্যাচার ও জুলুমের উপাদানও আজ সংস্কৃতিতে শামিল হয়েছে। মূল্যবোধ ও মানদণ্ডের পরিবর্তনের সাথে সাথে আজ তথাকথিত সংস্কৃতি ও সভ্যতার দাবীদার সংগঠন ও সম্প্রদায় হিংস্র বন্য পশুর মতো হানাহানি ও সংঘাতে লিপ্ত, একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

ইসলামী সংস্কৃতির সংজ্ঞা

আমরা যখন বুঝতে পারলাম যে, সংস্কৃতির অর্থ সুসভ্য আচরণ, শিষ্টাচার ও উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ- যার ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তখন এ সংজ্ঞার আলোকে আমরা এ সিদ্ধান্তে

www.pathagar.com

উপনীত হতে পারি যে, ইসলামী সংস্কৃতি বলতে "আল্লাহ প্রদত্ত পয়গাম ও ইসলামী শরীয়তের বুনিয়াদে মানুষের সামগ্রিক জীবনের সৌজন্যমূলক আচরণ, শিষ্টাচার, সৎকর্মশীলতা ও উন্নত নৈতিকতাকে বুঝায়। মানুষের জীবনের সকল কর্মকাণ্ডই ইসলামী সংস্কৃতির আওতাভুক্ত যা মানবতার আদর্শ মুহাম্মদ (সাঃ) এর পদাংক অনুসারিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

এক কথায় ইসলামী সংস্কৃতির সংজ্ঞা হলো- কোরআন ও সুন্নাহর বুনিয়াদে পরিচালিত মানব জীবনের সকল কর্মকাণ্ড, ক্রিয়াকলাপ ও আচরণ।

এ ভাবেই সমস্ত বাকবিতণ্ডা ও মতবিরোধ থেকে আত্মরক্ষা করতে সংস্কৃতি লাগামহীন স্বার্থবোধক সংজ্ঞা পেশ করে। কেননা সংস্কৃতির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে অনেক জটিলতা ও পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে। কোনো কোনো গ্রন্থকার সংস্কৃতির অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক হীন ব্যাখ্যাই উপস্থাপিত করেছেন। একজন গ্রন্থকার বলেন, 'সংস্কৃতি হচ্ছে শুধু দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের নাম।' কিন্তু পর্যালোচনার পর দেখা যায় যে, আচরণ ও এর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দূরতম সম্পর্কও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেউ কেউ সংস্কৃতির সংজ্ঞা পেশ করে বলেছেন, মানব জীবনের বিভিন্ন শাখার জ্ঞানই হচ্ছে সংস্কৃতি। তারা সংস্কৃতির আভিধানিক অর্থ ও প্রচলিত পরিভাষা এবং বাস্তব জ্ঞানের যোগসূত্রকে কোনো গুরুত্বই প্রদান করেননি। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আমরা এখানে সংস্কৃতির ব্যাপক দিকের আলোচনা হতে বিরত রয়েছি। কারণ এর সমস্ত দিকের আলোচনা আমাদের মূল আলোচনার বিষয় বহির্ভূত।

ইসলামী সংস্কৃতির উৎস ঃ কোরআন ও সুন্নাহ

আমাদের দৃষ্টিতে ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে "কোরআন ও সুন্নাহর অনুসৃত নীতি ও আচরণের নাম"। তাই আমরা নিঃসন্দেহে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কোরআন ও সুন্নাহই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির মূল উৎস।

প্রকৃপক্ষে এ দু'টো উৎস প্রাচীন ও আধুনিক যুগের অতুলনীয় ও দৃষ্টিহীন উৎস। এ হচ্ছে অতীত শিক্ষা, সভ্যতার চূড়ান্ত প্রতিবেদন। তা ছাড়া একমাত্র কোরআন ও সুন্নাহই কালের বিবর্তন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অতিরঞ্জন ও সংকলনের মারাত্মক ত্রুটি সমূহ হতে মুক্ত। আল কোরআনের অপরিবর্তনশীলতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কোরআনেই বর্ণিত রয়েছে- "আমি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এবং আমি এর হিফাজতকারী" (হিজরত-৯)। এ কারণেই কোরআনের কোনো পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সাধ্য কারও নেই।

পবিত্র সুন্নাহ

পবিত্র সুন্নাহ যে ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম উৎস এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন ঃ

"হে নবী! আপনার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে করে আপনি মানুষের নিকট এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও শিক্ষা তুলে ধরেন" (নাহল-৪৪)।

এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈমানদারদেরকে রাসূলের সুন্নাহ তথা শিক্ষা ও আদর্শের অনুসরণের নির্দেশ দান করে বলেছেন-

"রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো; আর রাসূল যা করতে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।" (হাশর-৭)

www.pathagar.com

এর তাৎপর্য হচ্ছে আল-কোরআনেরই অনুরূপ সুন্নাতে রাসূলের সংরক্ষণের বিশেষ এন্তেজাম করে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎস হিসাবে সুন্নাতে রাসূলের হিফাজতেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের উন্নত জীবন যাপন ইহলৌকিক ও পরলৌকিক কল্যাণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছুই কোরআন ও সুন্নাহতে সন্নিবেশিত রয়েছে। এটি অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে প্রমাণিত যে মানব জীবনের যাবতীয় আচরণ, ক্রিয়াকাণ্ড ও সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবন ব্যবস্থার মূলনীতি আল-কোরআন ও সুন্নাহতে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন- "হে নবী! প্রত্যেক ব্যাপারে সুস্পষ্ট মূলনীতি সহ আমি আপনার নিকট এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি" (সূরা নাহল-৮৯)। প্রকৃত হাদীস হচ্ছে কোরআনের ব্যাখ্যা।

ইজমা

ইসলামী সংস্কৃতির তৃতীয় উৎস হচ্ছে ইজমা- যেসব ব্যাপারে কোরআন ও সুন্নাহে কোনো সুস্পষ্ট বিধান নেই সে সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আইনবিদদের (ফকীহ) ও ইসলামী চিন্তাবিদদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তই হবে ইসলামী সংস্কৃতির তৃতীয় উৎস।

ক্বিয়াস

ইসলামী সংস্কৃতির চতুর্থ উৎস হচ্ছে ক্বিয়াস। জীবনবোধ ও সাংস্কৃতিক জীবনধারায় নবোদ্ভুত সমস্যা ও জটিলতার ক্ষেত্রে যদি কোরআন সুন্নাহ ও ইজমার কোনো সুস্পষ্ট নীতিমালা খুঁজে না পাওয়া যায় তখন কোরআন ও সুন্নাহর মূলনীতিকে সামনে রেখে গবেষণার ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণের নামই হচ্ছে ক্বিয়াস। বস্তুতঃ ইসলামী সংস্কৃতির তৃতীয় উৎস হিসাবে আমরা ইজতেহাদকে গ্রহণ করতে পারি। কোরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির আলোকে গবেষণার নামই হচ্ছে ইজতেহাদ। অর্থাৎ যে বিষয়ে কোরআন ও সুন্নায় সরাসরি সুস্পষ্টভাবে কোনো আয়াত বা হাদীস নেই সে বিষয়ে কোরআন সুন্নাহ মূলনীতির (নসুস) আলোকে গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ইজতেহাদ বলা হয়। এ গবেষণালয়ের সিদ্ধান্তে যখন রাসূলের সাহাবী অথবা ফকীহগণ (ইসলামী চিন্তাবিদগণ) অথবা পুরো উম্মত যে কোনো স্তরে ঐক্যমত গ্রহণ করে তখন তা হয় ইজমা। আর যখন বিভিন্ন চিন্তাবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে তখন তা হয় ক্বিয়াস।

কোরআন সুন্নাহ মূলনীতির সাথে সমন্বিত গবেষণা প্রসূত সিদ্ধান্তে ঐক্যমতে পৌঁছানো ইজমা। আর দ্বিমত বা ভিন্নমত পোষণ করলে তা হয় ক্বিয়াস। শুধু ইজতেহাদকে সংস্কৃতির উৎস হিসেবে মানলে ইসলামী সংস্কৃতির উৎস হয় তিনটি (১) কোরআন (২) সুন্নাহ (৩) ইজমা। আর ইজমার ফলশ্রুতি সহ উল্লেখ করলে ইসলামী সংস্কৃতির উৎস হচ্ছে ৪টি (১) কোরআন (২) সুন্নাহ (৩) ইজমা (৪) ক্বিয়াস।

ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্ব

কোরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত নীতি ও আচরণের অনুসরণের নামই যখন ইসলামী সংস্কৃতি তখন কোনো মুসলমানের পক্ষেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতির অনুসরণের ব্যাপারে কোনো প্রকার ইতস্তত ও সন্দেহের অবকাশই থাকে না।

১. ইসলামী সংস্কৃতির বাস্তব অনুসরণের কোনো কোনো ক্রিয়াকাণ্ড ফরয, আবার কিছু ওয়াজেব, কিছু সুন্নত ও মুস্তাহাবও রয়েছে। যেমন- সালাত, সওম, নামায, রোযা, যাকাত,

www.pathagar.com

সাদকাহ, দোয়া, জিকর ইত্যাদি। আবার নৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন- ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, সহনশীলতা, স্থৈর্য, উপদেশ, কল্যাণ কামনার গুণাবলী সৃষ্টি, পাপাচার, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি অপরাধসমূহ বর্জনও ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। অর্থনৈতিক লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয়, শ্রমের মজুরী, আদান-প্রদান ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপ ইসলামী সংস্কৃতিরই আওতাধীন।

সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনের আচরণ, যেমন ঃ মাতাপিতার প্রতি সম্মান ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার, সুন্দর দাম্পত্য জীবন, আত্মীয়স্বজনের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা ও তাদের গভীর সম্পর্ক, প্রতিবেশীর অধিকার আদায় ইত্যাদি কার্যকলাপও ইসলামী সংস্কৃতির পরিধির অন্তর্গত। মুসলমানদের সামগ্রিক ক্রিয়াকাণ্ড ও আচরণের মধ্যে যা ফরয ও ওয়াজিব দৃঢ়তার সাথে তার অনুসরণ এবং সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন, এর সীমারেখা ও বিস্তারিত দিকের সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা অপরিহার্য।

আবার যা সুন্নাত ও মুস্তাহাব তার বিস্তারিত জ্ঞানলাভ প্রত্যেকের জন্য জরুরি। কারণ ইলম ছাড়া আমলের কল্পনাও করা যায় না। মানুষ যে কাজ করবে তার প্রকৃতি ও ধরণ, তার শর্তসমূহ, সূচনা ও সমাপ্তি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ না করলে সে কাজ কখনও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিতই হতে পারে না। ইলমই আল্লাহর রেজাবন্দি হাসিলের অন্যতম মাধ্যম। হুজুর (সঃ) ইলমের ফযিলত সম্পর্কে বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি জ্ঞান সাধনার উদ্দেশ্যে পথ অতিক্রম করে, আল্লাহতায়ালা তার জন্য জান্নাতের পথ প্রশস্ত করে দেন" (মুসলিম)। "যাকে আল্লাহতায়ালা জ্ঞান রাজ্যে পাণ্ডিত্য দান করেন তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করেন" (বুখারী, মুসলিম)।

এ ক্ষেত্রে সাধারণ মূলনীতি হচ্ছে যে সব কাজ হুজুর (সঃ) অধিকতর করে গেছেন, কোনো অবস্থায়ই তা বর্জন করেননি তা ওয়াজিব। আর যা হুজুর (সঃ) অধিকাংশ সময় করেছেন, মাঝে মাঝে ছেড়ে দিয়েছেন ও করার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা সুন্নত।

২. ইসলামী সংস্কৃতি যেহেতু ইলম ও মারেফাতের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত আচরণ সমূহের নাম, সেহেতু যারা এ সংস্কৃতিকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গ্রহণ করে তারাই দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্য ও সাফল্যের অধিকারী। যারা ইসলামী জীবনধারা ও সংস্কৃতিকে বর্জন করে- এ থেকে ঘাড় ফিরিয়ে অপর কোনো সংস্কৃতি ও মতবাদকে গ্রহণ করে তারা উভয় জাহানেই অনিবার্য ধ্বংস ও ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আল-কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ "আর যারাই আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে তারা অবশ্য বিভ্রান্ত ও দুর্ভাগা হবে না, আর যারা আমার আল-কোরআনে প্রদর্শিত হেদায়াত ও আমার জিকর হতে ঘাড় ফিরিয়ে নেবে, তারা অবশ্য পৃথিবীর মারাত্মক সমস্যা ও সংকটে পতিত হবে এবং কেয়ামতের দিন অন্ধ ও দিশেহারা অবস্থায় আমি তাদেরকে সমবেত করবো (সূরা তোয়াহা, ২৩-২৪)।

৩. আল্লাহপ্রীতি ও আল্লাহভীতিভিত্তিক পরিপূর্ণ জীবনপদ্ধতির নামই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি। মানবজীবনে সকল সমস্যার একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত সমাধানই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি। আর এ সমাধান যেহেতু আল্লাহর দেয়া তাই আল্লাহর এ মহান নিয়ামতের কোনো বদলা ও তুলনা নেই। এ জীবনবিধান আল্লাহ তার সমস্ত সৃষ্টির জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এটি তার পছন্দনীয় একমাত্র জীবনপদ্ধতি বলে ঘোষণা করেছেন। মানুষকে অন্যান্য সকল পদ্ধতি পরিহার করে একেই অনুসরণ করা ও মেনে চলার হুকুম দিয়েছেন। কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ "আজকে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন ব্যবস্থাকে

www.pathagar.com

পরিপূর্ণ করে দিলাম। আমার (নবুওয়াত অহি ও রাসূলরূপ) নিয়ামত সমাপ্ত করলাম এবং একমাত্র ইসলামকেই আমার রেজাবন্দির পদ্ধতি হিসাবে নির্ধারণ করে দিলাম" (মায়েদা-৩)।
সমগ্র বিশ্ববাসী আল্লাহর দেয়া এ জীবন বিধানের অনুসরণের আগ্রহী হওয়া এবং বাস্তব জীবনে এ পদ্ধতিরই অনুসারী হওয়া উচিত। এর বিপরীত সকল মতাদর্শ ও জীবনদর্শনকে নিঃসঙ্কোচে কোনো প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই বর্জন ও দূরে ছুঁড়ে ফেলা উচিত।

৪. আমরা সবাই আল্লাহর বান্দাহ। তারই কুদরতে আমরা পয়দা হয়েছি। তারই অফুরন্ত রহমত ও অনুগ্রহ, তারই অবদানে আমরা রিয্‌ক ও জীবন যাপনের সমস্ত উপাদান ও নিয়ামত পাচ্ছি। সৃষ্টি জগতের সমস্ত জীবজন্তু, বৃক্ষ ও উদ্ভিদ জগত, প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদ, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও খনিজ জগতের সকল বস্তু ও পদার্থ তারই হুকুমে আমাদের খেদমত ও কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছে। আমরা আমাদের পরিবেশে যে সকল মানুষের স্নেহ-মমতা, দয়া ও অনুগ্রহ পাচ্ছি তাও মূলত আল্লাহরই দান। আমাদের ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ কিসে- তা আমাদের চেয়ে আমাদের দয়ালু সৃষ্টিকর্তাই অনেক বেশি জানেন। আমাদের পিতা-মাতার চেয়েও তিনি আমাদের প্রতি আরও বেশি করুণাশীল ও মেহেরবান। এ জীবনের সমাপ্তির পর অনন্ত জীবনে আমাদেরকে তারই সামনে হাজির হতে হবে। আমাদের জীবনের যাবতীয় ভালো-মন্দ কাজের হিসাব আল্লাহর দরবারে দিতে হবে। অবশ্যই আল্লাহর কাছে আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। সে মহাবিচারের দিন আল্লাহ ও আমাদের মধ্যে বিচার ফায়সালায় চূড়ান্ত মানদন্ড হবে একমাত্র কোরআন ও সুন্নাহ। কোরআন ও সুন্নাহর দলিলের বুনিয়াদে আল্লাহর দেয়া জীবনবিধানের আনুগত্য ও নাফরমানীর বুনিয়াদেই আমাদের জীবনের সাফল্য-ব্যর্থতা ও জান্নাত-জাহান্নামের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
প্রকৃত ব্যাপার যখন এই, তখন এর চেয়ে বড় বেকুফী, অন্ধতা, আহম্মকী ও পাগলামী আর কী হতে পারে? যে আমরা সে মহান আল্লাহর দেয়া নির্ভুল জীবনদর্শনকে বর্জন করে অর্বাচিন বিভ্রান্ত দার্শনিকদের সৃষ্ট গোলক ধাঁধা ও শয়তানের আবিষ্কৃত ও প্রদর্শিত ভ্রান্ত ও অভিশপ্ত মতবাদের খপ্পরে পড়ি ও তাদের চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র জালে আবদ্ধ হই? আল কোরআনে বলা হচ্ছে- "তোমরা কি লক্ষ্য করছো যে, আসমান ও জমিনের সবকিছু তোমাদের অনুগত করে দিয়েছি। দৃশ্য-অদৃশ্য সকল নিয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছি। অথচ মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আল্লাহর ব্যাপারে অনর্থক ঝগড়ায় লিপ্ত রয়েছে, কোনো প্রকার ইলম হেদায়াত ও উজ্জ্বল প্রামাণ্য কিতাব ছাড়া। যখন তাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় যে, তোমরা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবের অনুসরণ করো, তদুত্তরে তারা বলে, আমরা সে নীতিরই অনুসরণ করবো যার উপর আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি। যদিও শয়তান তাদেরকে জ্বলন্ত অগ্নির (জাহান্নামের) দিকে ডাকছে। আর যারা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে নিশ্চয়ই তারা মজবুত রজ্জু ধারণ করেছে (নির্ভরযোগ্য আশ্রয় গ্রহণ করেছে)। সকল কাজের চূড়ান্ত ফায়সালা আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত।" (লোকমান, ২০-২২)

৫. অহিভিত্তিক জীবনদর্শনকে জীবন ধারণের প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড হিসাবে গ্রহণের ফলে জীবনে সৌন্দর্য ও পূর্ণতার প্রকাশ ঘটে। এক সমন্বিত জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ জীবনব্যবস্থা সমষ্টিগত জীবনের সামাজিক মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা, সংবেদনশীলতা

www.pathagar.com

ও পারস্পরিক কল্যাণ কামনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। প্রজ্ঞা ও প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এ ধরনের সমস্ত ব্যাপারে বিচার বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত ন্যায়বোধ ও সামাজিক সুবিচারের মাপকাঠিতে নির্ধারিত হয়। কেননা ইসলামী সমাজে সুবিচার কায়েম করা ফরয। একে অপরের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ, মার্জিত ব্যবহার ও প্রশংসনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী অর্জন, এ ধরনের সমাজের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। এবং আল্লাহর অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয় কাজ বর্জন, জুলুম, খেয়ানত এবং আল্লাহর নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা থেকে মুক্ত থাকা এই সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যারা আকিদাহ্ বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী ও সামজিক আচরণ, আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করে বস্তুতঃ তারাই নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত স্বভাবেরই অধিকারী-

"খোদাদ্রোহীদের প্রতি তারা কঠোর ও নিজেরা পরস্পর স্নেহপরায়ণ (ফাতাহ-২৯)। "নিজেরা অভাব গ্রস্থ হলেও তারা অপরের স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয়, এবং অপরের জন্য নিজেরা ত্যাগ স্বীকার করে" (হাশর-৯)। "তারা একে অপরের বন্ধু (সাথী), সৎকাজের নির্দেশ দান করে, মন্দ ও অসৎ কাজ হতে বিরত রাখে" (তওবা-৭১)। "মুমিনদের প্রতি তারা নম্র ও কাফেরদের প্রতি কঠোর" (মায়েদা-৫৪)।

মানব রচিত মতবাদগুলো মানুষের সৌভাগ্য ও মুক্তির ক্ষেত্রে কোনো মূল্যবান অবদান রাখতে পারেনি। বরং আমরা এর বিপরীতই দেখতে পাই। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানকে পরিহার করে মানব রচিত মতবাদের অনুসরণই মানুষকে অনিবার্য ধ্বংস ও বিপর্যয়ের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বিধানের প্রতি অনীহা প্রদর্শন ও অমান্য করাই মানুষের ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মূল কারণ।

মূলতঃ মানুষের ধ্বংস ও বিপর্যয়ের জন্য একমাত্র মানুষ ছাড়া অপর কেউ দায়ী কি? আল্লাহর বিধানকে ছেড়ে দিয়ে কি মানুষ খুন, রাহাজানি, লুটতরাজ ও নৃশংসতা থেকে মুক্তি পেতে পারে? পোড়া ঘরবাড়ি, ফুটপাতে পড়ে থাকা মা-বোন, মানুষের নৃশংসতার শিকার দুঃস্থ ও পঙ্গুর দল, বাস্তুহারা ফকির ও মিস্‌কিন, যাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ এই যে তারা বিত্তশালীদের মুখাপেক্ষী, নিরাপরাধ ফাঁসি মঞ্চে ঝুলন্ত মানবদেহ, কারাপ্রাচীরের আড়ালে অন্তরীণ লাখো বনী আদম, অধিকার বঞ্চিত কোটি কোটি মানব সন্তান যাদের আজাদীকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে, আমাকে বলতে পারেন কাদের প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে অগণিত বনী-আদমের অধিকার ও স্বাধীনতা জ্বলে পুড়ে খাক হচ্ছে? কারা অসংখ্য বনী আদমের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে? মজলুম আদম সন্তানেরা কাদের স্বার্থের বলি হচ্ছে? কোন ফেরাউন ও চেঙ্গিসের স্টিম রোলারে মানবতা আজ পর্যুদস্ত ও নিষ্পেষিত হচ্ছে? তারা কী মানুষ নয়, যদি মানুষের হাতেই মানবতা এমনিভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত, পর্যুদস্ত ও নিষ্পেষিত হতে থাকে তা হলে সে মানুষের গড়া মতবাদের মধ্যে শান্তির আবেহায়াতের সন্ধান করা কী সবচেয়ে বড় আহাম্মকি নয়? জালিম মানবরূপী দানবদের গড়া মতবাদের মধ্যে কি শান্তির সওগাত আশা করা যায়? এমনি জালিম মানুষকে অহিভিত্তিক ব্যবস্থার বিপরীত কোনো জীবন বিধান রচনার অধিকার দেয়া যেতে পারে?

তাই যুক্তির কষ্টি পাথরে যাঁচাই করলে এ সত্যই প্রতিভাত হয়ে যে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আহার ও পানীয় দ্রব্য সামগ্রীর চেয়েও মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত অহিভিত্তিক জীবনবিধানের প্রয়োজনীয়তা, অপরিহার্যতা আরও বেশি তীব্র, আরও বেশি প্রকট। মানুষের জৈবিক চাহিদার চেয়েও অহিভিত্তিক জীবন দর্শনের চাহিদার গুরুত্ব অধিক।

www.pathagar.com

৬. ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তিই যেহেতু কোরআন ও সুন্নাহ, সেহেতু এর মধ্যে নিহিত রয়েছে মানুষের অতীতের ও আজকের সকল সমস্যার নির্ভুল ও সুষ্ঠু সমাধান। একমাত্র আল্লাহর কোরআন ও রাসুলের সুন্নাহ ছাড়া কারও মতবাদ বা গ্রন্থের মধ্যে কোনো নির্ভরযোগ্য সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না। আল্লাহর বিধান ছাড়া সুষ্ঠু, নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য সমাধান দেয়ার সাধ্য আর কারো নেই।

সমগ্র সৃষ্টি, তার রহস্য, তাৎপর্য, মূলতত্ত্ব, স্রষ্টার ধারণা, দৃশ্য-অদৃশ্য, জৈব-অজৈব, জড়-অজড়, বস্তু ও পদার্থের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, চূড়ান্ত পরিণতি, মানব সৃষ্টি, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক, সৃষ্টি জগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের জীবন-মৃত্যু, জীবনের পরিণাম, পুনরুত্থান, হিসাব-কিতাব, প্রতিদান, শাস্তি ও পুরস্কারের প্রসঙ্গে এ সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ, এ বিশাল প্রশস্ত উপত্যকা ও মরুভূমি, এ অর্থে অসীম নীল সমুদ্র, নদী-নালা, সীমাহীন নীল আকাশ ও অসীম সবুজ পৃথিবী, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অগণিত সৃষ্টি ও শক্তি এবং মৃত্তিকার তলদেশের অগণিত খনিজ পদার্থ ও সৃষ্টির সকল রহস্যের তাৎপর্য ও মূলতত্ত্ব, – সবকিছুর সঠিক উত্তর একমাত্র আল্লাহর কোরআন ও রাসূলের সুন্নতে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। যখন সকল জ্ঞান ও আবিষ্কারকে মূল জ্ঞানের উৎস আল-কোরআন ও সুন্নাহর অনুগত করে দেয়া যায় তখনই প্রকৃত সত্য ও নির্ভুল তথ্য লাভ করা যেতে পারে।

ইসলামী সংস্কৃতির উপাদান

যারা কোরআনে হাকীম, সুন্নাতে রাসুল ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ ও কর্মধারা অধ্যয়ন করবেন, তারা এটি সুস্পষ্টভাবে উপলব্দি করতে পারবেন যে, নবুওয়াত ও খিলাফতের স্বর্ণযুগে ইসলামী আইন, এর বিভিন্ন আহ্‌কাম নির্দেশ ও নিষেধ, ফরমান ও উপদেশাবলী একীভূত ছিল। এসবকে আলাদা আলাদাভাবে সুবিন্যস্ত করা হয়নি। ইসলামী জিন্দেগীর সমগ্র আহ্‌কামই সাধারণভাবে সন্নিবেশিত ও সংযুক্ত ছিল। ইসলামী আকীদাহ্ ইবাদত, নৈতিক বিধান, রাজনৈতিক পদ্ধতি, সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক বিধিবিধানগুলো কোনো বিক্ষিপ্ত অধ্যায়ে ও বিভাগে বিভক্ত করা ছিল না বরং সবকিছু এক, অবিচ্ছেদ ও অবিচ্ছিন্ন দেহের মতই সংযুক্ত ছিল। বরং কোরআনে করিম ও সুন্নাতে রাসূল এক সমষ্টিগত ও সামগ্রিক ও পরিপূর্ণ জীবনের হেদায়াত ছিল, যাকে এক কথায় আল্লাহ প্রদত্ত জীবনপদ্ধতি বা "আল্লাহর পথ" বলা হতো।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ হেদায়াত যেহেতু আল্লাহ ও তার রাসূলের দেয়াই ছিল সেহেতু সবটাই ছিল কাম্য ও পছন্দনীয়। এটাই ছিল সকলের অন্তরের একান্ত কামনা– আল্লাহর দেয়া সমস্ত হুকুম অবশ্যই মেনে চলতে হবে এবং আল্লাহ ও তার রাসূল যা করতে নিষেধ করেছেন তা অবশ্যই বর্জন করতে হবে। আল্লাহ রাসুলের প্রদত্ত হুকুম ও নিষেধ, ইবাদত, সামাজিক আচরণ, অর্থ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক পদ্ধতি যে ব্যাপারেই হোক না কেন সকল ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়িত করার মধ্যেই দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতে আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত প্রাপ্তি ও মুক্তি রয়েছে বলে সে যুগের সবাই বিশ্বাস করতো। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের আনুগত্যহীনতা ও আল্লাহ রাসূলের নিষেধসমূহ অমান্য করার মধ্যেই রয়েছে দুনিয়ার অশান্তি, বিপর্যয়, ক্ষতি ও আখেরাতের ব্যর্থতা ও কঠিন শাস্তি। মোদ্দা কথা নবুয়ত ও খিলাফতে রাশেদার পবিত্র যুগে

www.pathagar.com

ইসলামী আইনসমূহকে সুবিন্যস্তভাবে ছক বেঁধে বিভিন্ন বিভাগ ও অধ্যায়ে সুসজ্জিত ও সংকলিত করা হয়নি, বরং সরাসরি কোরআন ও সুন্নাহ হতেই তা আমল করা হতো।

তাবেয়ীন ও তাব্য়ে তাবেয়ীনদের যুগে ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশ সাধিত হয়। হাদীসগ্রন্থ অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের উল্লেখসহ সংকলিত হয়ে নতুন করে ফিকাহ বা ইসলামী আইনশাস্ত্রের উপরও মূল্যবান গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন শুরু হয়। কিন্তু এসবকে বিদয়াত নামে আখ্যায়িত করা চলে না বরং প্রিয় নবী (সাঃ) বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরামকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য বিভিন্ন সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তাফসীর শাস্ত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে আব্বাস (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে মাসউদের (রাঃ) পাণ্ডিত্য মীরাসী আইনে হযরত যায়েদ ইব্নে সাবিতের (রাঃ) বুৎপত্তি, এ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরামের অনন্য প্রতিভা ও গভীর পাণ্ডিত্যের কথা মহানবী (সাঃ) উল্লেখ করেছেন। "বংশধারা" বিষয়ে হযরত আবুবকর (রাঃ), সাহিত্য ও কাব্যজগতে হযরত হাস্নান বিন সাবিতের (রাঃ) সমকক্ষ কেউ ছিল না। বাগ্মীতায় হযরত সাবিত ইবনে কায়েসের (রাঃ) সাথে মোকাবিলা করা ও তার উপর প্রাধান্য লাভ করার মত আরবে কোনো বক্তাই ছিল না। মুসলমানরা এ সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা শুরু করে কোরআন ও সুন্নাহর বুনিয়াদে নতুন নতুন বিষয়ের উপর গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। আলাদা আলাদা বিষয়ের উদ্ভব ঘটে। যুগ পরিক্রমার সাথে সাথে মৌলিক বিষয়াবলী ছাড়াও এক একটি বিষয়ের শাখা উপশাখার উপর গ্রন্থ রচনা শুরু হয়। এমনিভাবে মুসলিম চিন্তানায়ক ও পণ্ডিতগণের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত সৃষ্টি হলো। তাদের চিন্তা গবেষণার ফসল বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তাদের চিন্তা-গবেষণা পাণ্ডিত্য ও বিভিন্ন বিষয়ে তাদের গভীর বুৎপত্তির কারণে মুসলিম সমাজ তাদের রচিত গ্রন্থাবলীকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করলো। ইসলামী সমাজে তারা উলুল আমর-এর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলেন।

এমনিভাবে এ সকল মুসলিম মনীষী ও ইমামগণ কর্তৃক তাফসীরশাস্ত্র, হাদীসশাস্ত্র, আকায়েদশাস্ত্র, নীতিবিজ্ঞান, সৌরবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, ফিকাহশাস্ত্র বা ইসলামী আইনশাস্ত্র, উসূলে ফিকাহ ইসলামী আইনশাস্ত্রের উৎস, তর্কশাস্ত্র, ভাষা বিজ্ঞান ও সাহিত্য ইত্যাদি স্বতন্ত্র বিষয়ের মর্যাদ লাভ করলো। ক্রমে ক্রমে এসব বিষয়ের উপর প্রচুর গ্রন্থ রচিত হলো। আমরা এ পর্যায়ে এ আলোচনাকে এভাবে পরিবশেন করতে পারি যে ইসলামের বুনিয়াদ হচ্ছে প্রকৃত তত্ত্ব ও জ্ঞানের উপর। এক কথায় ইসলামী জীবন দর্শনের বুনিয়াদ হচ্ছে ইসলামের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উপর। আর ইসলামের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে নিম্নে বর্ণিত উপাদানসমূহের উপর। তাই আমরা নিম্নে উল্লেখিত উপাদানসমূহকেই ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি ঃ

১. আকিদাহ,
২. ইবাদত,
৩. আখলাক ও
৪. মুয়ামিলাত।

মুয়ামিলাত বলতে ব্যবহারিক জীবনের সমগ্র আচরণকে আমরা বুঝাতে চাই। এ সকল উপাদানের মধ্যে আকায়েদ হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। #

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক দাসত্ব রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে বিছিন্ন নয়

মরিয়ম জামিলা

যদিও এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদের ঈমান এবং মানুষ হিসেবে আমাদের অনন্য পরিচিতির দিক থেকে বিদেশী রাজনৈতিক শাসনের চাইতে সাংস্কৃতিক অধীনতা অনেক বেশি ক্ষতিকর। তবে বাস্তবে সাংস্কৃতিক দাসত্ব রাজনৈতিক দাসত্বের সঙ্গে শুধুমাত্র সম্পৃক্তই নয় বরং সকল ইচ্ছা ও কাজে তা অবিভাজ্য। প্রায় ৬শ' বছর আগের কৃতি মুসলমান ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন তার *মুকাদ্দীমায়* এই সত্য স্বীকার করেছেন।

"বিজিতরা সব সময় বিজয়ীদের পোশাক, প্রতীক, বিশ্বাস এবং অন্যান্য আচার-প্রথা অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। এর কারণ হচ্ছে মানুষ সব সময় বিজয়ীদের কাছে প্রিয়পাত্র হতে আগ্রহী হয়। এটা দুই কারণে হয়- প্রথমতঃ বিজয়ীদের প্রতি শ্রদ্ধা, দ্বিতীয়তঃ বিজয়ীদের মত যোগ্যতার অধিকারী হলে তাদের পরাজয় হতো না এই মনোভাব হেতু যোগ্যতা অর্জনের জন্যে। এই বিশ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হলে এটা একটা ব্যাপক আস্থার ভাব সৃষ্টি করে। বিজয়ীদের সকল কিছু অনুকরণে বিজিতরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এই বিশ্বাস অজ্ঞাতভাবে অথবা বিজয়ের জন্যে বিজয়ীদের শারীরিক ও অস্ত্রের

www.pathagar.com

শক্তির চাইতে আচার-আচরণ প্রাধান্য বিস্তার করেছে এই বিশ্বাস থেকে সৃষ্টি হতে পারে। এই অবস্থায় তখন এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, বিজয়ীদের অনুকরণ পরাজয়ের কারণ দূরীভূত করবে। এইভাবে দেখা যায়, বিজিতরা পোশাক, অস্ত্র ধারণ যন্ত্রপাতি এবং জীবন ধারণের সকল পদ্ধতিতে বিজয়ীদের অনুকরণ করে। বস্তুত প্রতিটি দেশই তার বৃহৎ বিজয়ী প্রতিবেশীকে অনুকরণের চেষ্টা করে। স্পেনের মুসলমানেরা বিজয়ী প্রতিবেশী খৃস্টানদের অনুকরণ করেছে। খৃস্টানদের পোশাক, অলঙ্কার এবং আচার-আচরণের বিভিন্ন দিক এমনকি ঘরে ছবি রাখার ব্যাপারে মুসলমানরা তাদের অনুকরণ করেছে। সযত্ন পর্যবেক্ষণে এই হীনমন্যতা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।"

ইবনে খালদুন মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তার সময়ের স্পেনিশ মুসলমানদের ন্যায় আজকের ভারত উপমহাদেশের মুসলমানরাও অনুকরণ করছে। অবশ্য ভুলে যাওয়া উচিত নয় বিদেশী সভ্যতার অন্ধ ও সমালোচনাহীন অনুকরণ স্বতঃস্ফূর্ত নয়। আমাদের বিদেশী প্রভুরা শাসনের প্রথম লগ্ন থেকেই খুব সতর্কতার সঙ্গে আমাদের জীবন পদ্ধতিকে ধ্বংস করে সেখানে তাদের আচার-পদ্ধতি চালুর ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তার ফলে অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তাদের আচার-প্রথা প্রবেশ করেছে।

প্রায় একশ বছর আগে বৃটিশ সরকার উপমহাদেশের মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান এবং কার্যকরভাবে শাসনের নির্দিষ্ট পদক্ষেপের প্রস্তাব দানের জন্যে উইলিয়াম হান্টারকে নিযুক্ত করেছিলেন। সেই হিসেবে ১৮৭১ সালে তিনি লিখলেনঃ আমাদের ভারতীয় মুসলমান, তারা কি রাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বিবেকের কাছে বাধা! মুসলমানদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে ফেলার জন্যে এবং তাদেরকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে বিদেশী প্রভুত্ব মেনে নিতে শান্তভাবে আত্মসমর্পণ করানোর জন্যে 'সবজান্তা' ডঃ হান্টার প্রস্তাব করেছেন ইংরেজি শিক্ষার। তাই বইয়ের সমাপ্তি পর্বে তিনি তার সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন, "এভাবে মুসলমান যুবকদেরকে আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনার ভিত্তিতে শিক্ষিত করে তুলতে পারি। তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে এবং ধর্মশিক্ষার বিষয়ে সামান্যতম হস্তক্ষেপ না করেই আমরা তাদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলতে পারি, যাতে করে তারা ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করলেও ধর্মান্ধ হবে না। বিশ্বের অন্যতম চরম গোঁড়া সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুরা যেভাবে সহনশীলতার শিক্ষা পেয়েছে, মুসলমানদেরকেও সেই পদ্ধতি অনুসরণে উৎসাহিত করা যেতে পারে। অনুরূপ সহনশীলতা মুসলমানদেরকে তাদের পূর্ব-পুরুষদের গোঁড়ামী থেকে মুক্ত করে আনবে, যে গোঁড়ামী তাদেরকে নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা ও অপরাধজনক কাজের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে। আর এসবই তারা করে এসেছে ধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে। মুসলমানী আইনশাস্ত্র আবশ্যিক বিষয় হিসেবে নিয়মিত পড়ানো হবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু এটাকেই শিক্ষার মৌল লক্ষ্য হিসেবে ধরে নেয়া ঠিক হবে না। মুসলমানী আইন মানে মুসলমানী ধর্ম, মুসলমানরা সমগ্র পৃথিবীতে তাদের আইনানুগ অধিকারে বিশ্বাসী। তারা আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব, আনুগত্য অথবা খৃস্টান সরকারের অধীনতার কথা জানে না। মুসলমানী আইন সরকারের কোনো প্রয়োজন এবং জীবন সম্পর্কে তার ছাত্রদেরকে কোনো ধারণা দেয় না। এর পরিবর্তে আমাদের উচিত একটা উদীয়মান মুসলিম জাতি গড়ে তোলা যারা নিজস্ব সংকীর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি ও মধ্যযুগীয় ভাবধারার গণ্ডীতে আবদ্ধ না থেকে পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের নমনীয় শিক্ষায়

www.pathagar.com

শিক্ষিত হবে। ইংরেজি প্রশিক্ষণ জীবনের লাভজনক অধ্যায়ে প্রবেশের নিশ্চয়তা দেবে। কোন পদ্ধতির প্রবর্তনের দ্বারা হিন্দু ও মুসলমানদের সমভাবে উচ্চতর ধর্মীয় ধারণায় উন্নীত করা সম্ভব, সে সম্পর্কে আমি এখানে কিছু বলতে চাই না। তবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, অনুরূপ উন্নত অবস্থায় তারা একদিন উপনীত হবে এবং এতদিন নেতিবাচক ভূমিকা পালন করলেও আমাদের প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতি হচ্ছে এ বিষয়ে প্রাথমিক পদক্ষেপ।"

উইলিয়াম হান্টারের ভবিষ্যৎবাণী সত্যে পরিণত হয়েছে এবং আজ আমরা তার ফল ভোগ করছি। বংশপরম্পরায় পাওয়া সেই সম্পত্তি ৪৭-এর স্বাধীনতার পরও সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় এখনও বহাল রয়েছে। বৃটিশ শিক্ষা পদ্ধতি এতই দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়িত হয়েছে যে, সমগ্র উপমহাদেশে আধুনিকতা তথা ধর্মনিরপেক্ষতার বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদের মোকাবিলা করার জন্যে পর্যাপ্ত ইসলামী জ্ঞানদানে সক্ষম একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও কোথাও নেই। আমাদের যুবকেরা নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কোনো আকর্ষণ ছাড়াই বড় হচ্ছে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে Lord cromer ছিলেন আরব বিশ্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। ১৮৮৩ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত পঁচিশ বছর প্রতিবন্ধকতাহীনভাবে তিনি মিশর শাসন করেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কৌশল জানার জন্যে তার বিরাট বই Modern Egypt অপরিহার্য। এই বইয়ের সমাপ্তিতে তিনি কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখেননি যে, সরাসরি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের চাইতে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের নীতিই ছিল তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

Lord cromer লিখেছেন, "কোনো বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন রাজনীতিকের চিন্তা করা ঠিক নয় যে, ইসলামকে পুনর্জীবন দানে সক্ষম এমন পরিকল্পনা তাদের রয়েছে, বস্তুতঃ ইসলাম এখনো মরে যায়নি, বরং শতাব্দী ধরে টিকে থাকার যোগ্য। তবে রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে তা মৃতপ্রায়, তার ক্রমাগত অবনতি কোনো আধুনিক তত্ত্ব প্রয়োগে, তা যতই দক্ষতার সঙ্গে করা হোক না কেন ঠেকানো যাবে না। এই পর্যন্ত যতটুকু বিচার করা যায়, তাতে দু'টি মাত্র বিকল্প পন্থা সম্ভব। মিশরকে পর্যায়ক্রমে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে নতুবা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে নিতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই দুই বিকল্পের প্রথমটির পক্ষে। আমরা যা করব তাতে ভাল, জোরদার এবং স্থিতিশীল সরকারের ব্যবস্থা করতে হবে যা অরাজকতা এবং দেউলিয়াত্ব দূর করে মিশরকে ইউরোপের জন্যে সমস্যায় পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করবে। এ ধরনের সরকারের কাজে আমাদের বেশি মাথা ঘামানো উচিত নয়। তবে আমাদের বিদায়ের পর সরকারকে এমনভাবে কাজ করতে হবে যা পশ্চিমা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ... এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, মিশরের সম্পূর্ণ মুসলমানী নীতির ওপর প্রাচীন চিন্তাধারা ও পশ্চাদগামী সরকার প্রতিষ্ঠার সময় ইউরোপ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে। মিশর যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাতে ঐ ধরনের চিন্তাধারা অনুসৃত হলে বস্তুগত স্বার্থের সাংঘাতিক ক্ষতি হবে। যারা এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে চান এবং সমস্যার সমাধান চান, তাদেরকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে মিশরের নতুন বংশধর পশ্চিমা সভ্যতা সত্যিকারভাবে অনুসরণ বা গ্রহণে বাধ্য হয়। আমার বিশ্বাস ইংল্যান্ডের সুমহান পরিচালনায় পশ্চিমা সভ্যতার রশ্মি কৃষ্ণ আফ্রিকার সবচাইতে দুর্ভেদ্যস্থানে গিয়ে পৌঁছবে এবং এমনকি মিশরের ক্লেদাক্ত কৃষকেরাও তাতে নতুন জীবন লাভ করবে। মিশরীয়দের অজ্ঞতা এবং অকৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও

www.pathagar.com

আমি এখনো আশা করি, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বংশধরেরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখবে যে, Anglo-Saxon জাতির লোকেরা প্রথম তাদের অত্যাচারী কৃতদাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে, তারা তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে যে, তারাও মানবিক আচরণ পাওয়ার অধিকারী। তারা তাদের সামনে নৈতিক অগ্রগতি এবং চিন্তার স্বাধীনতা ও বস্তুগত সুখ, স্বাচ্ছন্দ্যের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে পশ্চিমা সভ্যতার সত্যিকার মহাসড়ক।"

এটাই ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূল লক্ষ্য। স্বাধীনতার পরও কেন আমাদের ওপর বিদেশী প্রভাব এত জোরদার তার জবাবও এই বৃটিশ শাসকের উক্তি থেকে পাওয়া যাবে। বস্তুতঃ সকল প্রচারণা সত্ত্বেও আমাদের স্বাধীনতা একটা সামান্য ব্যাপার মাত্র। দীর্ঘদিন আমাদের দেশ বিদেশী শাসনাধীন ছিল, আমাদের জনগণকে অতীত ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে বিদেশী প্রভুরা খুব যত্নের সঙ্গে সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এইভাবে তারা সাফল্যের সঙ্গে বিশেষতঃ সামাজিক দিক থেকে প্রাজ্ঞ লোকদের মধ্য থেকে একদল সাক্ষীগোপাল ও গৃহশত্রু বিভীষণ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। তথাকথিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়ার পর আমাদের নেতৃত্ব এই পশ্চিমা চক্রের হাতে গিয়ে পড়ে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে এই নেতৃত্ব অব্যাহত থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল। কারণ আমাদের জনসংখ্যার বৃহৎ অংশই তাদের ধ্যান ধারণা এবং তাদেরকে ঘৃণা করতো, এই কারণে গণতান্ত্রিক পন্থায় পশ্চিমা সভ্যতার বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়ল। এই জন্যে খুবই শক্ত হাতে একনায়কত্ব চাপিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা হলো। যারা এর বিরোধিতা করলো তাদেরকে নির্দয়ভাবে নিশ্চিহ্ন করা হলো। এমন কি ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত বৃহৎ শক্তিগুলো তাদের জনগণকে দেয়া গণতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা মুসলমানদের দিতে রাজী হবে না, কারণ তারা ভাল করেই জানে মুসলমানদের মনে ইসলামের প্রভাব খুবই জোরদার, গণতান্ত্রিক রায় প্রকাশের সুযোগ একবার আসলেই সকল মুসলিম অধ্যুষিত দেশ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। আর এই অবস্থা হলে এশিয়া ও আফ্রিকায় তাদের প্রভুত্ব চিরদিনের জন্যে খতম হয়ে যাবে। এই জন্যে ইসলামী আন্দোলনকে তাদের বিরাট ভয়। বিশ্বব্যাপী তাদের সংগঠিত সকল চক্রান্তের লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনকে শেষ করা। রাজনৈতিক দাসত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত অর্থনৈতিক দাসত্বকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারি না, বরং বলা যায় অর্থনৈতিক দাসত্বই আমাদের এই পরিস্থিতিতে নিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে বৃহৎ শক্তিবর্গ বিদেশী সাহায্যের টোপ গেলাতে উৎকণ্ঠিত। উচ্চহারে সুদ নিয়ে এই সাহায্য শেষ পর্যন্ত গ্রহীতা দেশকে ভিক্ষুকে পরিণত করে। এতে কোনো অতিশয়োক্তি নেই যে, পশ্চিমা বিরাট বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো তাদের সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশের প্রধান মাধ্যম। অনুন্নত (এখন উন্নয়নগামী) মুসলিম দেশসমূহে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে পর্যায়ক্রমে বিরাট বিলাসবহুল ভবন, অত্যাধুনিক কারুকার্যের হোটেল, শহরের রূপ পাল্টিয়ে দেয়। ব্যবস্থা হয় নৈশ ক্লাব এবং ক্যাবারে নাচের। হলিউড থেকে অপরাধমূলক ও অবৈধ যৌন সংসর্গের জঘন্য ছবি আসে, তার অনুকরণে দেশে ছবি নির্মিত হয়, পর্ণ ছবি, পুস্তক এবং বিদঘুটে পোশাক এসে বাজারে সয়লাভের সৃষ্টি করে যা সামাজিক উৎকর্ষতার চূড়ান্ত বিকাশ বলে বিবেচিত হয়। খাদ্যে ভেজাল দেয়া আমাদের শরিয়তে বিরাট পাপ বলে গণ্য হলেও এই পরিবেশে তা দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং অন্যের জীবন ও স্বাস্থ্যের বিনিময়ে ভেজালদানকারী দিনে দিনে

www.pathagar.com

প্রাচুর্যের উচ্ছশিখরে আরোহন করে। মাদক দ্রব্যের ব্যবহার অস্বাভাবিক বেড়ে যায়, আমাদের বেতারগুলো কদর্য ও নগ্ন গানে সাধারণ মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে। বিদেশী প্রভাবিত শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থায় পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ করিয়ে মেয়েদেরকে চাকুরিতে নেয়া হয়। এইভাবে আমাদের মহিলারা স্ত্রী, মা, বোন এবং কন্যার পবিত্র আসন থেকে বাস ট্রেনের টিকেট সংগ্রাহক, ব্যাংকের কেরানী, টেলিফোন অপারেটর, সেলস গার্ল, বিমানবালা, রেস্তোরার ওয়েট্রেস, হোটেলের কক্ষ সেবিকা, ফ্যাশন মডেল এবং বেতার, টেলিভিশন, ছায়াছবি ও রাষ্ট্র আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের গায়িকা ও নর্তকীতে পরিণত হয়। এইভাবে পর্যায়ক্রমে পর্দা, বাড়ি, পরিবার অবৈধ যৌন সংসর্গের জোয়ারে ভেসে যায়। যুবক যুবতীরা একটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে গড়ে উঠে। এইসব ব্যাপার আকস্মিকভাবে হয় না বরং আমাদের ওপর যারা প্রভুত্ব বজায় রাখতে চায়, তারা খুব সতর্কতা ও দক্ষতার সঙ্গে আমাদের জীবন প্রবাহে এই সবের অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয়। আমাদের শত্রুরা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিকে থেকে আমাদের অধঃপতন ঘটিয়ে দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে ছোট করতে চায়। তাদের স্বার্থেই অধঃপতন ঘটুক, আমাদের দেশ দুর্নীতিতে ভেসে যাক এটাই তাদের কাম্য।

এই ভীতি কার্যকরবাবে মোকাবিলার জন্যে আমাদেরকে বুঝতে হবে রাজনৈতিক দাসত্ব কেন অবিচ্ছেদ্য, সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে হবে যে, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া সত্যিকার রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। বিরোধী এবং বিদেশী শাসনের অধীনে ইসলামের উৎকর্ষ অসম্ভব। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমাদের ইসলামী পুনর্জাগরণের সকল আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানাতে হবে এবং আমাদের সরকার যাতে আইন হিসেবে ইসলামের নির্ভেজাল শরিয়তকে গ্রহণ করে, সে জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। ইসলামী আন্দোলনকে সকল গণসংযোগ মাধ্যমের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে হবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে। কোনো বিদেশী শক্তি যাতে আমাদের ভূখণ্ডে সামরিক ঘাঁটি করতে না পারে, তার তীব্র বিরোধিতা করতে হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে আমাদের সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব সম্পদ ও বন্ধু মুসলিম দেশগুলোর ওপর নির্ভর করতে হবে। প্লেগরূপী বিদেশী সাহায্য অবশ্যই পরিহার করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক লেনদেনে, বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিবর্গের সঙ্গে আমাদেরকে সমঅংশীদার হিসেবে সৎ ব্যবসার ওপর জোর দিতে হবে। ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ সব সময় ইসলামকে তাদের শক্তিশালী শত্রু জ্ঞান করে আসছেন। ফলে তাদের নতুন বংশধরেরা একই দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামকে অধ্যয়ন করে থাকে। পশ্চিম ইউরোপ থেকে উদ্ভুত বস্তুবাদী দর্শনই প্রতিটি মুসলিম দেশে ইসলামী জীবন পদ্ধতি পুনরুজ্জীবনে সবচাইতে বড় বাধা হয়ে আছে। এই কারণে আমাদের কিছু উলেমাকে পাশ্চাত্যের অধিবাসী হয়ে ইউরোপের সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম এবং দর্শন পড়তে হবে, যাতে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্নত দর্শন উপস্থাপন করা যায়। এইভাবে সকল দিক থেকে আমাদেরকে সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করতে হবে যাতে ঈমানের শক্তিবৃদ্ধি হয়ে আমরা দুনিয়া ও আখেরাতে সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারি। #

[প্রবন্ধটি মরিয়ম জামিলার বিখ্যাত 'ইসলাম ও আধুনিকতা' গ্রন্থ থেকে নেওয়া।]

www.pathagar.com

সংস্কৃতি ও ইতিহাস

আলিয়া আলি ইজেতবেগভিচ

বুদ্ধিবাদী ও বস্তুবাদী-উভয় দলই ইতিহাসের এই ব্যাখ্যায় থিতু হয়ে আছে যে, পৃথিবীর বিকাশ শুরু হয়েছে একেবারে নিম্নতম পর্যায়ে থেকে এবং গুটিকয় অচলাবস্থা ও ব্যতিক্রম ব্যতীত ইতিহাস অনবরত এগিয়ে চলছে সামনের দিকে। অন্যকথায় তুলনামূলকভাবে বর্তমান কালটি অতীত কাল থেকে উন্নত এবং ভবিষ্যত থেকে অবনত। এ নিয়মেই ইতিহাস চলছে তাদের মতে। বস্তুবাদীদের এই দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিক কারণ তাদের নিকট ইতিহাস হল মানুষের বস্তুগত প্রগতি। তাদের চিন্তাধারা বস্তু ও সমাজকে ঘিরে, স্বয়ং মানুষকে ঘিরে নয়। ফলত এটা সংস্কৃতির ইতিহাস নয়, বরং সভ্যতার ইতিহাস।

মানুষ ও সংস্কৃতির ইতিহাস শূন্য থেকে শুরু হতে পারে না, তেমনি বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী তা ক্রমঅগ্রগতির ধারাতেও একনিষ্ঠ হতে পারে না। মানুষ ইতিহাসে প্রবেশ করেছে প্রবল নৈতিকতাসহ যা সে তার 'পশুত্বময় পূর্বসূরী'র নিকট থেকে পায়নি। প্রাগৈতিহাসিক কালে পশু ও আদিম মানুষের সহাবস্থানের সময় যে মানবিক গুণাবলী মানুষকে পশু থেকে আলাদা করেছিল বিজ্ঞান তা পর্যবেক্ষণ করেছে এবং স্বীকারও করেছে, কিন্তু কখনোই ব্যাখ্যা করেনি। গোড়াতেই (a prior) ধর্মীয় অনুধাবনাগুলো প্রত্যাখ্যান করার ফলে বিজ্ঞান এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।[১]

প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সমাজ জীবনের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছেন লুইস মরগান তার Ancient Society বইয়ে। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এ রকম ঃ[২]

- একটি গোত্রের সকলে মিলে তাদের নেতা পছন্দ করে, আবার সকলে মিলেই তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। সেক্ষেত্রে ক্ষমতাচ্যুত নেতা পুনরায় গোত্রের অপরাপর সদস্য তথা সাধারণ যোদ্ধায় পরিণত হয়।

www.pathagar.com

- একই গোত্রের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক ও যৌন সংসর্গ নিষিদ্ধ থাকে।
- গোত্রের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা এতই প্রবল যে, অনেক ক্ষেত্রে তা আত্মউৎসর্গের পর্যায় অতিক্রম করে।
- বন্দীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা হয়।
- গোত্রের সকল সদস্যই মুক্ত, স্বাধীন থাকে।
- গোত্রে নতুন সদস্যের অন্তর্ভুক্তি ঘটে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ধর্মীয় রীতিগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় নৃত্য ও নাটকের মধ্যে। প্রতিমার অস্তিত্ব নেই।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতান্ত্রিক মনোভাব অস্তিত্বশীল থাকে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই চিত্র দেখে এঙ্গেলস পুলকিত হন এবং মন্তব্য করেন, "কী চমৎকার সংবিধান! কী শিশুসুলভ সরলতা। সেনাবাহিনী নেই, পুলিশ, পাদ্রী, রাজা, মন্ত্রী, বিচারক, আইন, জেল কিছুই নেই- অথচ সব কিছুই সুশৃংখলভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। নারী-পুরুষ সবাই স্বাধীন; কোনো দাসত্ব নেই, এক গোত্রের ওপর আরেক গোত্রের আধিপত্য নেই।"[৩]

মর্গান বর্ণিত সমাজচিত্র শৈল্পিকভাবে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন তারই দেশের ঔপন্যাসিক ফেনিমোর কুপার। সন্দেহ নেই, র‍্যালফ ওয়ালডো ইমারসনের মনেও একই প্রতিক্রিয়া কাজ করেছে যখন তিনি আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে লেখেন, "আমি এদের মধ্যে মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতা দেখেছি এবং যত বেশি হিংস্রতা তাদের মধ্যে, তত বেশি মহত্ত্ব।"

টলস্টয় তার সামাজিক আদর্শের ভিত্তিভূমি খুঁজে পেয়েছেন আদিম রুশ কৃষকদের নিষ্কলুষ সরল জীবন ধারায়। এখানে এবং সর্বত্রই নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধগুলো নীচু স্তরের বস্তুগত ও সামাজিক উন্নয়নের সাথে সংযুক্ত থেকেছে।

ইউনেস্কো প্রকাশিত General History of Africa[৪] বইয়ে আমরা আদিম আফ্রিকীয় মানুষের সংস্কৃতি বিষয়ে আগ্রহোদ্দীপক চিত্র পাই। উদাহরণস্বরূপ জানা যাচ্ছে যে, প্রাচীন আফ্রিকীয় রাজ্যগুলোতে বিদেশী, সাদা কিংবা কালো, আগন্তুকদের আন্তরিক আতিথ্য দেওয়া হত এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মতই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত তারা। অথচ একই সময়ে প্রাচীন গ্রীস কিংবা রোমে বিদেশী আগন্তুকদেরকে দাস হিসেবে গণ্য করা হত। এগুলো লক্ষ্য করে বিখ্যাত জার্মান জাতিতাত্ত্বিক লিও ফ্রবেনিয়াস বলছেন, The Africans are civilized upto their bones, and the idea of their being barbarians is a Europen fiction.[৫]

আমেরিকার ইন্ডিয়ান, আফ্রিকা বা তাহিতির আদিবাসী কিংবা আদিম রুশ কৃষক বা ভারতের ব্রাত্য শ্রেণী-যাদের মধ্যে এই মানবিক মূল্যবোধগুলো জীবন্ত ছিল-এদের উৎপত্তি কোথায়? এবং কেন তারা ইতিহাসের প্রারম্ভে অস্তিত্বশীল থাকলেও ঐতিহাসিক প্রগতির সাথে সাথে সংখ্যালঘুতে পরিণত হল?

মর্গান তার সুপরিচিত বইটি শেষ করেন এই কথাগুলো বলে, "রাষ্ট্রে গণতন্ত্র এবং সমাজে সৌভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও সাধারণ শিক্ষা বয়ে থাকবে অভিজ্ঞতা, মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞান। এবং সেটা হবে সেই আদিম মানুষের স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের নবতর পুনরাবৃত্তি।"

অর্থাৎ মর্গানের মতে ভবিষ্যতে সভ্য সমাজে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব আসবে তিনটি ব্যবস্থাপনা দ্বারা ঃ অভিজ্ঞতা, মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞান। কিন্তু মজার ব্যাপার হল (১) আদিম

www.pathagar.com

সমাজে সাম্য-স্বাধীনতা ও সৌভ্রাতৃত্ব অভিজ্ঞতা, মন ও বিজ্ঞান থেকে উৎসারিত হয়নি এবং (২) মর্গানের বইটি লিখিত হওয়ার (১৮৭৭) পরবর্তী সময়পর্ব পর্যবেক্ষণ করে আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি যে, তার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে।

ইতিহাস তথাকথিত বর্বররা লিখছে না, ইতিহাস লিখছি আমরা। আমরা যত বেশি সভ্য হচ্ছি তাদের প্রতি আমাদের বোধ তত বেশি ঝাপসা হয়ে আসছে। কেউ যখন গণহত্যা চালায় কিংবা কোনো সংস্কৃতি ধ্বংস করতে চায় তখন তাকে আমরা বর্বরতা বলি, অপরদিকে যখন সহমর্মিতা ও মানবিকতার দাবি জানাই তখন বলি, "সভ্য জাতির মত আচরণ কর"। অর্থাৎ সকল ভালত্বে অধিকার আমাদের, মন্দত্বে তাদের। অথচ ইতিহাসের ধারা কি সাক্ষ্য দেয়? সুসভ্য স্প্যানিশরা কি নির্মম ও নির্লজ্জভাবে মায়া ও এ্যাজটেক এবং তাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করেনি? সভ্য ও সাদা চামড়ার বসতি স্থাপনকারীরা কি পরিকল্পনা মাফিক ইন্ডিয়ান উপজাতিদের নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেনি? মার্কিন সরকারের অনুদান কি তাদের সংস্কৃতির যৌবনকে ফিরিয়ে দিতে পারবে? তিন শ' বছর ধরে ইউরো-মার্কিন সভ্যতার ধারকেরা যে দাস ব্যবসা চালিয়ে এসেছে তা ইতিহাস থেকে মুছে যাবে কখনো? ঐ সময়ে তের থেকে পনের মিলিয়ন (সঠিক সংখ্যা কোনো কালেই জানা যাবে না) মানুষকে ধরা হয়েছিল নিতান্ত পশু শিকারের মতই।

এ প্রেক্ষিতে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের কথা আসে যেখানে পশ্চিমা এবং অনুন্নত, অল্প সভ্যমানুষের মধ্যে সম্পর্ক গড়ার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু উপায়টি হল ছল-চাতুরি, ভণ্ডামি ও অর্থনৈতিক দাসত্ব আরোপ এবং সে সাথে চলছে দুর্বলদের বস্তুগত, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংসের চক্রান্ত।

মধ্যযুগের[৮] ব্যাপারে আমাদের সংস্কারও একই প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যাযোগ্য। মধ্যযুগ কি সত্যিই অন্ধকার ও অস্বস্তির যুগ? সভ্যতার বিচারে হয়ত তাই। ইওরোপীয় বস্তুবাদী দার্শনিক হেলভেটিয়াসের ভাষায় মধ্যযুগে মানুষ পশুত্বে পরিণত হয়েছিল এবং মানুষের আইন পরিণত হয়েছিল দুর্বোধ্যতার আখড়ায়। কিন্তু বলা বাহুল্য খ্রিস্টান দার্শনিক নিকোলাই বার্দায়েজেভ বা চিত্রকর জঁা আরপ-এর নিকট মধ্যযুগ সেভাবে প্রতিভাত হবে না।[৬] সত্যি কথা হল, স্বচ্ছলতা ও আয়েশের ঘাটতি থাকলেও মধ্যযুগীয় সমাজ সব সময় অন্তর্নিষ্ঠ সারবত্তায় পরিপূর্ণ থেকেছে। সময়টি ছিল আধ্যাত্মিকতা ও মননমন্থনের স্বর্ণ যুগ যা ছাড়া পশ্চিমা মানুষের ক্ষমতা ও আকাঙ্ক্ষাকে বোঝা যায় না। মধ্যযুগ জন্ম দিয়েছে চমকপ্রদ বিশাল শিল্পকর্ম এবং সুসমন্বয় ঘটিয়েছে একটি মহান ধর্ম (খ্রিস্ট) ও একটি মহৎ দর্শনের (গ্রীক) মধ্যে। একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সৃষ্টি প্রকৌশল হিসেবে গথিক রীতির জন্ম এই মধ্যযুগেই। এই যুগ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পরিবর্তে যে অন্যতর উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে তাকে এ এন হোয়াইটহেড বলছেন "qualitative progress."[৭]

শিল্প ও ইতিহাস

একদিক থেকে বলতে গেলে, সংস্কৃতি কাল ও ইতিহাসের উর্ধ্বে। সংস্কৃতির উত্থান ও পতন আছে, কিন্তু সাধারণ অর্থে প্রগতি বলতে আমরা যা বুঝি তার সাথে এর কোনো আত্মীয়তা নেই। শিল্পে জ্ঞান কিংবা অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নেই, যেমনটি বিজ্ঞানে রয়েছে। প্রাচীন প্রস্তরযুগ থেকে আজ অবধি আমরা শিল্পে প্রকাশ ক্ষমতার কোনো বর্ধিত পর্যায় খুঁজে পাইনে প্রগতির সমান্তরালে। সেই আদিকালের শিল্পের যে অনুভাবনা ও বোধ, আজকের মহৎ শিল্পেরও তাই।

www.pathagar.com

সভ্যতার যেমন প্রস্তর যুগ, ইস্পাত যুগ ইত্যাদি আছে, সংস্কৃতির সে ধরনের কোনো উর্ধ্বমুখী স্তর নেই। সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে নব্য প্রস্তর যুগ প্রাচীন যুগ প্রাচীন প্রস্তর যুগ থেকে এক ধাপ অগ্রসর, কিন্তু শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে বরং উল্টোটি। সে ব্যাখ্যা শিল্পের মধ্যেই রয়েছে। প্রাচীন প্রস্তর যুগ নব্য প্রস্তর যুগ থেকে কয়েক হাজার বছর পুরনো হলেও সে সময়ের শিল্প পরবর্তী সময়ের শিল্পের চেয়েও বেশি আকর্ষণীয়, খাঁটি। কবিতা সর্বত্রই গদ্যের পূর্বসূরী, সঙ্গীত মানুষের ভাষা বর্ণনা রীতির পূর্বজ। প্রমাণ রয়েছে যে প্রতিটি ধর্মই শুরুতে ছিল খাঁটি ও সরল, শুধু পরবর্তীকালেই এর মধ্যে ব্যবহারিক বিকৃতি এসেছে। এ পর্যায়ে অন্তত এটুকু বলা যায় যে, সংস্কৃতির নিয়মতান্ত্রিক ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা একটি ধারণাগত বৈপরীত্য; এ ক্ষেত্রে যা সম্ভব তা হল শুধু সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীর ধারালিপিবদ্ধ করা।

জ্যাক রিসলার বলেছেন, "চার পাঁচ হাজার বছরের পুরনো মিশরীয় ভাস্কর্য আবিষ্কৃত হওয়া মাত্র, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই সত্যিকারের শৈল্পিক মূল্যমানতা অর্জন করে।" অনেক সমকালীন শিল্পী প্রাচীন মন্দিরগাত্রে খোদাই, কাদা, মার্বেল, সোনা বা আলাবেষ্টারের বিনম্র বিন্যাস থেকে স্বীয় শিল্পকর্মের অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকেন। এই প্রাচীন শিল্পকর্মগুলো কখনো কমনীয় ও সূক্ষ্ম (যেমন, থটমস ২য় ও থটমস ৩য়-এর সময়ে), কখনো কঠিন চেহারার স্মারকচিহ্নরূপে উৎকীর্ণ (যেমন চিওপস-এর সময়ে) এবং কখনো বাস্তবিকতাপূর্ণ ও অল্প প্রতীকী (যেমন আকেনীটেন এর সময়ে)।[৯]

সভ্যতার চোখে আবিষ্কারকালে আমেরিকা প্রাচীন পৃথিবীর চেয়ে পাঁচ থেকে ছয় হাজার বছর পিছিয়ে ছিল, এমন কি এলাকাটি এর লৌহ যুগেও পৌঁছায়নি (এইচ. জি. ওয়েলস জানাচ্ছেন)। কিন্তু সময়ের এই মাপযোগ আমেরিকার শিল্পজগতে আরোপ করা যায় না। বোনামপাক মন্দিরে, যেখানে আমেরিকা মহাদেশের প্রাচীনতম চিত্রকর্ম রক্ষিত আছে, আমরা অসাধারণ সৌন্দর্যময় দেয়ালচিত্র পাই। ১৯৬৬ সালে প্যারিসে প্রদর্শিত মায়া ভাস্কর্যও একই অনুভব জাগ্রত করে।

নীটশের নিকট গ্রীক ট্র্যাজেডি শিল্প জগতের সবচেয়ে বড় অর্জন। তার মতে মানব সংস্কৃতির সর্বোন্নত রূপ পাওয়া যেতে পারে গ্রীক সংস্কৃতিতেই।[১০] "কোনো আধুনিক কবি হোমার কিংবা ধ্রুপদী গ্রীক ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠত্বকে ছুঁতে পারেনি"- বলছেন আঁদ্রে মরিস। রজার কৎ লিখছেন, "দর্শনের কথা ভাবতে ভাবতে কখনো আমার মনে হয়, প্লেটোর পর তা আর খুব বেশি অগ্রসর হয়নি।" সিসেরোর নীতি ভাবনানির্ভর লেখাগুলো এখানে প্রাসঙ্গিক হতে পারে (যেমন ডি' ফিনিবাস বলোনারাম এট মেলর্ম' কিংবা 'ডি এ্যামিসিয়া'), কিন্তু তাঁর শ্রমসংঘ বা রাষ্ট্র পদ্ধতির ওপরে সভ্যতাভিত্তিক লেখা আজকের বিবেচনায় সম্পূর্ণরূপে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। একজন অজ্ঞাতনামা রোমান লেখকের বই 'ডি রিবাস বেলেসিস', যেখানে সামরিক সরঞ্জামাদির চিত্তাকর্ষক ড্রইং রয়েছে, সামরিক ইতিহাসের দিক থেকে মূল্যবান শুধু। কিন্তু আমরা সেনেকার 'সুখ' বা ভার্জিলের কবিতাকে আমাদের জীবনের খণ্ডপটে বাঁধতে পারিনে- তা আমাদের জীবনকে আপ্লুত করে সব দিক দিয়ে। সপ্তম ও অষ্টম শতকের ম্যানিয়োসি নামক চার হাজারের বেশি জাপানি কবিতার সংকলনটি (প্রধানত গীতি কবিতা) আজও বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম মহৎ শৈল্পিক অর্জন বলে বিবেচিত। অ্যাস্কাইলাস বা সফোক্লিসের ট্র্যাজেডি সব সময়ই এক অনুপম সত্যের বাণীবাহক। ইউরিপিডেস লিখেছেন 'ট্রোজান উইমেন', দু'হাজার বছর পর সার্ত্রে একই

www.pathagar.com

নামে লিখছেন আরেক নাটক। সৃষ্টি ভাবনার প্লাটফর্মে এদের মধ্যে আমরা কোনো বিরোধিতা খুঁজে পাইনে। কিন্তু বিজ্ঞান সূত্র বৃত্তাবদ্ধ। এ্যারিস্টটলের পদার্থবিদ্যা, টলেমীর জ্যোতির্বিদ্যা বা গ্যালেনের চিকিৎসাশাস্ত্র আজকের বিজ্ঞানের সাথে কতটুকু অংশীদারিত্ব দাবি করতে পারে? এ্যারিস্টটলের দুটি বিজ্ঞান গ্রন্থ (Physics ও On Heaven) সম্পর্কে বার্ট্রান্ড রাসেল বলছেন, "আধুনিক বিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে এই দুই বইয়ে লিখিত একটি বাক্যও আজ আর সময়োপযোগী নয়।"

শিল্প-তরঙ্গ প্রবাহিত হয় পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চল থেকে উন্নত অঞ্চলে। অন্য কথায় পূর্ব থেকে পশ্চিমে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে। কিন্তু বিজ্ঞানের চলাচল ঠিক বিপরীতক্রমে। অনিবার্য প্রভাবনাসহ প্রাচ্যের সঙ্গীত, হিন্দু লোকসঙ্গীত, আফ্রিকীয় নাচ ও গান, ওসানিয়ার শিল্প প্রবেশ করেছে পশ্চিমে। বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র অঞ্চল বলে বিবেচিত ওসানিয়ার শিল্প স্থান পেয়েছে ইউরোপ আমেরিকায় গ্যালারীতে। আফ্রিকীয় শিল্পের অবগুণ্ঠনের পর তা ইউরোপ আমেরিকার শিল্পে নবতর ঢেউ আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে। পশ্চিমা সভ্যতার অপরাপর জগতের মৌলিক শিল্পকর্ম থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেনি। শিল্পের এই সার্বজনীন অন্তর্যোগের কারণেই আইভরিকোস্টের আফ্রিকীয় মুখোশ এবং সিসটিন চ্যাপেলের ছাদচিত্র একই "sensory exitement" তৈরি করে।[১১]

১৯৬৬ সালে ডাকারে ঊনত্রিশটি দেশের অংশ গ্রহণে অনুষ্ঠিত আফ্রিকীয় শিল্পের আন্তর্জাতিক সম্মেলন সংস্কৃতি জগতের একটি অসাধারণ ঘটনা। কিন্তু একই সাথে কোনো আফ্রিকীয় দেশে আয়োজিত আফ্রিকীয় দেশগুলোর বাণিজ্য মেলা হয়ত কোনো খবরেই আসবে না। শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে তা কখনোই অনুন্নত নয়। কারণ শিল্পে অনুন্নত বা উন্নত বলে কিছু নেই। কালো আফ্রিকা তাই শিল্পকলা, লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের জগতে এক সত্যিকার পরাশক্তি।

নীতি ও ইতিহাস

আমরা কেন এ বিশ্ব সংসারে জীবন যাপন করছি- এ প্রশ্ন সংস্কৃতির, আর কিভাবে জীবন যাপন করছি- এ প্রশ্ন সভ্যতার। একটি জীবনের অর্থ সম্পর্কিত, অপরটি জীবনের যাপন প্রণালী সম্পর্কিত। সভ্যতার নানা কীর্তি প্রতিভাত হচ্ছে সেই আগুন আবিষ্কার থেকে আরম্ভ করে জলকল, লোহা, লেখনী, ইঞ্জিন, আণবিক শক্তি, নভোচারণ ইত্যাদি ক্রমোৎকর্ষের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সংস্কৃতির ভিন্ন চরিত্র। সে ঠিকই নতুনতরভাবে আরম্ভ করছে অনেক কিছু, কিন্তু পেছনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে মানুষের যে প্রতীকী ভালত্ব-মন্দত্ব, সদগুণ ও সংশয় তা তার মানবিক অস্তিত্বকেই সংহত করে।

আজকের সকল সংকট ও সমস্যা দু'হাজার বছর আগেই নীতি-ভাবনায় পরিচালিত ছিল। মানবতার সকল মহৎ শিক্ষক পয়গম্বর মুসা (আঃ), যীশু খ্রিস্ট, মুহাম্মদ (সাঃ) এবং অপয়গম্বার কনফুসিয়াস, গৌতম বুদ্ধ, সক্রেটিস, কান্ট, টলস্টয়, মার্টিন বুবার (খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে আজ অবধি) সকলে সারসত্য বিচারে বলতে গেলে একই নৈতিকতার শিক্ষা দিয়েছেন। সামাজিক শৃংখলা ও উৎপাদনের নিয়ম থেকে নৈতিক মতগুলো পৃথক এবং তা অবিচ্ছিন্নতার পরিচায়ক। কিন্তু বাস্তব জীবনে সবকিছু বিপরীত ক্রমিক, যেমন জন কেনথ গলব্রেইথ বলেছেন, পরিবর্তনশীলতাই অর্থনৈতিক জীবনের নিয়ম। নৈতিক সত্যগুলোর অপরিবর্তনীয়তার বীজ রোপিত হয়েছে সেই সৃষ্টির সময়ে যখন মানবিক দ্বন্দ্বপ্রকরণ ও

www.pathagar.com

রহস্যকেও আমাদের জীবনের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়। এ কাজটি মানবেতিহাস শুরু হওয়ার আগেই সম্পন্ন হয়েছিল স্বর্গে। বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা এই ব্যাপারটি জানতে আমাদের সহায়তা করতে পারে না। যীশু খ্রিস্ট তার সত্য বার্তা উচ্চারণ করেন তার শৈশবে এবং তিরিশ বছর বয়সের মধ্যেই তার মিশন সম্পন্ন করেন। খোদা ও মানুষ সম্পর্কে মহৎ সত্যগুলো উচ্চারণে জ্ঞান কিংবা অভিজ্ঞতা কোনোটিই প্রয়োজন হয়নি তার। কারণ তা জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অধিগম্য নয়। তা "জ্ঞানী ও বিদ্বানদের নিকট লুক্কায়িত এবং শুধু অল্পসংখ্যক মানুষের নিকট প্রত্যাদিষ্ট নয় কি!"[১২]

সারবত্ত নৈতিক নির্দেশনাগুলো স্থান-কাল ও সামাজিক পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত নয়। পৃথিবীব্যাপী মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ ও কর্মকাণ্ডের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা নৈতিক নীতিগুলোর মধ্যে আশ্চর্যজনক সামঞ্জস্য লক্ষ্য করি।[১৩] এপিকটেটাস ও মারকিউস-একজন দাস, অপরজন রাজা-একই নৈতিক শিক্ষা, এমনকি একই বাক্যমালা প্রচার করেন। সাধারণভাবে যে সমস্ত ভালো-মন্দ, নীতি-অনীতির ধারণা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয় সেগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সাথে জড়িত। নীতির মৌলিক চেতনায় আমরা সার্বজনীনতা লক্ষ্য করি। ব্যাপারটি কান্টের বিখ্যাত 'শর্তহীন আদেশে'র নীতি (Categoric Imperative) দ্বারাও দৃঢ়ীকৃত হচ্ছে। এই নীতিটি, যা প্রাচীন চিন্তাবিদদের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে পাওয়া যায় তা প্রথম সংজ্ঞায়িত হয়েছে কান্টের "Foundation of the Metaphysics of Morals"-এ এইভাবে, "Work only according to the principle of which you may want to become a general law". এবং এরপর তার Critique of Pure Reason'-এ বলছেন, "Work in such a way that the principle of your will can serve at any time as a principle of general legislation".

কিভাবে সৎ জীবন যাপন করতে হয় সে প্রশ্নের উত্তরে প্রাচীন গ্রীসের সাত সাধুর এক সাধু থেলেস (জন্ম ৬২৪ খ্রিঃ পূঃ) বলেছিলেন, "যে কাজের জন্যে আমরা অন্যকে তিরস্কার করি, নিজেরা সেটা করা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে।" প্রাচীন রোমের সিসেরো বলেন, "অন্যের যা কিছুকে তুমি সমালোচনা কর নিজে সেটা করা থেকে দূরে থাকো।"[১৪] যীশু খ্রিস্টের সমসাময়িক এবং প্যালেস্টাইনে বাসরত ইহুদী চিন্তাবিদ হিল্লেল নৈতিকতা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "যা তুমি নিজের জন্যে চাও না তা তোমার প্রতিবেশীর জন্যে চেয়ো না। সমগ্র তওরাত এই নীতির সাথে সম্পৃক্ত।"[১৫] বুদ্ধ ও পিথাগোরাসের সমসাময়িক কুনফুসিয়াসও একই শিক্ষা প্রচার করেন চীন দেশে ঃ "আমি নিজে যা করতে চাইনে, তা অন্যের জন্যে করি না।"[১৬] একই নীতি যীশু খ্রিস্ট প্রকাশ করেছেন তাঁর বিখ্যাত এই উক্তিতে ঃ "Do unto others as you would have them unto you"[১৭]-Categoric Imperative-এর এই চিত্র প্রমাণ করে যে, সার্বজনীন নৈতিক নীতির কোনো প্রগতিশীল ইতিহাস নেই। আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য থাকতে পারে কিন্তু সারসত্যটি সর্বত্রই এক।

শিল্পী ও অভিজ্ঞতা

শিল্পের যেমন বিবর্তন নেই, শিল্পীর জীবনও তেমনি বিবর্তনহীন। প্রত্যেক শিল্পী শিল্প সৃষ্টিতে একেবারে আনকোরা, যেন তার পূর্বে আর কেউ কিছুই সৃষ্টি করেনি। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কারও অভিজ্ঞতা ব্যবহার করেন না। অন্যের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ন ও সংগ্রহ বিজ্ঞানভিত্তিকতার নির্দেশ দেয়, কিন্তু শিল্পে অন্যের অভিজ্ঞতা ব্যবহারের অর্থ হল অনুকরণ, পুনরাবৃত্তি তথা এক কথায় শিল্পের অকাল মৃত্যু।

www.pathagar.com

পিকাসো সত্তর বছর ধরে আঁকেন এবং এই সময়পর্বে তিনি কিউবিজম, নব্য কিউবিজম, অভিজ্ঞতাবাদ ও পরাবাস্তববাদের পর্যায় অতিক্রম করেন, কিন্তু ব্যাপারটি শিল্পীর মন্দ থেকে ভালোর দিকে কিংবা অপূর্ণাঙ্গতা থেকে পূর্ণাঙ্গতার দিকে গমনের নির্দেশ দেয় না। এটা কোনো বিবর্তন নয়, বরং আবহমান মানবিক জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসার প্রতি সাড়া দেওয়া। শিল্পের এই অভিজ্ঞতা-অনির্ভর ও ইতিহাসহীন চরিত্র বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, বড়দের জন্যে এক ধরনের বিজ্ঞান ও ছোটদের জন্যে আরেক ধরনের বিজ্ঞান। বাচ্চাদের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও বয়সের ওপরে তার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়বস্তু বোঝা নির্ভর করে। কিন্তু সে অর্থে এমন সঙ্গীত নেই যা উপভোগ করার জন্যে বাচ্চাদের বড় হয়ে উঠতে হয়। বাক, মোৎসার্ট, বেতোফেন, দেবুসী প্রমুখের সুরলহরী বুঝুক আর না বুঝুক, ছোট বড় সকলের মনেই তা সমান সাড়া জাগায়। বেতোফেনের বিখ্যাত বত্রিশ সনেটের সুরচক্র একদিকে তরুণ ছাত্রদের সাহিত্য শিক্ষার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, আবার তা স্বনামখ্যাত পিয়ানো শিল্পীর পিয়ানোতে বাজানো হচ্ছে ক্লাসিক আবহে।

পিকাসো কথা বলতে শেখার আগেই মাত্র দু'বছর বয়সে ছবি এঁকেছেন। তার বয়সী শিশুরা সবে যখন শব্দ উচ্চারণ করতে শিখেছে, ওভিড তখন কথা বলতেন ষট্পদীতে। মাত্র ছয় বছর বয়সে মোৎসার্টের প্রথম কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। সুতরাং শিল্প জ্ঞান নয়, অন্তর্মন্থিত উপলব্ধি। দিনভর কাজ শেষে একজন কৃষক একখণ্ডও কাঠ নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে খোদাই করা শুরু করতে পারেন- দশ বছরের একাডেমিক শিক্ষার প্রয়োজন নেই তার। কাজেই বিশেষ প্রতিভাও শিল্পে সবকিছু নয়। স্মরণ করা যেতে পারে টলস্টয় ও তার প্রতিষ্ঠান "ইয়াসানীয়া পলিয়ান"-কে যেখানে তিনি গভীর ধর্মীয় ও নৈতিক আলোচনায় বসতেন শুধু শিশুদের সাথে।[১৮] কাজেই শিল্প, ধর্ম ও নীতিক ভাবনা বোঝার উপকরণ বুদ্ধি ও যুক্তি থেকে নয়, আসছে অন্তর্গত প্রদেশ থেকে। এখানে একটি যুক্তি আরেকটি যুক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে না; একটি হৃদয় আরেকটি হৃদয়ে একনিষ্ঠ হচ্ছে গভীর মমত্বসহকারে।

টীকা

১. এই সময়ের জীবন্ত স্মৃতি প্রায় সকল জাতির কিংবদন্তী ও রূপকথায় পাওয়া যায় স্বর্ণযুগের মীথ হিসেবে। বাইবেলের Age of the Patriarches এখানে উল্লেখ্য। এই সময়পর্ব যে ভালো ছিল না- সে বিবেচনা এসেছে শুধু বিবর্তনবাদের সাথে। Betrand Russell তার 'History of Western Philosophy' বইয়ে বলছেন, "The common belief that the past had been bad appeared only with the theory of evolution."

২. Morgan তার উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন উত্তর আমেরিকার Iroquois কৌম থেকে যা এ জাতীয় আলোচনার মডেল হিসেবে গৃহীত।

৩. Engels : The Origin of The Family, Private Property and the state, New York. 1928, P. 86.

৪. UNESCO কর্তৃক সম্পাদিত। পরিকল্পিত ৮ খণ্ডের ২ খণ্ড ইতোমধ্যে প্রকাশিত।

৫. বোঝাই যাচ্ছে, Frobenius এখানে Civilized শব্দটি ব্যবহার করেছেন Cultured-এর অর্থেই।

৬. Jean Arp : "I am against mechanized things and chemical formulas. I like the middle ages. Its tapestries and sculputers."

৭. Whitehead : The Future of Religion.

৮. এখানে অব্যশ্যই আমরা ইউরোপের কথা বলছি। এ অর্থে মধ্যযুগ পৃথিবীর অন্যান্য অংশে বিরাজ করছিল না। যেমন, ভারত থেকে স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় ইসলামী সভ্যতা সে সময়ে উৎকর্ষ লাভ করছিল ক্রমাগত।

www.pathagar.com

৯. Jacque Risler : La Civilization Arabe.
২০. একই ধরনের বিবৃতি মার্কস দিয়েছেন ; তার নিকট প্রাচীন শিল্পকর্ম উপস্থাপন করে "unreachable norms and models". কিন্তু আনন্দের আতিশয্যে মার্কস বুঝতে পারেননি যে, তারই বিবৃতি তার দর্শনের বিরোধিতা করছে। সংস্কৃতি যদি সভ্যতা এবং এর উপকাঠামোর প্রতিফলন হয় তাহলে কেন unreachable হবে? আর কেন বা সভ্যতার ইতিহাস আরম্ভ হওয়ার আগেই আদিম সমাজে এর অস্তিত্ব থাকবে?
১১. Faure : The Spirit of Forms.
১২. St. Luke 10. 21.
১৩. Tolstoy বলেছেন, "খোদা কি? - এ ব্যাপারে যদিও বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন, কিন্তু খোদা তাদের নিকট কি চায় সে ব্যাপারটি যেন সকলেই সমানভাবে বুঝে থাকেন।"
১৪. Diogenes Laerritus 1. 36.
১৫. Babylonian Talmud. part-sabbath.
১৬. Lun-Yu: Thoughts and Talks of Confusious.
১৭. St. Matthew 7:2 and St. Luke 6 : 31.
১৮. Petrov: Tolstoy.

সংস্কৃতি ও সভ্যতা

দ্বৈতবাদের স্রোত

আমরা প্রায়শ সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে এক করে দেখি, কিন্তু এই প্রত্যয় দুটি অভিন্ন নয়।[১] সংস্কৃতির শুরু সৃষ্টিযজ্ঞ "Prologue in heaven"-এর সাথে। সংস্কৃতি তার ধর্ম, নীতি ও দর্শন সহযোগে মানুষ ও মানুষের আদি উৎস পারমার্থিক জগতের পারস্পারিক সম্পর্ককে উদ্ভকিত করে। সকল সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি মানুষের স্বর্গীয় উৎপত্তির ধারণার প্রতি স্বীকারোক্তি কিংবা অস্বীকৃতি, সন্দেহ কিংবা স্মৃতিচারণ; সংস্কৃতি এই হেঁয়ালি দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এবং এই হেঁয়ালিই যুগে যুগে নানাভাবে প্রকাশ করে চলছে সে।

বিপরীতক্রমে সভ্যতা হল প্রাণীবিদ্যক ও এক রৈখিক জীবনের ধারাবাহিকতা যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বস্তুগত আদান-প্রদান চলে। এখানে মানব জীবনের সাথে পশু জীবনের পার্থক্য রয়েছে বটে, কিন্তু তা শুধু মাত্রা, স্তর ও সংগঠনের দিক থেকে; গুণগত প্রেক্ষাপটে নয়। এ পর্যায়ে মানুষ পরাজাগতিক রহস্য, হ্যামলেট কিংবা কারামাজোভের মত কালজয়ী চরিত্রের শাশ্বত অন্তর্দ্বন্দ্ব দ্বারা আক্রান্ত নয়। সমাজের অসংখ্য বেনামী সদস্য এখানে প্রকৃতিপ্রদত্ত দ্রব্যাদির সদ্ব্যবহার করে এবং পৃথিবীকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে থাকে।

সংস্কৃতি হল মানুষের ওপর ধর্মের কিংবা মানুষের ওপর স্বয়ং মানুষেরই (man's influence on himself) প্রভাবের ফলশ্রুতি, যেখানে সভ্যতা হল প্রকৃতি তথা বাহ্য পৃথিবীর ওপর বুদ্ধিমত্তার প্রভাবের ফল। সংস্কৃতি হল "মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার আর্ট" যেখানে সভ্যতার অর্থ হল শৃংখলা, ক্রিয়া ও যথার্থতা। সংস্কৃতি হল "অনবরত নিজেকে সৃষ্টি করা", সভ্যতা হল পৃথিবীকে পরিবর্তন করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। এখানেই মানুষ ও বস্তু তথা humanism ও chosism[২] এর মধ্যকার বৈপরীত্য স্পষ্ট হয়।

ধর্মাচরণ, নাটক, কবিতা, খেলাধুলা, লোকজ সংস্কার, লোককথা, পুরাণগাঁথা, নৈতিক ও নন্দনতত্ত্বীয় ব্যবস্থা, দর্শন, থিয়েটার, গ্যালারী, যাদুঘর, গ্রন্থাগার, রাজনীতি ও বিচার ব্যবস্থা যা মানুষের ব্যক্তিত্বের মূল্য ও তার স্বাধীনতাকে স্বীকার ও শ্রদ্ধা করে- এগুলোই

www.pathagar.com

মানব সংস্কৃতির অখন্ড ধারাচিত্র, যার শুরু স্বর্গে, স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্ট মানুষের মধ্যকার আদি যোগাযোগের সূত্রে। এ হল "এক প্রজ্বলিত আলোক শিখার সাহায্যে গাঢ় অন্ধকার ভেঙে ভেঙে অনতিক্রম্য সেই পবিত্র পর্বতে মানুষের আরোহণ প্রচেষ্টার ছবি।"[৩]

সভ্যতা পারমার্থিক নয়, বরং কলাকৌশলগত প্রগতির ধারাবাহিকতা, ঠিক যেমনটি ডারউইনীয় বিবর্তন মানবিক নয়, জীববিদ্যক প্রগতির ধারাবাহিকতা। সভ্যতা হল আমাদের পূর্বপুরুষদের চারপাশে অস্তিত্বশীল অচেতন, অর্থহীন ও প্রাকৃতিক ও যান্ত্রিক উপাদানসমূহের ক্রমাগত উন্নয়ন। কাজেই সভ্যতা নিজে ভালোমন্দ নিরপেক্ষ। মানুষের নিশ্বাস ও খাদ্য গ্রহণ যেমন সহজাত, তেমনি সভ্যতার সৃজনও স্বাভাবিক। সভ্যতা একাধারে আমাদের অন্তর্গত স্বাধীনতার অন্তরায়, আবার আমাদের জন্যে অপরিহার্যও বটে। বিপরীতক্রমে সংস্কৃতি হল মানবিক স্বাধীনতারই নির্বাচন ও প্রকাশন।

সভ্যতায় বস্তুর ওপর মানুষের নির্ভরতা বেড়েই চলেছে। এক হিসেব মতে প্রত্যেক মার্কিন প্রতি বছর অন্তত ৮ টন বিভিন্ন ধরনের বস্তুগত দ্রব্যাদি ব্যবহার করে থাকে। প্রতিনিয়ত নতুন চাহিদার সৃষ্টি ও সেই চাহিদা পূরণের ব্যাপক আয়োজনের মধ্য দিয়ে সভ্যতা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বস্তুগত আদান-প্রদান ত্বরান্বিত ও ঘনট করে; সেখানে বাহ্যিক জীবন যাপন ছন্দ উচ্চকিত হয়, কিন্তু অন্তর্নিষ্ঠ জীবনের সুরটি চাপা পড়ে যায় সভ্যতার যান্ত্রিকতার তলে।

"Produce to gain, gain to squander"- সভ্যতায় এই ভাবনা সহজাত। অপরদিকে প্রতিটি সংস্কৃতি তার ধর্মীয় প্রকৃতির কারণে মানুষের চাহিদা ও যোগানের পরিমাণকে হ্রাস করতে চায়। সে চায় মানুষের অন্তর্গত স্বাধীনতার সুরকে জোরালো করতে। সকল সংস্কৃতিতে পাওয়া সন্ন্যাসবৃত্তি ও আত্মস্বীকৃতির ব্যাপারটি এখানে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধর্মের "সংযত আকাঙ্ক্ষার" নীতির পরিবর্তে সভ্যতাকে এই ভিন্নধর্মী মন্ত্রকে লালন করতে হয়েছেঃ "প্রতিনিয়ত তৈরি কর নতুন আকাঙ্ক্ষা।"[৪] কিন্তু এই দাবির অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য দুর্ঘটনাপ্রসূত নয়; এই দুই বিপরীতধর্মী দাবি মানব চরিত্রের দুই অপরিহার্য দ্বন্দ্বমূলক প্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব করছে।

সংস্কৃতির বাহক মানুষ, সভ্যতার বাহক সমাজ। সংস্কৃতির অর্থ সহজাতবোধের পরিচর্যার মাধ্যমে আত্মশক্তি অর্জন, সভ্যতার সংযোগ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, নগরী ও রাষ্ট্রের সাথে- এর মাধ্যম হল চিন্তা, ভাষা ও লেখনী।[৫] সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্পর্ক স্বর্গজগত ও ইহজগতের বা Civitas Dei ও Civitas Solis-এর সম্পর্কের অনুরূপ। একটি নাটকীয়তার (drama) প্রতিনিধিত্ব করে, অপরটি প্রতিনিধিত্ব করে ইউটোপিয়ার।

ট্যাটিটাস বলছেন যে, রোমানদের চেয়ে বার্বাররা তাদের দাসদের সাথে তুলনামূলকভাবে অনেক ভালো আচরণ করত। সাধারণভাবে সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যকার সীমারেখা বোঝার জন্যে প্রাচীন রোমকে উদাহরণ হিসাবে ধরা যেতে পারে। লুণ্ঠন, যুদ্ধ, অমানবিক শাসকশ্রেণী ও অসংখ্য নিরাবয়ব মানুষ, নিম্নতম প্রলেতারিয়েত শ্রেণী, মিথ্যে গণতন্ত্র, রাজনৈতিক ছলচাতুরি, খৃষ্টান হত্যা, গ্লাডিতোরিয়া (রোমের শাসক ও সামন্ত শ্রেণীর মনোরঞ্জনের জন্যে প্রদর্শিত দাসদের মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রাণপণ খেলা), নীরো ও কালিগুলার আচরণ- এ সবই যে রোমান সভ্যতার সত্য চিত্র সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, কিন্তু সংস্কৃতির কতটা সেখানে ছিল কিংবা সংস্কৃতির অনুষঙ্গ আদৌ ছিল কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ হয়। স্পেঙ্গলার তাই বলছেন, "Hellenic soul and Roman intellect - that is the difference between culture and civilization"[৬] -

www.pathagar.com

একইভাবে মায়া সংস্কৃতি, প্রাচীন জার্মান ও স্লাভ এবং ভারতীয় আদিবাসীদের সংস্কৃতিও রোমানদের সভ্যতা থেকে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত।

ইউরোপীয় রেনেসাঁও এই প্রেক্ষিতে ভালো দৃষ্টান্ত হিসেবে গৃহীত হতে পারে। সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে মানবেতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই যুগটি এক ধরনের পতনোন্মুখতার যুগ। রেনেসাঁর আগের শতকে ইউরোপে এক সত্যিকার অর্থনৈতিক বিপ্লব সংগঠিত হয়, যা সম্ভব হয় বর্ধিত উৎপাদন ও ভোগের মাধ্যমে এবং জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধির সাথে সাথে। কিন্তু রেনেসাঁর যুগ বলে পরিচিত পরবর্তী দু'শ' বছরে (১৩৫০-১৫৫০) এই অর্থনৈতিক বিপ্লবের অনেকখানিই হারিয়ে যায়। পৃথিবীর পরিবর্তে শুধু মানুষ ও মানবমুখে একনিষ্ঠ থাকায় বাস্তবতার প্রতি এক অলস ঔদাসীন্য দেখা দেয় এ সময়ে। এই রেনেসাঁর যুগে একের পর এক যখন পশ্চিমা সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম শিল্পকর্মগুলো সৃষ্টি হচ্ছে, তখন অন্যান্য ক্ষেত্রে সাধারণ স্থবিরতা ও পরিষ্কার অবক্ষয়ের চিত্র ফুটে উঠেছিল যার সাথে যোগ হয় জনসংখ্যা হ্রাসের প্রবণতা। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা ছিল ৪ মিলিয়ন; একশ' বছর পরে এই সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ২.১ মিলিয়নে। চতুর্দশ শতকে ফ্লোরেন্সের লোকসংখ্যা ১ লক্ষ থেকে ৭০ হাজারে হ্রাস পায়।

কাজেই দুই ধরনের প্রগতি রয়েছে যাদের মধ্যে মূলত কোনো আন্তঃসম্পর্ক নেই। অন্য কথায় 'সংস্কৃতির প্রগতি' ও 'সভ্যতার প্রগতি' সমান্তরালবর্তী নয়।[৭]

শিক্ষা ও ধ্যান

সভ্যতা মানুষকে শিক্ষিত করে, সংস্কৃতি মানুষকে আলোকিত করে। একটির প্রয়োজন জ্ঞানার্জন, অপরটির প্রয়োজন ধ্যান।

ধ্যান নিজেকে জানার এবং পৃথিবীতে নিজের স্থানকে বুঝে নেয়ার অন্তর্নিষ্ঠ প্রচেষ্টা যা জ্ঞানার্জন, শিক্ষা কিংবা বাস্তব উপাত্তসমূহ সংগ্রহ প্রচেষ্টার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ধ্যান এগিয়ে নিয়ে যায় বিচক্ষণতা, নমনীয়তা, প্রশান্তি বা অন্য কথায় Greek Catharsis - এর দিকে। এটা হল কতক ধর্মীয়, নৈতিক ও শৈল্পিক সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করার লক্ষ্যে নিজেকে নিজের মধ্যেই নিবেদন ও নিমজ্জিত করা। অপরদিকে শিক্ষা হল প্রকৃতিকে জানা এবং স্বীয় অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রকৃতির দিকে ফেরা। বিজ্ঞান প্রয়োগ করে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, বিভাজন ও পরীক্ষণ পদ্ধতি যেখানে ধ্যানের অর্থ 'খাঁটি উপলব্দি' (নব্য প্লেটোবাদে ধ্যান উপলব্দির পরাবৌদ্ধিক মাধ্যম)। ধ্যানমূলক পর্যবেক্ষণ ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত (সপেনহাওয়ার বলছেন); এই ধ্যান কোনো বৈজ্ঞানিকের পথ নয়, তা একজন কবি, একজন ভাবুক বা একজন শিল্পীর পথ। একজন বৈজ্ঞানিকেরও ধ্যানের রাজ্য অতিক্রম করতে হয়, কিন্তু ধ্যানের রাজ্যে প্রবেশমাত্রই বিজ্ঞানী আর বিজ্ঞানী থাকেন না, তিনি হয়ে পড়েন অখণ্ডসত্তা এক শিল্পী। ধ্যানে নিজের ওপর আধিপত্য করা যায়, বিজ্ঞান সাহায্য করে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে। আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষা আমাদের সভ্যতাকে এগিয়ে নেয়, সংস্কৃতিকে নয়।

আজকের দিনে মানুষ শেখে; অতীতে মানুষ ধ্যানমগ্ন হত। কিংবদন্তী বলে বোধিপ্রাপ্ত হওয়ার আগে মহামতি বুদ্ধ তিন দিন তিন রাত্রি নদীর ধারে ধ্যানমগ্ন হয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন সময়চেতনা বিস্মৃতি হয়ে। জেনোফেন সক্রেটিস সম্পর্কে একই রকম কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ একদিন সকালে সক্রেটিস একটি জটিল সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেছিলেন যার সহজ সুরাহা হচ্ছিল না; দুপুর গড়িয়ে গেল, তিনি ঠাঁই দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে

www.pathagar.com

লাগলেন। তখন কেই কেউ ঔৎসুক্য সহকারে ঘটনাস্থলের অদূরে তাদের মাদুর এনে অবস্থান নেয় যাতে তারা তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারে। সক্রেটিস দিনাবসানের পর সারা রাত্রিও একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন, অতঃপর পরের দিন সূর্যোদয়ের পর তার ধ্যানভঙ্গ হয়। তিনি সূর্যের দিকে ফিরে প্রার্থনা করেন, তারপর নিজের পা বাড়ান।[৮]

টলস্টয় তার সারা জীবন অতিবাহিত করেন মানুষ ও মানুষের নিয়তি বিষয়ে চিন্তা করতে করতে, যেখানে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রবাদপুরুষ গ্যালিলিও সারা জীবন নিজের চিন্তাকে বেঁধে রাখেন একটি শরীরের পতনজনিত সমস্যার সাথে। ধ্যান করা বা শিক্ষা লাভ সম্পূর্ণ দুই ধরনের কর্মকাণ্ড বা দুই ধরনের শক্তি যা দুই ভিন্ন লক্ষ্যে নিবেদিত। প্রথমটি বেতোফেনকে তাঁর 'The Ninth Symphony' সৃষ্টির দিকে এগিয়ে নেয়; দ্বিতীয়টি নিউটনকে এগিয়ে নেয় 'The Law of Gravitation' আবিষ্কারের দিকে। এভাবে ধ্যান ও শিক্ষার মধ্যকার বৈপরীত্য আরেকবার পুনরাবৃত্ত করে মানুষ ও পৃথিবী, আত্মা ও বুদ্ধিমত্তা কিংবা সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যকার বৈপরীত্যকে।

ধ্যানের বিষয়বস্তু কি?

প্রকৃতিতে বহুবিদ বাস্তব উপকরণ সহজলভ্য যার যাহায্যে মানুষ পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতিতে যে জিনিস অনুপস্থিত সেটি হল আত্মা (Self) বা ব্যক্তিত্ব যার মাধ্যমে মানুষের সাথে শাশ্বতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই আত্মা বা অহম বা 'আমিত্ব'- এর মাধ্যমে মানুষ একই সাথে পৃথিবী ও পর জগতের বাসিন্দা হতে পারে। এরই মাধ্যমে সে পারমার্থিকতা ও অন্তর্গত স্বাধীনতার অস্তিত্বের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে।

কাজেই ধ্যান হল আত্মসমুদ্রে অনবরত অবগাহন করা, নিজেকে নিজের মধ্যে স্থাপিত করা; ধ্যানের সাথে সামাজিক প্রশ্নমালার কোনো সম্পর্ক নেই।

ধ্যান বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড নয়। একজন বিজ্ঞানী নতুন মডেলের প্লেন তৈরি করতে গিয়ে ধ্যান করেন না; তিনি চিন্তা করেন, গবেষণা, অনুসন্ধান ও তুলনামূলক বিচার করেন। কিন্তু একজন সাধু, একজন কবি বা একজন শিল্পী ধ্যান করেন। তারা সত্যানুসন্ধান ও এক মহিমাময় রহস্যের উন্মোচনের পথে বিচরণ করেন। এই সত্যানুসন্ধ্যান সবকিছু, আবার কিছুই নয়; একটি আত্মার নিকট সবকিছু, বাদ বাকি পৃথিবীর নিকট কিছুই নয়।

কাজেই ধ্যান একটি ধর্মীয় কর্মকাণ্ড। এ্যারিস্টটলের নিকট যুক্তি ও অনুধ্যানের মধ্যে পার্থক্য মানবিক ও স্বর্গীয়-এর মধ্যকার পার্থক্যের অনুরূপ।

বৌদ্ধ ধর্মে প্রার্থনার অর্থ ধ্যান। খৃস্ট ধর্মের 'Contemplative Order' একই ব্যাপারে। স্পিনোজা অনুধ্যানকে নৈতিকতার চূড়ান্ত ফর্ম ও উদ্দেশ্যরূপে আখ্যায়িত করেছেন।

শিক্ষা মানুষকে অধিকতর ভালো, অধিকতর স্বাধীন বা অধিকতর মানবিক করে না। পরিবর্তে শিক্ষা মানুষকে অধিকতর দক্ষ, অধিকতর সমর্থ ও সমাজের জন্যে অধিকতর উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পশ্চাতপদ মানুষের চেয়ে শিক্ষিত মানুষেরা অকল্যাণকর কাজে বেশি পটু। সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস অধিকতর সভ্য ও শিক্ষিত মানুষ কর্তৃক অল্প শিক্ষিত ও অনগ্রসর মানুষের বিরুদ্ধে অন্যায়, অযৌক্তিক ও বশ্যতামূলক আগ্রাসনের ইতিহাস। শিক্ষার উচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসী তৎপরতাকে মসৃণ করার জন্যেই সব রকমের সহায়তা করেছে।

www.pathagar.com

গণসংস্কৃতি

সভ্যতা ও সংস্কৃতি এক নয়। এখন প্রশ্ন হল : তথাকথিত গণসংস্কৃতি (mass culture) কি সংস্কৃতি নাকি সভ্যতারই একটি প্রকল্প বিশেষ?

যে কোনো সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় বিষয় হল মানুষ, ব্যক্তি বিশেষ, ব্যক্তিত্ব হিসেবে। কিন্তু গণসংস্কৃতির বিষয় হল mass বা man-mass[৭]। একজন মানুষের আত্মা রয়েছে, কিন্তু একদঙ্গল জনতার চাহিদা ছাড়া কিছু নেই। সুতরাং সকল সংস্কৃতি মানুষেরই লালিত সন্তান, যেখানে গণসংস্কৃতি হল শুধু প্রয়োজন পূরণ বা চাহিদার যোগানদার। সংস্কৃতি ব্যক্তিসত্তা অভিমুখী, গণসংস্কৃতি পরিচালিত ঠিক বিপরীতক্রমে : সার্বিক সমরূপতা (uniformity) তথা নৈর্ব্যক্তিকরণের দিকে।

একটি সর্বব্যাপ্ত ভুল হল গণসংস্কৃতির (mass culture) সাথে লোকসংস্কৃতিকে (popular culture) এক করে দেখা। এটা লোকসংস্কৃতির জন্যে ক্ষতিকারক। কারণ তা গণসংস্কৃতির চেয়ে সন্দেহাতীতভাবে স্বতন্ত্র, খাঁটি সক্রিয় ও জীবন্ত। এর মধ্যে কোনো চটকদারি নেই।

লোকসংস্কৃতি সৃজন ও অংশ গ্রহণের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু গণসংস্কৃতির মূল কথা হল নিপুণতার সাথে অন্যকে বশে আনা। নাচ, গান, ধর্মীয় আচার ইত্যাদি একটি গ্রাম কিংবা উপজাতীয় জীবনের সাধারণ সম্পদ। এগুলো তারা পরিবেশন করে তারাই উপভোগ করে সকলে মিলে, অকৃত্রিম বন্ধন ও অনুভাবনা সহকারে। কিন্তু গণসংস্কৃতির উপভোগের ক্ষেত্রে মানুষ উৎপাদক ও ভোক্তা- এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দর্শকদের মধ্যে থেকে কেউ কি টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালাকে প্রভাবিত করতে পারেন? তথাকথিত গণমাধ্যম- সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও অন্যান্য সম্প্রচার মাধ্যম প্রকৃতপক্ষে গণবশীকরণেরই মাধ্যম। একদিকে গুটিকয়েক মানুষের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদকীয় অফিস, অপরদিকে লক্ষ কোটি নিষ্ক্রিয় দর্শকশ্রোতা।

১৯৭১ সালে নেয়া একটি অনুসন্ধান রিপোর্টে দেখা যায় যে, প্রায় সকল ইংরেজ সপ্তাহে ষোল থেকে আঠারো ঘন্টা ব্যয় করে টেলিভিশন দেখে। প্রতি তিনজন ফরাসির একজন কখনো বই পড়ে না; ফরাসি দেশের শতকরা ৮৭ ভাগেরও বেশি মানুষের সাংস্কৃতিক বিনোদনের প্রধান মাধ্যম টেলিভিশন। ব্যালে ও অপেরার স্থান অনুসন্ধান তালিকার একেবারে নীচে। ১৯৯৭ সালে জাপানে নেয়া একটি অনুসন্ধান রিপোর্টে একই চিত্র পাওয়া যায়। প্রায় ৩০ ভাগ জাপানী কোনোরকম বই পড়ে না. তাদের প্রায় প্রত্যেকে প্রতিদিন ২.৫ ঘন্টা সময় ব্যয় করে টেলিভিশন দেখে। সানফ্রানসিসকো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Horkara দাবি করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়গামী উঠতি প্রজন্মের জ্ঞান ধারণ ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ মান থেকে অনেক নীচে। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, টেলিভিশন মানুষের সকল সমস্যার রেডিমেড সমাধান দিয়ে থাকে এবং অত্যন্ত সহজেই তা সাহিত্যের ও চিন্তনের স্থান দখল করে নিয়েছে; ফলত তা সৃষ্টিশীল বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড অসম্ভব করে তুলেছে। আমরা দেখছি কিভাবে সরকারি আধিপত্যের মধ্যে রেডিও-টেলিভিশনের মতো গণমাধ্যমগুলো গণপ্রবঞ্চনা করে যাচ্ছে। এখন আর মানুষকে শাসন করার জন্যে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। এখন বৈধভাবেই মানুষের ইচ্ছাকে অবশ করে তাদের শাসন শোষণ ও 'সত্য'র বটিকা সেবন করিয়ে তাদের স্বচিন্তা ও মতামত গঠনে প্রতিহত করা যাচ্ছে সহজেই এবং তা সম্ভব হচ্ছে এই গণ্যমাধ্যম দ্বারা।

www.pathagar.com

গণমনস্তত্ত্ব প্রমাণ করেছে যে, ঘন ঘন পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে[১০], অবাস্তব কোনো মীথের ব্যাপারে মানুষকে প্রভাবিত করা সম্ভব। গণমাধ্যম, বিশেষত টেলিভিশনকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে, তা মানুষের চৈতন্য ও আবেগ এবং অনুপ্রেরণাময় দিকটিকেই বশীভূত করেনি শুধু, বরং মানুষের মধ্যে এই অনুভূতিকেও সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে যে, আরোপিত মতামতটি যেন তারই।[১১]

সকল অগণতান্ত্রিক ক্ষমতা তাদের উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে টেলিভিশনকে বেছে নিয়েছে। ফলত টেলিভিশন স্বাধীনতার শত্রু হবার পাশাপাশি পুলিশ, জেলখানা ও কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর হয়েছে। অতীতে শাসকের দাপট হ্রাস করার জন্যে যদি সংবিধান প্রণীত হয়ে থাকে তাহলে বর্তমানে টেলিভিশনে ছদ্মবেশী ক্ষমতা নিবারণের জন্যেও নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

গণসংস্কৃতি মনের এমন একটি অবস্থা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যাকে Johan Huizinga বলেছেন 'ছেলেমানুষি'। তিনি সমকালীন মানুষের আচরণে শিশুসুলভতা লক্ষ্য করছেন, যেমন হালকা বিনোদন ভক্তি, পরিপক্ক হিউমারের অভাব, গণশ্লোগান ও মিছিলের দিকে ঝোঁক, ঘৃণা কিংবা ভালোবাসা, প্রশংসা কিংবা নিন্দা প্রসঙ্গে অতি অভিব্যক্তি ইত্যাদি।

পরিশেষে আমরা যন্ত্রের প্রতি একটি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দৃকপাত করতে পারি। যন্ত্র ও প্রযুক্তির প্রতি সংস্কৃতির সহজাত ভীতি ও বিরাগ রয়েছে। Berdjajev বলছেন, "যন্ত্র সংস্কৃতির প্রথম পাপ।" এই ঋণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি আসছে এই কারণে যে, যন্ত্র প্রথম দিকে বিভিন্ন বস্তুর ওপর আধিপত্য করত আর এখন মানুষের ওপর আধিপত্য করতে শুরু করেছে। স্মরণ করুন ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথ), টলস্টয়, হেইডেগার, নীজবাস্তনী, ফকনার প্রমুখের সতর্ক বাণী। অন্যদিকে মার্কসবাদী Henri Lefevre সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন ঃ "স্বাধীনতার সর্বোচ্চ স্তর অর্জিত হবে শুধু সেই সমাজে যেখানে প্রযুক্তিগত সম্ভাবনার সার্বিক স্ফূরণ ঘটবে এবং সেটা হল কমিউনিস্ট সমাজ"। আসলে যে সমাজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইউটোপিয়াকে আদর্শ মানে সে সমাজ যন্ত্র ও প্রযুক্তিকে ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু যন্ত্র মানুষকে ব্যবহার করে, তাকে নিরাপত্তা দেয় না; শিক্ষা ও গণমাধ্যমের সহযোগিতায় তা একই কৌশলকেন্দ্রে সকলকে আনতে চায়, অতঃপর ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিত্বকে ভোঁতা করে, তাঁর কর্ম, চিন্তা ও বক্তব্যকে পানসে করে তাকে একটি একক সমাজের (কর্তৃত্বের) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মানববিরোধী প্রগতি

আমেরিকার হাইড্রোজেন বোমার স্রষ্টা অপেনহেইমারের মতে প্রযুক্তি ও বস্তুগত উন্নয়নের প্রেক্ষিতে মানব জাতি গত চার শ' বছরে যা করেছে, তার চেয়ে বেশি করেছে গত চল্লিশ বছরে। ১৯০০ সাল থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত মানুষে মানুষে মনোদূরত্ব বেড়েছে $১০^{২৬}$-$১০^{৪০}$, তাপমাত্রা বেড়েছে $১০^{৫}$-$১০^{১১}$, চাপ বেড়েছে $১০^{১০}$-$১০^{১৬}$। আগামী তিরিশ বছরের মধ্যে পুরনো পিস্টন ইঞ্জিনের পরিবর্তে আসবে পারমাণবিক শক্তিচালিত নৌকা। সেদিন খুব দূরে নয় যেদিন রাস্তার নিচে শুয়ে থাকা বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে বৈদ্যুতিক যানবাহন চলাচল করবে।

www.pathagar.com

জাঁ রসতান্দ বায়োলজির যাদুকরী সম্ভাবনার কথা কল্পনা করেছেন। তার মতে অত্যন্ত প্রতিভাবান মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নকৃত বংশগত সারবস্তু ব্যবহার করার মাধ্যমে মানব জাতি নিজেকে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবে। বিজ্ঞানীরা যদি কৃত্রিম ডিএনএ (DNA-ক্রোমোজমের মধ্যে পাওয়া বংশগত সারবস্তুর রাসায়নিক ভিত্তি) উৎপাদন করতে সক্ষম হয়, তাহলে নবতর সীমাহীন সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে। ইচ্ছেমত সন্তান পাওয়া সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, মানুষের মস্তিষ্কে যে দশ বিলিয়ন কোষ থাকে তার সাথে বিশেষ প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত আরও কয়েক বিলিয়ন যোগ করে প্রতিভার ফুলঝুরি ঘটানো যাবে। মৃতদেহ থেকে নেয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংযোজন হবে একটি সাধারণ ঘটনা এবং মস্তিষ্কের অবসাদ ও ধ্বস (lag)-এর কারণ আবিষ্কৃত হলে জীবনকে দীর্ঘায়িত করার প্রাচীন মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে। উন্নত দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কর্ম সময় কমিয়ে আনবে সপ্তায় ৩০ ঘন্টায়, কর্মবছর হ্রাস পাবে ৯ মাসে। ১৯৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৬৯ মিলিয়ন মটর, ৬০ মিলিয়ন টেলিভিশন সেট, ৭.৭ মিলিয়ন নৌকা ও ইয়ট ছিল। একই বছরে আমেরিকানরা শুধু ছুটি কাটনো বাবদ খচর করে ৩০ বিলিয়ন ডলার। সে দেশে ব্যক্তিগত ব্যবহার্যের দুই-তৃতীয়াংশ বিলাসদ্রব্য। এক হিসেব মতে ধনী দেশগুলো (মোট দেশের এক-তৃতীয়াংশ) বছরে শুধু কসমেটিকস-এ খরচ করে ১৫ বিলিয়ন ডলার। এ সমস্ত দেশে জীবনযাত্রার মান ১৮০০ সালে যা ছিল তার চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি উন্নত এখন। আগামী ৬০ বছরে আজ যা আছে তার চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি উন্নত হবে। এখন আমরা প্রশ্ন করতে পারি, সে সময়ে কি প্রগতির পরাকাষ্ঠার পাশাপাশি মানব জীবন পাঁচ গুণ বেশি সুখি ও মানবিকতাপূর্ণ হবে? স্বতঃসিদ্ধরূপেই উত্তর আসবে না। পৃথিবীর অন্যতম ধনী দেশ যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬৫ সালে পাঁচ মিলিয়ন অপরাধকর্ম সংগঠিত হয়। সেখানে ভীতিকর অপরাধকর্ম বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে চৌদ্দ গুণ বেশি (অনুপাত ১৭৪ঃ১৩)। একই দেশে প্রতি ১২ সেকেণ্ডে একটি অপরাধ, প্রতি ঘন্টায় একটি খুন, প্রতি ২৫ মিনিটে একটি ধর্ষণ, প্রতি ৫ মিনিটে একটি ডাকাতি এবং প্রতি মিনিটে একটি করে গাড়ি চুরির ঘটনা ঘটে। সে দেশে প্রতি এক লক্ষ জনে খুন হয় ১৯৫১ সালে ৩.১ জন, ১৯৬০ সালে ৫ জন, ১৯৬৭-তে ৯ জন। পশ্চিম জার্মানীতে ১৯৬৬ সালে ২ মিলিয়ন অপরাধ কর্মের খবর পাওয়া যায়। ১৯৭০-এ তা এসে দাঁড়ায় ২,৪১৩,০০০-এ। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, কানাডা, বেলজিয়াম, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ব্যতিক্রমহীনভাবে অপরাধ প্রবণতার উর্ধ্বগামী চিত্র সুস্পষ্ট।

বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত অপরাধ বিজ্ঞানীদের সপ্তম আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে (১৯৭৩, সেপ্টেম্বর) সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করা হয় যে, বর্তমান সময় অপরাধের বিশ্বজনীন আগ্রাসন দ্বারা আক্রান্ত। মার্কিন অপরাধ বিজ্ঞানীরা হতাশভাবে বলেন ঃ 'আমাদের গ্রহ এক 'স্খলনের সমুদ্র' অর্থাৎ কম বেশি সকলেই অপরাধপ্রবণ এবং এখান থেকে মুক্তির কোনো পথ দেখা যাচ্ছে না। 'বিশ্ব পরিস্থিতি ৭০'- জাতিসংঘের এই রিপোর্টে বলা হয় যে, একটি শিল্পোন্নত দেশে (নাম বলা হয়নি) কিশোর অপরাধীর সংখ্যা ১ মিলিয়ন থেকে (১৯৫৫) দশ বছরে বেড়েছে ২.৪ মিলিয়ন (১৯৬৫)। জাতিসংঘ মহাসচিবের এক রিপোর্টে বলা হয়, "বস্তুগত উন্নতি সত্ত্বেও মানব জীবন কখনোই এতটা নিরপত্তাহীনতায় ভোগেনি। বিভিন্ন প্রকৃতির

www.pathagar.com

অপরাধ (ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধ), চুরি, প্রতারণা, দুর্নীতি, ডাকাতি, আধুনিক জীবন ও প্রগতির প্রতিনিধিত্ব করছে।"

রুশ মনস্তাত্ত্বিক হোজকভের গবেষণায় দেখা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মাদকাসক্তি তুমুলভাবে বেড়েছে, বিশেষত উন্নত দেশগুলোতে। ১৯৪০ থেকে ১৯৬০ -এ মাদক দ্রব্যের বিক্রয় দ্বিগুণ বেড়েছে; ১৯৬৫ সালে এসে তা বাড়ে ২.৮ গুণ বেশি, ১৯৭০-এ ৪.৩ গুণ এবং ১৯৭৩ সালে ৫.৫ গুণ। মাদক দ্রব্য সেবনজনিত মৃত্যুর হার বার্লিনে ১০০০০০ জনে ৪৪.৩ জন, ফ্রান্সে ৩৫ জন, অস্ট্রিয়ায় ৩০ জন। আমরা মাদকাসক্তিকে দারিদ্র ও পশ্চাদ্‌পদতার সাথে সম্পর্কিত ভাবতাম, সেক্ষেত্রে সমাধানের সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু উন্নত দেশে মাদকাশক্তি কেন? প্রাচুর্যের সন্তানেরা কিসের থেকে পলায়ন করতে চায়? ইউরোপের অন্যতম ধনী দেশ সুইডেনে প্রতি দশজনে একজন মাতাল (নারী-পুরুষ)। মাদক দ্রব্যে সর্বোচ্চ হারে কর আরোপ করেও অবস্থা তথৈবচ। পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসনও সুস্পষ্ট। সকল ফরাসি প্রেক্ষাগৃহের অর্ধেক জুড়েই চলে পর্ণো ছায়াছবি। প্যারিসেই ২৫০টি সিনেমা হল শুধু পর্ণো চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে। সেই সাথে যোগ হয়েছে জুয়া। বৃহত্তম জুয়া নগরীগুলো সভ্যতম অঞ্চলে অবস্থিত দোভিলে, মন্টে কারলো, মাক্যাও, লাস ভেগাস। আটলান্টিক সিটির বিশাল নৃত্যশালার একটি ঘরে ৬০০০ জুয়াড়ীর ধারণ ক্ষমতা রয়েছে। পরিসংখ্যান বলে যে, ১৯৬৫ সালে ফরাসিরা জুয়া খেলায় খরচ করে ১১৫ বিলিয়ন ফ্রাঁ, মার্কিনীরা খরচ করে ১৫ বিলিয়ন ডলার।

সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে আত্মহত্যা ও মানসিক রোগীর সংখ্যা বাড়ার সম্পর্ক কিভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? "মনস্তাত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ তার জীবনের সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্য ও উৎকর্ষের মধ্যে অতৃপ্তি দ্বারা আক্রান্ত হয় বেশি"- বলছেন একজন মার্কিন মনস্তাত্তিক। ক্লাসিক সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্ত উন্নততম সমাজের এই চিত্র প্রগতির প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দেয়।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি এক হাজার জনে চারজন মানসিক হাসপাতালের বাসিন্দা, নিউইয়র্ক শহরে এই সংখ্যা হাজারে ৫.৫ জন। হলিউডে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানসিক চিকিৎসকের সমাগম। গণস্বাস্থ্য সার্ভিসের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রত্যেক পাঁচজন মার্কিনীর একজনের মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখোমুখি।

১৯৬৮ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, আলোচ্য বছরে যে সমস্ত দেশে আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুর সংখ্যা সর্বাধিক তাদের তালিকায় প্রথম আটটি দেশ হল পশ্চিম জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, কানাডা, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, হাঙ্গেরী, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ড। এ সমস্ত দেশে হৃদরোগ ও ক্যান্সারের পরেই আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুর স্থান (১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়স্কদের মধ্যে)। একই সংস্থার '৭০ সালের রিপোর্টে এ ব্যাপারগুলোকে শিল্পায়ন, নগরায়ন ও পারিবারিক ভাঙনের সাথে যুগপৎ হিসেবে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে উন্নয়ন ও শিক্ষাকেও যুক্ত করা যায়। যুগোস্লাভিয়ার অতি উন্নত অঞ্চল স্লোভেনিয়াতে (যেখানে সাক্ষরতার হার ৯৮%) প্রতি ১০০০০ জনে আত্মহত্যার সংখ্যা ২৫.৮ জন, কিন্তু অনুন্নত কসোভোতে (যেখানে সাক্ষরতার হার ৫৬%) মাত্র ৩.৪% (অনুপাত ৭ঃ১)। ড. এ্যান্থনি বেইলের গবেষণা মতে বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রদের

www.pathagar.com

মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা তাদের সমবয়স্ক অন্যদের তুলনায় ছয় গুণ বেশি। কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা তাদের বয়সী অন্যদের তুলনায় দশ গুণ বেশি। এটা উদ্বেগজনক কারণ, এখানে অধ্যয়নকারী ছাত্রছাত্রীরাা ধনাঢ্য পরিবার থেকে আগত, নয়ত সরকারী বৃত্তিধারী।

এটা ধরে নেয়া ভুল যে, উপরোক্ত চিত্রটি শুধু পশ্চিমা সভ্যতাতেই সীমাবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে সভ্যতা মাত্রেই এর সংযোগ অনিবার্য। যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ইংল্যান্ড বা সুইডেন সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, জাপান সম্পর্কেও তা-ই প্রযোজ্য। তবে জাপানের ক্ষেত্রে জাপানি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কাঠিন্য ও জাপানি পরিবারের ভূমিকা এ পরিস্থিতিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করেছে। বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দূরে এসে বলা যেতে পারে যে, সভ্যতা ও স্বাচ্ছন্দ্য মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উনিশ শতকের বিজ্ঞান ও বয়োলজি যে 'বস্তু' দিয়ে মানুষ সৃষ্ট বলে ধরে নিয়েছিল মানুষতো তা দিয়ে সৃষ্ট নয়। মানুষ শুধু তার ইন্দ্রিয় সহযোগে বেঁচে থাকে না। "অবাস্তবায়িত আকাঙ্ক্ষা বেদনার জন্ম দেয়, বাস্তবায়িত আকাঙ্ক্ষা জন্ম দেয় তারল্যের", বলছেন সোপেনহাওয়ার। প্রাচুর্য ও তার সাথে সংলগ্ন মানসিকতা যে কোনো মূল্যবোধক পদ্ধতির প্রতি ভক্তিকে হ্রাস, এমন কি নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

সরল সহজ জীবন যাপনের প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকতা ধ্বংসের মাধ্যমেও সভ্যতার আগ্রাসী চেহারা বেরিয়ে আসছে। এখানে দ্বন্দ্বটি আসছে মানব জীবনের যান্ত্রিক ও জীবন্ত, কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক নীতির মধ্যে। সভ্যতার আগ্রাসনের কারণেই ব্রাজিলে প্রতি বছর ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বনাঞ্চল উজাড় হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র আশি ভাগের বেশি পানি শিল্পবর্জ্য দ্বারা দূষিত। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর কারখানার চিমনি ও মোটর গাড়ি থেকে নির্গত ২৩০ মিলিয়ন টন বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর উপাদান বাতাসে প্রবেশ করে। ফরাসি শক্তিকেন্দ্রগুলো ১৯৬০ সালে ১১৪ হাজার টন সালফার গ্যাস এবং ৮২ মিলিয়ন টন অঙ্গার উৎপাদন করে। অনেক প্রতিরোধক ব্যবস্থা সত্ত্বেও ১৯৬৮ সালে এই সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। জার্মানীর রুর অঞ্চলের প্রতিটি শহরেই প্রতি বছর উৎপাদিত হয় ২৭০০০ টন বর্জ্য। ইংল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ডের ফুসফুসে ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর সংখ্যা গত পঞ্চাশ বছরে দশ গুণ বেড়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে বেড়েছে গত কুড়ি বছরে পঞ্চাশ ভাগ। টোকিওর বিশাল ইয়ানাগা ক্রসওয়ে থেকে নেয়া অনুসন্ধান থেকে দেখা যায় সেখান দিয়ে পার হওয়া ৪৯ জন যাত্রীর মধ্যে ১০ জন যাত্রীর রক্ত চলাচলের গতি স্বাভাবিকের চেয়ে ২ থেকে ৭ গুণ বেশি। প্রধান কারণ, যানবাহন থেকে নির্গত গ্যাস। শুধু তাই নয়, মোটর যান আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে সড়ক দুর্ঘটনায় যত মানুষ মারা গিয়েছে তা এই শতকের সমস্ত যুদ্ধজনিত মৃত্যুর সংখ্যাকেও হার মানায়।

সভ্যতার মধ্যে এমন কোনো ধনাত্মক শক্তি নেই সভ্যতার সকল আবিলতা ও অসামঞ্জস্য মোকাবেলা করতে পারে। আসলে সভ্যতার অসুখ সভ্যতার ভিতরকার কোনো ঔষধ দিয়ে চিকিৎসাযোগ্য নয়, একে সভ্যতার বাইরে থেকে চিকিৎসা করাতে হবে এবং এটা পারে একমাত্র সংস্কৃতি। কারণ সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞান কখনো ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে না কিংবা সভ্যতা পারে না ক্লাসিক্যাল কাঠামোতে ফিরে যেতে। The circle is closed.

www.pathagar.com

লাক্ষণিক অর্থে অমঙ্গলবোধের দর্শন আসছে শুধু বিশ্বের ধনাঢ্য ও উন্নত অঞ্চল থেকে। যেমন, ইবসেন, হেইডেগার, সেইলার, পিন্টার, বেকেট, ও'নীল, বার্জম্যান, কামু, আন্তনিনি প্রমুখ এরকম অঞ্চলের বাসিন্দা। বিজ্ঞানী, যারা বস্তুর বাহ্যিক চরিত্রে বিশ্লেষণ করেন, তারা সাধারণত আশাবাদী; কিন্তু চিন্তক ও শিল্পীরা, বিশেষত শিল্পীরা বড় বেশি দ্বিধাক্রান্ত।

কিন্তু সাদামাটাভাবে দেখলে একটি জাতির জীবনে বিমর্ষবাদ প্রকাশিত হয় সম্পূর্ণ সাক্ষরতা, সামাজিক নিরাপত্তা, মাথাপিছু আয় কয়েক হাজার ডলারে উন্নীত হবার পর। পরিহাস্য হলেও সত্য উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রথম পর্যন্ত স্কান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থা সবচেয়ে ভালো থাকলেও সেখানেই উৎপত্তি হয় চূড়ান্ত বিমর্ষবাদী দর্শনের। এ দর্শনে মানুষের ভাগ্য হতাশাপূর্ণ ও ট্র্যাজিক এবং সকল মানুষের চেষ্টা ও অস্তিত্ব অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অনর্থক বলে বিবেচিত। তাহলে কি বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য আধ্যাত্মিক নিরানন্দের জন্ম দেয়?

স্বাচ্ছন্দ্য বহির্নিষ্ঠ এবং অনর্থকতার বোধ জীবনের অন্তর্নিষ্ঠ অভিজ্ঞান-সভ্যতায়। দ্বান্দ্বিকভাবে প্রকাশ করলে ঃ যত বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য, তত বেশি শূন্যতা ও নৈরাশ্যের অনুভূতি। বিপরীতভাবে আদিম সমাজগুলো দরিদ্র হতে পারে এবং সূক্ষ্ম সামাজিক স্বাতন্ত্র্য দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে কিন্তু তাদের জীবন জীবন্ত, সমৃদ্ধ ও বিচিত্র অনুভূতির ধারক। ফোকলোর প্রাচীন মানুষের জীবন যাপন ছন্দের অনন্য সাধারণ চিত্রটি উপহার দেয়। অসন্তোষ ও নৈরাশ্য তাদের দরিদ্র জীবনে অনুপস্থিত।

এই মঞ্চেই সভ্য পৃথিবী উন্মোচন করেছে তার মানবিক 'ট্রাজেডি'। বিজ্ঞান কর্তৃক সভ্যতাকে উপহার দেয়া শৃংখলা ও নিশ্চয়তার মুকুটকে ছিন্ন ভিন্ন করেছে থিয়েটার। বিজ্ঞান প্রদান করে থাকে উৎপাদন সামগ্রীর সমৃদ্ধ তালিকা, যান্ত্রিক শক্তির প্রদর্শন ইত্যাদি; আর শিল্প নির্দেশ করছে মানবিক গুণাবলীর পতনাবস্থা, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক অবক্ষয়, সন্ত্রাস, পশুত্ব ও শূন্যতা। বস্তুগত সমৃদ্ধির মধ্যে থেকে থিয়েটার আবিষ্কার করছে আক্রমণাত্মক, অসহায় ও অপরাধপ্রবণ মানুষকে। এ্যাবসার্ড নাটকগুলো আজকের সবচেয়ে উন্নত সমাজের মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি।

কবিরা যদি মনুষ্য জাতির সংবেদী নিরীক্ষক হন তাহলে তাদের ভীতি ও সংশয় দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, পৃথিবী মানবতার দিকে এগুচ্ছে না, এগুচ্ছে উন্মুক্ত বিমানবিকীকরণ ও বিচ্ছিন্নতার দিকে।

১৯৬৮ সালের নোবেল সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত ইয়াসুনারী কাওয়াবাতা ১৯৭১ সালে আত্মহত্যা করেন। এর দু'বছর আগে ১৯৬৯ সালে আরেকজন জাপানি ঔপন্যাসিক তুকিয়ো মিশিমা একই ভাবে জীবনাবসান ঘটান। ১৯৮৫ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত অন্তত তের জন জাপানি ঔপন্যাসিক ও লেখক আত্মহত্যা করেছেন। জাপানি সংস্কৃতির এই 'অবিরাম ট্রাজেডি' হল জাপানের প্রথাসিদ্ধ সংস্কৃতিতে পশ্চিমা সভ্যতা ও বস্তুবাদী ভাবধারার অনুপ্রবেশের পরোক্ষ ফল। মৃত্যুর এক বছর আগে কাওয়াবাতা লেখেন, "মানুষ এক কংক্রিটের দেয়াল দ্বারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, যে দেয়াল ভালোবাসার সকল

www.pathagar.com

সঞ্চালনকে বাধাগ্রস্ত করে। প্রগতির নামে শ্বাসরোধ করা হচ্ছে প্রকৃতির।" 'তুষার রাজ্য' নামক উপন্যাসে কাওয়াবাতা মানুষের বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গ চেতনাকে কেন্দ্রীয় আলোকে তুলে ধরেছেন।

সকল মহৎ সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি একইভাবে সভ্যতায় মানুষের ব্যর্থতা ও পরাজয়ের চিত্র খুঁজে পেয়েছেন। আঁন্দ্রে মার্লো উনবিংশ শতকীয় আশাবাদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়েছেন ঃ "ইউরোপ ধ্বংসাক্রান্ত এবং রক্ত দ্বারা কলঙ্কিত মানুষ তৈরি করতে চেয়েছিল, ইউরোপ তা করেছেও।" একই চিত্র দেখিয়েছেন পল ভেলরী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পর।

নাস্তিবাদ বলছে ' পরিপ্রেক্ষিতহীন পৃথিবীর কথা, বলছে 'ভীষণ নৈঃশব্দে'র কথা, বলছে 'ভগ্ন ও ছিন্নভিন্ন ব্যক্তিত্বের' কথা-কিন্তু নাস্তিবাদ কোনোক্রমেই কোনো বিষাক্ত দর্শন নয়, যেমনটি কেউ কেউ বলে থাকেন। বস্তুত এই দর্শন অত্যন্ত গভীর ও শিক্ষাপ্রদ। এটা সেই পৃথিবীর বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ ও অসমর্থনের প্রকাশ যে পৃথিবী তার (মানুষ) মৌলিক ভাবমর্যাদাকে আক্রান্ত করেছে। এটা সভ্যতার এক রৈখিক বিশ্ববিস্তারের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহ। একই কারণে কেউ কেউ আধুনিক নাস্তিবাদকে এক ধরনের ধর্মরূপে দেখেছেন এবং ধারণাটি ভিত্তিহীন নয়।

আদিম উদ্বিগ্নতা, কবরপাড়ের চিত্রকল্প, এ পৃথিবী থেকে, যেখানে যে আগন্তুক মাত্র, মুক্তি লাভের পথ অনুসন্ধানের বেপরোয়া প্রচেষ্টা-এ সবকিছুই ধর্ম ও নাস্তিবাদে উপস্থিত। পার্থক্য শুধু এই যে, এ প্রচেষ্টায় নাস্তিবাদ কোনো পথ খুঁজে পায়নি, কিন্তু ধর্মে এ পথের সন্ধান মিলে গেছে।

বিজ্ঞান, ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির মাধ্যমে মানবিক সুখ সমস্যার সমাধানে সভ্যতার নিদারুণ ব্যর্থতাকে যখন মানুষ উপলব্ধি ও স্বীকার করবে তখনই মনুষ্য জাতির ওপর সবচেয়ে কঠিন মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবটি আসবে। তখন সময় হবে ইতোপূর্বে গৃহীত কতক চিন্তাধারার পুনর্বিবেচনার। প্রথম পুনর্বিবেচনার বিষয় হবে মানুষকে নিয়ে গড়ে ওঠা বৈজ্ঞানিক ভুল ধারণা। কারণ সভ্যতা যদি মানুষের সুখ-শান্তি সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়ে থাকে, তাহলে মানুষের উৎপত্তি বিষয়ে ধর্মীয় ধারণাটিই সত্য এবং বৈজ্ঞানিক ধারণাটি মিথ্যে। তৃতীয় কোনো বিকল্প নেই।

নাস্তিবাদ

ধর্ম ও আধুনিক নাস্তিবাদের মধ্যে কিছু সাধারণ সাদৃশ্য থাকায় নাস্তিবাদকে সভ্যতার অন্তর্গত একটি ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

নাস্তিবাদ স্রষ্টার অস্বীকৃতি নয়, বরং তার আপাত অনুপস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিংবা যেমনটি বেকেট বলছেন, মানুষের অনুপস্থিতির বিরুদ্ধে তথা এই সত্যের প্রতিবাদ যে মানুষের ধারণাটি অবাস্তবায়নযোগ্য ও অসম্ভাব্য এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষ ও পৃথিবী সম্পর্কে ধর্মীয় ভাবনাকে নির্দেশ করে, বৈজ্ঞানিকতা নয়। বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা অনুসারে মানুষ সম্ভবপর ও বাস্তবায়নযোগ্য। কিন্তু চূড়ান্তরূপে গণ্য তা-ই অমানবিক এবং সার্ত্রের বিখ্যাত উক্তি "man is futile passion" শুনতেও যেমন, অন্তর্নিষ্ঠ অর্থেও তেমনি-ধর্মীয়। যেহেতু বস্তুবাদে আবেগ নেই, সেহেতু নিরর্থকতার বোধও নেই।

www.pathagar.com

সংসারের উচ্চতর উদ্দেশ্যকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে বস্তুবাদ অনর্থকতা ও তুচ্ছতার বোধকে ধারণ করার ঝুঁকি থেকে মুক্ত। বস্তুবাদী পৃথিবী ও মানুষের একটি প্রায়োগিক লক্ষ্য রয়েছে। কিন্তু "man is futile passion" এই বক্তব্য নির্দেশ করে যে মানুষ ও পৃথিবী অভিন্ন নয়। পৃথিবীর প্রতি এই রকমের আমূল বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সকল ধর্মের সূত্রপাত। সার্ত্রের অনর্থকতার বোধ এবং কামুর এ্যাবসার্ড একই উদ্দেশ্য ও বোধবৈদগ্ধ্যের অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়াটি ধর্মীয় চরিত্রের, কারণ তা জীবন যাপনের বৈশ্বিক উদ্দেশ্যকে প্রত্যাখ্যান করে।

স্রষ্টার অনুসন্ধান এক ধরনের ধর্ম। কিন্তু অনুসন্ধানে খোদা মেলে না। নাস্তিবাদী দর্শনে যে উদ্বিগ্নতার প্রকাশ তা সর্বতোভাবেই, শুধু উপসংহার ব্যতীত, ধর্মানুসারী। নাস্তিবাদী ও ধর্ম উভয় মতেই মানুষ এই পৃথিবীতে আগন্তুক মাত্র, কিন্তু নাস্তিবাদের আগন্তুক হতাশায় হারিয়ে যাবার গল্প শোনায়, আর ধর্মের আগন্তুক উচ্চারণ করে মুক্তির পয়গাম।

আলবেয়ার কামুর বক্তব্যকে বোঝা যেতে পারে শুধু একজন হতাশ বিশ্বাসীর চিন্তা-ভাবনা হিসেবে ঃ "যে পৃথিবী থেকে হঠাৎ করে আলোর ঝলকানি তিরোহিত হয় সে পৃথিবীতে মানুষ নিজেকে আগন্তুক ভাবে, তার কাছে এটা মুক্তি সম্ভাবনাহীন নির্বাসন; যেহেতু হারানো মাতৃভূমির কোনো স্মৃতি কিংবা প্রতিশ্রুত রাজ্যে পৌঁছানোর কোনো বন্দোবস্তও তার কাছে নেই।" অথবা "আমি যদি গাছগুলোর মধ্যে একটি গাছ হতাম তাহলে জীবনের একটি বোধ থাকত কিংবা এই বোধের সমস্যা-ই-উদ্ভূত হত না। কারণ তাহলে আমি এই পৃথিবীরই একটি অংশ হতাম যে পৃথিবীকে এ মুহূর্তে আমি আমার সমস্ত চৈতন্য দিয়ে প্রতিরোধ করি।" অথবা 'all is allowed since God doesn't exist and man dies". এই শেষের বাক্যটিতে বুদ্ধিবাদী চিন্তাবিদদের ঠুনকো নাস্তিকতার কোনো সমর্থন নেই, বরঞ্চ এটা হল সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে পড়া এক আত্মার আহাজারী। এটা হল 'ব্যর্থতা থেকে উদ্ভূত নাস্তিকতা।'

নৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নে অস্তিত্ববাদও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। Simone de Bouviore লিখছেন, "শুরুতে মানুষ কিছুই নয়; ভালো বা মন্দ হওয়াটা নির্ভর করছে তারই ওপর, অন্য কথায় তার স্বাধীনতা গ্রহণ বা বর্জনের ওপর। নির্বাচিত স্বাধীনতা তার লক্ষ্যকে চূড়ান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করে এবং কোনো বাহ্যিক শক্তি, এমন কি মৃত্যু এই স্বাধীনতার অনুদানকে ধ্বংস করতে পারে না। যদি এই খেলায় হেরে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলেও প্রত্যেক মানুষের উচিত প্রতিটি মূহূর্তে ঝুঁকি নেয়া এবং সংগ্রাম করে যাওয়া।" এমন কি সার্ত্রের অস্তিত্বের দ্বৈততা, 'অস্তিত্বের দ্বারা অস্তিত্ব' (etre et soi) এবং 'অস্তিত্বের জন্যে অস্তিত্ব' (etre pour soi)- এটাও বস্তুবাদের পরিষ্কার অস্বীকৃতি। শুধু প্রতিশব্দগুলো নতুন, সারসত্যটি পুরনো ও সহজে সনাক্তযোগ্য।

টীকা

১. সংস্কৃতির ইংরেজি culture শব্দটি বুৎপত্তিগতভাবে cult' (ল্যাটিন cultus) শব্দটির সাথে সম্পর্কিত। দুটো শব্দেরই উৎপত্তি ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ 'কুল' (Kwel) থেকে। অপরদিকে সভ্যতা বা Civilization সম্পর্কিত 'Civis' শব্দটির সাথে যার অর্থ নাগরিক।

www.pathagar.com

২. Chosism-এর উৎপত্তি ফরাসি শব্দ 'chose' থেকে যার অর্থ বস্তু বা thing; শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ডুরখেইম, কোনো কিছুকে নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গিতে নিরীক্ষা করার প্রেক্ষিতে।

৩. Malreaux : Antimemoirs, Serbocroatian translation, Zagreb. 1969 P. 276.

৪. New York Times-এ সম্প্রতি প্রকাশিত একটি নিবন্ধে এই প্রস্তাবনাকে বলা হয়েছে 'নবযুগের প্রথম সূচক'।

৫. Marshall McLuhan প্রমাণ করেছেন যে, লেখনী চিন্তন প্রক্রিয়ায় বিচিত্র পরিবর্তন আনে। তিনি বলেন, "The use of an alphabet produces and supports the habit of expressing in visual and space terms, especially in terms of uniform space and uniform time, continually and constantly."
M. McLuhan: The Gutenberg Galaxy, Serbocroatian translation. Belgrade, 1973, P. 32.

৬. Oswald Spengler : The Decline of the West. Allen and Unwin Ltd. 1971, P. 32.

৭. একটি মজার দৃষ্টান্ত এই যে, রেনেসাঁর যুগেও মানব মন বিচিত্র কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল এবং তা শুধু সাধারণ মানুষ নয়, শিল্পী ও মানবতাবাদীদেরকেও আক্রান্ত করে। যেমন, "জ্যোতিষতত্ত্বকে বিশেষভাবে স্বাগত জানান উদারপন্থী চিন্তকরা এবং তা প্রাচীনকালের চেয়েও এ সময়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করে।" – জানাচ্ছেন বার্ট্রান্ড রাসেল।

৮. Xenephon, Symposium, P. 220.

৯. এই প্রতিশব্দটি সাহিত্যে প্রথম চালু করেন Ortega Y. Gasset; এই `mass' হল ব্যক্তিত্ব হারানো কতক বেনামী, নিরবয়ব মানব ইউনিটের সমষ্টি।

১০. ১৯৪৫ সাল পর্যন্তও জাপানিদেরকে শিক্ষা দেয়া হত যে, মিকাডো হল সূর্যদেবীর সন্তান এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে জাপানকে সৃষ্টি করা হয়। এমন কি এই ধারণা শিক্ষা দেয়া হত বিশ্ববিদ্যালয়েও। পরবর্তীতে আমরা দেখি নতুনতর মীথ। রাশিয়া, চীন ও উত্তর কোরিয়ায় এই মীথ গড়ে ওঠে। স্টালিন, মাও সেতুং ও কিম সুং-কে ঘিরে গড়ে ওঠে এক ধরনের 'Leader Cult'.

১১. এ ব্যাপারে চমৎকার আলোকপাত করা হয়েছে Djura Susnjic লিখিত 'Fisherman For Human Souls' বইয়ে। #

[লেখাটি আলিয়া আলি ইজেতবেগভিচ-এর বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ *Islam Between East and West* থেকে সংকলিত। গ্রন্থটি *পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলাম* শিরোনাম দিয়ে বাংলায় অনুবাদ করেছেন ইফতেখার ইকবাল।]

www.pathagar.com

আমরা ও আমাদের নাটক

আরিফুল হক

তাজা গ্রেনেড হাতে একদল তরুণ। উদ্ধত, উদ্যত। ধ্বংস করতে চায়, নিশ্চিহ্ন করতে চায়, সব অতীত, সব ঐতিহ্য। ওরা সহিংস, বিক্ষুব্ধ, কারণ অতীত ওদের কিছুই দেয়নি। দিয়েছে বঞ্চনা, হতাশা, শোষণ, আর একরাশ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি।

ঐতিহ্যের প্রতীক পিতা ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তরুণদের প্রশ্ন করলো -

'খোকা। কেন এ ধ্বংস? এ ধ্বংস দিয়ে তোরা কি পাবি? বিক্ষুব্ধ তরুণদের উত্তর, ওরা পেতে চায় না কিছুই, শুধুই ওরা দাউ দাউ করে জ্বলছে; এখন আগুন জ্বেলেই সে জ্বালার পরিসমাপ্তি ঘটাবে। অসহায় পিতা বললো, "ধ্বংসই যদি তোদের একমাত্র কাম্য হয়ে থাকে তবে এই আমি বুক পেতে দিলাম আমাকেও নিশ্চিহ্ন করে দে"- বে-পরওয়া তরুণদের উত্তর "তথাস্তু"।

www.pathagar.com

অতঃপর গ্রেনেড চার্জে পিতার জীবন বিনাশ এবং সেই সাথে ঐহিত্যের প্রতীক শহীদ মিনারের ধ্বংস সাধন।

এটি একটি বিপ্লব ধর্মী নাটকের কাহিনী। নাটকের নাম, "বিশ বছরের যৌবন"। কিছু তরুণ নাট্যকর্মী দ্বারা ৩৭তম প্রযোজনা হিসেবে মঞ্চায়িত হল এ নাটক। বাংলাদেশে এ ধরনের শ্লোগানধর্মী নাটকই অভিনীত হচ্ছে বেশী করে। বলা হচ্ছে "জীবনের কাছাকাছি নাটক"। "সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার" এ নাটক।'

নাটক জীবনের কাছাকাছি থাকবে, জীবনের পথ নির্দেশক হিসেবে কাজ করে যাবে এটাই তো কাম্য। এটাই নাট্য শিল্পের দায়িত্ব। কিন্তু এই সব বিপ্লবধর্মী মঞ্চ নাটকে, পথ নাটকে, সত্যই কি আমাদের জীবন সংগ্রামের সূত্র-উৎস, প্রকৃত স্বরূপ মানব কল্যাণকামী হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে আমাদের কাছে? নাকি শুধুই কিছু উদ্দেশ্য প্রণোদিত রাজনৈতিক শ্লোগান নাটকের মোড়কে মুড়ে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে আমাদের নাট্যদর্শকদের কাছে? এ ভাবনাই আজ সবার মনে।

পরের দিন এক আলোচনা সভায় ঐ নাট্যকর্মী তরুণ বন্ধুদের প্রশ্ন করেছিলাম-সত্যিই কি তোমরা বিশ্বাস কর অতীত তোমাদের কিছুই দেয়নি? তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ইতিহাস কি শুধুই বঞ্চনা আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ইতিহাস? বন্ধুদের প্রশ্ন করেছিলাম- তোমরা কি তোমাদের সঠিক ইতিহাস জান? তোমরা কি জান, তোমাদের পূর্ব পুরুষদের বিশ্বজয়ী তলওয়ার একদিন হঠাৎ কিভাবে বেঈমানী আর জুয়াচুরির আঘাতে ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল? কিভাবে রাজার জাতের রাজ্য গিয়েছিল? ভাষার পরিবর্তনে ভাষা গিয়েছিল? বাযেয়াফতীর ফাঁদে পড়ে জমিদারি গিয়েছিল।

খানদানী পোশাক, খানসামার পোশাকে রূপান্তরিত হয়েছিল? কিভাবে শাসকের জাত এক রাতে শাসন ক্ষমতা হারিয়ে চাষা, ছোটলোক, মুটে, মিস্ত্রী, সেবাদাসে পরিণত হয়েছিল। সেই করুণ ইতিহাস কি তোমরা জান?

তোমরা কি জান, হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য, স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্য তোমাদের পূর্ব পুরুষদের শতাব্দীব্যাপী মরণপন লড়াইয়ের ইতিহাস? টিপু সুলতান, সিরাজউদ্দৌলা, মীরকাশিম, সৈয়দ নিসার আলি তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ, মজনু শাহ, দুদু মিয়া, নূর আহমদ, মিজানপুরী, কাজী মিয়াজান, হাবিলদার রজব আলি, পাগলা টিপু, মুন্সী মেহেরুল্লাহ, সৈয়দ আমহদ বেরেলভী, শাহ সৈয়দ আব্দুল আজিজ, হাজী এমদাদ উল্লাহ সহ ১৭৫৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত অগণিত অকুতোভয় বীর মুজাহিদের আত্ম বিসর্জনের সুদীর্ঘ ইতিহাস কি তোমরা জান?

তোমরা কি জান ফরাসী পর্যটক চিকিৎসক বার্নিয়ার লিখেছিলেন- "এককালের সমগ্র পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ বাংলা সম্পদশালী মুসলমানরা জঠর জ্বালায় ধুঁকে ধুঁকে রক্তহীন দুর্বলতায় লুটিয়ে পড়েছে বাবুদের পায়ের তলায়।" সেই নুয়ে পড়া মাথা 'বলবীর উন্নত মম শির" হুঙ্কারে সোজা করেছিলেন যে কবি, সেই কাজী নজরুল ইসলাম 'অনল প্রবাহের' কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী, আকরাম খাঁ, আবুল হাশিম, আবুল মনসুর আহমদ, মওলানা মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, কবি ফররুখ আহমদের কথা কি তোমাদের জানা আছে?

'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান' গ্রন্থে উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন - "তাদেরকে (মুসলমানদের) অশিক্ষার অভিশাপে অন্ধ রেখে তাদের বুকের উপর স্থায়ী আসনে চেপে বসে আছেন"।

www.pathagar.com

সেই অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে উদ্ধার করতে শিক্ষার আলো হাতে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন সেই ফরিদপুরের কাজী (নবাব) আবদুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহমদ, স্যার সৈয়দ আমির আলি, নবাব সলিমুল্লাহ, হাজী মুহম্মদ মুহসীন এবং তাঁদের মুসলিম শিক্ষা আন্দোলন কর্মসূচীসমূহ যেমন, 'মহামেডান লিটারারী সোসাইটি, ট্রান্সস্লেশন সোসাইটি, আলীগড় এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ, অসংখ্যা আঞ্জুমান, সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন, ক্যালকাটা ইসলামিয়া কলেজ, হুগলী মুহসীন কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অগণিত বিদ্যোৎসাহী কর্মধারার ইতিহাস কি তোমরা জান?

ওদের চাহনি দেখে মনে হয়েছিল, ওরা এসব জানে না। ওরা জানে না ওদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ঐতিহ্যের কথা। ওরা শুধু জানে ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা, কিন্তু জানে না, পলাশীর যুদ্ধ, বালাকোটের যুদ্ধ, বকসারের যুদ্ধ, সিপাহী বিপ্লব, ফকির বিদ্রোহ, সন্যাসী বিদ্রোহ, নারকেল বাড়িয়ার প্রতিরোধ, বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র ও সংসদীয় সংগ্রাম, পাকিস্তান আন্দোলন এবং পাকিস্তান অর্জনে আমাদের পূর্বপুরুষদের অসীম ত্যাগ তিতিক্ষা এবং অকাতরে জীবনদানের কথা। ওরা শুধু শুনেছে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ জীবনহানির কথা, কিন্তু শোনেনি প্রথম স্বাধীনতা পাকিস্তান হাসিলের জন্য পাঁচ লক্ষ লোকের জীবনহানির কথা, কিংবা কয়েক কোটি লোকের উচ্ছেদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা।

বাঙালী মুসলমানদের আত্মবিকাশকে স্তব্ধ করার জন্য 'বঙ্গ বিভাগ' রদ কল্পে বৃটিশদের উপর চাপ প্রয়োগের জন্য সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কংগ্রেসী নেতা সূর্যসেনকে ওরা আজাদীর হিরো হিসেবে জেনে এসেছে, কিন্তু জানে না সূর্যসেনের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দু'বছর আগে ১৯২৮ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামী কাজী বজলুর রহমান চট্টগ্রামের অত্যাচারী জেলা শাসক ডেভিডকে তার বাড়ীতে প্রকাশ্যে ছুরিকাঘাতে নিহত করে ফাঁসীতে গিয়েছিলেন সেই আত্মত্যাগের ইতিহাস।

ওরা ক্ষুদিরামের গল্প জানে-"বড় লাটকে মারতে গিয়ে মারলাম ভারতবাসী" কিন্তু জানে না, 'তরিকায়ে মুহম্মদীয়া আন্দোলনের সেই দুঃসাহসী বীর মুজাহিদ শের আলির কথা, যিনি দু'শো বছরের ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে একমাত্র বড়লাট লর্ড মেয়োকে লৌহশলাকায় এফোড় ওফোড় করে নিজে শহীদ হয়েছিলেন।' ওরা অনেক রঙীন অসত্য ফ্যানটাসীর ইতিহাস জানে, শুধু জানে না নিজেদের সত্য সমুজ্জ্বল আড়াই হাজার বছরের আলোকিত ইতিহাস।

ওরা জানে না আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বহমান এক মহান ধারাবাহিকতারই ইতিহাস। ৭৭৭ খৃষ্টাব্দে আগত সুফী সুলতান বায়েজিদ বোস্তামী, সৈয়দ সুলতান মাহীসওয়ার, শাহ মুহম্মদ সুলতান রুমী, বাবা আদম শহীদ, শাহা নিয়ামতুল্লাহ বুৎশিকান, হযরত শাহজালাল (রঃ) কিংবা বখতিয়ার খিলজী থেকে ইলিয়াস শাহী আমল পর্যন্ত আগত মুসলমান সুফী দরবেশ সাধক, নৃপতিগণ, অত্যাচারী ব্রহ্মণ্যবাদের কবল থেকে এদেশের অত্যাচারিত পদদলিত গণমানুষকে মুক্ত করে সাম্য সৌভ্রাতৃত্বে আলোকিত পথে সমবেত করার মধ্য দিয়েই সূচনা করেছিলেন যে স্বাধীনতা সংগ্রাম আজকের তরুণ সেই স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস জানে না।

সুতরাং, ওরা নাটক লিখবে কি করে? নাটক লেখার অনুপ্রেরণা পাবে কোথায়? নাট্য চরিত্রই বা সৃষ্টি করবে কিভাবে? এই ইতিহাস বিচ্ছিন্নতা ওদের বিদেশী অনুকরণের প্রবণতা

www.pathagar.com

দিনে দিনে বাড়িয়েছে। এছাড়াও রয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য 'এপার ওপার" শিল্পে আন্তর্জাতিকতা ইত্যাদির সংগে গাঁটছড়া বাঁধার সহজ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব লাভের মোহ।

উইব্রখট, মলিয়ার, শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন, ডি. এল রায়, থেকে রুদ্রপ্রসাদ, অজিতেশ পর্যন্ত আমাদের নাট্যকার নাট্যকর্মীদের ফিলিং ইমোশনকে যে ভাবে নাড়া দেয়, এদের রচিত কাল্পনিক চরিত্রে নাটকগুলো যে ভাবে আমাদের নাট্যকারদের ইমাজিনেশনকে উদ্দীপিত করে, তার চেয়ে অধিক রোমাঞ্চকর বীরত্বগাঁথা আমাদের ঘরে থাকা সত্ত্বেও ঈশা খাঁ, মুসা খাঁ, সোনা গাজী, কেদার রায়, হুসেন শাহ, মাসুম খাঁ, আদিল খাঁ, খান জাহান আলির মত প্রত্যক্ষ বীরদের কালজয়ী চরিত্রগুলো তাদের কল্পলোককে মোটেই উদ্দীপিত করতে পারে না। এ যেন এক স্বেচ্ছা এতিম ভাব। দরিদ্র বিলাস।

এই ইতিহাস-অজ্ঞতা এবং পরদেশী সংস্কৃতির প্রাধান্যের জন্য দায়ী আমাদের আত্মভোলা স্বভাব, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার প্রতি অনীহা এবং ইতিহাস বিমুখতা। আমাদের গৌরবময় অতীতকে তুলে ধরার মত তেমন কোন উদ্যোগ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়, পাঠ্যসূচীতে কিংবা রেডিও-টেলিভিশনের কর্মসূচীতে প্রাধান্য পায়নি। আমাদের ইতিহাস ধর্মীয় দর্শন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিটি সংগ্রামে, আন্দোলনে বাস্তবে প্রকাশিত হলেও কি যেন এক লুকোচুরি খেলায় আমাদের বর্তমান বংশধরদের কাছে তা প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে। যার ফলে তরুণ সমাজ আজ বিভ্রান্ত হতাশাগ্রস্ত। আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির এই কৃত্রিম আকালের সুযোগে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে অন্তঃসার শূন্য বিদেশী সংস্কৃতি। যাদের ইতিহাস নেই, তারা ইতিহাস সম্পদ আহরণে ব্যস্ত। অথচ আমাদের হাজার বছরের আত্মিক সম্পদ, ঐতিহ্য সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমাদের তরুণরা Identity crisis এর আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। শতাব্দীর স্বাধীনতা সংগ্রামে, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে যে জাতি স্বাধীনতা অর্জন করলো, সে জাতির তরুণ সমাজ আজ আত্মবিস্মৃত, দিশেহারা, আত্মহননে উদ্যত। এক সাগর রক্তের বুকে ভেসে ওঠা স্বাধীনতার দ্বীপে এখন ভাঙ্গনের বহ্নুৎসব। রাজনীতিতে ভাঙ্গার গান, রাজপথে ভাঙ্গার গান, নাট্যচর্চায় ভাঙ্গার গান, কবি সম্মেলনে ভাঙ্গার গান। সর্বত্রই ভাঙ্গো ভাঙ্গো রব। রাস্তা ভাঙ্গছে, গাড়ী ভাঙ্গছে, রেল ভাঙ্গছে, আদালত ভাঙ্গছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গছে। শোনা যাচ্ছে দেশ ভাঙ্গার নীল নকশাও নাকি কেউ কেউ তৈরী করে ফেলেছে। এ ভাঙ্গনের খেলার পরিণতি কি? পরাধীনতা? আবার দাসত্ব, সেটাই কি আজ কাম্য?

তরুণ বন্ধুরা! তাকিয়ে দেখ ফিলিস্তিনের দিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের দিকে, আফগানিস্তানের দিকে, ইথিওপিয়া ও কাশ্মীরের মুসলমানের দিকে। জানতে চেষ্টা কর তাদের রাত কিভাবে যায়, দিন কি ভাবে আসে। স্বাধীনতা যাদের নেই তারাই জানে দাস হয়ে থাকার দুর্বিসহ যন্ত্রণার কথা। তোমরা কি জান ভাঙ্গনের নাটক দিয়ে যে ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন তৈরী করছো অচিরেই তা তোমাদের স্বাধীনতাকে গিলে খাবে।

এ দেশের স্বাধীনতা কোন দিনই সুরক্ষিত ছিল না। আজও নেই। জন্মলগ্ন থেকেই এদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে। এদেশের মানুষের আবহমান কালের ঐতিহ্যের চিরবিকাশমান ধারাকে স্তব্দ করে দিতে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত, আভ্যন্তরীণ চক্রান্তের অন্ত নেই। এ চক্রান্ত আটলান্টিকের ওপারের। এ চক্রান্ত ভারত মহাসাগরের পারের। এদের একজন বৃহৎ জাতিসত্ত্বার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার স্বার্থে আমাদের মত ক্ষুদ্র দেশগুলো স্বার্থ

www.pathagar.com

বিরোধী কাজে লিপ্ত আছে। অপর জন আজন্ম জাতিক্রোধ নিয়ে আমাদের স্বাতন্ত্র্য, ধর্ম ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে তাদের ধর্মের সাথে 'এক দেহে লীন' করার কাজে সদা তৎপর রয়েছে।

বন্ধুগণ, দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে, উপমহাদেশের উগ্র সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি এদেশের সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়কে কোন দিনই স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে মেনে নিতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কয়েকটি ঐতিহাসিক উক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। পরিষ্কার হয়ে যাবে কেন ভারতবর্ষ ভাগ হয়েছিল। কেন আজও আমরা আন্তর্জাতিক এবং আভ্যন্তরীণ চক্রান্তের জাল ছিন্ন করতে পারছি না। কেন আজও আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সততই হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

রবার্ট বায়রণ তার 'দি ষ্টেটসম্যান অফ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন- (কংগ্রেস নেতা) বালগঙ্গার তিলক (১৮৯৫) বলেছেন "এই উপমহাদেশের মুসলমান অধিবাসীরা হল বিদেশী দখলদার। কাজেই তাদের শারিরীকভাবে নির্মূল করতে হবে।"

১৯২০ সালে হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেসী নেতা ডঃ মুন্‌জে বলেছিলেন –"ইংল্যান্ড যেমন ইংরেজ জাতির, জার্মান যেমন জার্মান জাতির, তেমনি ভারতবর্ষ হল হিন্দুদের"।

১৯২৫ সালে হিন্দু নেতা লাল হরদয়াল বলেছিলেন – "আমি ঘোষণা করছি যে হিন্দু জাতি তথা হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ চারটি নীতির উপর নির্ভর করবে। (ক) হিন্দুস্থানের সামগ্রিক অর্থনীতি (খ) হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা (গ) ম্লেচ্ছদের শুদ্ধিকরণ (ঘ) আফগান দেশ জয় করে ভারতভুক্ত করা ও তাদের শুদ্ধি করা।"

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু তার এক ভক্ত কুমিল্লার আশরাফ উদ্দীন চৌধুরীকে লেখা চিঠিতে লিখেছিলেন, "বাংলা ভাগ করা হয়েছে সচেতনভাবেই, কারণ এ পথেই পুনরায় অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা করা যাবে।"

পণ্ডিত নেহেরু আরও বলেছিলেন, "প্রশান্ত মহাসাগর থেকে নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত সমস্ত এলাকা একদিন ভারতের একচ্ছত্র দখলে চলে আসবে। তখন স্বাধীন রাষ্ট্র সত্ত্বা নিয়ে কোন সংখ্যালঘু জাতি টিকে থাকবে না।"

জনাব মাসুদুল হক তার "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সি আই র ভূমিকা" গ্রন্থে বলেছেন : "১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধে (নেপাল সীমান্তে পূর্ব পাকিস্তানের উপর দিয়ে সেনা চলাচলের অনুরোধ) আইউব খানের ভূমিকায় পাকিস্তান সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে ভারত। পাকিস্তানের দুর্বল করার লক্ষ্যে সে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত করার পরিকল্পনা নেয়। ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার উপর সে পরিকল্পনা তৈরীর দায়িত্ব অর্পিত হয়।"

কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপলনী বলেছিলেন–"কংগ্রেস অথবা সমগ্রভারতীয় জাতি কখনই অখণ্ড ভারতের দাবী পরিত্যাগ করবে না।"

না, ওরা অখণ্ড ভারতের দাবী পরিত্যাগ করেনি। ওরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে মনে প্রাণে স্বীকার করে নেয়নি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করলেও ভারতীয় সেনাবাহিনী আজও ঐ দিনকে তাদের ইষ্টার্ন কমান্ডের বিজয় দিবস পালনের মাধ্যমে আমাদের

www.pathagar.com

স্বাধীনতাকে অবমূল্যায়ন করে থাকে। তাছাড়া এই সেদিনও তো তাদের দূত ভারতীয় কংগ্রেসী নেতা, মায়ারাম সার্জান স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে সদম্ভে বলে গেলেন-: "ইউরোপীয় দেশসমূহ এক সময় পরস্পরের শত্রু ছিল, আজ তারা অভিন্ন ইউরোপ গড়ছে। আমরা কেন ৪৭' এর পূর্বাবস্থায় অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা করতে পারবো না? আমরা ভাগ চাইনি। বৃটিশদের কারসাজিতে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়েছি। অথচ আজ প্রমাণ হয়েছে এ বিভক্তি টেকে না। আজ আমাদের অস্তিত্বের জন্যই এক হওয়া প্রয়োজন"।

মায়ারাম বাবু! মিথ্যা বলে, ইতিহাস বিকৃত করে আমাদের তরুণদের বিভ্রান্ত করবেন না। আপনি কি আপনাদের প্রখ্যাত বিচারপতি এইচ এম সারা ভাই এর "পার্টিশন অফ ইণ্ডিয়া" গ্রন্থটি পড়েন নি? পড়ে দেখুন, তাহলে আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, ভারত বিভক্তির জন্য হিন্দুরাই দায়ী। বৃটিশ বা মুসলমানরা নয়। বিচারপতি সারাভাই লিখেছেন "It is resonably clear that it was Congress which wanted partition. It was Jinnah who was against partition but accepted it as the second best"

মুসলমানদের সমমর্যাদা ও অধিকার আপনারা কোন দিনই দিতে চান নি। মুসলমানদের জাতি হিসেবেও স্বীকার করতে আপনাদের নেতারা নারাজ ছিলেন। তাই এ ভাগ পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে জাতি হিসেবে টিকে থাকার জন্যই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা ছাড়া সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপায় ছিল না। ধ্বংসের অতল গহ্বর থেকে বেঁচে ওঠার জন্যই যে আমাদের স্বাধীনতার প্রয়োজন ছিল এ কথা আমরা ভুলে যাই কি করে। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে ১৯৪৭ সালেও বাবু গুরু লাল কর "আমাদের জাতিসত্ত্বা নামক পুস্তকে লিখলেন "হিন্দুস্থানের অহিন্দুদের হিন্দু সংস্কৃতি এবং ভাষা গ্রহণ করতে হবে, হিন্দু ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে হবে।" ধর্মনিরপেক্ষতার লেবাসধারী ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যশক্তি তো নিজের দেশে আজও বারবার গো হত্যা নিবারণের নামে বাবরী মসজিদের নামে ঈদের জামাতকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে মুসলিম নিধন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। আর এপারে আমাদের সংস্কৃতিক জীবনে অন্তর্ঘাতী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বাঙালী সংস্কৃতির কথা বলে, পরিচয়হীনতার বিভ্রান্তিতে ফেলে, আমাদের পায়ের নীচে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। স্পেনের ইতিহাস থেকে ওরা জেনেছে যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যই মুসলমানদের মূল জীবনী শক্তি।

সুতরাং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের সব চিহ্ন মুছে দিতে পারলেই স্পেনের মুসলমানদের মত বাংলাদেশের মানুষকেও নিশ্চিহ্ন করা যাবে। আমরা জানি, সংস্কৃতির পরিশীলিত প্রকাশ মাধ্যম হল ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, নাটক, চিত্রাঙ্কন ও অন্যান্য চারু ও কারুকলা, এসব কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে যে কোন সংস্কৃতির চেহারা বদল সহজ সাধ্য। আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে এসব ক্ষেত্রে বিপুল অর্থব্যয়ে বিদেশী এজেন্ট নিয়োগ করা হচ্ছে। বিশেষ কর ৭১-এর পর এদেশের সরকারগুলোর নতজানু নীতির দরুন অনুকূল সুযোগ পেয়ে তারা ব্যাপকভাবে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য মুছে ফেলার কাজে মেতে উঠেছে। রেডিও, টেলিভিশন, বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমীর অনুষ্ঠানমালার দিকে তাকালেই সংস্কৃতির চেহারা বদলের দিকটা প্রকট হয়ে ওঠে।

নাটকের কথায় ফিরে আসি। এদেশের নাটক জন্মলগ্ন থেকেই বাবুকালচারের সঙ্গে জড়িত। বাবুদের বাগানবাড়ীতে যে নাট্যকলার জন্ম সে নাট্যশিল্পকে আজও এদেশের

www.pathagar.com

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মনে যুগযুগ ধরে লালিত আদর্শ, জীবনবোধ, জীবনাচার, জীবন সংগ্রামের সংগে সম্পৃক্ত করা যায়নি। বাংলাদেশের হাটের মাঠের মাটি মানুষের দাওয়া দহলিজের কথা আমাদের নাটকে শোনা যায় না। ১৪ কোটি মানুষকে দারিদ্র সীমার নীচ থেকে উপরে ওঠার অনুপ্রেরণা নাটক দিতে পারে না। নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাংখা নাটক জাগাতে পারে না, ধর্মনিরপেক্ষতার সস্তা শ্লোগানে আকৃষ্ট ধর্মহীন বে-পরওয়া যুব সমাজের মনে মূল্যবোধ জাগাতে পারে না। সত্য সুন্দরের আদর্শ নাটকে নেই, আছে সংঘাত, প্রেম। আছে কাল্পনিক রাজাকার কিংবা মোড়ল বা চেয়ারম্যানদের সকল সমস্যার মূল বানিয়ে স্থূল ক্যারিকেচার। আছে ধর্মপরায়ণ দাড়ি টুপিধারী মানুষকে ভিলেন সাজিয়ে ধর্মবোধ শিথিল করার প্রয়াস। মুক্তিযুদ্ধের কাল্পনিক স্বপক্ষ-বিপক্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যে ফাটল সৃষ্টির অপপ্রয়াস। রাজাকারই এখন নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। রাজাকার ছাড়া নাটক নেই। যেন রাজাকারই দেশের একমাত্র সমস্যা। সীমাহীন দারিদ্র্য, কর্মহীন মানুষের ভিড়, শিক্ষাক্ষেত্রে সন্ত্রাস, মূল্যবোধের অবক্ষয়, ধর্মের প্রতি অনীহা, জাতীয় সংহতিতে ফাটল, বিদেশী আগ্রাসন, পানি সমস্যা, করিডোর সমস্যা, তালপট্টি সমস্যা, শান্তিবাহিনী সমস্যা, স্বাধীন বঙ্গভূমি সমস্যা, কোনটিই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে উঠতে পারেনি, নাটক মেতে আছে রাজাকার চেয়ারম্যান নামক কাল্পনিক চরিত্রগুলোকে আচকান, দাড়ি, টুপি পরিয়ে হাস্যপরিহাসের মাধ্যমে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্মবোধে আঘাত হানার কাজে, ইসলাম সম্পর্কে বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজে। নাটক যেন এখন সমাজের প্রতিচ্ছবি নয়, বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার। নাট্যশিল্পে ইদানিং আর একটা সর্বনাশের সুর ধ্বনিত হচ্ছে। কতিপয় অ-শিল্পী ব্যক্তিস্বার্থ, রাজনৈতিক অভিলাষ আর সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের মোহ নিয়ে সমগ্র নাট্যচর্চাকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। এরা তেমন ভাল অভিনেতা কেউ নন, নাট্যকার নন, এমন কি নাট্য সংগঠকও নন, অথচ সমগ্র বাংলাদেশের নাট্যচর্চার মালিক- মোখতার হিসেবে নিজেদের জাহির করে থাকেন। এরা অল্প কয়েক জনে মিলে ট্রেড ইউনিয়নের মত নাট্যজগতেও একটা নাট্য ট্রেড ইউনিয়ন চালু করেছে। যার সদস্য না হলে, চাঁদা দিতে অপারগ হলে বাংলাদেশে নাট্যচর্চা করার অধিকার হারাতে হয়। এদের সদস্য নন এমন সংগঠনকে নাট্যমঞ্চ বরাদ্ধ দিলে এরা হল কর্তৃপক্ষের উপর চড়াও হন। এদের অনুমোদন ব্যতিরেকে পেশাদার আলোক সজ্জাকর, রূপ সজ্জাকরগণও কোন নাট্যদলে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। এমন কি শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত নাট্যোৎসবে এদের অনুমোদিত দল ছাড়া অন্যদল প্রবেশাধিকার পায়নি। নাট্যাঙ্গনে এটি কতিপয় স্বৈরাচারী প্রকৃত নাট্যসেবীদের আতংকগ্রস্ত করে তুলেছে। নাট্যাঙ্গনের সর্বত্রই এদের দাপট।

এমনকি, রেডিও টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালার দিকে তাকালেও এদের দৌরাত্ম্য প্রবলভাবে নজরে পড়ে। সকালে গণআদালত বসায়, বিকেলে কোর্টে হাজির হওয়ার ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়। সে সব উপেক্ষা করে সন্ধ্যায় ঠিকই টেলিভিশন অনুষ্ঠানে এদের হাজির হতে দেখা যায়। এই ট্রেড ইউনিয়ন দেশের নাট্যচর্চায় কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখেনি। দেশে নাট্যমঞ্চ নেই, নাট্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই, নাটকের প্রয়োজনীয় লাইব্রেরী নেই, দুঃস্থ

www.pathagar.com

নাট্যশিল্পীকে সহায়তা দানে কোন ভূমিকা নেই। বরং এদের অশুভ তৎপরতায় নাট্যকর্মীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে, দল ভাঙছে। নাট্যচর্চার ক্ষেত্রেও অশুভ সন্ত্রাসী ছায়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। যা অচিরে নাট্যচর্চা ধ্বংস করবে।

দেশের সার্বিক নাট্যচর্চার স্বার্থে এইসব অশুভ তৎপরতা রোধ করতে হবে যারা রাজনৈতিক হানাহানি দিয়ে নাট্যাঙ্গন কলুষিত করতে চায় তারা নাটকের কেউ না, শিল্পের কেউ না। আজ দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত সৌভাগ্যক্রমে যাদের মূল আদর্শ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশী সংস্কৃতি। সুতরাং সরকারেরও সতর্ক থাকতে হবে এই ইতিহাস-ভূগোল তালগোল পাকানো সংস্কৃতিসেবীদের সম্পর্কে। তা নাহলে অতীতের মত চেহারাবদল করে এ সরকারের রক্তের সংগেও এরা মিশে যাবে, পরিণামে বেরিয়ে আসবে দুষ্টক্ষত ক্যানসার হয়ে।

সংগে সংগে আমার দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা প্রিয় তরুণ সমাজের উদ্দেশ্যে বলবো -ভাঙ্গন নয় performing Art- এর অমিত তেজকে কাজে লাগিয়ে ছায়াচ্ছন্ন মানুষের বুদ্ধি বিবেকের সামনে আলো জ্বেলে দিন। ইতিহাস ঐতিহ্যকে স্বচ্ছ করে তুলুন। অকূল সমুদ্রে পতিত তরুণ সমাজকে বাতিঘর হয়ে জানিয়ে দিন তোমরা কোন ভূঁইফোড় জাতি নও, হাজার হাজার বছরের ইতিহাস আছে তোমাদের। যে ইতিহাস আমাদের পেশীতে দিয়েছে বল, বুকে দিয়েছে স্বাধীনতার পিপাসা।

যার ফলে একদা ইংগ বৃটিশ চক্রান্তে সহায় সম্পদহীন কুলিমজুর, প্রজা, রায়ত, চাষা ছোটলোক বাঙ্গালী মুসলমানের ছেলেরা আজ স্বাধীন জাতি হিসেবে একটা দেশ চালাচ্ছে, বিমানবহর চালাচ্ছে, সেনাবাহিনী চালাচ্ছে। রেল, হাসপাতল, প্রকৌশল, কূটনৈতিক বিভাগ সবই চালাচ্ছে। চাষা ছোটলোক বলে কথিত বাঙালী মুসলমানদের ছেলের এ গৌরব বড় কম নয়। এ গৌরব স্বাধীনতার। এ গৌরব আমাদের পূর্ব পুরুষদের আত্মত্যাগের। আমাদের দায়িত্ব সেই স্বাধীনতা সুসংহত করা। তার জন্য চাই স্বাধীন চিত্তের বিকাশ। মনদাসত্ব নিয়ে জাতি হিসেবে টিকে থাকা যায় না। জাতি হিসেবে টিকে থাকতে না পারলে দেশ থাকে না, স্বাধীনতা থাকে না। অনার্যরা এদেশে জাতি হিসেবে টিকে থাকতে পারেনি বলেই আর দেশ ফিরে পায়নি। প্রয়োজনের তাগিদেই আমাদের পূর্ব পুরষরা লড়াই করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল, আজ প্রয়োজনের তাগিদেই জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে সেই স্বাধীনতা সু-সংহত করতে হবে।

বলুন, আমরা কারো মত হব না। আমরা আমাদের মত হব। আমাদের মত করে কাব্য লিখবো, নাটক লিখবো, ইতিহাসচর্চা করবো, দর্শনচর্চা করবো, জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তি উদ্ভাবন করবো। নিজেদের মত করেই নিজেদের সৃষ্টি শক্তি বিকশিত করে তুলবো। পদ্মা মেঘনা বিধৌত এই পাললিক ভূমিতে বাংলাদেশী সংস্কৃতি আমাদের ঐতিহ্যে নতুন নতুন রক্ত গোলাপ ফোটাবে যা সুষমার লাবণ্যে হবে বাংলাদেশী আর সৌরভে হবে বিশ্বজনীন। #

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক ভাবনার নানা প্রসঙ্গ

মাসুদ মজুমদার

১. ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক শব্দ। আবার শব্দ তিনটির সাযুজ্য এত ঘনিষ্ঠ যে, যাত্রা-যাত্রী-বাহন মিলে যেমনটি একাকার হয়ে যায়, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিও একের মধ্যে অন্যের প্রকাশ। একটি অন্যটির হাত ধরে চলে। তাই একটির প্রসঙ্গ এলো তো অন্যটি সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রাথমিকভাবে আমরা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে একটি সাধারণ আলোচনার সূচনা করতে চাই। নাতিদীর্ঘ এই প্রায়োগিক আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা সাংস্কৃতিক ভাবনার নানা প্রসঙ্গ নিয়ে একটু আলোকপাত করবো।

ইংরেজিতে একটি শব্দ আছে 'ক্যাটালিস্ট', যার বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে প্রভাবক। বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে এটি বহুল পরিচিত শব্দ। এর অর্থ নিজের গুণ নষ্ট না করে নিজস্ব গুণে অন্যের গুণের ভেতর প্রভাব বিস্তার করে দেয়া। সহজ উপমা হচ্ছে দুধে তেঁতুল। একটু তেঁতুল দুধে ডুবিয়ে দিলে দুধ ছানা হয়ে যাবে। কিন্তু তেঁতুল নিজস্ব গুণাগুণ হারায় না। সংস্কৃতি সমৃদ্ধ জাতির ভাষা-সাহিত্যে প্রভাবক-এর ভূমিকা পালন করে। ভাষা সাহিত্যের ওপর ভর করে সংস্কৃতি, যা পানি নীচের দিকে প্রবাহিত হবার ধর্মের মত আপনিতেই গড়িয়ে চলে। স্রোতের প্রাবল্যকে যারা ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাবার সামর্থ্য রাখে, তাদের জন্য এটি প্রভাবক, এখানে গ্রহণ-বর্জন করার ক্ষমতাটাই স্বকীয়তা। এই গুণ যাদের নেই, তাদের কাছে স্রোতের এই প্রাবল্যটাই আগ্রাসন।

সংস্কৃতি যে আগ্রাসন চালায়, ভাষা-সাহিত্যে এর যে প্রকাশ, সেটা রাজনীতির মত দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। রাজনীতিতে যেটাকে দাসত্ব বলা যাবে, সংস্কৃতিতে বলতে হবে মানসিক গোলাম। মগজ ধোলাই হতে হতে মানসিক গোলামী শারীরিক অবয়ব পায়। সেটাই সাংস্কৃতিক গোলামীর নামান্তর। এটা রক্ত-মাংসে জড়িয়ে গেলে স্বকীয় জাতিসত্তা বলতে অবশিষ্ট কিছু থাকে না। এই কারণে আজকের স্বাধীনতা মানে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ রাজনৈতিক নিপীড়ন, অর্থনৈতিক শোষণের সাথে সাংস্কৃতিক গোলামীর প্রসঙ্গটি আলোচনা কিংবা বিবেচনা থেকে বাদ পড়ে না।

www.pathagar.com

২. ভাষা-ভাব প্রকাশের উক্তি বা সংকেত। মনের ভাব প্রকাশ করতে ব্যবহৃত শব্দাবলী। নিজস্ব ভাব প্রকাশের রীতি। উক্তি বচন কথা। ভাব প্রকাশের বাহন ভাষা। এর পরিধি গদ্য থেকে পদ্য নাগাদ। সাধু, কথ্য ও চলতি পর্যন্ত। আঞ্চলিক থেকে মূল ভাষার অপভ্রংশও। ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের বিবর্তিত রূপই অপভ্রংশ। অপভ্রংশ সব সময় বিকৃত কিংবা অশুদ্ধ নয়। ভাষায় বিবর্তন ও রূপান্তর সিদ্ধ। ভাষার ইতিহাস এর স্বীকৃতি দেয়।
জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন। আয়ারল্যান্ডবাসী খ্যাতিমান ভাষাতত্ত্ববিদ। ভারতীয় ভাষাসমূহের ওপর ২০ খন্ডে তার গবেষণা কর্ম 'ল্যাংগুয়িস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া' সর্বজন স্বীকৃত ও গ্রাহ্য। তিনি মনে করেন, নানা প্রাকৃত ভাষার একটি মাগধী। এটি ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় ভাষাগুলোর অন্যতম। এর বিবর্তিত রূপ থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি।
স্পষ্ট এই অভিমতটি গ্রহণ করেছেন ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি আরো বিস্তৃত করে অভিমত দিয়েছেন-প্রাকৃত ভাষাগুলোর শেষ স্তরের নাম অপভ্রংশ। মাগধীর তিনটি ভাগ রয়েছে। পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য মাগধী অপভ্রংশ। তার মতে পূর্ব মাগধীর তিন শাখার একটি বাংলা, অপর দু'টি আসামি ও উড়িয়া।
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এই দু'টি মত গ্রহণ করতে চাননি। তার মতে গৌড়ী প্রাকৃতের অপভ্রংশের পরিণত রূপ বাংলা। এই মতটি পরবর্তি গবেষকদের প্রভাবিত করেছে অধিকতর। যুক্তি এবং তথ্যও জোরালো। উনবিংশ থেকে বিংশ শতকের বিরাট অংশ জুড়ে সংস্কৃতকে বাংলার জননী ভাবা হতো। 'পন্ডিত'রা এই মতটি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদদের তথ্য উপাত্ত ও যুক্তির কাছে 'বাংলা ভাষা সংস্কৃতের মেয়ে' মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে যারাই অভিমত দিয়েছেন, প্রত্যেকের বক্তব্য একসাথে উপস্থাপন করলে দেখা যাবে প্রত্যেক ভাষাই একটি রূপ থেকে রূপান্তরিত হয়ে পরিমার্জিত রূপ পেয়েছে। ব্যাকরণবিদরা বিধিবদ্ধ ও রীতিসিদ্ধ করেছেন। আগে ভাষার বীজ জন্ম নিয়েছে। তারপর ব্যাকরণ। বাংলাভাষায় ব্যাকরণের প্রলেপ দেয়ার সময় পন্ডিতদের মগজে ঢুকলো 'সনাতন' হিন্দু ধর্মের সাথে বাংলাকে জড়িয়ে দিলে মুসলমানিত্ব খর্ব করা সহজ। এই 'পন্ডিতরাই' এক সময় বাংলাকে কাক-পক্ষীর ভাষা বলে ইতরশ্রেণীভুক্ত করে শ্লাঘা অনুভব করতো।
বাংলা ভাষার আদিপর্ব নিয়ে বিতর্ক যাই থাকুক কুতর্ক নেই। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের সদস্য হিসেবে বাংলার অধিষ্ঠান নিশ্চিত হলেও ভাষায় দুটো আমেজ ধরা পড়ে। ভাষা সমৃদ্ধির প্রাক্কালে পন্ডিতরা ঠান্ডা মাথায় সংস্কৃত আমদানী আর হিন্দু মীথ ও মাইথোলোজি দিয়ে বাংলাকে পরিপুষ্ট করতে চাইলো। ততদিনে 'কাক-পক্ষীর' এই ভাষাটিকে সমৃদ্ধ করতে হাত বাড়ালো ফারসী, আরবী, ইংরেজী, ফ্রান্স, পর্তুগীজ ওলন্দাজসহ উর্দু হিন্দী সমেত অন্য ভাষাগুলো। ধর্মের সুরতে, শাসনের দরজা দিয়ে, জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসের সূত্রে বাংলার শব্দভান্ডার এতটা সমৃদ্ধ হতে লাগলো যে, পূর্ববাংলার 'চাষারা'ও ভাষার দখলদারিত্ব পেয়ে গেলো। বাংলার মানচিত্রের মত ভাষার চরিত্রেও বিভাজনের রেখা বসলো।
এই রেখাটি সুস্পষ্ট হতে বেশি সময় নিলো না। হাজার বছরের মধ্যে মানুষের মুখে মুখে বিবর্তিত হয়ে জাত-পাতের বাধা ডিঙ্গিয়ে বাংলা আজকের রূপে দাঁড়িয়ে গেছে। লাভ করেছে আধুনিক মার্জিত ও শৈল্পিক ভাষা সুষমা। এর ভেতর মুসলমানিত্ব লীন হয়ে গেছে। হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টীয় চৈতন্যও ভর করেছে। জল-পানির তফাৎটা ঠুনকো এবং কৃত্রিম। বিগত

www.pathagar.com

শতকের চল্লিশের দশক থেকে বাংলাভাষা সাধারণভাবে ধর্মাশ্রয়ী নয়। এটি পূর্ববাংলার মানুষের প্রতিনিধিত্বশীল ভাষা হিসেবে দাঁড়াতে শুরু করে। হিন্দু আর হিন্দির যাতাকলে পিষ্ট হতে হতে এককালের উইলিয়াম কেরী, প্যারী চাঁদ মিত্র, রাম রাম বসু, প্রমথ-প্রেমদাসদের কোলকাতার মায়া ও নাড়ী ছিন্ন করে বসে। এখন ঢাকা বাংলাভাষার পীঠস্থান। সর্বভারতীয় ভাষা সংস্কৃতির আগ্রাসনে কঁকিয়ে ওঠা বাংলা ওখানে আড়ষ্ট আর ঢাকায় উন্মুক্ত। কোলকাতায় বসে যারা ভাষা নিয়ে ভাবেন, গদ্য চর্চা করেন, কথা শিল্পের জাল বুনেন, তারাও ওঁৎ পেতে থাকেন ঢাকার বাজারের জন্য। চটজলদি বাঁধাই শুকাবার আগেই 'দেশ' 'সানন্দা' ঢাকায় ঢুকে যায়। এর ভেতর জঞ্জাল আসে, অখাদ্য আসে, কুখাদ্য আসে, তার চেয়ে বেশী আসে আগ্রাসী উপকরণ।

ভাষাকে বাহন করে সাহিত্য দাঁড়ায়। সাহিত্য জীবনবোধকে ধারণ করে। জীবনবোধের বহিঃপ্রকাশই সংস্কৃতি। পূর্ববাংলার মাটি মানুষকে ধরে রাখে লোকবল বিবেচনা করে, যা পলি নয়, তা বর্জন করে, ঠেলে দেয় গাঙ্গেয় বদ্বীপের শেষ ঠিকানা দক্ষিণা সাগরে। যা কিছু ভালো, সুন্দর আর কল্যাণের, তাকে গ্রহণ করে মাতৃকোলে শিশুর মত করে। পশ্চিমবঙ্গের ভাষা আর নান্দনিক সাহিত্য-সংস্কৃতি বাংলাকে আশ্রয় করে দাঁড়ালে গঙ্গা পাড়ি দিতেই হবে। গঙ্গাস্নানে জাত-পাত আর বর্ণবাদ ধুয়ে মুছে যা কিছু ভালো তাকে 'ঢাকাই' করে দেবে। ঢাকাই করে দিচ্ছে।

আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ও সংস্কৃতির রূপান্তর শ্লথ, মন্থর। কোলকাতাকেন্দ্রিক ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির আহাজারী আমাদেরকে ব্যাথাতুর করছে। ভাষার স্থানান্তর এত দ্রুত হলো যে সেই 'ভাষা শরণার্থী'কে আমাদের মত করে আশ্রয় শিবির গড়ে দিতে সময় নিচ্ছে। এটি সন্ধিক্ষণ। কোলকাতা থেকে ভাষা-সাহিত্যের ঢাকাকেন্দ্রিক পলায়নের ক্রান্তিকাল। ঢাকা পুরো মাত্রায় সমৃদ্ধ হবার আগে ওপারের সবটুকু হজম করা কষ্টকর। আত্মস্থ করা সময় সাপেক্ষ। তবে এটা ঠিক তাৎক্ষণিক কিছু মুসাফির বেশে তস্করের প্রবেশ ঘটছে। বোধকরি ঢাকা এবং ঢাকার সাহিত্য পাড়া এই ব্যাপারে সজাগও।

পূর্ব বাংলা অতীতে বর্গী যেমন ঠেকিয়েছে, তেমনি হার্মাদকেও কূলে ঘেঁষতে দেয়নি। আগ্রাসন মুক্তির জন্য সংস্কৃতির যে প্রাণশক্তি থাকা চাই পূর্ববাংলায় তা আছে। তৌহিদ ও বিশ্বাসভিত্তিক যে সমাজ ও সমাজকাঠামো তাতে ভাঙ্গন আছে, ফাটল আছে, বিচ্যুতি আছে, কিন্তু পোক্তও। মাটির গভীরে, অনেক গভীরে প্রবিষ্ট শেকড়টা হেঁচকা টানে উঠে আসার নয়। প্রবল বাতাসে হেলবে দুলবে, গড়িয়ে পড়বে, লুটিয়ে পড়বে; কিন্তু নিশ্চিহ্ন হবার নয়।

কারণ, এখানকার গণবিশ্বাস আরোপিত নয়। বিশ্বাসের উপর দাঁড়ানো সংস্কৃতির প্রলেপটি জলরঙ নয়। একেবারে সোঁদা মাটির কাদামিশ্রিত রঙ ও গন্ধমাখা। জোয়ার সব কিছুকে তাৎক্ষণিক লণ্ডভণ্ড করে দেয়। ঝড়-ঝঞ্ঝা ধ্বংস ডেকে আনে, কিন্তু মাটির গভীর থেকে উপ্ত চারাগাছ আবার ঠিকই গজিয়ে যায়। পত্র পল্লবিত হয়, ফলবান হয়, ছায়া দেয়, মায়া দেয়, আবার চারদিকে বিলায়ও।

সংস্কৃতি যদি পরগাছা হয় তাহলে কোলকাতার উপর দিল্লীর মত আছর করবে। নয়তো আগ্রাসন ঠেকিয়ে প্রতিরোধ করে সতত চিরায়ত হবে। ঢাকা এমন এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার যে ঐতিহ্য হারায় না, আত্মস্থ করে; লীন হয় না বরণ করে, রঙ বদলায় না ছড়িয়ে দেয়। এই ঐতিহ্য জীবনবোধের বহিরাঙ্গ নয়; ভেতরের সুপ্ত ম্রিয়মান

www.pathagar.com

কিছু নয়। ভেতর বাইরে একই দেহ এবং আত্মার মত। রুহ ও শরীরের মত। ছায়া ও কায়া যেমন একটি অপরটিকে অনুসরণ করে তেমনি পূর্ব বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি নবান্নে যা বৈশাখে তাই, রমজানের ঈদে বা পৌষ পার্বনে অভিন্ন। খাদ্য বা রুচিতে যা সূচী আর আপ্যায়নেও তাই। যা ধর্ম, তাই জীবনবোধ, যা জীবনাচার তাই ধর্ম। যা বিশ্বাস, তাই জীবনের প্রতিফলন। যা জীবনে প্রতিফলিত, তাই সংস্কৃতি। এর সবটুকু মিলেই আমাদের গদ্যের অবয়ব, পদ্যের উপমা, আর কথা সাহিত্যের নানা শাখায় সংস্কৃতির চিরায়ত রূপ ভেসে উঠে, যেটি ধরা পড়ে সহজে। মা যখন পুত্রকে সঁপে দেন, নওশার সাজে সাজিয়ে দেন, মুখে গ্রাস তুলে দেন কিংবা ছড়া কেটে ঘুম পাড়িয়ে দেন, দোলনায় যখন আদুরে দোলা দেন কিংবা কবরে শুইয়ে মাতম করেন, তখন জীবন জীবনাচার আর ধর্মে ফারাক নেই। নেই ভাষায় সাহিত্যে সংস্কৃতিতে।

শহীদ সালামের মা, আবুল বরকতের বাবা, আবদুল জব্বরের বোন-ভাই ,আত্মীয়-স্বজন প্রিয়জনদের কুষ্টিনামা টানুন। পুঁথি সাহিত্য থেকে আজকের সাহিত্যের ভেতরে প্রবেশ করে দেখুন। অনুবাদ শাখা থেকে মৌলিকে যান, কবিতার উপমা, গল্পের নায়ক, উপন্যাসের চরিত্র অবচেতন মনে কবি সাহিত্যক সবাইকে শেকড়ের দিকে টানে , ঐতিহ্যমুখি করে। হ্যাঁ মাঝে-মধ্যে ব্যত্যয় ঘটে, ঘটিয়ে দেয়া হয়। আরোপ করা হয় । শেষ পর্যন্ত ওসব টেকে না। আমার যা তাই হয়ে যায়।

যে ভাষা প্রকৃতিক ভাষার রূপান্তরের পথ ধরে পরিমার্জিত হয়ে বিশ্বের অন্যতম পরিশীলিত ভাষায় অধিষ্ঠান পায়, যে জাতি সত্তায় নিজেদের অস্তিত্বের সৌধ নির্মাণ করতে জানে, ভাষার উপর আগ্রাসন ঠেকায় রক্ত দিয়ে সাংস্কৃতিক গোলামীর জিঞ্জির ছিন্ন করে লাগাতার আন্দোলনের পথ অতিক্রম করে, বিকৃতি-বিচ্যুতির রূপক তস্করদের স্বরূপ বুঝে যায় প্রতিটি বিপর্যয়ের পরে, সেই জাতিসত্তা টিকে যায় নিজস্ব বিশ্বাস ও সংস্কৃতির প্রাণশক্তির জোরে। সেই জাতির ভাষা স্রষ্টার নেয়ামত। সংস্কৃতিচর্চা আর সাহিত্য সাধনা সেখানে ইবাদততুল্য। তাই ওপারে সাহিত্য সংস্কৃতি ও ভাষায় বিদায়ী বিউগলের করুণ বেদনাবিধুর সুর। এপারে সৃষ্টি সুখের উল্লাস এবং আনন্দের সানাই। একটি বিশ্বাসের টান এবং মানবিক সংস্কৃতির অর্জন, অন্যটি সীমাবদ্ধতার ফসল ও আত্মবিস্মৃতির খেসারত।

৩. একটা সময় ছিলো যখন সংজ্ঞা নিরুপণ করে সংস্কৃতি বোঝবার চেষ্টা করা হতো। এখন কাউকে সংস্কৃতি বোঝাতে হয় না। যার যার সুবিধামত সবাই একটা সংজ্ঞা বানিয়ে নিয়েছেন।

সংস্কৃতির রাজনৈতিক ব্যবহারটা বোধ করি বিগত শতকের গোড়ার দিক থেকে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে যে শব্দটি এই উত্তর আধুনিক যুগে আমরা শুনতে পাই, আগে তেমনটি শোনা যেত না। বরং পনের শতকের প্রথম দিকে ধর্ম রাজনীতি আলাদা করার খৃষ্টীয় তত্ত্বটির মত সংস্কৃতিকে অন্যসব থেকে আলাদা করার একটা ভাব-প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পোপেরটুকু পোপকে, সিজারেরটুকু সিজারকে দেবার কথা বলে ধর্ম রাজনীতি থেকে আলাদা হলো। সেই বিকশিত পুঁজিবাদই সংস্কৃতিকে আলাদা করতে চায়, তবে ভিন্ন ধারায়। ধর্ম থেকে রাজনীতি, রাজনীতি থেকে ধর্ম আলাদা করার তাগিদটা এসেছিল খৃষ্টীয় তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা ও অনাচারের প্রতিবাদ থেকে- একথা যেমন সত্যি, ধর্মের নৈতিক বেষ্টনী ভেদ করার একটা বস্তুতান্ত্রিক ভাবনাও এর ভেতর প্রবলভাবে কাজ করছিলো সেটিও মিথ্যা নয়। এখন সংস্কৃতিকে নৈতিকতামুক্ত করার ভোগবাদী মানসিকতাটা ধর্ম

www.pathagar.com

রাজনীতি আলাদা করার চেয়েও প্রবল। কারণ, দেউলে হতে হলে প্রথমে অনৈতিক হতে হয়, মানবিক কুপ্রবৃত্তিকে নিরাপদ স্থান করে দিতে হয়। অথচ পুজির কোন ক্ষতি হয় না। সমাজবাদ গোড়ায় সংস্কৃতি নিয়ে ভাবতে পারেনি। যখন ভাববার প্রয়োজন বোধ করলো তখন পুঁজিবাদকে টেক্কা দিতে সংস্কৃতিকেও রাষ্ট্রিক বানাতে চাইলো।

পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ বস্তুবাদী দর্শনের দু'টো অপভ্রংশ। তাই আলাদা করার চেষ্টা যেমন সফল হলো না তেমনি রাষ্ট্রিক করার চেষ্টাটাও সাফল্য পেল না। এখন বস্তুবাদে পুঁজি ও সংস্কৃতি আলাদা নেই। সংস্কৃতিও পণ্য পুঁজিও সংস্কৃতির ভোক্তা। এখানে এসে সমাজবাদ আর প্রতিযোগিতায় নামার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না।

পুঁজিতন্ত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বেড়িমুক্ত সংস্কৃতি পণ্যমানে উন্নীত হতে পেরে তুষ্ট। বস্তুবাদও একে বস্তুতান্ত্রিকতার হাতিয়ার বানাতে পেরে খুশী। গণিকার দেহ খদ্দেরের কাছে ভোগের, তার নিজের কাছে পুঁজির, দালাল ফড়িয়াদের কাছে বিনিয়োগ, সেক্যুলার রাষ্ট্রে কাছে করের উৎস। কোন কবি যখন সেই দেহ কবিতার ভাষায়, ভাস্কর ভাস্করের ভেতর দিয়ে 'নান্দনিক' করে উপস্থাপন করেন, সেটাও সংস্কৃতি হয়ে যায়। সেটাও এখন পণ্যমানে বিকায় এবং নিরুপিত হয়।

সঙ্গত কারণেই রাজনৈতিক আধিপত্যের মত সাংস্কৃতি আধিপত্যের প্রশ্ন এসেছে। ভৌগোলিক আগ্রাসনের মত সাংস্কৃতিক আগ্রাসনও সমার্থক হয়ে ধরা পড়ে। সংস্কৃতিকে এভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝবার চেষ্টাটা অভিনব মনে হতে পারে। মনে করাটা অংশত সত্যও বটে। কারণ, শ্রেণী সংগ্রামীদের নিক্তিতে তুলে সংস্কৃতি মাপার একটা ফ্যাশন দীর্ঘদিন চালু ছিল। এখানে এসে শিল্পের জন্য শিল্প শ্লোগান আর ঋজু ভাষায় থাকেনি। ভোঁতা হয়ে গেছে। এক সময় সংস্কৃতি আর বিনোদনের ভেতর ফারাক কিছু ভাবা হতো না। প্রমথ চৌধুরী যাকে গড়ের মাঠের খেলা ভেবেছেন এখন কেউ সেভাবে নেয় না। সব কিছুর ভেতর অর্থও খুঁজতে চায়। কার্যকারণ জানতে চায়। লাভ-ক্ষতিও খতিয়ে দেখতে চায়। এটাই বস্তুবাদের বৈশিষ্ট্য। বস্তুর বাইরে আর কোন জীবন-জিজ্ঞাসার সন্ধান করা হলে বুঝতে হবে সেটা এমন কোন বিষয়, যা অতি লৌকিতার ভেতর আচ্ছন্ন। তাকে আর বস্তুবাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। পেশামানেও ভাবা হয় হয় না।

সংস্কৃতিকে যখন বস্তুবাদ এই স্তরে নিয়ে গেছে, তখনই তো মঞ্চের খলনায়কও বুদ্ধিবৃত্তিক একজন ব্যক্তিত্বের চেয়ে নন্দিত। মডেল তারকাতো আরো বড় ব্যাপার। সুপারস্টার এখন ওঠে আসে বিনোদন মাধ্যমে থেকে। আর বিনোদন মাধ্যমটি মানসিক স্তুতির হলেও এর পণ্যমানটা আর তুচ্ছ নয়। সেটা আগেই উল্লেখ করেছি।

সংস্কৃতি যখন এমনভাবেই পুঁজি স্পর্শ করে জীবনকে প্রভাবিত করছে তখন আমরা বৈধ-অবৈধতার ফতোয়া দিচ্ছি। সংস্কৃতি প্রকাশের ক্ষেত্রগুলো শুধু অচিহ্নিতই থাকছে না, উপেক্ষিত হচ্ছে। এই উপেক্ষার মান ও স্তর যতখানি, এই ক্ষেত্রে আমাদের উপস্থিতির মাত্রা, মান, স্তরও সেই পর্যায়ে রয়েছে।

আমি বলছি না, 'আমাদের' সংস্কৃতিকেও পণ্যমানে উন্নীত করতে হবে। এটাও দাবি নয় যে, সংস্কৃতির নামে ধেই ধেই নাচতে হবে। রবং বক্তব্যটা হচ্ছে সংস্কৃতির ধরা ছোঁয়ার উপায়-উপকরণগুলো নিজেদের মত করে মানসম্মতভাবে উপস্থাপন করতে হবে। বিষও সংস্কৃতির নামে 'সুগার কোটেট' হয়ে বাজারজাত হচ্ছে তখন আমাদের যোগ্যতায়ও মুন্সিয়ানা বিকল্প কোথায়!

www.pathagar.com

ইসলাম সংস্কৃতিকে আলাদা করে বুঝতে চায় না। পুরো জীবনবোধের পরিচ্ছন্ন পরিশীলিত ও নান্দনিক প্রকাশটাই সংস্কৃতি। এর পরিধি পুঁজিতন্ত্রের মত খন্ডিত নয়। বস্তুবাদের মত বস্তুনির্ভরও নয়। যা নিষিদ্ধ নয় তাই সিদ্ধ। যা হারাম নয়, তাই হালাল। যা অবৈধ নয়, তাই বৈধ। কিন্তু কোন কিছুই নিরর্থক নয়, অপ্রয়োজনীয় কিংবা বাহুল্য হবার সুযোগ নেই। এর প্রকাশটা আরো বর্ণাঢ্য এবং সর্বপ্লাবী। যা কিছু পরিশীলিত, কল্যাণকর, দৃষ্টিনন্দন, সুখকর, মনোলোভা সেটাই সংস্কৃতি। সুন্দর দন্তের হাসি যেমন সংস্কৃতি, পরিতৃপ্ত মনের জিকিরও সংস্কৃতি।

মনোবিজ্ঞানীরা মনকে তিন স্তরে বুঝতে চান। যে মন সুকৃতির দিকে ঝুঁকতে চায়, আবার দুষ্কৃতির দিকেও ঝুঁকতে চায়, এই মন দ্বান্দ্বিক। যে মনের উপর ইচ্ছাশক্তির লাগাম নেই, সেই মন অসৎ। যে মন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রিত, সেই মন পরিশীলিত, উত্তম। মানসিক এই বিষয় বস্তুবাদ গুরুত্ব দেয় না। সমাজবাদ ভুল পথে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে চায়। আর ইসলাম এটার উপরই সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে। একইভাবে প্রকৃতির ধর্ম হিসেবে ইসলাম দৃষ্টিশক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর সংযমের বেষ্টনীর কথা বলে। মানুষের জৈবিক পন্থা নিরূপণ করে দেয়, চাহিদার বিষয়টিও এড়িয়ে যায় না, বিবেচনায় রাখে সংযম ও বৈধ প্রাকৃতিক পন্থা বাতলে দেয়।

জীবনবোধকে এত গভীর থেকে ঘনিষ্ঠভাবে বুঝতে না চাইলে সংস্কৃতি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা না করাই উত্তম। আবার মানুষকে মানবিক সত্ত্বায় না ভেবে ইসলাম এক কদমও এগুতে বলে না। জীবনকে অর্থবহ একটি লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবার জন্যই জীবনবিধান। জীবনবিধানের একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী, জীবনবিধান, জীবনবোধ একখাতে প্রবাহিত হতে সম্প্রসারিত জীবনাচার চাই। সম্প্রসারিত জীবনাচার মানেই পরিব্যাপ্ত পরিমন্ডল। এর প্রকাশটাই সংস্কৃতি।

এটি প্রকাশ পায় ভাষায়, সাহিত্য-বিনোদন প্রক্রিয়ায়, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, পরিচ্ছদসহ রুচির প্রকাশযোগ্য সকল বিভাগ। জন্ম থেকে এর শুরু। মৃত্যু পর্যন্ত এর নানামুখি বর্ণাঢ্য প্রকাশ।

লুঙ্গি-ধুতিতে সংস্কৃতি নেই। যেমনি সেই জল-পানিতে। কিন্তু কোন মানুষ যখন জল বলার মধ্যে, ধুতি পরার মধ্যে নিজস্ব স্বকীয়তা আবিষ্কার করে, তখন সেটিও সংস্কৃতি হয়ে যায়। সাবান দিয়ে ধুয়ে দিলেই কাপড় পরিষ্কার হয়, কিন্তু পাক হওয়ার শর্ত পূরণ হয় না। সেটির জন্য বাড়তি কাজ শুধু আল্লাহর নামে পুরো পানিতে একবার ভিজিয়ে পানি সরিয়ে দিতে হয়। পশুপাখির গোস্ত খায় সারা পৃথিবীর মানুষ; কিন্তু হালাল হওয়ার শর্ত শুধু আল্লাহর নামে জবাইয়ের মধ্যে। দু'টি প্রায়োগিক প্রসঙ্গ টানার অর্থ ধর্ম আর সংস্কৃতির ভেতর বিভাজন অসম্ভব, একথাটা বুঝতে চেষ্টা করা। একইভাবে ভালো কাজটি খারাপ পদ্ধতিতে হতে পারে না- এই নীতিবোধ সতত সর্বত্র তাড়িয়ে ফিরে বলে স্বাভাবিকতায় বিকৃতি, মিথ্যাচার সংস্কৃতির উপজীব্য হয় না। যেটি বস্তুবাদে হ'তে দোষ নেই।

জীবন ও জীবনবোধকে দেখার জন্য আমরা এখন মিডিয়া-নির্ভর, বিনোদন নির্ভর, জ্ঞান-প্রযুক্তি নির্ভর হতে চাই। নির্ভরতার এই ক্ষেত্রগুলোর ওপর যার নিয়ন্ত্রণ যতটুকু, তার সংস্কৃতির প্রকাশ ততবেশি মাত্রায় দৃশ্যমান। আর প্রভাব-বলয় ততটুকু প্রসারিত। মানবিক বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার ওপর এর প্রভাবই মুখ্য। যেমন ধরা যাক, প্রিন্টিং মিডিয়ায় চলতি মাসে দু'হাজার বই প্রকাশিত হয়েছে, দু'ডজন সংবাদপত্র-ম্যাগাজিন প্রকাশ পেয়েছে,

www.pathagar.com

ইলেকট্রনিক মিডিয়া-অডিও-ভিডিও বাজারে এসেছে পাঁচ হাজার। চ্যানেলগুলোর ওপর তাদেরই নিয়ন্ত্রণ থাকবে, যারা এই উপাদানগুলো প্রচুর পরিমাণে যোগান দিতে সক্ষম এবং কথিত মান সংরক্ষণে পারঙ্গম।

অসমযুদ্ধে কাউকে জিতিয়ে দেয়া প্রকৃতির ধর্ম নয়। আল্লাহরও নয়। তাহলে ভেবে দেখার গরজ আছে আমাদের অবস্থা-অবস্থান কোথায় কতটুকু। এটাই প্রভাববলয় বুঝবার-মাপবার মাপকাঠি। এই মাপকাঠি কি বলে দেয় না আমরা অস্তিত্বের সংগ্রামও করছি না! আর একটি জরুরী কথা বলে রাখা ভালো, সামরিক আগ্রাসন প্রতিরোধ-প্রতিহত করা যায়। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধ করা যায় না। বিকল্প ধারা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিহত করা যায়। রোগ-বালাই যেমন শরীর নিজস্বভাবে প্রতিরোধ করে তেমনি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধটাও ভেতর থেকে আত্মশক্তি বলে করতে হয়। সে শক্তি এবং ভিত্তি না থাকলে কোন জাতির সংস্কৃতির পলি জমাট বাঁধে না, সেই শূন্যতা পূরণ করা হয় ধারে কিংবা আমদানিতে, যার অপর নামও আগ্রাসন।

এই আগ্রাসন আমাদেরকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে ফেরে, কিন্তু আমরা যুদ্ধ করার দায়বোধও করছি না। অথচ ভাবখানা এমন 'বিপ্লব' আমাদের মায়েদের আঁচলের গিটে কিংবা বাবার আস্তিনের পকেটে। আর সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে সব পরগাছা, আরোপিত, আগ্রাসী, পকেট থেকে বিপ্লব হাতে নিয়ে একটা দম নিয়ে ফুঁ দিলেই ফুৎকারে বৈরি সব উড়ে যাবে। গণমানুষ বলে ওঠবে তথাস্তু।

আমরা বুঝি না আমাদের আত্মস্থ করার ক্ষমতা কত কম। ধারণক্ষমতা কত ক্ষুদ্র। তার চেয়েও ক্ষুদ্র আমাদের মানসিকবোধ এবং প্রস্তুতি। আত্মস্থ করার ক্ষমতা আর ধারণশক্তি দিয়ে একটি জাতি বিকশিত হয়। সেটাও আমাদের জানার বাইরে থেকে যাচ্ছে ।

ইসলামী সংস্কৃতির প্রাণ স্পর্শ করতে হলে বুঝতে হবে আল্লাহ-রাসূল (সা:) পরিশীলিত আরবীয় লোকজ সংস্কৃতিই ইসলাম। দজলা-ফোরাত অতিক্রম করে সেটি আল্লাহ-রাসূল (সা:) পরিশীলিত পারস্য সংস্কৃতিতে অবগাহন করেছে। সেটাই ছিল অগ্রগতি। কোন মতেই বিকৃতি নয়, নন্দিত তো বটেই।

আদর্শ প্রযুক্তি নয়। প্রযুক্তি লাগসই হতে হয়। আদর্শ ঠাঁই নেয়, প্রভাব ছড়িয়ে দেয়। সবকিছুর ওপর আদর্শের প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। পরিচ্ছন্ন-পরিশুদ্ধ করে আপনাতে লীন করে নেয়। আত্মস্থ করার দুর্বার ক্ষমতা, ধারণ যোগ্যতা, যা শুধু ইসলামেরই আছে। গাঙ্গেয় বদ্বীপে আমরা প্রভাবিত হয়েছি। প্রভাবিত করতে পেরেছি কম। তিক্ত সত্যভাষণ হচ্ছে উম্মাহপ্রীতি আমাদের নিজস্ব জাতিসত্তাকে অংশত ম্লান করেছে। অথচ উম্মাহপ্রীতি আমাদের জাতিসত্তাকে শাণিত করার কথা ছিলো। আজ আমরা বুঝতে শুরু করেছি, নিজস্ব ভাষা লোকজ ঐতিহ্য ছুঁড়ে ফেলার নয়- আদর্শের মোড়কে ঢেকে ফেলার। এই সত্য বুঝতে আমাদের সময় নিয়েছে প্রায় একশো বছর। সৌরবর্ষের এই সময়টুকু আমরা পিছিয়ে আছি। এই সত্য মেনে প্রতিযোগিতার দৌড়ে দ্রুতগামী হতে পারলেই আমরা এগুবো, নয়তো আমাদের পেছনে পড়ার ভাগ্য বিপর্যয় কেউ ঠেকাতে পারবে না। ইতোমধ্যে এই কথাটুকু তো আমরা বুঝেছি-সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রাজনৈতিক-ভৌগোলিক আগ্রাসনের চেয়েও মারাত্মক এবং সুদূরপ্রসারী।

জাতীয় জীবনে আমাদের সাফল্যের উপমা প্রচুর। আবার ব্যর্থতার অচিহ্নিত ক্ষেত্রও বেশুমার। নিজস্ব সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায়, আমরা তার কোন অবয়ব তুলে ধরতে

www.pathagar.com

পারিনি। এতটুকু ব্যর্থতার গ্লানি বহন করার মধ্যে কোন বড় সমস্যা ছিল না। সমস্যাটা আমরা নিজের টুকু প্রকাশযোগ্য করতে পারিনি। এ বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপও অনুল্লেখযোগ্য, কিন্তু এটা আমার নয়, ওটা আরোপিত, সেটা আর্যদের, ওটি পাশ্চাত্য আগ্রাসন এমন নেতিবাচক বক্তব্যটা জোরালো-ঝাঁঝালো এবং প্রতিবাদী কণ্ঠে বলার চেষ্টা করেছি অধিক মাত্রায়।

ব্যক্তি ব্যষ্টিত রূপান্তরিত হলে সামাজিকায়ন শুরু হয়। সামাজিক রূপটিই রাষ্ট্রযন্ত্রের নানা মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর সবটুকু সামাজিকতা নির্ভর করে না। গ্রহণ-বর্জন, প্রভাব বিস্তার এবং ছাড় দেয়ার একটা আবহ-আবর্তের মাধ্যমে সামাজিক কিছু দাঁড়ায়। সেটা অন্যান্য ক্ষেত্রের ব্যাপারে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। মানুষেরই সংস্কৃতি থাকে, অন্য প্রাণীর নয়। দু'জন মানুষ সাধারণত সমান আচরণ করে না। দু'হাজারের আচরণ, দু'কোটির আচরণের সমান হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এ কারণেই যেখানে সামাজিক কথাটা আসে, সেখানে গ্রহণ-বর্জনের মাপকাঠি যেমন বড় হয়ে যায়, ধৈর্যের পরিধিও বাড়াতে হয়। ব্যক্তি-ইচ্ছা, গোষ্ঠি-চিন্তা সম্প্রদায়গত ভাবনা অংশত গৌণ হয়ে যায়। এখানে এসে সার্বজনীন হতে হলে মিশ্র কিছু একটা দাঁড়ায়। গরিষ্ঠ মানুষের সুবিধা এতটুকু যে, তারা গরিষ্ঠতার জোরে প্রাধান্য পায়। প্রাধান্য তাদের ইচ্ছার প্রকাশকে সহজ করে দেয়। গরিষ্ঠ মানুষ ইচ্ছা করলেই যাচ্ছেতাই করতে পারে না। এই কারণেই প্রথম বন্ধু না খুঁজে শত্রুতা কমাতে হয়। ক্ষতিকর কমিয়ে নির্দোষকে আস্কারা দিতে হয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই জন্য যা অবৈধ নয়, তাই বৈধ। যা হারাম নয়, তাই হালাল। এখন একটি বড় মাপের বেষ্টনী বা বাগডোর থাকাটা জরুরী।

প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করেছি, আমরা উম্মাপ্রীতি প্রদর্শন করতে গিয়ে লোকজ ও নৃতাত্ত্বিক ভাবনাকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছি। এটা কেউ স্বজ্ঞানে করিনি। বাংলার মর্যাদা বুঝতে সময় নিয়েছে এই কারণেই। পরিশীলিত লোকজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আদর্শ ও বিশ্বাস ততক্ষণ উদারচিত্তে গ্রহণ করে, যতক্ষণ তা বিশ্বাসকে ভেঙ্গে না দিচ্ছে। আদর্শের প্রাণকে হরণ করতে উদ্ধত না হচ্ছে। নবান্ন-নতুন তোলা ফসলের প্রথম গ্রাস-এই আনুষ্ঠানিকতায় 'দোষ' কোথায়! ফসল কাটার গান অন্যায় হতে যাবে কেন? বিয়েতে উৎসব কি অন্যায়! মেহেদী দিলে কি জাত যায়! গ্রামে মেলা বসিয়ে উৎসব করলে ক্ষতি কি? কবির গানে ঈমান নষ্ট হবে কেন?

পুঁথির আসরে নষ্টামির সুযোগ কই? পয়লা বৈশাখ আর হালখাতা আমার হতে দোষ কি? দোষটা হচ্ছে আগাছা-পরগাছার, আমার-আপনার। আমি-আপনি মাঠে নেই, মাঠে যে আছে তাকে তিরস্কার করে লাভ কি? আপনি আপনার মত উপস্থাপন করুন। আপনার মত করে স্রোতকে বেগবান করুন। প্রকৃত কৃষকের ক্ষেতে আগাছা থাকে না। সংস্কৃতিবান লোকের প্রাবল্যের কাছে অপসংস্কৃতি ও সংস্কৃতিহীনতা টিকে না।

সংস্কৃতি হচ্ছে সর্বোচ্চ পরিশীলিত রুচিবোধের প্রকাশ। পরিচ্ছন্ন পোশাকের কাছে অপরিস্কার পোশাকধারী সংস্কৃতিবান শেখ সা'দীকে ভালো মানায়নি। আবার সুন্দর রুচি পরিপাটি পোশাক নেহেরুকেও আকর্ষণ করেছে। কেতাদুরস্ত বাবুর পোষাক এক সময় খোশমেজাজী মানুষের দরবারী-মজলিশী পোশাক ছিলো। এখানে আমার দায়িত্ব সতর ঢাকা আছে কি নেই তা দেখা। পরিচ্ছন্ন বটে পাক কিনা তা ভাবা। কারণ পাক-পবিত্র জিনিস পরিচ্ছন্ন হতে বাধ্য, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলেই পাক-পবিত্র হয় না।

www.pathagar.com

এই কারণেই আল্লাহ-রাসূল (সা:) ও পরিশীলিত আরবী কালচার ইসলামী হতে অসুবিধা হয়নি। আল্লাহ-রাসূল (সা:) পরিশীলিত পারস্য সংস্কৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে ইসলামকে প্রতিনিধিত্ব করতে কোন সমস্যাই তৈরী করেনি।

গাঙ্গেয় বদ্বীপ এই বাংলায় যদি আত্মস্থকরণের এই ধারা বলবৎ থাকতো, গরিষ্ঠতা আমাদেরকে আরবী ফারসী কিংবা আরব-পারস্যের কাছাকাছি পৌঁছিয়ে দিতো। আরবীয়-পারস্য সংস্কৃতির সবটুকু জাহেলিয়াত, এটা কেউ মানতে চাইবেন না। কিন্তু আরবী-ফারসীতে গালিকেও আমরা দোয়া ভাবি-এটা তাদের ঔদার্যের, আত্মস্থকরণের ফসল, আর আমাদের সীমাবদ্ধতা ও গ্রহণ ক্ষমতার দোষ।

বিষয়টাকে এতটা খোলা-মেলা আলোচনায় টানার অর্থ নিজেদের দেউলেপনার প্রকাশটাকে উৎকটভাবে তুলে ধরা নয়। একটি মহল সংস্কৃতিকে টেনে নিয়ে গান-বাজনায় প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে, আর একটি মহল কিছু ধর্মীয় আচার আর আরবী-ফারসী উর্দু ভাষায় শব্দবন্দী করে নিয়েছে।

নৈতিকতা শিকায় তুলে সুন্দরী প্রতিযোগিতার পণ্যমান যারা বুঝবেন না, তারাই শুধু এর ভেতর নষ্ট সভ্যতা আবিষ্কার করবেন, মার্কিন ডলারে খচিত গড ট্রাস্ট ধর্মীয় কোন বিষয় নয়, রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ, এর পণ্যমান আছে। পণ্যমানে বিশ্বাস কেনার তাড়না এটা সংযোজিত হয়েছে। বাইবেল ছুঁয়ে শপথেও রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিপুষ্ট।

সংস্কৃতি যদি সামগ্রিক ব্যাপার হয়, তাহলে ধর্মের নামে হোক অধর্মের নামে হোক, ধর্মনিরপেক্ষতার নামেই হোক খন্ডিত কিংবা অপভ্রংশ হতে যাবে কেন। আরো কিছু জিনিস আমরা গোড়ায় ভুল করি। নারীর রূপচর্চায় আগ্রহ-অনাগ্রহের কোন কারণ নেই? সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নারীর পণ্যমান নিরূপনের বেসাতি নিয়েও আমার কথা নয়, আমার কথা আরো গোড়ায়। নারী হিজাবের মাপকাঠি অতিক্রম না করুক। হিজাবের আওতায় নারীসত্ত্বা পূর্ণমানে বিকশিত হোক এটাই যদি আমার প্রত্যাশা হয়, তাহলে আমার বক্তব্যের সারবত্তা থাকে, নারীকে আমি কোথাও সত্ত্বামানে স্বীকৃতি দেবো না। শুধু পণ্যমান ঠেকাতে গেলে সামগ্রিকতা থাকে না, বরং এই ধারণাটাই প্রাধান্য পায় কোথাও আমি নারীর বিকাশ-উপস্থিতি প্রাধান্য চাই না। আমাদের উপলব্দির সীমাবদ্ধতার আঘাতটা আসে আদর্শকে স্পর্শ করে আমাদের কূপমন্ডুকতার ওপর। বিষয়টা বিবেচিত হয় প্রতিক্রিয়াশীলতার মাপকাঠি দিয়ে। সকল অর্থে প্রতিক্রিয়া খারাপ নয়। কিন্তু প্রত্যেকটি ক্রিয়ার বিপরীতে যারা শুধু প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে, তারা সব সময় রক্ষণভাগে খেলতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। আসলে জেতার জন্য চাই আক্রমণভাগের খেলা। এখন বিবেচনা করতে হবে আমরা আর কতদিন রক্ষণভাগে খেলবো। ক্রিয়া না করে শুধু প্রতিক্রিয়া প্রদর্শণ করবো।

গরিষ্ঠ মানুষের সংস্কৃতির প্রকাশটা ঘটে রাষ্ট্রীয় কর্মধারায়, সরকারী আচরণে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইবেল স্পর্শ করে শপথ নেন। ডলারে গড ট্রাস্ট এর কথা আছে, বড়দিনে রাষ্ট্রীয় আচার, ক্যাথলিক হোক প্রোটেস্টেন্ট হোক তিনি কপালে বুকে ত্রিত্ত্ববাদের ত্রিভুজ এঁকে কাজ শুরু করে স্বস্তি পান। খৃস্টবাদের একটি বাড়তি সুবিধা হচ্ছে তাতে কোন শরীয়ত নেই, বাইবেলের হিতোপদেশই যথেষ্ট। আর ইহুদীদের সুবিধা তারা তাদের শরীয়ত দিয়ে খৃস্টবাদকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারছে। যেমন আমাদের বৌদ্ধদের কার্যত কোন শরীয়ত নেই। তারা ব্যতিক্রম ছাড়া হিন্দু সংস্কৃতিতে অবগাহন করে তুষ্ট, আর হিন্দুরাও তাদের ওপর প্রভাব রেখে খুশী।

www.pathagar.com

ইসলাম এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পৃথক। এর প্রাণশক্তি এতবেশি যে, খণ্ডিত প্রকাশও তুল্যবিবেচনায় সর্বপ্লাবী। এর আরো ব্যতিক্রমী রূপ হচ্ছে এর মাঝে প্রকৃতির সাযুজ্য শতভাগ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির মেলবন্ধন সব সময় নির্ভরশীল ও সম্পূরক।

আদর্শের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট থাকে। এটি বাহন চায়, প্রচার কামনা করে, প্রতিষ্ঠার ভেতরই এই সার্থকতা খোঁজে। যদি বাহন হিসেবে আমরা মুসলমানকে বিবেচনা করি, তাহলে এর মান বিবেচনায় আনুন। আল্লাহ সাধারণত প্রাকৃতিক নিয়ম এর ব্যত্যয় ঘটান না। যা ঘটান সেটা কুদরত। সেটা স্বাভাবিক নয়, অস্বাভাবিক এবং অতিপ্রাকৃতিক। স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে মৌলিক মানবীয় গুণাবলীসম্পন্ন মানুষগুলোর ইসলামী নৈতিকতা থাকুক কিংবা নাই থাকুক, নেতৃত্ব দেবে তারা। ইসলামী নৈতিকতা আখেরাতের সাফল্যের নিশ্চয়তা দেয়া, খেলাফত প্রাপ্তির পূর্বশর্ত বিচেচনা করে না। তাহলে রেডিও-টিভি গানের ভুবন সংস্কৃতির পূর্ণ জগতে ভুল প্রতিনিধিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু গুণগত অবস্থানে কারা অগ্রসর কারা অগ্রসর নয় সেটার ওপর নির্ভর করে আমাদের অবস্থান, উপস্থিতি। কারণ, এর প্রকাশটা ঘটবে আমাদের তৎপরতার সূত্র ধরে, আকাশ থেকে ধপাস করে পড়ে নয়। হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে ওঠেও নয়। এই সব ক্ষেত্রে যারা প্রায়োগিক কিছু ভাবেন আবেগের সাগর মন্থন করে কিছু পাবেন না। যা কিছু প্রয়োজন, তা বাস্তবের মাঠে নেমে আবাদ করে ফসল ফলিয়ে গোলায় তুলতে হবে। অন্যের গোলায় হাজার মন ধানের কথায় আমার চুলা জ্বলবে না, পাতিলও গরম হবে না।

সবশেষে বলবো, সমৃদ্ধি আসে আত্মস্থ করার পথ ধরে। বাংলা ভাষা সংস্কৃতির কন্যা-এটা বহু আগে ভূয়া প্রমাণ করেছেন পণ্ডিতরা। সংস্কৃতির সাথে এর কোন রক্ত সম্পর্কতো নে-ই বাংলার কাছে এর জাত-পাতও তুচ্ছ।

বঙ্গাল-বাঙ্গালা মুসলিম ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার বাস্তবতা। সেই সুত্রে বাংলাইতো পূর্ববাংলা। পূর্ব পাকিস্তান, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। নৃতাত্ত্বিকভাবে আমার বাঙ্গালীপনা, আমার মুসলমানিত্বকে বিভাজন করার সাধ্য নেই। সেটাকে আমরা আরো নিশ্চিত কিরেছি জাতি-রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অবয়ব দিয়ে। বেরুবাড়ি ছাড়া অবশিষ্ট মানচিত্রে বঙ্গোপসাগরের উজাড়করা দ্বীপ -এইতো আমাদের পূর্বাপর পরিচয়, ভূমিপত্র হবার প্রমাণ।

আমার মাতৃভাষা প্রায় পাঁচ হাজার বিদেশী শব্দ সমৃদ্ধ। এর প্রায় বাইশ'শ এসেছে পারস্য থেকে। আরবী থেকে আমরা হজম করেছি প্রায় দেড় হাজার শব্দ। অবশিষ্ট বিদেশী শব্দের বাংলা রূপ উল্লেখযোগ্য। এটাই এই মাটির বৈশিষ্ট। ভাষায় আমরা যেটুকু উদার হতে পেরেছি, সংস্কৃতির দরজা তত প্রশস্ত করে দিতে পারলে আমাদের দায়িত্ব হবে শুধু বৈধ-অবৈধতার বাগডোরটা শক্ত হাতে ধরে রাখা। কারণ, বাংলায় লীন হয়ে অন্যরা কৃতার্থ, আমরা সমৃদ্ধ। সমৃদ্ধিকে দু'হাতে বরণ করতে হলে নেতৃত্বের নিশ্চয়তা চাই। নেতৃত্বের দায়িত্ব হচ্ছে আমার আঙ্গিনায় প্রবিষ্ট সংস্কৃতির রূপ-সৌকর্যের ভেতর পরিশীলিত রূপটা খুঁজে বের করা। এর জন্য একটা মানদন্ড চাই, যা দিয়ে তস্কর চিহ্নিত করা যাবে। আবার প্রকৃত মেহমানকে অভ্যর্থনা জানাবার প্রশস্ত রাস্তা তৈরী করাও সম্ভব হবে। এই কাজটা দরজা বন্ধ করে তস্কর ঠেকানো নয়, আবার সেন্সরের কাঁচিও নয়, এর নাম সৃষ্টিশীলতা। #

www.pathagar.com

সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতি

মতিউর রহমান মল্লিক

'সংস্কৃতি' শব্দটির অর্থ-শিক্ষা বা চর্চা দ্বারা লব্ধ বিদ্যা-বুদ্ধি, শিল্পকলা-রুচি নীতি, উৎকর্ষ, কৃষ্টি, Culture, তমদ্দুন, মার্জনা, পরিশীলন, অনুশীলন, সভ্যতা, ভদ্রতা, শিষ্টতা, সংস্কার, শুদ্ধি, শোধন, পরিষ্কার বা নির্মল করা অথবা সংশোধন। মানব সমাজের মানসিক বিকাশের প্রমাণ, একটি জাতির মানসিক বিকাশের অবস্থা, কোন জাতির বৈশিষ্ট্যসূচক শিল্প-সাহিত্য, বিশ্বাস-সমাজনীতি ইত্যাদি।

"Culture is that what we are".-HG Lasky অর্থাৎ সংস্কার করে যা পাওয়া যায় তা-ই সংস্কৃতি।

পাশ্চাত্যে একবার সংস্কৃতি সম্পর্কিত একটি বক্তব্য দারুণ রকমের বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলো। ঐ বক্তব্য সম্পর্কে *A Dictionary of Literary terms by J. A. Coddon* বলেছেন ঃ

In 1959 C. P. Snow delivered a lecture in Cambridge which tells that the linkage between humanity and technology is a kind of culture. Here humanity means Arts, and technology means science. This lecture caused a great deal of controversy.

১৯৫৯ সালে অধ্যাপক C. P. Snow ক্যামব্রিজে প্রদত্ত এক

www.pathagar.com

লেকচারে বলেছিলেন ঃ মানবতাবাদ এবং প্রযুক্তিবাদ এই দুয়ের মধ্যবর্তী যোগসূত্রই হচ্ছে কালচার বা সংস্কৃতি।

এখানে মানবতাবাদ অর্থ সংস্কৃতি এবং প্রযুক্তিবাদ অর্থ বিজ্ঞান। পরবর্তীতে তাঁর ঐ বক্তব্য ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করেছিলো।

A.S. Hornby - এর *Oxford Advanced learners English Dictionary* সংস্কৃতি সম্পর্কে একাধিক তথ্য পরিবেশন করেছেন :

ক. Refined understanding and apperciation of arts, Literature etc. সাহিত্য, কলা ইত্যাদির পরিশোধিত অনুধাবন এবং চিন্তাধারাই হলো কালচার বা সংস্কৃতি।

খ. State of intellectual development of a society. কোন সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির নামই সংস্কৃতি।

গ. Particular form of intellectual expression specially in art and literature. বিশেষত সাহিত্য এবং কলার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকাশই হচ্ছে সংস্কৃতি।

ঘ. Customs, Arts, Social institution etc. of a particular group of poeple ... কোন একটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সামাজিক প্রথা, আচার-ব্যবহার, সাহিত্যকলা ইত্যাদিই হলো ঐ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ কানাডীয় ইউনেস্কো কমিশন Canadian National Commisson for UNESCO সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য বিশেষজ্ঞদের একটি সভা আহ্বান করে। দীর্ঘ আলোচনা ও মত-বিনিময়ের পর উক্ত বিশেষজ্ঞরা যে সংজ্ঞা স্থির করে তাকে তাঁরাই working difiniton বলে উল্লেখ করেন। তাঁদের মতে এই সংজ্ঞাটির গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হবে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের পরে, কেননা সংজ্ঞাটি পরীক্ষামূলক ও সংশোধনমূলক ও সংশোধন সাপেক্ষ। স্থিরকৃত সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ :

Culture is a dynamic value system of learned elements, with assumptions, conventions, beliefs and rules permitting members of a group to relate to each other and to the world to communicate and to develop their creative potential.

সমাজবিজ্ঞানী ও নন্দনতাত্ত্বিকেরা সংস্কৃতিকে পর্যবেক্ষণ করেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কারো মতে সংস্কৃতি হলো অতীতের ঐতিহ্য ও আগামীর স্বপ্নের প্রেক্ষিতে নির্মিত মানুষের ভাবধারা, নান্দনিক রূপ ও মূল্যবোধের সমন্বিত প্রকাশ। আবার অভিধানে সংস্কৃতির সংজ্ঞার্থ সন্ধান করলে হয়তো এই রকমের একটি বাক্য পাওয়া যাবে : Cultivation, improvement of refinement by education and training. The trainign and refinement of mind, tastes and manners, the condition of being thus trained and refined. The intellectual side of civilization.

সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য সত্ত্বেও আধুনিক জ্ঞান চর্চার ধারায় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করা হয়েছে মানুষের সৃজনশীলতার সমুদয় ফসল-রূপে, মানুষ যা এই পৃথিবীতে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করেছে। এ সমস্ত কৃতি ও সৃষ্টি প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষকে পশু থেকে পৃথক করেছে এবং পরে মানুষের জীবনযাপনকে করেছে উন্নততর। বলা যায়, মানুষের জীবনযাত্রার সকল উপাদান এবং সমুদয় উপলব্ধি নিয়েই মানব-সংস্কৃতি।

www.pathagar.com

ড. কাজী দীন মুহম্মদ তাঁর *ইসলামী সংস্কৃতির রূপ* প্রবন্ধে বলেছেন : 'কালচার' কি? উৎকর্ষ বা অনুশীলন। আজকাল সাধারণত একটা বিশেষ অর্থে এর ব্যবহার করা হচ্ছে যা অর্থ হচ্ছে মানব-মনের উৎকর্ষসাধন-পদ্ধতি বা রূপায়ন।

অনেকে Refinement অর্থেও কথাটার ব্যবহার করে থাকেন। আবার কারো কারো মতে মানবকল্যাণমুখীতারই নাম 'কালচার'। কেউ কেউ আবার Civilization এর কোন তফাৎ খুঁজে পান না। এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে- *অক্সফোর্ড ডিকশনারী* বলে : Trained and refined state of understanding and menners and tastes, phase of these prevalent at a time or place, instilling of it by training, artificial rearing of bees, fish bacteria etc. অর্থাৎ সংস্কৃতি হল বোধ, আচরণ ও আস্বাদনের প্রশিক্ষিত রূপ। একই সময় ও স্থানের প্রেক্ষিতে যে সবের ক্রমোন্নয়ন, বলা যেতে পারে, মৌমাছি, মাছ, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি প্রজননের ধরনে ধীরে ধীরে যেসব পরিশীলিত রূপের চর্চা। সংস্কৃতির একটি চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন বসনিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট আলীয়া আলী ইজেতবেগভিচ, সংস্কৃতি হলো অনবরত নিজেকে সৃষ্টি করা।

আমাদের সংস্কৃতি প্রবন্ধে আবদুল মান্নান তালিব বলেছেন : 'তাহযীব ও তমদ্দুন দুটো আরবী শব্দ। তমুদ্দুন শব্দটা এসেছে 'মুদন' থেকে। তা থেকে 'মাদানিয়াত' অর্থাৎ নাগরিক বোধ। অন্য কথায় নগর জীবন ভিত্তিতে যে পরিশিলিত সভ্যতা গড়ে ওঠে তাকে তমুদ্দুন বলা যায়। তাই তমুদ্দুন সভ্যতার প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে 'তাহযীব' শব্দটা এসেছে 'হযব' থেকে। হাযাবা, হাযযবা, তাহযীব মানে কেটে সমান করা। যেমন বাগানের চারদিকে যে গাছের বেড়া দেয়া হয় মালি কাঁচি দিয়ে কেটে তার মাথাগুলো তাহযীব করে। অর্থাৎ ও দু'পাশ কাঁচি দিয়ে কেটে সমান করে। কোনো একটা ডাল বা পাতা সমান করে কাটা-সীমানা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইলে মালির কাঁচি সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা কেটে সমান করে দেন। এভাবে পরিশীলিত পরিমার্জিত করাকে তাহযীব বলে। তাই তাহযীব অর্থ দাঁড়ায় মানুষের পরিশীলিত জীবনধারা।'

অবশ্যি 'কালচার'-এর ধারণা বিস্তার লাভ করার পরই আমাদের দেশে তাহযীব-তমুদ্দুন এবং পরবর্তী কালে সংস্কৃতি শব্দটার প্রচলন শুরু হয়।

কালচার সম্পর্কে মজার কথা বলেছেন, আবুল মনসুর আহমদ তাঁর *বাংলাদেশের কালচার* গ্রন্থের *কালচার কি?* নামের প্রবন্ধে : 'কালচারের সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। এত কঠিন যে উনিশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পুরো এক'শ বছরের দীর্ঘ কালপ্রবাহে ইউরোপ, আমেরিকার দুইজন পণ্ডিতও এ ব্যাপারে একমত হইতে পারেন নাই। তাহার উপর অনেকেই আবার কালচার ও সিভিলিযেশনকে একই অর্থে ব্যবহার করিয়া বিষয়টাকে আরও জটিল ও সমস্যাটাকে আরও জোরালো করিয়া ফেলিয়াছেন। ফলে অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে কালচারকে ডিজাইন করার আর কোনও উপায় নাই। বিশেষণ দ্বারাই উহাকে বুঝিতে হইবে। ইংরাজি সাহিত্য কালচার শব্দ প্রথম আমাদানি করেন ফ্রান্সিস বেকন ষোল শতকের শেষ দিকে। উহাকে ডিফাইন করার চেষ্টা করেন সর্বপ্রথম ম্যাথু আর্নল্ড এবং ওয়াল্ট ইমার্সন আমেরিকায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি। কিন্তু কালচার শব্দের যে অর্থে তাঁহারা উহার সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন শব্দটা বেশি দিন সে অর্থে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। বিশ শতকের মাঝামাঝি রবার্ট এযরা পার্ক ও টেইলার

www.pathagar.com

প্রভৃতি মার্কিন পণ্ডিত এবং টার্নার ও লাস্কি প্রভৃতি ইংরাজি পণ্ডিতগণের লেখায় কালচার শব্দটা অনেক ব্যাপক গভীর অর্থে ব্যবহার শুরু করে। এর ফলে শব্দটা নতুন তাৎপর্য গ্রহণ করে। কিন্তু তাহাতে সমস্যা মেটে না। বরঞ্চ শব্দটা ব্যাপকতর ও গভীরতর মনে গ্রহণ করার ফলে সমস্যার জটিলতা ব্যাপক ও গভীর হইয়াছে।'

সেই জটিলতা কতটা ভয়াবহ ও মানবতাবিরোধী হয়েছিল তার একটি চিত্র এঁকেছেন মার্যেডিউক পিকথল। পরের একটি উপ-অধ্যায়ে যে বিষয়কে তুলে ধরতে চাই। সংস্কৃতির বোঝবার জন্যে সভ্যতাকে অনুধাবন করার একটি তাৎপর্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।

আবুল মনসুর আহমদ এই ব্যাপারে চমৎকার উদাহরণ পেশ করেছেন : 'মাছ-গোস্ত তরকারী রাঁধিয়া খাইবে না কাঁচা খাইবে এটা হইবে সভ্যতার প্রশ্ন। কিন্তু কি প্রণালীতে রান্না করিবে, কোনটা খাইবে, আর কোনটা খাইবে না, কোনটা হালাল, কোনটা হারাম, কি ধরনের পাক-প্রণালী পছন্দের, পেষ্ট্রি-প্যাটিস ভাল না রসগোল্লা সন্দেশ ভাল, এসব কালচারের প্রশ্ন। খেলাধূলাকে মানুষের কর্মজীবনের স্বাভাবিক অংগ স্বীকার করা সভ্যতা। কিন্তু খেলার বিভিন্ন রূপ ফুটবল না রাগবি, ক্রিকেট না বেসবল, পলো না ঘোড়দৌড়, হকি না ডাংগুলি, এসব সভ্যতার প্রশ্ন নয়, কালচারের প্রশ্ন মাত্র।'

প্রাজ্ঞ-পন্ডিত আবুল হাশিম তাঁর 'ইসলামী সংস্কৃতির অর্থ' প্রবন্ধে সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতির বাহন প্রসঙ্গে বলেন ঃ সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, কারুকার্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পকলা-ই সংস্কৃতি। ইহা সত্য নহে। অর্থাৎ শিল্পকলা-ই-সংস্কৃতি নহে-ইহারা সংস্কৃতির বাহন। তবে সংস্কৃতি কাহাকে বলে? মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধন এবং তাহার ব্যবহারিক জীবন ও প্রত্যক্ষ জড়-পরিবেশে সেগুলির ফলিত রূপই হইতেছে সংস্কৃতি।

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অনেকেই সংস্কৃতিকে একটি Complex, জটিল এবং মনোবিকৃতির বিষয় বলে মনে করেন। E.B. Tailor তাদের একজন। তিনি তার *Primitive culture* গ্রন্থে লিখেছেন : আমরা যেমন তেমনি করে যা আমাদের গড়ে তুলেছি তাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি আমাদের বর্তমান ও অতীতের মাঝে যোগসূত্রের রূপরেখা। এটি একটি জনসমষ্টির স্বকীয় পরিচয় দেয় এবং একই সঙ্গে অবশিষ্ট বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে।

Culture is that complex-whole which includs knowledge, art, moral law custom and any other capabilities and habits aquired by man as a member of society. অর্থাৎ সমাজের সদস্যরূপে অর্জিত আচার, আচরণ, ব্যবহার, জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতি, প্রথা, আইন ইত্যাদির জটিল সমাবেশই হলো সংস্কৃতি।

কোন একটা জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সামাজিক প্রথা, আচার-ব্যবহার, সাহিত্য-কলা ইত্যাদিই হলো ঐ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি। সত্যি কথা বলতে কি, সংস্কৃতি সম্পর্কে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ঐ মারাত্মক অনৈক্য, পশ্চিমা সমাজকে এমন মানবতাবিধ্বংসী মানবগোষ্ঠীতে পরিণত করেছে। পাশ্চাত্য জগৎ সার্বিকভাবে গ্রহণ করেছিল এরিষ্টটলের সামাজিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া-বিচ্ছিন্ন দর্শনকে। যদিও প্লেটোর দর্শন ছিল সমাজ সম্পৃক্ত। তিনি বিশ্বকে দেখেছিলেন শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে, যে শিক্ষার আবার রাষ্ট্রব্যবস্থার শক্তি ও স্থায়িত্বে জন্যে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ প্লেটোর লক্ষ্য ব্যবহারিক। কিন্তু এরিষ্টটল শিল্পকে স্বাধীন ও

www.pathagar.com

সামাজিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন। শিল্পের মৌলিক বিষয়ে এরিষ্টটলের উক্তি : 'হে তেখনে মিমেইতাই তেন ফসিনু' অর্থাৎ শিল্প স্বভাবের অনুসরণ করে। স্বভাব যা করতে ইচ্ছে করবে শিল্পও তাই করবে।

কিন্তু প্লেটো তা চাইতে পারেননি বলে ট্রাজেডির রচয়িতাদের ধিক্কার দিয়েছেন : "The tragic poet is an imitator and therefore, like all other imitators, he is thrice removed from the throne of truth." অর্থাৎ ট্রাজিক কবি হলেন নকলবাজ, সুতরাং সকল নকলবাজের মতই তিনি সত্যের সিংহাসন থেকে তিনগুণ অপসারিত হলেন।

এরিষ্টটলের শিল্পের যা ইচ্ছে তাই করবার দর্শন যে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তা আজ গোটা দুনিয়ায় সচেতন মানুষ টের পাচ্ছে। সুতরাং এরিস্টটলের শিল্প-দর্শনকে স্বাধীন-শিল্প দর্শন না বলে বলা উচিত লাগামহীন শিল্প-দর্শন।

লাগামহীন শিল্প দর্শন

লাগামহীন শিল্প-দর্শনের নমুনা পেশ করেছেন মার্মেডিউক পিকথল তাঁর *ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা* নামে প্রকাশিত একটি বক্তৃতায় : 'কয়েক বছর আগে ইংল্যান্ডের সংবাদপত্র-মহলের একটি আলোচনার কথা আপনাদের কারো নিশ্চয়ই স্মরণ আছে। প্রশ্নটি ছিল এই : মনে করুন একটি কক্ষে একটি জীবন্ত শিশুর সঙ্গে একটি সুবিখ্যাত ও অনুপম সুন্দর গ্রীক ভাস্কর্য মূর্তি রয়েছে, সমপর্যায়ের মূর্তির মধ্যে এ মূর্তিটি অসাধারণ ও অতুলনীয়, সুতরাং এর স্থান পূরণ অসম্ভব। এখন ধরুন, কক্ষটিতে আগুন লেগেছে, আর মূর্তি ও শিশুটির মধ্যে কেবল একটিকেই বাঁচান সম্ভব। এ অবস্থায় কাকে বাঁচাতে হবে?

আমার মনে আছে, প্রায় অধিকাংশ সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও পদস্থ ব্যক্তি হতভাগ্য শিশুটির সামনে মৃত্যুর দ্বারা উন্মুক্ত করে সেই অনুপম গ্রীক ভাস্কর্য মূর্তিটি রক্ষার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, প্রতিদিন লাখ লাখ শিশুর জন্ম হয়, পক্ষান্তরে প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য শিল্পের সেই শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনটির স্থান পূরণ কখনো সম্ভব হবে না।'

কোন মুসলমান কখনো এই অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি গ্রহণ করতে পারে না। কিংবা এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিপোষক হতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে প্রতীকবাদিতা তথা প্রতিমা পূজার সর্বশেষ মার্জিত রূপ।

শিল্প-সংস্কৃতির ঐ প্রতীক-পূজারী ইউরোপকে যথার্থভাবে জেনেছিলেন মহাকবি ইকবাল। তাই তিনি খোলাখুলিভাবে ইউরোপ সম্পর্কে মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর *প্রচ্যের জ্ঞান* কবিতায় :

'জ্ঞানীরা নিরাশ হলো ইউরোপ থেকে
কেননা এ জাতির অন্তর পবিত্র নয়।'

আর শিল্পের গোলামদেরকে লক্ষ্য করে তিনি তাঁর *শিল্পীদের প্রতি* কবিতায় উচ্চারণ করেছিলেন :

'তোমার আত্মা যদি দাসত্ব
দুঃখে পীড়িত হয়ে থাকে
তাহলে শিল্পের জাহানও তোমার
মন্দির প্রদক্ষিণ ও সিজদার সমাবেশ।'

www.pathagar.com

প্রকৃত শিল্পীর দায়িত্ব সম্পর্কেও কবি ইকবাল চিরদিনের বাণী উপস্থাপন করেছিলেন *মিশরের পিরামিড* কবিতায় :

'প্রকৃতির দাসত্ব হতে শিল্পকে আজাদ করো
শিল্পীরা শিকারী, শিকার কখনো নয়।'

সংস্কৃতি বিভাজ্য কোন বিষয় নয়

এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মনে করেন শিল্প ও সংস্কৃতির কর্মতৎপরতা এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্মক্ষমতা একসাথে চলতে পারে না। অর্থাৎ সমাজ-সংস্কার আন্দোলন আর শিল্প সংস্কৃতির আন্দোলন আদৌ এক নয় এবং এই দুটো বিষয়কে একই ধরনের কর্মসূচীর আওতায়ও আনা সম্ভব নয়। কিন্তু ড. আহমদ শরীফ যদিও তিনি ইতিবাচক বিশ্বাসের ঘোরতর বিরোধী, বলেছেন অন্য কথা সংস্কৃতির বিষয়ে। শিল্প, সাহিত্যের সম্পর্ক দৃঢ়। বলেছেন, লেখার মাধ্যমে কিছু সংখ্যক লোককে উজ্জীবিত করে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষায় ঃ মানবতাবাদী লেখকের উদ্দিষ্ট পাঠক মধ্য ও উচ্চবিত্তের শিক্ষিত জনগণই। তাদের কিছুসংখ্যক লেখার মাধ্যমে সংবেদশীল ও সংগ্রামী করে গড়ে তুলতে পারলেই তাদের মাধ্যমেই গণ-সংযোগ ও গণ-আন্দোলন সম্ভবপর হয়। দুনিয়া জুড়ে সৈন্যরা ছড়িয়ে রয়েছে, কেবল সেনাপতিরই অভাব। দুর্যোগ-দুর্দিনে শিক্ষিত সংবেদশীল দৃঢ়চিত্ত সাহসী ও ত্যাগপ্রবণ কর্মীর নেতৃত্বই সংগ্রামে সাফল্য আনে।

আমহদ শরীফ এখানে একজন লেখকের সাধনাকে এক দৃঢ়চিত্ত কর্মীর নেতৃত্বে পরিণত করার কথা বলেছেন। গণ-আন্দোলনের আয়তক্ষেত্রকে আদৌ বিভাজন করেননি। লেখক ও কর্মীর সংগ্রামের পূণ্যভূমিকে পৃথক করে দেখাননি।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী *শিল্পের কমিটমেন্ট* প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন : 'শিল্পীর কমিটমেন্ট কথাটি অপেক্ষাকৃত হাল আমলের। কিন্তু এর মূল বিষয়টি সৃজনশীল শিল্পকর্মের শুরু থেকেই লক্ষ্য করা যায়। শিল্পী স্বেচ্ছাচারী হবেন না, মানবতাবিরোধী হবেন না। পারিপার্শ্ব ভুলে গিয়ে আত্মকেন্দ্রিক ও জীবন বিমুখ হবেন না, অস্তিত্বহীন হবেন না। অশুভ, অকল্যাণ, কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেবেন না। তিনি 'কমিটেড' থাকবেন অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবেন, নিবেদিত প্রাণ থাকবেন, শুভ কল্যাণ ও মানবতার প্রতি। এ নিয়ে কোন তর্ক নেই...। শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে অবশ্য নির্দিষ্ট গোষ্ঠীবদ্ধ করা যায় না। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। একটির অভাবে আরেকটির মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা যখন কারারুদ্ধ হয় তখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা ধীরে ধীরে হীন বল হয়ে পড়ে। তারপর একসময় পরাধীনতার অন্ধকারে হারিয়ে যায় চিরকালের জন্য।'

মরিয়ম জমিলা *ঐ* বিষয়টির গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছেন একটি ইতিবাচক উপস্থাপনার মাধ্যমে। তিনি তার *সংস্কৃতির দাসত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়* প্রবন্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন : 'বিদেশী রাজনৈতিক শাসনের চাইতে সাংস্কৃতিক অধীনতা অনেক বেশী ক্ষতিকর। ... বাস্তবে সাংস্কৃতিক দাসত্ব রাজনৈতিক দাসত্বের সঙ্গে শুধুমাত্র সম্পৃক্তই নয় বরং সকল ইচ্ছা ও কাজে তা অবিভাজ্য। ... কার্যকর মোকাবেলার জন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে রাজনৈতিক দাসত্ব আর সাংস্কৃতিক দাসত্ব কেন অবিচ্ছেদ্য, সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে হবে যে, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া স্বাধীকার রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। বিরোধী এবং বিদেশী শাসনের অধীন ইসলামের উৎকর্ষ অসম্ভব।'

www.pathagar.com

সুতরাং রাজনৈতিক আন্দোলনকে এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বিভক্ত করা আত্মহত্যার শামিল। একটি জাতিকে যখন মুখোমুখি লড়াইয়ে পরাজিত করা যায় না তখন নানাভাবে সেই জাতির মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপন করা হয়। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত 'ইসলামে রাজনীতি নেই' বলে এবং হারাম বলে বিপুলসংখ্যক বীর্যবান মানুষকে নপুংসক করে ফেলা হয়েছে এবং কৌশলে অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে অর্থাৎ ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে কাবু করা হয়েছে। অপর দিকে 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই শ্লোগান দিয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উর্বর জীবন থেকেও অসংখ্য মেধাবীকে বানানো হয়েছে নির্ভেজাল নাস্তিক, না হয় নারী উপাসক, প্রভৃতি স্থায়ী কাপুরুষ।

টলষ্টয় জীবন শিল্পী ছিলেন। বিজ্ঞান এবং শিল্পের মধ্যে গভীর সম্পর্ক কামনা করেছিলেন। Science and art are closely connected as the heart and the lungs, so if one organ is diseased the other cannot function properly. অর্থাৎ বিজ্ঞান এবং শিল্প হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসের মতই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সুতরাং একটার রোগে ধরলে অন্যটি সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না।

টলষ্টয় বিজ্ঞানকে সামাজিক উদ্দেশ্যে সুদীপ্ত দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন : 'বিজ্ঞানকেও সামাজিক উদ্দেশ্যমুখী হতে হবে। উদ্দেশ্যহীন গবেষণা সমাজের অগ্রগতিকে সাহায্য করতে পারে না। তাই প্রকৃত বিজ্ঞান হচ্ছে এইটে জানা-আমাদের কি বিশ্বাস করা উচিত কি বিশ্বাস করা উচিত নয়, মানুষের সম্মিলিত জীবন কিভাবে গঠিত হওয়া উচিত কিভাবে উচিত নয়।'

আল্লামা ইকবাল কেন সমাজমনস্ক এবং রাজনীতির ব্যাপারে মনোযোগী হয়েছিলেন তা তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন : 'যেহেতু বর্তমান রাজনৈতিক আদর্শসমূহ যে ভাবে ভারতে রূপ পরিগ্রহ করেছে তাতে তার ইসলামের মৌলিক কাঠামো ও প্রকৃতিকে প্রভাবিত করতে পারে, তারই জন্যেই আমি রাজনৈতিক ব্যাপারে মনোযোগী হয়েছি।'

সুতরাং সমাজ সংগঠনের আন্দোলন এবং শিল্প-সংস্কৃতির আন্দোলনের মধ্যে বিভাজন রেখা টেনে দেয়ার অর্থ হলো, একটি সুস্থ-সবল দেহ থেকে একটি চিরজাগ্রত চিত্ত প্রবাহকে জোর করে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া।

ইসলামী সংস্কৃতি

একজন মনীষী ইসলামী সংস্কৃতির একটি তাৎপর্যগত দিকের উল্লেখ করে বলেছেন : 'ইসলাম সমষ্টিগতভাবে মানব প্রকৃতির স্থুল-সূক্ষ্ম সবগুলো বৃত্তিরই সুসামঞ্জস্য ও কল্যাণমুখী পরিচর্যা এবং ব্যবহারিক জীবনে ও বাস্তব পরিবেশে তার প্রকাশ সমর্থন করে। আর এই হলো ইসলামী সংস্কৃতির অর্থ ...।'

আর একজন মনীষী ইসলামী দর্শনকে ইসলামী সংস্কৃতির নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করে বলেছেন : 'ইসলাম একটি জীবন দর্শন। এই জীবন দর্শন মানুষের বৃত্তিসমূহ পরিচর্যার ধারা ও পদ্ধতিকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাহার ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি ফলিত হয়, তাহাই ইসলামী সংস্কৃতি। সুতরাং ইসলামী সংস্কৃতিতে ইসলামী মূল্যবোধগুলি সক্রিয় থাকিবে; অর্থাৎ ইসলামী সমাজে সাহিত্যে ... চিত্র, স্থাপত্য ... প্রভৃতি শিল্পকলা ইসলামী মূল্যবোধের বাহন হইবে।'

ড. কাজী দীন মুহম্মদ তাঁর *ইসলামী সংস্কৃতির রূপ* প্রবন্ধে ইসলামী সংস্কৃতির একটি বিশ্লেষণধর্মী ব্যাখ্যা দিয়েছেন : সাহিত্য, সংগীত ... কারুকার্য, স্থাপত্য ... ইত্যাদি

www.pathagar.com

শিল্পকলা, পেনিসিলিন, রকেট, হাইড্রোজেন বোমা ইত্যাদি বিজ্ঞান-কলা যাকে বলা হয় সংস্কৃতির বাহন, এ সবই মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধনে এবং তার ব্যবহারিক জীবনে ও প্রত্যক্ষ জড় পরিবেশে সেগুলোর ফলিত রূপ। জীবন ও জগতের প্রতি মানুষের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এই বৃত্তিসমূহের পরিচর্যার ধারা ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে আর সেই জন্য ওইগুলোতে মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনের প্রতিফলনও হয় আলাদা রকমের। এদের উপর এই জীবনানুভূতির ও জীবনাদর্শের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক, গভীর ও মৌল। এই জীবনানুভূতি জীবনাদর্শ একটি জীবন-দর্শন নির্ভর। এই জীবন-দর্শন যখন মানবীয় বৃত্তিসমূহের নিয়ামক হয় তখন সেটা শিল্প পরিচর্যার ধারা ও পদ্ধতিকে যেভাবে নিয়ন্ত্রিত করে সেভাবেই তারা বিকশিত হয়ে উঠে। ইসলাম এমনি একটি জীবন-দর্শন। তাই যখন তার সংস্কৃতি প্রকাশের বাহনগুলো শিল্প-বিজ্ঞানের ধারা-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হয় সাহিত্যে, সংগীতে, ... স্থাপত্যে, চিত্রে... ফুটে উঠবে ইসলামী মননশীলতা। আর সেই শিল্পকলা যে সংস্কৃতির বাহন তা-ই হল ইসলামী সংস্কৃতি। আর এক কথায় মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ... আশরাফুল মাখলুকাত করে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করতে তাকে দিন-রাত করতে হচ্ছে সাধনা আর অনুশীলন ... এই সাধানার সামগ্রিক রূপ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ যে সংস্কৃতিবোধকে উদ্বুদ্ধ করে এবং যে সংস্কৃতিবোধকে প্রভাবান্বিত করে, সে জীবনবোধকেই বলা হয়েছে ইসলামী জীবনবোধ; আর এই আকিদারই বহিঃপ্রকাশ ইসলামী তমুদ্দন। সে তমুদ্দনের বাহনে অর্থাৎ শিল্প-সাহিত্য তাই ইসলামী জীবনবোধের নব মূল্যায়নের চলমান বিকাশ।

ইসলামী সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সবচেয়ে অর্থবহ বক্তব্য রেখেছেন সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (র:) : 'সংস্কৃতি হচ্ছে দ্বীন ও দুনিয়ার এক মহত্তম সমন্বয়। ... এ হচ্ছে একটি ব্যাপকতর জীবনব্যবস্থা বা মানুষের চিন্তা-কল্পনা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, পারিবারিক কাজকর্ম, সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড, রাজনৈতিক কর্মধারা, সভ্যতা ও সামাজিকতা সব কিছুর ওপরই পরিব্যাপ্ত। আর এ সমস্ত বিষয়ে যে পদ্ধতি ও আইন বিধান খোদা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তারই সামষ্টিক নাম হচ্ছে 'দ্বীন-ইসলাম' বা ইসলামী সংস্কৃতি।'

মাওলানা মওদূদী (র:) ঐ বক্তব্যে ইসলামী সংস্কৃতির একটি বিপ্লবী এবং ব্যাপকতর সংজ্ঞা দিয়েছেন। এবং দ্বীন-ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতিকে অবিভাজ্য রেখেছেন। বস্তুত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার লক্ষ্য আর ইসলামী সংস্কৃতির চূড়ান্ত লক্ষ্য একই।

ইসলামী সংস্কৃতি ও উপাদান

ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ড: কাজী দ্বীন মুহম্মদ ঐ সংস্কৃতির উপাদান নিয়ে একটি জটিলতর অথচ প্রয়োজনীয় আলোকপাত করেছেন : 'তমুদ্দুনের বিকাশ আসলে দুটো পরোক্ষ ও একটি প্রত্যক্ষ প্রবৃত্তির গঠন-তাৎপর্য, সংস্থাপনা ও আবহাওয়ার উপর যথেষ্ট [Climate] নির্ভরশীল।'

দুই. বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নিছক বাইরের প্রচেষ্টা ও অনুশীলনী : কোন বিশেষ অবস্থা থেকে অবস্থান্তর ঘটানো-যাকে বলা হয় ব্যষ্টি এবং সমষ্টিগত উন্নতি-সেদিকে নিয়ে যাওয়ার উদ্দাম স্পৃহাজাত অভিব্যক্তির এক বিশিষ্ট সহায়ক পদ্ধতির মারফতে রূপায়ন।

তিন. এই প্রথম ও দ্বিতীয় দফার বাইরের কিছু নয় বরং দু'য়ের সমন্বিত অভিব্যক্তির প্রেরণা ও তজ্জাত আত্মবিকাশের প্রচেষ্টার মৌল ধারা-যার নাম দেয়া যায় ধর্ম।

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান তালিব তাঁর *বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব* প্রবন্ধে সংস্কৃতির মূল উপাদান সরবরাহকারী এবং 'ধর্মকে অস্বীকার করে যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তার উন্নতর হবার কোন প্রমাণ নেই' বলে উল্লেখ করেছেন। এবং ইসলামী সংস্কৃতির তিনটি উপাদানের প্রসঙ্গে তিনি তার *বাংলাদেশে সংস্কৃতি* প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন এই রকম :

১. তওহীদ ইসলামী সংস্কৃতির প্রথম ও মৌলিক উপাদান
২. রিসালাত ও নবুওয়াত এর দ্বিতীয় মৌলিক উপাদান।
৩. ইসলামী সংস্কৃতির আর একটা মৌলিক উপাদান হচ্ছে আখেরাতে বিশ্বাস।

বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী দার্শনিক-চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী [র:] তাঁর *ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা* গ্রন্থের ভূমিকায় সংস্কৃতির মৌলিক উপাদান পাঁচটি বলে উল্লেখ করেছেন। এবং ঐ পাঁচটি মৌলিক উপাদানের যথার্থ ব্যাখ্যা দানের পর ইসলামী সংস্কৃতিরও মৌলিক পাঁচটি উপাদান সংক্রান্ত উপাদানের যথার্থ ব্যাখ্যা দানের পর ইসলামী সংস্কৃতিরও মৌলিক পাঁচটি উপাদান সংক্রান্ত একটি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এই ধরনের :

১. জীবন সম্পর্কে ধারণা,
২. জীবনের চরম লক্ষ্য,
৩. মৌলিক বিশ্বাস ও চিন্তাধারা,
৪. ব্যক্তি প্রশিক্ষণ এবং
৫. সমাজ ব্যবস্থা।

প্রথমটির সম্পর্কে তিনি বলেন : 'দুনিয়াবী জীবন সম্পর্কে তার ধারণা কি? এই দুনিয়ায় সে মানুষকে কি মর্যাদা প্রদান করে? তার [অর্থাৎ সেই সংস্কৃতি] দৃষ্টিতে দুনিয়া বস্তুটা কি? এ দুনিয়ার সাথে মানুষের সম্পর্ক কি? মানুষ এ দুনিয়াকে ভোগ-ব্যবহার করবে কি ভাবে? বস্তুত জীবন-দর্শন সম্পর্কিত এই প্রশ্নগুলো এমনি গুরুত্বপূর্ণ যে, মানব জীবনের তামাম ক্রিয়া-কাণ্ডের ওপরেই এগুলো গভীরভাবে প্রভাবশালী হয়ে থাকে। এই দর্শন বদলে গেলে সংস্কৃতির গোটা স্বরূপ মূলগতভাবে বদলে যায়।'

এই জীবন দর্শন সম্পর্কে *পাক ভারতে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারা* প্রবন্ধে প্রবীণ দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন : 'ইসলাম গোড়াতে মানব-জীবনের সবগুলো দিককে স্বীকার করে নিয়েছে বলে ইসলামকে বলা হয়েছে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। মানব প্রকৃতির অনুকূলেই তার ভিত্তি গড়ে উঠেছে বলে মানুষের নবী হযরত মোহাম্মদ [স:]' বলেছেন : সদ্যজাত শিশু সত্য ধর্মেই জন্ম নেয়, তার পিতামাতা তাকে ইহুদী, ক্রিশ্চিয়ান বা সেবিয়ান করে তোলে।'

জীবন-দর্শন সম্পর্কে আব্দুল মান্নান তালিব বলেছেন খোলাখুলি কথা : 'জীবন-চর্চাই সংস্কৃতি এ কথা ঠিক। তবে এই জীবন-চর্চার পেছনে যে চিন্তা ও জীবন দর্শন অলক্ষ্যে কলকাঠি নেড়ে চলেছে-সেটিই হচ্ছে সংস্কৃতির আসল নিয়ন্ত্রক ও পরিকল্পক... মানুষের সংস্কৃতি শুধুমাত্র জীবন-চর্চা নয়, পরিকল্পিত চিন্তা ও জীবন দর্শনের ভিত্তিতে জীবন-চর্চার নাম।'

জীবন-দর্শনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত যে দ্বিতীয় [সংস্কৃতির মৌলিক] উপাদানটি, সে সম্পর্কেও আবুল আ'লা মওদূদীর সুস্পষ্ট বক্তব্য : 'জীবন-দর্শনের সাথে যে প্রশ্ন গভীরভাবে সম্পৃক্ত তা হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য। দুনিয়ায় মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি? মানুষের এতো

www.pathagar.com

ব্যস্ততা, এতো প্রয়াস-প্রচেষ্টা, এতো শ্রম-মেহনত, এতো দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম কিসের জন্যে? কোন অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে মানুষের ছুটে চলা উচিত? কোন পরিণতির কথা মানুষের প্রতিটি কাজে প্রতিটি প্রয়াস প্রচেষ্টায় স্মরণ রাখা উচিত? বস্তুত এই লক্ষ্য ও আকাংখিত প্রশ্নই মানুষের বাস্তব জীবনের গতিধারাকে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।'

সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদীর দৃষ্টিতে সংস্কৃতির তৃতীয় উপাদান হচ্ছে মৌলিক বিশ্বাস এবং ধ্যান-ধারণা। এ সম্পর্কে তিনি বলেন : 'তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, আলোচ্য সংস্কৃতিতে কোন বুনিয়াদি আকীদা ও ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে মানুষের মন-মানসকে তা কোন ছাঁচে ঢালাই করে? মানুষের মন ও মস্তিষ্ক কি ধরনের চিন্তা সৃষ্টি করে? এবং তার ভেতর এমন কি কার্যকর শক্তি রয়েছে যা তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে এক বিশেষ ধরনের বাস্তব জীবনধারার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে? এ ব্যাপারে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই যে, মানুষের কর্মশক্তিকে তার চিন্তাশক্তিরই প্রভাবাধীন। ... তার মন-মানস যে ছাঁচে গড়ে উঠবে, তার ভেতর আবেগ-অনুভূতি ও ইচ্ছা-স্পৃহা ও ঠিক তেমনি পয়দা হবে এবং তারই আজ্ঞাধীন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো কাজ করে থাকবে।'

বিষয়টিকে বুঝবার জন্যে আমরা ঘোরতর এক বাঙালী সংস্কৃতির ধারক-বাহকের একটি প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি : 'আমরা বর্তমানে সংস্কৃতি বলতে সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী প্রভাবিত ব্যাপক অর্থেই তাকে গ্রহণ করি। কোন একটি জনগোষ্ঠীর আচার-ব্যবহার, থাকা-খাওয়ার রীতি-নীতি, ধর্মবিশ্বাস, জীবিকা অর্জনের পদ্ধতি, তাদের সংস্কার-কুসংস্কারসহ জীবনের হাজারো উপকরণ ও উপাচার, তার ভাষা, সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত, নৃত্য সব মিলেই তার সংস্কৃতি।'

একটি কুসংস্কারকেও ঐ প্রবন্ধকার সংস্কৃতি বলে স্বাগত জানিয়েছেন তার বুনিয়াদী আকীদা ও ধ্যান-ধারণার দিক থেকে।

আর এক পন্ডিত আবিষ্কার করেছেন : 'মনে হয় মানুষ স্বভাবত পৌত্তলিক : কোনো বিশেষ প্রতিমা, বিশেষ তত্ত্ব বিশেষ আচার বা বিশেষ ধরন-ধারণ এ না হলে যেন তার চলতে চায় না।'

'মানুষ স্বভাবত পৌত্তলিক' এই তত্ত্বটি হয়তো ঐ পন্ডিত প্রবন্ধের মধ্যে নিজেই লক্ষ্য করেছেন, তারপর তিনি তা গোটা মানবজাতির ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং ধ্যান-ধারণাগত বিভ্রান্তি শুধু একটি অপরাধ নয়, রীতিমত অত্যাচারও।

ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানের চতুর্থটি হচ্ছে মূলত : সংস্কৃতি মানুষকে একজন মানুষ হিসেবে কি ধরনের মানুষরূপে গড়ে তোলে অর্থাৎ কি ধরনের নৈতিক ট্রেনিং-এর সাহায্যে সে মানুষকে তার নিজস্ব আদর্শ মোতাবেক সার্থক জীবন যাপনের জন্যে তৈরি করে? কোন ধরনের স্বভাব-প্রকৃতি, গুণরাজি ও মন-মানসে সে মানুষের মধ্যে পয়দা করে এবং তার বিকাশ-বৃদ্ধির চেষ্টা করে? তার বিশেষ নৈতিক তালিম-এ মানুষ কি ধরনের মানুষে পরিণত হয়?

সত্যিকার অর্থে সংস্কৃতির আসল উদ্দেশ্য যদিও সমাজব্যবস্থার পুনর্গঠন কিন্তু ব্যক্তির উপাদান দিয়েই সে সমাজ-সৌধ নির্মিত হয়। আর সে সৌধটির দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে তার প্রতিটি পাথরের সঠিকরূপে কাটা, প্রতিটি ইটের পাকা-পোক্ত হওয়া, প্রতিটি কড়ি কাঠের মজবুত হওয়া, কোথাও ঘুণে কাঠ না লাগানো এবং কোথাও অপক্ক, নিকৃষ্ট ও দুর্বল উপকরণ ব্যবহার না করার ওপর।

www.pathagar.com

ব্যক্তি প্রশিক্ষণের এই সাংস্কৃতিক উপাদানটি ইসলামের গৌরবময় দিনগুলোতে পরিপূর্ণভাবেই বিকশিত হয়েছিলো, যার সম্পর্কে মার্মেডিউক পিকথল একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন: 'ইসলামে কোন অজ্ঞ মুসলমানের অস্তিত্বের কথা পবিত্র কুরআনে কখনো ধারণা করাও হয়নি এবং মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-ও তা কখনো কল্পনা করতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞ মুসলমান কথাটি মুসলমান পদবাচক সংজ্ঞার পরিপন্থী বা বিপরীতার্থক। ইসলামের গৌরবময় দিনে একজন 'দরিদ্র মুসলমানের' মত একজন অজ্ঞ মুসলমানকেও খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর হতো।'

সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানের পঞ্চমটি হচ্ছে : সে সংস্কৃতিতে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে মানুষে মানুষে কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়? তার আপন খান্দানের সঙ্গে, অধীনস্থ লোকদের সঙ্গে, তার উপরস্থ লোকদের সঙ্গে, তার নিজ সংস্কৃতির অনুসারীদের সঙ্গে এবং তার সংস্কৃতিবহির্ভূত লোকদের সঙ্গে কি ধরনের সম্পর্ক রাখা হয়েছে? অন্যান্য লোকদের ওপর তার কি অধিকার এবং তার ওপর অন্যান্য লোকদের কি অধিকার নির্দেশ করে দেয়া হয়েছে? তাকে আজাদী দেয়া হলে কতখানি আজাদী দেয়া হয়েছে আর বন্দী করা হলে কতদূর বন্দী করা হয়েছে? বস্তুত এ প্রশ্নগুলোর ভেতর নৈতিক চরিত্র, সামাজিকতা, আইন-কানুন, রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সকল বিষয়ই এসে যায়। আর আলোচ্য সংস্কৃতি কি ধরনের খানদান, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করে তা এ থেকেই জানা যেতে পারে। দুনিয়ার প্রত্যেক সংস্কৃতি ঐ পাঁচটি মৌলিক উপাদান দিয়েই গঠিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, ইসলামী সংস্কৃতিরও সৃষ্টি হয়েছে এই উপাদানগুলোর সাহায্যেই।

ইসলামী [জীবনবোধ] সভ্যতা কবিতায় আল্লামা ইকবাল সাংস্কৃতিক উপাদানের একটি যুক্তিগ্রাহ্য এবং কাব্যকুশল বর্ণনা দিয়েছেন :

উপাদান তার জিব্রীলের সৌন্দর্যবোধ
আজমের শুভ্র মনন আর আরবের হৃদয় উত্তাপ

বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে ইসলামী সংস্কৃতির জন্যে যে মৌল প্রত্যয়ের প্রয়োজন, সে ব্যাপারে ঐ পাঁচটি বিষয়ের কোন বিকল্প নেই। কেননা অন্য কোন প্রত্যয়ের ভেতরে ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি হবার মত কোন ধরনের উৎস : বিশ্বাসীর হৃদয় অর্থাৎ যে বিশ্বাসীর হৃদয় বিশ্বাসের আলোয় উদ্ভাসিত প্রথমেই তার থেকে ইসলামী সাহিত্য আশা করা যায়। দ্বিতীয় উৎস : Innate character বা মানুষের স্বভাব। আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে এই ফিতরাতের ওপরই সৃষ্টি করেছেন- যা খুব বিরল এবং দুর্লভ। কোরআনের ভাষায় তাকে [অর্থাৎ মানুষকে] উভয় [অর্থাৎ ভালো-মন্দ] পথ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে ... তবু মানুষ আবিলতায় যতই হাবুডুবু খাকনা কেন, কখনো তার প্রকৃতি প্রদত্ত বিবেক তাকে জাগিয়ে তোলে। যেমন কবি আবু নওয়াসের জীবন। তিনি নগ্নতা-বেহায়পনায় ছিলেন প্রসিদ্ধ। পাপাচার ছিলো তার প্রতিদিনের কাজ। কিন্তু কখনো কখনো তিনি বিবেকের স্পর্শে চৈতন্য ফিরে পেয়েছেন, শিশুর মত কেঁদেছেন, লিখেছেন, চেতনা জাগানিয়া কোন পবিত্র লেখা। এই লেখা তো আমরা খারিজ করতে পারি না।

সুতরাং কোন এক মানুষ সে- যে-ই হোক না কেন, কখনো কখনো তার জীবনাচারের মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতির কোন রূপ ফুঠে ওঠে, তাহলে তার সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করার অধিকার কারো নেই।

www.pathagar.com

ইসলামী সংস্কৃতির উৎস এবং সার্বজনীন সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিবেচনা করেছেন সুদানের খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়ের শিক্ষক প্রফেসর ইযযুদ্‌দীন আল আমীন। তার বিবেচনাটি হচ্ছে : আমাদের ঐহিত্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় প্রভৃতির মূল শেকড় আমাদের ইসলামী সমাজে প্রোথিত। সাহিত্যেও সে-সব দিকগুলো আনার সময় ইসলামের দর্শন ও শিক্ষাকে সামনে রেখে আনতে হবে। রবং উচিত হবে ইসলামের উদ্ভাস যেন সাহিত্যের খাঁজে খাঁজে মূর্ত থাকে। অন্যের মূল্যবোধ, রীতি নীতি যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তবে দেখতে পাবো, সেখানে কিছু কিছু দিক আছে যা ইসলাম প্রদত্ত না হলেও ইসলাম তাকে অসমর্থন করে না। ক্লাসিক সাহিত্যের এসব দিক আমাদের গ্রহণ করতে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। এসব দিক আমাদের অযথা এড়িয়ে যাওয়াও ঠিক নয়। কারণ আমাদের দৃষ্টিতে সঠিক এমন কাজ যদি অন্য কেউ আনজাম দেয় পৃথিবীতে, আমাদের আগমন এ জন্য হয়নি যে, সেগুলোরও আমাদের বিরোধিতা করতে হবে।

ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য

জীবনকে মহৎ করে গড়ে তোলাই সংস্কৃতির লক্ষ্য। এই যে বক্তব্য, এই বক্তব্যের মধ্যে একজন প্রত্যয়বাদীর জন্যে কোন ফাঁক নেই : কিন্তু একজন সংশয়বাদীর জন্য বিভ্রান্তি ছড়ানোর সুযোগ একটু থেকেই যায়। সে সুযোগ জীবনের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা নিয়ে। কেননা একজন সংশয়বাদী অখণ্ড জীবনে বিশ্বাসী নয়, অন্যদিকে একজন প্রত্যয়বাদী একটি খণ্ডিত জীবনকে মেনে নিতে পারে না।

মূলত ইসলামী সংস্কৃতি তার লক্ষ্য সম্পর্কে কখনোই কিন্তু গোজামিলের আশ্রয় নেয়নি; সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছে। একজন প্রাজ্ঞ-পণ্ডিতের ভাষায় : 'আনন্দেই জন্ম, আনন্দেই জীবন, আনন্দেই মৃত্যু'- এই আনন্দই মুসলিম জীবনের পাথেয়, সে আনন্দে আছে সন্তুষ্টি। আল্লাহর সন্তুষ্টির সংগেই আপন সন্তুষ্টি মিলিয়ে এক চরম আনন্দে পরিপূর্ণ হলে সে মহানন্দের ধেয়ে চলায় কোন বিরোধ নেই, নেই কোন দ্বন্দ্ব। না পাওয়ার অতৃপ্তির মাঝখানেও সন্তুষ্টি আর আনন্দ মিলে এক মহাতৃপ্তির আস্বাধন করে মুসলিম। তাই তার কাছে ইহজগত যত সত্য, পরজগত তেমনি সত্য বরং তার চাইতেও সত্য। ইহজগতের বস্তু অবয়ব কেবলই পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু সেখানে পরিবর্তন নাই, ধ্বংস নাই। সমগ্র বিশ্বের প্রাকৃতিক ও জাগতিক শৃংখলা মেনে নিয়ে বিশ্বনিয়ন্তার সংবিধানের ধারা অনুযায়ী চলার পথকে আনন্দময়, সুখের করে তোলা, সামগ্রিক মানব জীবনকে সুন্দরতম, মহত্তর, মহিমাময় করে তোলাই ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য; কেবলমাত্র শিল্প-কলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান মানবজীবনের এ বাড়তি উপকরণগুলো সৌন্দর্যবর্ধন, পরিমার্জন ও পরিশীলনই তার একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। কাজেই শিল্পানুরাগ যখন এমন পর্যায়ে পৌছে, যার সামনে জীবনের প্রধান লক্ষ্য গৌণ হয়ে পড়ে, তখন তা ইসলাম বিরোধী।

ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য প্রসঙ্গে মার্মেডিউক পিকথল খোলাসা যে বয়ান দিয়েছেন তা যথার্থ গুরুত্বের দাবী রাখে : অন্যান্য সংস্কৃতি হতে ইসলামী সংস্কৃতির সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। কেননা ইসলামী সংস্কৃতি কখনো কেবলমাত্র কোন সংস্কৃতিবান-ব্যক্তি-বিশেষ মাত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপূরক হতে পারে না। আরো পরিষ্কার ভাষায় বলতে গেলে, ইসলামী সংস্কৃতি শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অগ্রসর ব্যক্তি-বিশেষ মাত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিপূরণের বাহন হতে পারে না; এবং এখানেই বিভিন্ন সংস্কৃতির সংগে তার পার্থক্য। এটা সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত সত্য যে, ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য সীমিত পর্যায়ে কোন ব্যক্তিবিশেষ কিংবা

www.pathagar.com

ব্যক্তি-সমষ্টির বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন। ... যত বিরাট কীর্তিময় হোক না কেন, কোন যুদ্ধ কিংবা সন্ধি-চুক্তির সাফল্যকে ইসলামের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সাফল্যের ফলশ্রুতি বলে অভিহিত করা যেতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে সার্বজনীন মানবিক ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য, ইসলামের বিরামহীন অভিযাত্রা এই আদর্শের লক্ষ্যভূমির পথে অগ্রসরমান।

ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা গ্রন্থে সম্ভবত আলাদাভাবে ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়নি। কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতির কাঠামো নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ লক্ষ্য সম্বন্ধে খুব সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে : এ সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে চূড়ান্ত সাফল্যের [অর্থাৎ পরকালীন বিচার বিশ্বপ্রভুর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হওয়ার] জন্যে প্রস্তুত করা, আর তার দৃষ্টিতে এ সাফল্য অর্জনটা বর্তমান জীবনে মানুষের নির্ভুল আচরণের ওপর নির্ভরশীল। পরন্তু চূড়ান্ত ফলাফলের দৃষ্টিতে কোন সব কাজ উপকারী, আর কোন সব কাজ অপকারী, তা জানা মানুষের সাধ্য নয় বরং আখেরাতে ফয়সালাকারী খোদাই তা উত্তমরূপে অবিহত। এ কারণেই সংস্কৃতি জীবনের সকল বিষয়াদিতে খোদ নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করার এবং নিজের কর্মস্বাধীনতাকে খোদায়ী শরীয়ত সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে মানুষের কাছে দাবী জানায়।

ইসলামী সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

মুসলিম তমুদ্দনের মর্মকথা প্রবন্ধে ড. মুহম্মদ ইকবাল নবীর সৃষ্টিধর্মী প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তমুদ্দুনের বিকাশধারার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন। বলেছেন : 'নবীর প্রত্যাবর্তন কিন্তু সৃষ্টিধর্মী। তিনি প্রত্যাবর্তন করেন কালের প্রগতির সাথে যোগদান করতে, ইতিহাসের ঘটনাবর্ত নিয়ন্ত্রণ করে নব আদর্শের পৃথিবী সৃষ্টি করতে, সুফীর কাছে অখণ্ড অভিজ্ঞতার প্রশান্তিই শেষ কথা; নবীর পক্ষে এ হচ্ছে যুগান্তর আনয়নকারী মানসিক শক্তির উদ্বোধন। এই শক্তি দিয়ে তিনি-মানব জগতের রূপান্তর সাধন করেন। নবীর চরম আকাংখা তাঁর ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে একটি জীবন্ত জাগতিক শক্তিরূপে প্রত্যক্ষ করা। এই রূপে তাঁর প্রত্যাবর্তন তার ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মূল্য নিরূপণের একটা প্রায়োগিক মানদন্ড। সৃষ্টিধর্মী কর্মের মধ্যে নবী নিজের সংকল্পকে এবং যে সকল মূর্ত ঘটনার মধ্যদিয়ে তিনি একে রূপ দেবেন, সেগুলিকে যাচাই করে দেখেন। সামনের দুর্লভ্য বাধা জয় করার মধ্যদিয়ে নবী নিজেকে আবিষ্কার করেন এবং ইতিহাসের সম্মুখে প্রকাশিত করেন। অতএব তাঁর ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মূল্য নিরূপণের আরেকটা মানদন্ড হবে কি ধরনের মানুষ তিনি গড়ে তুলতে পেরেছেন এবং তাঁর বাণীর প্রেরণার কি ধরনের তমুদ্দুন বিকাশ লাভ করেছে।'

শুদ্ধতম সংস্কৃতির বিকাশে প্রেরিত মানুষের ভূমিকার দিকে দৃষ্টিপাত করলে অন্তত এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, ইসলামী সংস্কৃতি এমনই একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতি যার অখণ্ড দেহাবয়বে লেগে গেছে সুদীর্ঘ ইতিহাসজনিত স্পর্শের বৈভব।

ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের অন্যতম তরজমা দিয়েছেন এক প্রাজ্ঞ-দার্শনিক। তিনি ইসলামী সংস্কৃতির চূড়ান্ত বিকাশধারাকে যুক্ত করতে চেয়েছেন 'আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও' এই দর্শনের সঙ্গে। এবং বলেছেন: 'ইসলামের সত্যিকার নৈতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক আদর্শের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইসলামের নৈতিক আদর্শ : সৃষ্টির জীবনের সবগুলো বৃত্তির সম্যক বিকাশ এবং তাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের সৃষ্টি। এতে ব্যক্তিগত জীবনে শৃংখলার সৃষ্টি হয় এবং ব্যক্তি উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পায়। সে উন্নতির আদর্শ আল্লাহর গুণাবলী জীবনে বিকশিত করে তোলে।'

www.pathagar.com

আল্লাহর রসূল [স:] আদেশ করেছেন- তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও।

ড. আবদুল বাসেত বদর ইসলামী সাহিত্যের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, সে সিদ্ধান্ত ইসলামী সংস্কৃতিরও কোন কোন দিককে প্রভাবিত করে এবং সেগুলো যথাযথ বলে আমরা মনে করি। ড. বাসেত বদর বলেছেন: ইসলামী সাহিত্যে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বর্তমান। যার অন্যতম দিকগুলো হলো:

প্রথমত: বিশ্বাসগত বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল অর্থাৎ যে সাহিত্য কর্মের ভেতর ইসলামের এবং ঈমানের সৌন্দর্য বিকশিত হয়, তা-ই ইসলামী সাহিত্য।

দ্বিতীয়ত: শিল্পগত বৈশিষ্ট্য। জীবন এবং জগত এবং মানুষ থেকে লব্ধ অভিজ্ঞান এবং অনুভূতিকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সুসম্মতভাবে এবং শিল্পসমৃদ্ধভাবে প্রকাশ করার নামই ইসলামী সাহিত্য। শিল্পগত না হলে তার নাম অন্য কিছু হবে। ইসলামী সাহিত্য হবে না।

তৃতীয়ত: পরিব্যাপ্তিগত বৈশিষ্ট্য। ইসলামী সাহিত্য কোন নির্দিষ্ট সময় বা স্থান দ্বারা পরিবেষ্টিত নয়। তার চর্চায় মাধ্যম শুধু আরবী হতে হবে তা নয়।

মূলত জীবন চর্চার ক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতি চায় পরিশীলিত জীবন-চর্চা। এই পরিশীতি জীবন-চর্চায় যখন বিশ্বাসের আলো ফুটে উঠবে, শিল্পগত সৌন্দর্য ফুটে উঠবে, ফুটে উঠবে বিশ্বজনীনতা-বুঝতে হবে সে জীবন-চর্চায় ইসলামী সংস্কৃতিই বিকশিত হয়েছে।

মার্মেডিউক পিকথল বলেছেন : ধর্ম হিসেবে ইসলাম নিজস্ব পরিসরে ও নিজের শ্রেণীগত অগ্রগতির পর অন্য যে কোন ধর্মের চেয়ে অধিকতর ও ব্যাপক পর্যায়ে মানবীয় প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে থাকে। শক্তি হিসেবে বিশ্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের পর ইসলাম যে সাংস্কৃতিক ঐহিত্যের জন্ম দিয়েছে, অন্য কোন ধর্ম, সভ্যতা ও দর্শনের সম্মিলিত সাফল্যের সংগে তার তুলনা হয় না। মানে : ইসলামের সাংস্কৃতিক অবদানকে বিশ্বের সমস্ত ধর্ম, কৃষ্টি ও সভ্যতার সামগ্রিক অবদানের সংগে একপাল্লায় ওজন করা যেতে পারে। ... ইসলামী সংস্কৃতি এক বিশেষ সংস্কৃতি, যার মধ্যে বিশ্বের সকল সংস্কৃতি খুঁজে পাবে তার আধার অথচ তা নিজ বৈশিষ্ট্যে একক। ইসলামী সংস্কৃতির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য : তার ইতিহাস এবং ঐহিত্য সুদীর্ঘ প্রেক্ষাপটে দেদীপ্যমান। সেই ইতিহাসের দিকে যতই দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যাবে সেই ঐতিহ্যের দিকে যতই ফিরে তাকানো যাবে, ততই ইসলামী সংস্কৃতির একটি চিরকালের বৈশিষ্ট স্পষ্টতর হবে।

সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী [র:] বলেন : 'একথা যদিও সত্য যে, মানুষের বর্তমানকাল চিরদদিনই অতীতকাল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে এবং সেহেতু প্রত্যেক নব রূপায়ণেই পরবর্তী গঠন উপাদান থেকে সাহায্য গ্রহণ করা হয়, তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, ইসলামী সংস্কৃতি আপন প্রাণ-সত্তা ও মৌলিক উপাদানের দিক থেকেই সম্পূর্ণ রূপেই ইসলামী এবং এর ওপর কোন অনৈসলামী সংস্কৃতির অণুমাত্রও প্রভাব নেই। অবশ্য এর বাইরের বিষয়ে আরবীয় মনন, আরবীয় ঐতিহ্য এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংস্কৃতিগুলোর কিছু না কিছু প্রভাব অবশ্যই পড়েছে। ... আসল ও মূল জিনিসের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, ইসলামী সংস্কৃতি ... সম্পূর্ণ ইসলামেরই গঠন প্রক্রিয়ার ফল। ... ইসলাম অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে খুব কম জিনিসই গ্রহণ করেছে। এমনকি বলা যেতে পারে যে, এরও বেশীর ভাগই ইসলামেরই নিজস্ব জিনিস।'

www.pathagar.com

একবার এক রাষ্ট্রপ্রধান বলেছিলেন : Feel free in your mind, act freely in your expression and react freely to the environments around you. Let not the edge of your sensitivity be any sense of fear or expendiency. On may behalf I cannot do better than assure you in the spirit of Voltair, that I may differ, even protest, against what you say but I will defend your right to say it unless it is directed aginst they very existence of our homeland.

অর্থাৎ স্বাধীনতার চিন্তা করুন, স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করুন এবং স্বাধীনভাবে কাজ করুন। কিংবা শক্তি প্রয়োগ কোনোভাবেই আপনার অনুভূতিকে অন্ধ-উত্তেজনার শিকার হতে দেবেন না। আমি তো ভলটেয়ারকে আপনার চাইতে ভালোভাবে বুঝতে পারি না ... যাতে মতদ্বৈততা এমনকি বিরোধিতা করতে পারি। আমি রবং পারি আপনার বলার অধিকারকে প্রতিহত করতে-যেটা দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের মাতৃভুমির অস্তিত্ব নড়বড়ে করে দিতে সক্ষম।

অন্তত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এ বক্তব্যের মধ্যে রয়ে গেছে। একটি হচ্ছে, মত প্রকাশের স্বাধীনতার ব্যাপার। আরেকটি, বিরোধিতা করার ব্যাপার। অন্যটি হচ্ছে, মাতৃভূমির অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপার।

উল্লিখিত তিনটি বিষয়কে সামনে রাখলে এবং ইসলামী সংস্কৃতির বুদ্ধিবৃত্তিক কোন ব্যাপারে প্রশ্ন দেখা দিলে আল কোরআনের ছোট একটি বাক্য তার উত্তরের জন্য যথেষ্ট : 'দ্বীনের ব্যাপারে বলপ্রয়োগের কোন সুযোগ নেই।'

ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তির সংস্কৃতির আন্তর্জাতিকতার মানদন্ড তৈরী হয়েছে কোরআনের ঐ চিরন্তন বর্ণনার আলোকেই। ঐ আন্তর্জাতিকতা অন্য কোন সংস্কৃতিতে নেই; থাকতে পারে না। চিন্তাবিদ আবুল হাশিম বলেন : 'চিন্তা-বিবেক-মতবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা এবং পরমত সহিষ্ণুতা ইসলামী বৃদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতির অন্যতম আদর্শ। এই কারণেই খিলাফত যুগে বিরুদ্ধ-মত পোষণের দায়ে কাউকে হ্যামলক বিষপানে অগ্নি-কুন্ডে অথবা ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ হারাতে হয়নি।'

ইসলামী সংস্কৃতি কপটতাকে অনুমোদন করে না এবং কপটতা উৎপাদনের কোন প্রক্রিয়াকেই সে উদ্বোধন করে না। যেমন করে না ইসলামী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও [ইসলামী সাহিত্য ইসলামী সংস্কৃতিরই একটি অংশ]।

ড. আবদুল বাসেত বদর বলেছেন : 'লেখক মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত স্বাধীন। তাকে কোন ব্যাপারে বাধ্য করা সংগত নয়। আমরা ইসলামী সাহিত্যসেবীকে কোন কিছু চাপিয়ে দিতে চাইনে। মূলত আমাদের বক্তব্য হলো, যদি আমরা কোন লেখককে জোর করে কিছু চাপিয়ে দিই, তাহলে আমাদের মধ্য থেকেই কপট সাহিত্যকের উদ্ভব হবে ... আমরা ঈমানের প্রভাবমণ্ডিত হৃদয়-কন্দর হতে যার সাহিত্য উৎসারিত হয় সেই স্বেচ্ছাসেবক চাই। আপনি বলুন আপনাকে কি কেউ রোযা রাখতে বাধ্য করতে পারে? কিংবা আপনার অনিচ্ছা দান-সদকা করতে বলপ্রয়োগ করতে পারে? আমরা কি আপনাকে স্বৈরাচারীর মত আদেশ করতে পারবো ... আপনাকে সদকা করতেই হবে। না বরং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তা কবুল করবেন। মুসলিম সাহিত্যিক তেমনি। আসলে তিনি তার

www.pathagar.com

মুক্ত পাখায় ভর করে উড়ে চলবেন ঐতিহ্য-পারিত্রিক হাজারো রাজ্যে। নাস্তিকতার জন্যে সে-সব রাজ্যে বিচরণের দ্বার রুদ্ধ। আমাদের সাহিত্যিকরা উড়ে চলেন; আকাশ ও ধরণীর খাঁজে খাঁজে চরে বেড়ান। নানান রাজ্যের চিত্র ফুটে উঠে তার সাহিত্যে। অন্যদের চোখে সে সব সুদূর-দিগন্তের ছবি তমসাবৃত। সুতরাং তাদের চেয়ে প্রশস্ত পৃথিবীতে আমাদের অধিবাস। এবং সবই তো আমাদের; তারপরও চাপিয়ে দিতে হবে?'

ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতি এক সার্বত্রিক চরাচর এবং নিকষ নীলিমারই সন্ধান দিয়েছে। তবু সে তার বুদ্ধিবৃত্তিকে লাগামহীন করে দেয়নি। বিষয়টি অর্থাৎ স্বাধীনতার 'স্ব' এবং 'অধীনতার' মত ঔদার্যকে বুঝবার জন্যে লিও টলষ্টয়ের একটি শিল্পভাবনার সহযোগিতা নেয়া যায়।

টলষ্টয় বলেছেন : 'সব শিল্পকে নিষেধ করা অসম্ভবকে সম্ভব করার মত উদ্ভট পরিকল্পনা। শিল্পের অনুপস্থিতিতে মানব-জীবন দুর্বিসহ। তবে ইউরোপের মত যে কোন আর্ট-কে মেনে নেয়া যায় না।'

আরো খানিক এগিয়ে গিয়ে একজন প্রতীচ্য-সংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞ বলেছেন : 'প্রতীচ্যে শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চাকে-যাকে সংস্কৃতির একটি প্রাসংগিক অথবা একটি গৌণ দিক বলা যেতে পারে-প্রায় উপাসনার মত যে অপরিসীম গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে, একজন মুসলমান তাতে অবাক না হয়ে পারে না।'

ইসলামী সংস্কৃতির রূপ

রূপ অর্থ : আকৃতি, চেহারা, সৌন্দর্য, নেত্রগাহ্য বিষয়, প্রকার, রকম, স্বরূপ ইত্যাদি। আবার স্বরূপ অর্থ : স্বভাব, প্রকৃতি, নিজের রূপ, প্রকৃত অবস্থা ইত্যাদি। আমরা এখানে ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ নিয়েই আলোচনা করতে চাই।

ইসলামী সংস্কৃতি জীবনের সার্বত্রিয় সাফল্যই কামনা করে। সুতরাং সে কামনা করে সাহিত্যিক শৈল্পিক-বৈজ্ঞানিক সাফল্য। তার চোখে এগুলো হচ্ছে সহায়ক উপকরণ অথবা পথযাত্রীর শান্তি অপনোদনের মতো। পূজা কিংবা প্রতীক আশ্রয়িতার পর্যায়ভুক্ত করে না সে এটাকে আদৌ।

প্রতীচ্যের এক সংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞ বলেন : ইসলামী সংস্কৃতি বলতে ... তা যে কোন সূত্র হতেই উদগত হোক না কেন ... আমি ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের লব্ধ সংস্কৃতি বোঝাতে চাইনি। আর যে কোন উৎস থেকেই বিকাশ হোক না কেন, তা-ও বড় কথা নয়। বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতি বলতে আমি এমনি একটি ধর্মমত কর্তৃক স্বীকৃত কথা বলতে চাইছি, যাতে মানবিক অগ্রগতিই একটা নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য। যে সব মানুষ কোরআনের পথ-নির্দেশ অনুসরণ করে এবং তার বিধানসমূহ মেনে চলে, তাদের প্রতি মহাগ্রন্থ এ জগতে ও পরলোকে সাফল্যের যে প্রতিশ্রুতি দান করেছে আল-কোরআনে শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত কোন ব্যক্তিই তা অস্বীকার করতে পারে না। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সামগ্রিকভাবে গোটা মানবজাতির জন্য সাফল্য অর্জন। আর মানুষকে সৃজনধর্মী অবদান ও মৌলিক গুণগুলোর বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের ওপরই এর সাফল্য নির্ভরশীল। উন্মেষশীল মুসলিম সমাজের কোন প্রসারণ ব্যবস্থা আল কোরআন কিংবা মহানবীর কোন নির্দেশে বা আল হাদীসের অনুমোদিত না হলে বুঝতে হবে, তা ইসলামী বহির্ভূত এবং ইসলামী বিধি-ব্যবস্থার বাইরে তার অনৈসলামিক মূলানুসন্ধান করতে হবে। সাফল্যের পরিপন্থী হওয়ার কোন কারণ না ঘটলেও মুসলমানেরা তাদের সমাজ-জীবনে এগুলোর সংযোজন বা ফল গ্রহণ দ্বারা

www.pathagar.com

কোনরূপ সুফল আশা করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, কোন কর্মপন্থা আল-কুরআনের সুস্পষ্ট কোন বিধির পরিপন্থী হলে বুঝতে হবে তা ইসলামবিরোধী, আর এটা নিশ্চিতভাবে সাফল্য ও অগ্রগতিরও পরিপন্থী এবং একে গ্রহণ করলে মুসলমানেরা নিঃসন্দেহে এক অনিবার্য ধ্বংসের শিকার হবে। গোড়ার দিকে পৌত্তলিক আরবদের প্রতীক-পূজা এবং এর পংকিলতা ও মত্ততাময় রূপ-বৈচিত্র্যের সংগে সম্পৃক্ত ছিল বলে কতিপয় শিল্পকলাকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করে। কারণ, সমাজের এই প্রতীকবাদিতা ও এর পাপসর্বস্ব বৈশিষ্ট্যের মূলোৎপাটনের প্রয়োজন অনিবার্য ছিলো। তবে সুকুমার বৃত্তিজাত কাজগুলোর অনুরূপ পৃষ্ঠপোষকতা উভয়েরই গুরুত্ব অধস্তন বা গৌণধর্মী ছিলো। কেননা, ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য মানব জীবনের বাড়তি উপকরণগুলোর সৌন্দর্যবর্ধন, পরিমার্জন ও পরিশীলন নয়- বস্তুত সামগ্রিক মানবজীবনকে সুন্দরতর, মহত্তর, মহিমাময় করে তোলাই ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য।

ইসলামী সংস্কৃতির ন্যূনতম একটি প্রতিবাদী রূপ ফুটে উঠেছে আরবী ভাষাভাষী কবি আমহদ শাওকীর বেশ কিছু কবিতায়। মেয়েদের পর্দা প্রথার সাথে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের দিকে সংঘর্ষ বাধে নগ্নতার ও বেহায়াপনার। শাওকী এই সংঘাতের চিত্র তাঁর কিছু কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যদিও এখানে একান্তভাবে সমাজকেন্দ্রিক : ইসলামের প্রচারের বিষয়টি নেই। তবুও ইসলাম অসমর্থিত নয় :

'সুন্দরী!... ডাক শুনেই হলো প্রতারিত
স্তুতিই সব সুন্দরীকে ধোঁকায় ফেলে।
শুনে দেখ, আমার নামও ভুলেছে, যখন
ঘিরেছে তাকে প্রেমপিপাসু নটের দলে।
দেখলে আমায় অমনি ঘোরায় মুখটা, যেন
দুই হৃদয়ে প্রেম ছিল না কোনকালে।

এই কবিতায় কবি শাওকী পাশ্চাত্য নগ্নতার যে অস্থিরচিত্র এঁকেছেন তা পাশ্চাত্য নগ্ন-সংস্কৃতিরই স্বরূপ। কবি আহমদ শাওকীর আর একটি কবিতায় রয়েছে পর্দা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার জন্য তার অন্ধ অনুসরণের জন্য রীতিমত ধিক্কার। *নগ্নতা* কবিতার কিছু অংশ :

শুধাই ও মোর কোকিল রাণী
আমার গানের বুলবুলি
মা'বাদের সুর তোমার কণ্ঠে, কণ্ঠে তোমার মুওসেলী।
বন্দীনি মোর, হৃদয় তোমার ব্যথিত কিনা বিরহভারে
রাত কেটে যায় বিনিদ্র না
ঘুমাও পংকে নয়নভরে।
বন্দী তুমি, খাঁচায় আমি
ব্যাকুল তোমার প্রেমের টানে।
রাগ করো না মুক্তো-মানিক
সবাই লুকায় সংগোপনে।
উজাড় করে প্রেম দেব তাই
লুকিয়ে রাখি; স্নিগ্ধ-শাখে;
পক্ষ মেলে বের হয়ো না,
ভীড় করেছে শকুন, কাকে।

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যে নগ্নতা ও বেহায়াপনার ব্যাপারে, পরিপূর্ণ প্রত্যয়বাদী সাংস্কৃতিক যোদ্ধাদের সচেতন করবার লক্ষ্যে এবং ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ উন্মোচনের লক্ষ্যে ঐ কবিতার উদ্ধৃতি টেনেছেন প্রফেসর আল-আমীন। এবং বলেছেন :'কবে আবার মেয়েরা সমাজে চিৎকার শুরু করে দেয়, কবে না আবার বলে বসে আমাদের নারীদের অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে, ইউরোপের নারীদের মত অবাধ মেলামেশার দ্বারা উন্মুক্ত করতে হবে, সামাজিকভাবে বয়ফ্রেন্ডদের স্বামীর মর্যাদা দিতে হবে এবং তাকে পরিবারেরও সদস্য করে নিতে হবে।'

ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ, তার প্রকৃতি অনুধাবনের জন্যে আধুনিক বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ ড. মুহম্মদ ইকবালের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বক্তব্য তুলে ধরতে হচ্ছে :

১. জাতি, গোত্র, বংশ বর্ণ ও ভাষার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে বাস্তব বৈষম্য দূর করে এবং তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম তের শ' বছরে এমন একটা কৃতিত্ব অর্জন করেছে যা অপর ধর্মবিধানসমূহ তিন হাজার বছরেও করতে পারেনি। আমি বলতে চাই যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে উপলব্ধি ও অনুভূতির অতীত এক জীবনতাত্ত্বিক কর্মতৎপরতা, মিশনারী ব্যতীত মানব জাতির চিন্তা ও কর্মধারাকে প্রভাবিত করতে সমর্থ বর্তমান রাজনৈতিক চিন্তানায়কদের উদ্ভাবিত নববিধান প্রয়োগ করে সেই কর্মতৎপরতাকে অগ্রাহ্য করে দিলে যেমন মানবজাতির অনিষ্ট সাধন করা হবে, তেমনি যে নবুওতের বিশ্বজনীনতা থেকে তার জন্ম, তাকেও বিনষ্ট করা হবে।

২. দার্শনিক কবি, খাক্বানীর সমসাময়িক যে সব মুসলিম চিন্তানায়ক ভাবতেন যে, গ্রীক দর্শনের আলোকে ইসলামী সাহিত্যে ব্যাখ্যা করলেই জ্ঞানের পরিপূর্ণতা সম্ভব হবে, তাদেরকে লক্ষ্য করেই কবি এ পংক্তি ক'টি লিখেছেন। এর অর্থে সামান্য একটি পরিবর্তন করলেই তা আজকের দিনের মসুলিম চিন্তানায়কদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে :

দ্বীনের বাহন আমাদের
জন্ম লাভ করেছে আরবের মাটিতে,
চিহ্নিত করো না তার উরুদেশ
ইউনানী দাগে;
অপরিণত নয়া শিক্ষার্থী যারা,
বগলে তাদের দিও না
দুর্ভাগ্যের লিপি-ফলক।

৩. কোরানের মতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম-যা সাংস্কৃতিক অথবা রাজনৈতিক অনুভূতির দিক দিয়ে একটি জাতি কায়েম করে দেয়। এই কারণেই কোরান সুস্পষ্ট ঘোষণা করে যে, ইসলামের জীবন-পদ্ধতি ব্যতীত যে কোন পদ্ধতিকেই অস্বীকার করতে হবে। জ্ঞান এবং বুদ্ধির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ উদ্ভাসিত হয় ঐ দু'টি বিষয়ের যথার্থ বিকাশের মধ্যদিয়ে। মূলত ইসলামী সংস্কৃতি জ্ঞান এবং বুদ্ধির চর্চাকে অপরিহার্য করে, তার বিকাশের পরিপন্থী কোন মতাদর্শকে সে প্রশ্রয় দেয় না।

ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ উদ্ধারের জন্যে হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময়কালের একটি ঘটনা এবং হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রঃ) -এর আমলের একটি ঘটনাকে তুলে ধরা যায় : আদী ইবনে নযলা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর একজন প্রশাসক।

www.pathagar.com

অশ্লীল কবিতা পরিবেশনার খবর গেল খোদ ওমর ফারুক (রা:)-এর কাছে। আদীন ইবনে নয়লা অভিযুক্ত হলেন এবং পদচ্যুত হলেন।
হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের আমল। আমর ইবনে রবীয়া এবং আবুল আহওয়াস কবিতায় অশ্লীলতা প্রয়োগের অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন। ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র:) দু'জনকেই দেশান্তরিত করলেন। অবশ্য আমর ইবনে রাবীয়া পরে তওবা করেছিলেন এবং তার তওবাকে গ্রহণ করা হয়েছিল।
আগেই বলা হয়েছে, ইসালামী সাহিত্য ইসলামী সংস্কৃতির একটি বাহন। ইসলামী সংস্কৃতি কি ধরনের সাহিত্যের বিকাশধারাকে স্বাগত জানায় তা বুঝবার জন্যে ওপরে আমরা মাত্র দু'টি উদ্ধৃতি পেশ করেছি। কিন্তু ইংগিত দিয়েছি ইসলামী সংস্কৃতির অন্যান্য বাহনগুলোর মূলভিত্তি নীতি-পদ্ধতি কি হবে তারও।

উপসংহার

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মরহুম ড. হাসান জামান *সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য* গ্রন্থে সমাজ সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন : 'আমরা যদি আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বাদ দিয়ে আমাদের সমাজ সংগঠন করতে অগ্রসর হই, তবে আগে চলার ধাপ্‌পা আমাদের পেছনে দিকে টেনে নিয়ে যাবে ; তা হবে গতির নামে বিকৃতি ও পরের ধনে পোদ্দারি।'
সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সহনশীলতা, ধৈর্য ও আত্মনির্ভরতা আমাদের বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের তমদ্দুন ও জীবনদর্শনের যোগসূত্র সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা গঠনের ব্যাপারেও তিনি গুরুত্বারোপ করে বলেছিলেন : 'অজ্ঞানতা, অশিক্ষা-কুশিক্ষার কুয়াশা আমাদের জীবন ও জীবনবোধের আসল রূপ সম্পর্কে একটা ঘোলাটে ভার তৈরি করেছে; তাছাড়া ইসলামি সমাজও আমাদের দেশে এতদিন কায়েম হয়নি। কাজেই সাহিত্য, তমদ্দুন ও সমাজের সংগে আমাদের জীবনদর্শনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যোগসূত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ধারণা গঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে অপরিসীম।'
সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে উল্লিখিত উদ্ধৃতি অনুপ্রেরণাবহ সন্দেহ নেই।
বলা বাহুল্য, গত কয়েক দশকে আমাদের মূল্যবোধ ও শিক্ষাব্যবস্থার যে ব্যাপক অধঃপতন ঘটেছে তা আমাদের জাতির ভবিষ্যৎকে এক ভয়াবহ শূন্যতার সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। আমাদের জাতীয় প্রতিটি ক্ষেত্রই আজ শিক্ষা ও নৈরাজ্যের শিকার। এই অশিক্ষা ও নৈরাজ্যের অর্থাৎ সর্বৈব শূন্যতার আশু মোকাবেলা না করলে আমাদের দেশ ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ অভিভাবকহীন অরাজকতার মধ্যে অচিরেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে বলে ধরে নেয়া যায়।
সুতরাং একটি দুঃখজনক অন্ধকারকে প্রতিবাদহীনভাবে মেনে নেয়া শুধু অন্যায় নয়, অপরাধও। 'মানুষ বাঁচেনা, সে কিছু বাঁচিয়েও রাখে, তার বেঁচে থাকার রূপময়তা এবং বাঁচিয়ে রাখার ফলশ্রুতি নিয়েই গড়ে ওঠে সংস্কৃতি। দীর্ঘদিনের জীবন-চর্চার নিয়ম ও জীবন-চর্চার ফসল একত্রিত হয়ে সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ নির্মিত হয়। মানুষের স্বাধীন সত্তা তার

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক তৎপরতার মধ্যদিয়েই প্রতিফলিত হয়। নিজস্ব সংস্কৃতির সত্তা বজায় রেখে চলতে না পারলে জাতীয় অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। জাতি হিসেবে টিকে থাকা যায় না। আর জাতি হিসেবে টিকে থাকতে না পারলে দেশ থাকে না, দেশের স্বাধীনতা থাকে না।'

সত্যিকার অর্থে, সাংস্কৃতিক বিজয় ছাড়া রাজনৈতিক ও সামরিক বিজয়ও ক্ষণস্থায়ী হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে যদি আমরা মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বিকশিত হতে চাই তাহলে আমাদেরও অবশ্যই অচলায়তনের দ্বার ভেঙে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে উজ্জ্বল হতে হবে।

আজকাল আমরা প্রায়ই অপসংস্কৃতির কথা শুনে থাকি। অপসংস্কৃতির জয়-জয়কারে আমরা ভীত ও আতংকিত। সুস্থ ও নিরাপদ জীবন যাপন এখন আমাদের কাছে আকাংখার বিষয়। কিন্তু আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি কেন সমাজে অপসংস্কৃতি ও অসুস্থতার আবির্ভাব? আসলে সমাজে যদি সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড তথা ইসলামী সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতা জোরদার হতো এবং পত্র-পল্লবে বিকশিত হতো, তাহলে অপসংস্কৃতির বদলে সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের স্পন্দনে আমাদের মন-মানস ও সমাজ হতো স্পন্দিত। পৃথিবীতে কোন কিছুই শূন্য থাকে না। পৃথিবীর যে কোন অংগনেই ভালো বা মন্দ এ দু'য়ের যে কোনো একটি আসন গেঁড়ে বসবেই। এ দৃষ্টিভংগিতে এখন আমাদের অপসংস্কৃতির সয়লাবে ভীত ও আতংকিত না হয়ে সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে উদ্দীপ্ত হওয়া প্রয়োজন। মুসলিম জাহানের গৌরব ড. ইকবাল একদা বলেছিলেন:

শুধু অর্থনৈতিক সমস্যাই দেশের একমাত্র সমস্যা নয়। সাংস্কৃতিক সমস্যা মুসলিমদের পক্ষে আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রশ্ন অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে কোনক্রমেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ১৯৩২ সালের ২১ মার্চে এক বক্তৃতায় তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেছিলেন:

আমি... সবগুলো বড় বড় শহরে... সাংস্কৃতিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করি।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও চট্টগ্রামের এক সম্বর্ধনা সভায় আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন:

আমাদের ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম) হোক ওরিয়েন্টাল কালচারের পীঠস্থান-আরাফাত ময়দান। দেশ-বিদেশের তীর্থযাত্রীরা এসে এখানে ভীড় করুক।

সুতরাং সময়ের এক অকুণ্ঠ দাবী হচ্ছে: ইসলামী সংস্কৃতিকে জানা এবং যথার্থ ইসলামী সংস্কৃতি চর্চায় এগিয়ে আসা। #

www.pathagar.com

সংস্কৃতি ও ক্যালিগ্রাফি

ইব্রাহীম মন্ডল

আইয়্যামে জাহেলিয়াতের এক চরম সময়ে রাসূল (সঃ)-এর আবির্ভাব হয়। তিনি মানব জাতিকে ডাক দিয়েছিলেন অগ্নি, পাথর, মুর্তিপূজা, হিংসা বিদ্বেষ, হানাহানি, ও অন্যান্য পাপাচার ছেড়ে এক আল্লাহর পথে আসার জন্য। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে অনেকেই শান্তির পতাকাতলে হাজির হলেন। একত্ববাদে বিশ্বাসী এই জন সমষ্টিই মুসলমান। শান্তির ছায়াতলে ইসলামে দীক্ষিত এই জন সমষ্টির মাধ্যমে নতুন এক সভ্যতার জন্ম হয় যা পৃথিবীর জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। এই একত্ববাদে বিশ্বাসীদের মধ্যে যে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তাই ইসলামী শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি। জাহেলিয়াতের যুগে সাহিত্য, সংস্কৃতি দ্বারা গোত্রে হিংসার আগুন জ্বালানো, পরস্পর শত্রুতা সৃষ্টি, প্রতিশোধের স্পৃহা, হানাহানি, কাটাকাটি করতে উদ্বুদ্ধ করা হতো। অপরাধীদের ক্ষমা করা ছিল

www.pathagar.com

তখনকার সময়ের কল্পনাতীত। একত্ববাদ বিশ্বাসীদের শিল্প সাহিত্য, সংস্কৃতি ক্রোধ সংযত করা অপরাধীদের ক্ষমা করতে শেখায়। মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব ভালোবাসা ও সদ্ব্যবহার, সম্প্রীতি শিক্ষা দেয়। জীবনকে সম্মানিত করে তুলে অনাদর্শকে আদর্শবাদী, অজ্ঞ মুর্খকে নির্ভুল জ্ঞান ও সাহসহীন মানুষকে সাহসী ও নির্ভীক করে তুলে।

এ বিষয়ে উপমহাদেশের প্রখ্যাত পণ্ডিত, শিল্প সমালোচক সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন 'ইসলামী শিল্পের পূর্ণ বিকাশ লাভ করে ৮০০ থেকে ১৩০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে।' এই শতাব্দী যে দীপ্ত এবং ঔজ্জ্বল্য এই আধুনিক সভ্য পৃথিবীর কাছে উপস্থিত করেছে তা পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং পৃথিবীর যে কোনো সভ্যতার সঙ্গে বিচার করলে অতুলনীয় বিবেচিত হয়। মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে যখন সংস্কৃতি এবং সভ্যতার একটি আড়ষ্ট সীমা বন্ধন ছিল, একটি দুরন্ত নির্জরতায় পৃথিবীর সর্বত্র জড়িয়ে ছিল তখন ইসলামী সভ্যতা একটি স্বতন্ত্র উন্মুক্ততায় পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে। মূলত মুসলমানদের কারণেই পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পুনঃজাগরণের সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ বর্তমানে যা ইউরোপীয় রেনেসাঁ নামে অভিহিত। ইসলামের সংস্পর্শে না এলে তা কোনোক্রমেই সম্ভব হতো না। মুসলমানেরা স্পেন বিজয় করার ফলেই ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে নতুন সাড়া পড়েছিল। শিল্প সংস্কৃতির জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল।

মহান আল্লাহপাক জিব্রাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে আরবী ভাষায় রাসূল (সঃ) এর কাছে কোরআন অবতীর্ণ করেন। রাসূল (সঃ) লিখতে পারতেন না, সাহাবীরা আল্লাহর বাণী পাথরের গায়ে, দেয়ালে, গাছের ছালে লিখে রাখতেন। যারা এই আল্লাহর বাণী সুন্দর মনোরম করে লিখতেন তারাই কাতিব। কাতিবদের মর্যাদা ছিল অনেক উর্ধ্বে। রাসূল (স:) কাতিবদের ভালোবাসতেন। তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করতেন।

রাসূল (স:) এর জামাতা হযরত আলী (রা:) স্বয়ং ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। তিনি কোরআনের আয়াতকে চমৎকার করে লিখে রাখতেন। তিনি বলতেন, 'সুন্দর হস্তাক্ষর সত্যকে স্বচ্ছ করে তুলে।' আল্লাহ নিজে সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। যারা সৌন্দর্য চর্চা করেন তাদেরকেও তিনি পছন্দ করেন। সুতরাং ক্যালিগ্রাফি শিল্পের চর্চার মাধ্যমে যারা সুন্দরকে প্রচার করেন আল্লাহ তাদেরকেও পছন্দ করেন।

রাসূল (স:) ক্যালিগ্রাফি শিল্প এবং শিল্পীদেরকে পছন্দ করতেন ও এই শিল্পের প্রচার প্রসারে কাজ করেছেন। ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয় যে, বদরের যুদ্ধে যে সকল বন্দী মুক্তিপণ দিতে অক্ষম ছিল তাদের প্রত্যেককে দশ জন মুসলমানকে লেখাপড়া শিক্ষা দেয়ার শর্তে মুক্তি দেয়া হয়। এই শিক্ষাদানের মধ্যে ক্যালিগ্রাফিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ থেকেই ক্যালিগ্রাফির প্রতি মুসলমানদের প্রতি রাসূল (স:)-এর ভালোবাসার গভীরতা নিরূপণ করা যায়। সে সময়ে শুধু রাসূল (স:)-এর কাছে নয় মুসলমান সমাজের সর্বস্তরে ক্যালিগ্রাফি এবং ক্যালিগ্রাফি শিল্পীদের কদর ছিল। মুসলিম শাসকগণ শিল্পীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান ছাড়াও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করতেন। আব্বাসীয় আমলে রাষ্ট্রনায়কগণ ক্যাফিগ্রাফি চর্চা ও প্রসারে সতায়তা করেছেন।

অক্ষরকে বিশেষভাবে বিন্যাসের মাধ্যমে সুন্দর আকর্ষণীয় রূপ দেয়া এবং ইসলামী আদর্শকে সামনে রেখেই অতীতে সমগ্র বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে ক্যালিগ্রাফি চর্চা

www.pathagar.com

হয়েছে। পবিত্র কোরআনের সূরা আল বাকারার ৩১ নং আয়াতের আলোকেই বিশ্বাস করা হয় যেহেতু প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে আদম (আ:) কে অবহিত করা হয়েছে সেহেতু তাকে আরবী সম্পর্কেও অবগত করানো হয়েছে। এই বিশ্বাসের আলোকেই বিভিন্ন তথ্যে বলা হয়েছে যে, আদম (আঃ) এর পর তার পুত্র শীষ (আঃ) আরবী বর্ণ ও বিন্যাসের উৎকর্ষ সাধন করেন। এমনি ভাবেই বংশানুক্রমেই তারাই আরবী ভাষার বিকাশ সাধন করেছেন। আব্বাসীয় আমলে মুসলিম সভ্যতার যখন স্বর্ণযুগ তখন আরবী ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছিল বলে অভিমত পাওয়া যায়। এই তথ্য থেকেই আরবী ভাষা এবং ক্যালিগ্রাফি শিল্পের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

গ্রীক Kallos এবং Graphein শব্দ দু'টি মিলিত রূপ 'ক্যালিগ্রাফিয়া' থেকে ইংরেজি 'ক্যালিগ্রাফি' যার অর্থ 'সুন্দর লেখা' হস্ত লিখন শিল্প। স্থাপত্য শিল্পে রাসূল (স:)-এর ঐতিহাসিক নিদর্শন মদিনা মসজিদ আজ আধুনিক স্থাপত্যবিদদের কাছে বিস্ময়। বিংশ শতাব্দীর আধুনিক স্থাপত্যবিদরা গবেষণা করে মদিনা মসজিদকে আধুনিক স্থাপত্যের মডেল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইসলাম ধর্মের সাথে যেমন অন্যান্য ধর্মের পার্থক্য আছে, তেমনি পার্থক্য আছে শিল্প ও সংস্কৃতির। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মন্দির সবার জন্য উন্মুক্ত নয়, যারা ধর্ম প্রচার করেন শুধু তাদের অধিকার ও স্থান রয়েছে উপাসনা করার। তাই মন্দিরের অভ্যন্তরের প্রকোষ্ঠ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেখানে বাইরের আলো-বাতাসের শব্দ প্রবেশ করতে না পারে। পৃথিবীর কর্ম কোলাহল থেকে মুক্ত হয়ে উপাসনার স্থান হিসেবে নির্জন পাহাড় অজান্তেই বেছে নিয়েছিলেন। যেখানে পৃথিবীর কোলাহল স্পর্শ করতে পারেনি। ইসলাম ধর্মে সমস্ত ভূখণ্ড আল্লাহর। একজন মুসলমান যে কোনো স্থানে নামাজ আদায় করতে পারেন। ধর্মচর্চায় কোনো অন্তরায় নেই। উন্মুক্ততা ইসলামের একটা অংশ। মসজিদের নির্মাণ কাঠামোর ও প্রশস্ততায় সহজেই আলো-বাতাস প্রবাহিত হতে পারে। ভিতরের স্পেসের সাথে বাইরের স্পেসের একটা সংগতি আছে। সহজেই প্রবেশ করা যায়। কোথাও কোনো বাধা নেই। সবার জন্য উন্মুক্ত। ইসলামের এই উদারতাই তার স্থাপত্যে ব্যক্ত হয়েছে। রাসূলের (সা:) যুগে আরব উপদ্বীপে দুই ধরনের লোক বাস করত। এক দলকে বলা হত বেদুঈন- এরা নিছক মরুচারী যাযাবর ছিল। আর অন্য দলের লোকেরা থাকত শহরে। এই শহরের লোক সংখ্যা ছিল ১৫ থেকে ২০ হাজারের মত। দেশে দেশে ব্যবসা করত এরা। ইসলামী শিল্পকলা প্রথম বিস্তার লাভ করে মরুময় অঞ্চলে- তাঁবুতে থাকা মানুষের মধ্যে। তাঁবুতে বসবাসকারী থাকা মানুষের মধ্যে আসবাবপত্র খুব বেশি থাকে না। যাযাবর জীবনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হলে বেশি জিনিসপত্র নিয়ে চলাফেরা করা কষ্টকর। তাঁবুতে বসবাসকারী মানুষ প্রধানত তার শিল্পবোধের তৃপ্তি খুঁজেছে বয়ন শিল্পের মধ্যে। তাঁবুতে মানুষেরা গোড়া থেকেই সুন্দর গালিচা বুনতে চেয়েছে। এইসব গালিচা তাঁবুর মধ্যে বিছিয়ে পূরণ করতে চেয়েছে চাদরের অভাব। মরুভূমিতে পানির অভাব থাকায় পানি যোগাড় করে হিসেবে করে খরচ করতে না পারলে জীবন চলত না। এই প্রয়োজনে মৃৎপাত্র গড়ার দিকেও তাদের ঝোঁক ছিল। গালিচা, কাপড় ও মৃৎপাত্রের উপর ফুল, লতা-পাতা জ্যামিতিক নকশা এঁকেছে এরা। ইসলামে মানুষ ও জীবন-জন্তুর ছবি আঁকা অন্যায় বা হারাম বিবেচিত হওয়ার আল্লাহর

www.pathagar.com

শাস্তির ভয়ে তারা প্রাণীর ছবি অংকন পুরোপুরিভাবে বর্জন করেন। আঙ্গুর লতা-পাতা-ফুল দিয়ে নকশা করে মনের সৌন্দর্যবোধকে প্রকাশ করে তৃপ্তি খুঁজেছে।

ইসলামী শিল্পকলা বিকাশ লাভ করেছে মরুচারী যাযাবর জীবনের বাস্তবতাকে কেন্দ্র করেই। আরবরা আঙ্গুর লতার নকশা করত নানাভাবে। চেরাপাতাযুক্ত, পাক খাওয়া আঙ্গুর লতা ছিল এদের নকশার বিশেষ উপাদান। পরবর্তী যুগে ইসলামী বিশ্বে নকশা কলা বিশেষ জটিল হয়ে উঠে। ফুল-লতা-পাতা ও জ্যামিতিক আকার আকৃতি দিয়ে করা ইসলামী বিশ্বের বৈশিষ্ট্যসূচক নকশা সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়। বিভিন্ন ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শিল্পকলা। ইসলামে মানুষ ও জীব-জন্তুর ছবি আঁকা নিষিদ্ধ। তাই কোরআনে উল্লেখিত কোনো ঘটনাবলীকে চিত্রিত করতে অথবা মূর্তি নির্মাণের চেষ্টা হয়নি। খ্রিস্টীয় চিত্রকলা ও ভাস্কর্য সম্যকভাবে বুঝতে হলে পড়তে হয় অথবা জানতে হয় ইঞ্জিল কিতাবে (বাইবেল) বর্ণিত ঘটনাবলী। বৌদ্ধ ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শিল্পকে বুঝতে হলে জানতে হয় বুদ্ধের জীবন কথা, পড়তে হয় বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী। হিন্দু ধর্মকে কেন্দ্র করে যে শিল্পকলা গড়ে উঠেছে তাকে যথাযথভাবে বুঝতে হয়। পৌরাণিক উপাখ্যান জানতে হয়। কিন্তু মুসলিম শিল্পকলার মূল উপাদন ৪টি। (১) উদ্ভিদীয় পরিকল্পনা, (২) জ্যামিতিক আকার, আকৃতি ও রেখা। (৩) আরবী বর্ণমালা, (৪) বিশুদ্ধ অবিমিশ্র রং।

উদ্ভিদীয় পরিকল্পনায় বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়েছে ফুল ও লতাপাতা। জ্যামিতিক আকার-আকৃতির মধ্যে বৃত্ত, ঘনক, সরল ও বক্র রেখা বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্ভিদীয় ও জ্যামিতিক পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখা আরবী লিপি দিয়ে যে কোনোভাবে নকশা করা যায়। আরবী অক্ষরের সংখ্যা ২৯টি। এই অক্ষরগুলো আঁকাবাঁকা, খাড়া ও সমান্তরাল। এই অক্ষরগুলো সহজেই ফুল-লতা-পাতা ও জ্যামিতিক নকশার সাথে সঙ্গতি রেখে অলংকরণের কাজে ব্যবহার করা যায়।

চীন, জাপান বা অন্য কোনো দেশের বর্ণমালা এত সুন্দর করে আঁকা সম্ভবপর হয় না। তাই আরবী ক্যালিগ্রাফি ব্যাপক বিকাশ লাভ করেছে। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল কোরআনের ভাষা আরবী। বেহেশতের ভাষা আরবী। আরবী অক্ষর ইসলামি শিল্পকলাকে দিয়েছে বিশিষ্ট রূপ ও শিল্পগত ঐক্য। আরবী লিপিকলা ইসলামে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে জিবরাঈল (আঃ) প্রথম বাণী নিয়ে এসেছিলেন- 'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজী খালাক'। পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি (মানুষকে) সৃষ্টি করেছেন ঘনীভূত রক্তপিন্ড থেকে। পড় তাঁর নামে, যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। যিনি মানুষকে শিখিয়েছেন কলমের ব্যবহার, আর দান করেছেন সেই জ্ঞান যা ছিল মানুষের অজানা। (সূরা আলাক-আয়াত ১, ২, ৩, ৪)

ইসলামে প্রাণীর চিত্র আঁকার বিষয়টি বিতর্কিত। তাই চিত্রের স্থান দখল করে রয়েছে ক্যালিগ্রাফি। সুন্দর লিপিই হচ্ছে শিল্পের মাধ্যমে ধর্মের বাণী প্রচারের উপায়। কোরআনের বাণী হচ্ছে আল্লাহর বাণী, যা মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে। কাজেই এ ভাষার একটা অলৌকিকতা আছে। তাই যুগ যুগ ধরে কোরআনের সুন্দর লিখন পদ্ধতিতে ধারণ করে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং এক অর্থে হস্তলিখিত কোরআন অলৌকিক পদ্ধতিতে

www.pathagar.com

উচ্চাঙ্গ শিল্পে পরিণত হয়েছে। এই লিখন পদ্ধতি তাই অলৌকিকতা ধারণ করে রাখার চেষ্টা করেছে। সুতরাং হস্তলিখিত কোরআনের বাণী হচ্ছে অলৌকিক বাণী শৈল্পিক রূপব্যঞ্জনা। মুসলমানরা একে উচ্চাঙ্গ শিল্পে পরিণত করেছে। এই লিখন পদ্ধতির প্রকৃতি একক নয় বহুবিধ। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে একটি শৈল্পিক রূপ লক্ষ্য করা যায়। তা হচ্ছে অক্ষরগুলো লম্বা এবং সমান্তরাল স্বভাবের। এই দুই বৈপরীত্যের মাধ্যমে শিল্পীরা লিপি কর্মে সৌন্দর্য নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন আল্লাহ শব্দটিতে যে কয়টি অক্ষর আছে সে কয়টি লম্বা স্বভাবের। এই লম্বা স্বভাবটি সমান্তরাল স্বভাবের সাথে সমন্বিত হয়ে যে বৈচিত্র্য রূপ দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে তা লিপি কর্মে অতুলনীয়। ফুল লতাপাতা ও জিওমেট্রিক্যাল ফর্মের সাথে সঙ্গতি রেখে যে কোনো ভাবে এই লিপিকে উপস্থাপন করা যায়, যা অন্য কোনো ভাষার লিপি দ্বারা সম্ভবপর নয়। তাই আরবী ক্যালিগ্রাফি এত ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ করেছে। আধুনিককালেও আমরা দেখি ইরান, সুদান এবং নাইজেরিয়ার এই লিপিশিল্প অসাধারণ সৌন্দর্য মন্ডিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

এই লিখন পদ্ধতি পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্পকলায় প্রভাব বিস্তার করেছে। তার প্রমাণ আমরা পাই বিখ্যাত শিল্পী পলক্লীর বিভিন্ন চিত্রকর্মে। পলক্লীর 'ডকুমেন্ট' বা দলিল বলে একটি ছবির রেখাঙ্কনেও আমরা আরবী লিখন পদ্ধতির প্রভাব লক্ষ্য করি। কোরআনের বিভিন্ন আয়াত সুন্দর হস্তাক্ষরের মাধ্যমে বিশেষভাবে গেঁথে দেবার চেষ্টা হয়েছে। আরবী ক্যালিগ্রাফি ইউরোপীয় শিল্পেও প্রভাব বিস্তার করেছে। আরবী না জেনেও ইউরোপীয়রা আরবী লেখার অনুকরণে নকশা করেছে। কাপড়ের বুননে নকশাতে আরবী লিপিকলার অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাকে আমরা দেখি না কিন্তু তাঁর বাণী তেলাওয়াতের সময় আমরা দেখি। কাজেই শিল্পীরা অক্ষরগুলোকে হৃদয়গ্রাহী করার জন্যে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছেন এবং তারা এ কাজকে আল্লাহর ইবাদত মনে করেছেন। এ জন্যেই ক্যালিগ্রাফি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র। কোরআনের এই ভাষাকে অবলম্বন করে যে লিখন শিল্প মুসলিম দেশগুলোতে গড়ে উঠেছিল, তা সমস্ত বিশ্বের জন্যে অতুলনীয় শিল্প সম্পদ। বলা যেতে পারে পৃথিবীর শিল্পের বিমূর্ততার উদ্ভব এখান থেকেই।

আধুনিক শিল্প আন্দোলনের অন্যতম দিকপাল পাবলো পিকাসোর জন্ম স্পেনের আনদালুসিয়া অঞ্চলে। এই অঞ্চল আরবদের অধীন ছিল প্রায় ৭শ' বছর। এখানকার নকশায় ইসলামি জ্যামিতিক মন্ডন কলার প্রভার খুবই ব্যাপ্ত। পিকাসোর ছবিতেও জ্যামিতিক নকশার প্রভাব আছে। আধুনিক শিল্প আন্দোলনের বিখ্যাত শিল্পী আরি মাতিস তাঁর ছবির অনুপ্রেরণা পান ইরানী গালিচা থেকে। তাঁর ছবির রং ও ফর্ম গালিচা থেকে নেয়া। তিনি তার শিল্পে অবিমিশ্র রং-এর পাশাপাশি সংস্থাপনের মাধ্যমে রং-এর আবেদন ফুটিয়ে তুলেছেন। বিংশ শতাব্দীর চিত্রশিল্পে ইসলামি শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রভাব পড়েছে। বিমূর্ত শিল্পের জনক মন্ডিয়ান, পলক্লে এদের চিত্রেও ক্যালিগ্রাফি শিল্পে মুগ্ধ হয়ে বিমূর্ত শিল্পের জন্ম দিয়েছেন। বিমূর্ত শিল্পের ফিগার নেই ফর্ম আছে। শিল্পীরা ক্যালিগ্রাফির আদলে ফর্ম ব্যবহার করেছেন তাদের চিত্রকর্মে।

পৃথিবীর সবগুলো দেশেই আজ ইসলামি শিল্প নিয়ে নিরীক্ষা চলছে, ধর্মগত কারণে নয়,

www.pathagar.com

শিল্পের বৈশিষ্টগত কারণে। কাজেই ইসলামি শিল্পধারা একটি স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী শিল্পধারা হিসাবে আজ পরিগণিত।

অর্থাৎ কোরআনিক কালচার ক্যালিগ্রাফি নিয়ে বাংলা ও ৭০ থেকে ৮০ দশক পর্যন্ত অনেক খ্যাতিমান শিল্পী কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে মুর্তজা বশীর, শামসুল ইসলাম নিজামী, খুরশিদ আলম, অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, সাইফুল ইসলামসহ আরও অনেক শিল্পী। সঠিক পৃষ্ঠপোষকতার কারণে তেমন বিকাশ ঘটেনি। ৯ এর দশক থেকে বাংলাদেশেও কোরআনিক কালচার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয় সাহিত্য ও শিল্পের বিভিন্ন শাখায়। দেশের এক দল তরুণ এই ধারা পূর্ণজাগরণের আন্দোলনে নিয়োজিত। তারা শিল্প, সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে কাজ করতে থাকে। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র নামক সংগঠন গড়ে উঠে। যার রয়েছে শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমের ১৭টি শাখা। তাদের উদ্দেশ্যেই ইসলামী কালচার তথা কোরআনিক কালচার কে সমৃদ্ধ করে ব্যাপক ভাবে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করা।

দেশের ক্যালিগ্রাফারদের নিয়ে গঠিত হয় 'ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ'। পবিত্র সীরাতুন্নবী (স:) উপলক্ষে ৫টি ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী জাতীয় জাদুঘর লবিতে পক্ষকাল ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। প্রচুর দর্শক সমালোচকের মধ্যে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়, দেশের শীর্ষ পর্যায়ের শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন, মিডিয়াগুলোতে সাড়া পড়ে। এর ফলে সামাজিক ভাবেই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ক্যালেণ্ডার, ভিউ কার্ড, গৃহ সম্ভারসহ মসজিদ ডেকোরেশনে ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার বেড়ে যায়।

কোরআনিক কালচার এবং ইসলামী শিল্পের এই মাধ্যম ক্যালিগ্রাফি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখা-লেখি হয়।

দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে প্রচুর সুনাম কুড়িয়েছে। বিভিন্ন দেশের আমন্ত্রণে প্রদর্শনী করে আসছেন। এর মাধ্যমে মুসলিম দেশ সমূহের সাথে ইসলামিক কালচারে একটা সেতুবন্ধন তৈরী হচ্ছে।

আজ শুধু বাংলাদেশেই নয় সারাবিশ্বে সংস্কৃতির নামে চলছে অশ্লীলতা বেহায়পনা। চলছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। আজ মুসলমানরা জুলুম নির্যাতনের শিকার। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের কোরআনিক কালচারকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

আমরা বিশ্বাস করি, শিল্প শুধু শিল্পের জন্য নয়, শিল্প সত্যের জন্য, শিল্প সুন্দরের জন্য। ইসলামি শিল্প বিশেষ করে ক্যালিগ্রাফি সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, সুনীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, শুভ চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে, মানব চরিত্র উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। ধর্ম মানুষকে শুদ্ধ করে এবং শুভ কাজে অনুপ্রাণিত করে, ধর্মের সঙ্গে যে শিল্পের সম্পর্ক সে শিল্প কল্যাণকর হবেই। সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বর্তমান বিশ্বে ইসলামের পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছে। এর সাথে প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা পেলে বাংলাদেশেও ইসলামী কালচার ক্যালিগ্রাফি শিল্পের পুনর্জাগরণ ঘটবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। #

www.pathagar.com

ইকবাল দর্শনে সংস্কৃতি

ড. আবদুল ওয়াহিদ

জাতি পুনর্গঠনের জন্য দার্শনিক কবি ইকবাল 'স্বীয় উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত' কোন দর্শন হাজির করেননি। তিনি মুসলিম মিল্লাতকে আহবান জানিয়েছেন কুরআনের দিকে ফিরে আসার (Back to Quran)। ইকবাল মুসলমানদের সামনে নতুন কোন দর্শন নিয়েও দাঁড়াননি। তিনি উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন আত্মবিস্মৃত মুসলিম জাতিকে কুরআন অধ্যয়নের, বিশুদ্ধ হাদীস অধ্যয়নের, সোনালী অতীত ইতিহাসকে অধ্যয়ন করে নিজেদের ভুলত্রুটি শুধরে আবার পৃথিবীর মানুষকে কল্যাণ রাষ্ট্র তথা কুরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে। যে সমাজে আমীর-গরীব, ধনী-নির্ধন, উঁচু-নিচুর ব্যবধান থাকবে না। যে সমাজে অন্যায় থাকবে না, থাকবে না পৈশাচিকতার চিহ্ন মাত্র। যে সমাজের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যেভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায সম্মিলিতভাবে প্রতিষ্ঠা করে, অনুরূপ সম্মিলিতভাবেই বিধান অনুযায়ী সমাজের আর পাঁচটি কাজও আঞ্জাম দেবে যেভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেরা গুহা থেকে মানবতার মুক্তি সনদ কুরআনুল কারীম মানব সমাজে নিয়ে এসে জাহেলিয়াতের অমানিশাকে দূরীভূত করে তদানীন্তন মূর্খ-বেদুঈন মরুদ্যানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সর্বজনগ্রাহ্য ও মান্য সুশীল সমাজ। আজকের

www.pathagar.com

প্রেক্ষাপটে যারা সুশীল সমাজের স্লোগান উচ্চকিত করে, মানবতার কথা বলে, মানবাধিকারের বায়না ধরে, সন্ত্রাস নির্মূলের হাঁক-ডাক দিয়ে, গণতন্ত্রের গাল ভরা বুলি আওড়িয়ে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে হাবাগোবা পেয়ে যাচ্ছে তা-ই করে যাচ্ছেন, ঐ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠাতাগণ কখনো মিথ্যার বেসাতি করেছেন-এমন নজির বিশ্ব ইতিহাসে কেউ দেখাতে পারবে না। সেই সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে ইকবাল বুকটান করে দাঁড়িয়েছিলেন। নেতিয়ে পড়া মুসলমানদের পুনর্জাগরণের আহবান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন পাশ্চাত্যের কৃত্রিম আলেয়ার আলো থেকে মুসলমানদেরকে ফিরে আসতে নিজেদের ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপটে। এ জন্যে তিনি ইউরোপের মরীচিকার মুখোশকে খুলে দিয়েছিলেন মুসলমানদের সামনে। হতাশাদীর্ণ জাতিকে কাব্যাঘাত করে গদ্য-পদ্যে, বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করে আত্মবলে বলিয়ান হয়ে মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে আহবান জানিয়েছেন।

ইকবাল ভবিষ্যত কার্যসূচী হিসেবে মনে করেন আংশিকভাবে রাজনৈতিক ও আংশিকভাবে সাংস্কৃতিক কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। এ লক্ষ্যে তিনি কয়েকটি প্রস্তাবনাও পেশ করেন।

প্রথমত: আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে, বর্তমানে যারা রাজনৈতিক সংগ্রামে ভারতীয় মুসলিমদের কার্যকলাপের পথনির্দেশ করছেন বলে মনে করা হয়, তাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে এখনো এক ধরনের বিশৃংখলা রয়েছে। এই পরিস্থিতির জন্য অবশ্য জাতির উপর দোষারোপ করা চলে না। দেশের যে সব ব্যাপারের সাথে মুসলিম জনগণের ভাগ্য জড়িত রয়েছে, তার জন্য আত্মত্যাগের মনোভাব তাদের মধ্যে মোটেই নেই। আমি যা বলছি, সাম্প্রতিক ইতিহাস তার যথেষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে। দোষ যা কিছু, তা আমাদের, তাদের নয়। জাতিকে যে পথনির্দেশ দেওয়া হয়, তা সব সময়েই স্বাধীনভাবে পরিকল্পিত নয় এবং তার ফল হচ্ছে সংকট মুহূর্তে আমাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাঙন। এই কারণেই এসব প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক সংহতির জীবন ও শক্তির পক্ষে অপরিহার্য প্রয়োজনীয় ধরনের শৃংখলা সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারে না। এই দোষের প্রতিকারের জন্য আমি প্রস্তাব করছি যে, সমগ্র দেশব্যাপী প্রাদেশিক ও জেলা শাখাসহ ভারতীয় মুসলিমদের একটিমাত্র রাজনৈতিক সংস্থা থাকা প্রয়োজন। আপনারা তাকে যে কোন নাম দিতে পারেন। অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে, তার গঠনতন্ত্র এমন হওয়া প্রয়োজন হবে, যাতে যে কোন রাজনৈতিক চিন্তাধারাসম্পন্ন দলের ক্ষমতা লাভের ও তার নিজস্ব আদর্শ ও পদ্ধতি অনুযায়ী জাতির পথনির্দেশ করার সম্ভাবনা থাকে। আমার মতে ভারতে ইসলামের সর্বোত্তম কল্যাণের জন্য ভাঙনের সম্ভাবনা রোধ করার এবং আমাদের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে পুনরায় সুসংহত ও শৃংখলানুসারী করার এই হচ্ছে একমাত্র পন্থা।

দ্বিতীয়ত: আমি প্রস্তাব করি যে, অবিলম্বে এই কেন্দ্রীয় সংস্থার অন্ততঃপক্ষে ৫০ লক্ষ টাকার একটি জাতীয় তহবিল সংগ্রহ করা প্রয়োজন। নিঃসন্দেহে আমরা এক কঠিন সময় অতিবাহিত করে চলেছি, কিন্তু আপনারা নিশ্চিত জেনে রাখবেন যে, ভারতের মুসলিম জনগণকে যদি বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়, তা হলে তারা আপনাদের ডাকে সাড়া দিতে পশ্চাৎপদ হবে না।

তৃতীয়ত: আমি এই কেন্দ্রীয় সংস্থার নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশের অধীনে দেশব্যাপী তরুণ সংগঠন ও সুসজ্জিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের প্রস্তাব করছি। তারা বিশেষ করে আত্মনিয়োগ

www.pathagar.com

করবে সমাজ-সেবা, রীতিনীতির সংস্কার, জাতির ব্যবসায় সংক্রান্ত সংগঠন এবং শহরে ও পল্লীতে অর্থনৈতিক প্রচারের কাজে। এই অর্থনৈতিক প্রচার বিশেষ করে করতে হবে পাঞ্জাবে, যেখানে মুসলিম কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের প্রচুর ঋণের বোঝা ভূমিবিপ্লবের কঠোর প্রতিষেধকের জন্য প্রতীক্ষা করতে পারে না। ১৯২৫ সালে চীনে যখন চাষী সংগঠন গড়ে উঠেছিলো, এখানকার পরিস্থিতিও তেমনি ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে বলে মনে হয়। সাইমন রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে, চাষী তার সম্পত্তির একটা বিশেষ অংশ রাষ্ট্রকে দিয়ে দিচ্ছে। রাষ্ট্র তার পরিবর্তে নিঃসন্দেহে তাকে দেয় শান্তি ও নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। কিন্তু এসব আশীর্বাদ প্রাপ্তির মোট ফল দাঁড়িয়েছে কেবলমাত্র এক ধরনের বৈজ্ঞানিক উপায়ে কর আদায়, যান্ত্রিক উপায়ে প্রস্তুত পণ্য দ্বারা গ্রাম্য অর্থনীতির ধ্বংসসাধন এবং উৎপন্ন ফসলকে বাণিজ্যের আওতাভুক্ত করা যার ফলে চাষীদের প্রায় সব সময়েই মহাজন ও ব্যবসায়ী দালালদের শিকারে পরিণত হতে হচ্ছে। বিশেষ করে পাঞ্জাবে এটা একটা অত্যধিক গুরুত্বপর্ণ ব্যাপার। আমি আশা করি, প্রস্তাবিত তরুণ সংগঠন এ সম্পর্কে প্রচার কার্যের বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং পাঞ্জাবের চাষীদেরকে বর্তমান দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের ব্যাপারে সাহায্য কররে। আমার মতে, ভারতে ইসলামের ভবিষ্যত বহুলাংশে নির্ভর করবে পাঞ্জাবের মুসলিম চাষীদের স্বাধীনতার উপর। জীবনের দীপ্তি বৃদ্ধির জন্য এবং আমাদের ভাবী বংশধরদের কর্মের নতুন জগৎ তৈরীর উদ্দেশ্য ঈমানের অগ্নির সাথে মিলিত হোক তারুণ্যের অগ্নিশিখা। একটি সম্প্রদায় বলতে কেবল নিছক বর্তমান ও গণনা করার মতো নর-নারীর একটি সমষ্টি বোঝায় না। বাস্তবিকপক্ষে জীবন্ত বাস্তব হিসেবে তার জীবন ও কার্যকলাপকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় না তার অন্তর্নিহিত সত্তার গভীরে ঘুমন্ত অজাত অসীমতার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করে।

চতুর্থত: আমি ভারতের সবগুলো বড়ো বড়ো শহরে পুরুষ ও মহিলাদের সাংস্কৃতিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করি। এই সব শিক্ষাকেন্দ্রের রাজনীতির সাথে কোন সম্পর্ক থাকবে না। মানব জাতির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ইসলাম ইতোমধ্যে কি কি কৃতিত্ব অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট অনুভূতি সঞ্চার করে আমাদের তরুণ সমাজের অন্তরে ঘুমন্ত উদ্যমকে সুসংহত করাই হবে তাদের প্রধান কাজ। একটি জাতিকে বিচ্ছিন্ন খন্ড জীবনের সমষ্টি হিসেবে নয়, বরং অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতিসম্পন্ন সুনির্দিষ্ট সমগ্য হিসেবে উপলব্ধি করার ও তার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করার মতো ব্যক্তিমনের বিশালতা আনয়নের উপযোগী নতুন কর্তব্য পেশ করেই কেবলমাত্র একটি জাতির প্রগতিশীল দলসমূহকে জাগ্রত করে তোলা যায়। এ শক্তিকে জাগ্রত করা গেলে তারা আনয়ন করে নতুন সংঘাতের নব নব উদ্যম এবং সেই অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার অনুভূতি, যা ভোগ করে প্রতিরোধক্ষমতাও বয়ে আনে নতুন সত্তার প্রতিশ্রুতি। এই সব শিক্ষাকেন্দ্র একক উদ্দেশ্যের অনুসারী আমাদের শিক্ষা-প্রচেষ্টাসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে চলবে। এখনই আমি একটি প্রস্তাব আপনাদের সামনে পেশ করতে পারি। রাজনৈতিক সমস্যার চাপে হার্টগ কমিটির অন্তর্বর্তী রিপোর্ট এখন স্পষ্টত সবাই ভুলে গেছে। তাতে নিম্নলিখিত যে সুপারিশ করা হয়েছিলো, তাকে আমি ভারতীয় মুসলিমদের পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করি।

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, যে সব প্রদেশে ধর্মীয় অসুবিধার দরুন মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষার অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়েছে, সেখানে উক্ত সম্প্রদায় যাতে শিশুদেরকে সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঠায়, তার অনুরূপ ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে সরকারী ব্যবস্থা মিতব্যয় ও যোগ্যতা- উভয় দিকে দিয়ে লাভবান হবে এবং উক্ত সম্প্রদায়কে শিক্ষায় পশ্চাৎপদ অবস্থার ফলোদ্ভূত বাধা ও কলংক থেকে মুক্তিলাভে যথেষ্ট সহায়তা করা হবে।

আমরা পূর্ণরূপে অবহিত যে, এই ধরনের ব্যবস্থা কার্যকরী করা সহজসাধ্য নয় এবং অন্যান্য দেশে তাতে যথেষ্ট বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু আমাদের মতে, বাস্তব পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টার উপযুক্ত সময় এসে গেছে। পুনর্বার বিশেষ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে রিপোর্টের ২০৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে। 'সুতরাং সরকার পদ্ধতির মধ্যে বর্তমানে ও সম্ভবত আগামী কিছুকালের জন্যে যদি এমন বিশেষ ব্যবস্থা করা যায়, যাতে মুসলিম সম্প্রদায় জাতীয় অগ্রগতিতে পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ করতে পারে, তাহলে তা আমাদের মতে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক অথবা সুষ্ঠু শিক্ষাসংক্রান্ত নীতির সাথে অসামঞ্জস্যমূলক হবে না। এরূপ কোন বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই বলতে পারলেই আমরা খুশি হতাম এবং আমরা আশা করি, এরূপ বিশেষ ব্যবস্থা যথাসম্ভব কম হবে। শিক্ষা-ব্যবস্থায় জটিলতা সৃষ্টির কারণ হিসেবে এরূপ ব্যবস্থা অবাঞ্ছিত, কিন্তু যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি মুসলিম সম্প্রদায়ের বর্তমান পশ্চাৎপদ অবস্থা ও পৃথক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত স্বল্প সম্ভাবনার তাদেরকে সীমাবদ্ধ রাখার বিকল্প পন্থা হিসেবে এই ধরনের ব্যবস্থার প্রয়োজন, সেই কারণে জাতীয় নীতির ব্যাপক যুক্তিতে উক্ত বিকল্প পন্থাকে যুক্তিসংগত বলে গ্রহণ করতে আমরা কুণ্ঠাবোধ করছি না।

প্রস্তাবিত সাংস্কৃতিক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহকে অথবা তাদের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত নিখিলভারত মুসলিম সম্মেলনকে অবশ্যই দেখতে হবে, যাতে এই সব সুপারিশ কার্যে পরিণত করা হয়, কারণ এই সুপারিশ আমাদের সম্প্রদায়ের বর্তমান প্রতিবন্ধক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার ভিত্তিযুক্ত।

পঞ্চতম: আমি একটি ওলামা পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করি। তার ভিতরে এমন সব মুসলিম আইনজীবীও থাকবেন, যাঁরা আধুনিক আইন সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেছেন। আমার ধারণা হচ্ছে ইসলামী কানুন সংরক্ষণ ও প্রয়োজন হলে আধুনিক অবস্থার আলোকে তার পুনর্ব্যাখ্যা দান এবং তার সাথে তার মৌখিক নীতির সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখা। এই প্রতিষ্ঠানকে অবশ্য শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি লাভ করতে হবে, যাতে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন সংক্রান্ত কোন বিল এই পরিষদের পরীক্ষার পর্যায় অতিক্রম করার পূর্বে বিধান সভার সম্মুখে উথাপিত হতে না পারে। ভারতীয় মুসলিমদের জন্য নিছক বাস্তব মূল্য উপলব্ধি ছাড়াও আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, আধুনিক দুনিয়ার মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের- ইসলামী আইন সাহিত্যের অন্তমূল্য ও পুঁজিবাদী দুনিয়ার পক্ষে তার তাৎপর্য এখনও দীর্ঘকাল পূর্বে মানুষের অর্থনৈতিক আচরণের নিয়ন্ত্রণ- সীমা অতিক্রম করে গেছে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আমার প্রস্তাবিত পরিষদ অন্তত এদেশে ইসলামের স্বাভাবিক নীতির গভীরতর উপলব্ধি এনে দেবে।

এভাবে ইকবাল একটি কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বিজ্ঞজনোচিত দিক-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন আমৃত্যু। #

www.pathagar.com

মিডিয়া ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

সরদার ফরিদ আহমদ

বিশ্বখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী তার এক গ্রন্থে লিখেছেন, বর্তমানে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি- এই তিনটি বিষয় জানা না থাকলে সত্যিকারের মুসলমান হওয়া যায় না। জনাব কারযাভীর এই বক্তব্য বড় ধরনের ভাবনার জন্ম দেয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের অবস্থান কোথায়?

একই সাথে আরেকটি প্রশ্ন উঠতে পারে, বর্তমান বিশ্বে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করে কে বা কারা এবং কীভাবে? এর উত্তরে যদি বলি মিডিয়া, তাহলে হয়তো অনেকে চমকে যাবেন। অথবা বিশ্বাস করতে চাইবেন না। কিন্তু বাস্তবতাকে তো আর অস্বীকার করা যাবে না।

'গণমাধ্যম শাসন করবে বিশ্বকে'- এই স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞদের। উইলবার শ্রাম, ডেভিট কে বার্লো, শ্যানন, ওয়েভার, মার্শাল ম্যাকলুহান প্রমুখ গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব গণমাধ্যমের ওপর দীর্ঘদিন ধরে যে সকল গবেষণা করে গেছেন সেসব গবেষণার ভবিষৎবাণী খাটছে গোটা বিশ্বে।

গণমাধ্যমের ওপর বিশ্বব্যাপী মানুষের এই তথ্য নির্ভরতা আসলে পরোক্ষভাবে গণমাধ্যমেরই শাসন। মানুষ তথ্যের জন্য যতোই

www.pathagar.com

গণমাধ্যমের ওপর তার নির্ভরতা বাড়াচ্ছে, একট অসাধু চক্র ততোই গণমাধ্যমকে বাণিজ্যের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তাদের লক্ষ্য জনসেবা নয়, গণমাধ্যমের শক্তিকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করে জনগণকে বিভ্রান্তির ঘোলা পানিতে ডুবিয়ে রাখা। এতে ওই অশুভচক্রের লাভ। লাভ দু'ভাবেই- প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ।

গণমাধ্যমগুলো কি কি?

গণমাধ্যমের ইংরেজি 'মিডিয়া' (Media) আজ আমাদের কাছে 'গণমাধ্যম'-এর চেয়ে বেশি পরিচিত। 'গণমাধ্যম' বললে আমরা সহজে বা তাড়াতাড়ি বুঝি না বা বুঝতে চাই না। কিন্তু মিডিয়া বললে কেমন যেন পরিচিত মনে হয়। অনেকটা সহজে বুঝতেও পারি। এই যে বুঝতে পারা আবার না পারা তাও কিন্তু মিডিয়ার কারণেই হয়েছে। এখানে 'মিডিয়া' 'গণমাধ্যম'কে কেমন যেন দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এ কারণেই আমরাও 'গণমাধ্যমে'র পরিবর্তে 'মিডিয়া'ই ব্যবহার করেছি।

মিডিয়া কোনগুলো তা আগে জানা দরকার। মিডিয়াকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

১. প্রিন্ট মিডিয়া ঃ বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা।

২. ইলেকট্রনিক মিডিয়া ঃ রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, ইন্টারনেট।

এছাড়া জনসভা, সমাবেশ, মিছিল, হ্যান্ডবিল, খেলাধুলা, পোস্টার এগুলোও কম-বেশি মাত্রায় মিডিয়ার এক একটি ফর্ম (Form) বা টুল (Tool)। সভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এ সকল মিডিয়া মানুষের তথ্যের অভাব পূরণ করে আসছে বিভিন্ন কায়দায়। যোগাযোগের একাধিক উপাদানকে সুন্দর সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে কাজে লাগিয়ে মিডিয়া রূপান্তরিত হয় শক্তিশালী মিডিয়ায়।

কিছুদিন আগেও বইপুস্তক, সাংবাদপত্র, রেডিও ও চলচ্চিত্র আলোচিত মিডিয়া ছিল। এখন এর সঙ্গে যোগ হয়েছে টেলিভিশন ও ইন্টারনেট। এই দুটো মিডিয়ার প্রবল উপস্থিতির কাছে অন্যান্য মিডিয়া খানিকটা পেছনের সারিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সংবাপত্র কিন্তু এই দুটো ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে একটুও ছাড় দেয়নি। সে নিজে সগৌরবে তার অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এখনো তথ্যের জন্য সংবাদপত্র সম্ভবতঃ প্রধান ভরসা। এই ফাঁকে একথাও স্বীকার করে নেয়া উচিত্ যে, বিনোদনের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র থেকে অনেক অনেক এগিয়ে গেছে টেলিভিশন।

বই-পুস্তক

কমপিউটার ও অফসেট পুস্তিকার ছোঁয়ায় মুদ্রণ মাধ্যমে বৈপ্লবিক বিকাশ ঘটেছে। প্রিন্ট মিডিয়া দিনকে দিন আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। নানা উপাদান ও মাত্রাও যুক্ত হচ্ছে এ মিডিয়ায়। এ কারণে আমরা দেখি ঢাকা থেকেও আন্তর্জাতিক মানের বইও বের হচ্ছে।

বই প্রিন্ট মিডিয়ার অভিজাত রূপ। দেশে এখন বছরে কয়েক হাজার বই প্রকাশিত হয়। শুধু বাংলা একাডেমীর বই মেলায় গড়ে বছরে এক হাজার নতুন বই বের হয়। এছাড়া *ঢাকা বইমেলা* নামে আরো একটি বই মেলা বসে ঢাকায়। বাংলাদেশে বই পুস্তক প্রকাশনার সঙ্গে হাজার হাজার লোক জড়িত।

বাংলাদেশে প্রকাশিত বইয়ের বাজার কিন্তু মোটেই ছোট নয়। এর কারণ তিনটি ঃ এক. গোটা দেশের মানুষই বাংলা ভাষায় কথা বলে। দুই. দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি। সংখ্যাটা গ্রাহ্য করার মতো। তিন. শিক্ষিতের হার বাড়ছে। তরুণরা বই কিনছে। একটা কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, বাংলাদেশে দু'জন লেখক তরুণদের বই পড়ার

www.pathagar.com

অভ্যাস গড়ে দিয়েছেন। এদের একজন *সেবা প্রকাশনীর* কাজী আনোয়ার হোসেন, অপরজন হুমায়ূন আহমেদ।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলামী আন্দোলনের তরুণ কর্মীদের সবাইকে বই পড়তে হয়। এটা বাধ্যতামূলক। এ কারণেই এদেশে ইসলামী সাহিত্যের একটি বিশাল বাজার গড়ে উঠেছে। স্বভাবগত দিক থেকে এদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ। সে কারণেও ইসলামী বইয়ের চাহিদা সর্বত্র। সুসংবাদ যে, ইসলামের প্রতিটি বিষয়ের ওপর বাংলা ভাষার অত্যন্ত চমৎকার চমৎকার গ্রন্থ রয়েছে। বাংলাদেশের যে কোনো শিক্ষিত মানুষ বাংলাতেই ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানতে পারেন।

ঢাকাতে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের বাজার নিয়ে কয়েকটি কথা বলা দরকার। এটা স্পষ্ট যে, কলকাতার বাংলা বইয়ের প্রধান বাজার বাংলাদেশ। ২০০০ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার কলকাতার *আনন্দ পাবলিশার্স*কে ঢাকায় সরাসরি ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু দেশের সচেতন মানুষের প্রচণ্ড বাধার মুখে তা বাস্তবায়িত হতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষা এখন মৃত সংস্কৃতি। সেখানে বাংলা বই চলে না। কারণ সেখানকার তরুণরা বাংলা বই পড়ে না। কলকাতার বাংলা বইয়ের প্রকাশকদের যতো পুঁজি হয়েছে তার সবটা আমাদের বাজারের। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা যতটুকু টিকে আছে তা কেবল রাজ্যের মফস্বল এলাকার জন্য।

বাংলাদেশে কলকাতার বাংলা বই এবং পত্র-পত্রিকার মার্কেট যে কত বড় তার দুটি উদাহরণ দেয়া যাক। ১৯৯২ সালে *সাপ্তাহিক দেশ* একটি লেখায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে *তথাকথিত বাংলাদেশ* বলে অভিহিত করে। প্রতিবাদের ঝড় ওঠে বাংলাদেশে। সরকার *সাপ্তাহিক দেশ*-কে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হবার কয়েক সপ্তাহ পরেই *সাপ্তাহিক দেশ* রূপান্তরিত হয় পাক্ষিক-এ। অর্থাৎ *দেশ*-এর বাংলাদেশের বাজারটি এতোই বিশাল ছিল যে বাংলাদেশে ওটা নিষিদ্ধ হয়ে যাবার পর ৫০ বছরের বেশি বয়সী এই পত্রিকাটি আর সাপ্তাহিক থাকেনি, হয়ে গেছে পাক্ষিক।

কলকাতায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের যে বইটি চলে এক হাজার কপি সেই বইটিই ঢাকায় বা বাংলাদেশে চলে তার চেয়ে অনেক বেশি। ১৯৯৮ সালের ১৮ মার্চ ঢাকায় লেখক-পাঠক মতবিনিময়ের একটি সভায় এক প্রশ্নের জবাবে শীর্ষেন্দু স্বীকার করেছেন, বাংলাদেশের পাঠকরা আছেন বলেই আমরা খেয়েপরে বেঁচে আছি। সুনীল প্রায়ই বাংলাদেশে আসেন। লক্ষ্য একটাই বইয়ের বাজার ধরা। তিনি কারণে অকারণে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে প্রশংসা করে বলেন, আগামীতে বাংলা ভাষার নেতৃত্ব দেবে ঢাকা। তার এই বক্তব্যে আন্তরিকতার চেয়ে চাতুর্যতা বেশি। অবশ্য সুনীলের এসব বক্তব্য দেয়ার অনেক আগেই কবি আল মাহমুদ বলে দিয়েছেন, ঢাকা হলো বাংলা ভাষার রাজধানী।

আনন্দবাজার গ্রুপের পাক্ষিক *সানন্দা* পত্রিকাটি বাংলাদেশে প্রায় ৩০ হাজার কপি বিক্রি হয়। গোটা ভারতে এর সার্কুলেশন কিন্তু পাঁচ হাজারের বেশি নয়।

দুঃখজনক হলো, বাংলাদেশের এক শ্রেণীর চিহ্নিত বুদ্ধিজীবী কলকাতার বইয়ের প্রচার ও প্রসারে সব সময়ই তৎপর। এদের কারো কারো বাংলাদেশী লেখকদের বইয়ের আলোচনা লিখতে কলম না চললেও কলকাতার শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের *দারাশিকোহ* উপন্যাসের আলোচনা লিখেন কয়েক পাতা। আর ওই উপন্যাসে সম্রাট আওরঙ্গজেবকে খাটো করে মদ্যপ দারাশিকোকে মহিমান্বিত করা হয়েছে। এ কারণেই এতো উৎসাহ।

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের এক তরুণ শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের কিছুদিন আসে তসলিমা নাসরিনের *ফরাসী প্রেমিক* বইটি পড়ে এর ওপর একটি রিভিউ লিখে আনার এ্যাসাইনমেন্ট দেন। উদ্দেশ্য একটাই ইসলাম বিদ্বেষী তসলিমার এই হাফ পর্ণোগ্রাফী উপন্যাসটি যাতে শিক্ষার্থীরা পড়তে বাধ্য হয়।

বই-পুস্তকের ভেতরে ঢুকে গেছে শয়তানের পোকা, মিথ্যে আর বিভ্রান্তিকর তথ্য, উপাত্ত ও মতামত। একপেশে চিন্তা এসব গ্রন্থকে অনেকে ক্ষেত্রেই দলীয় করে ফেলেছে। বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর স্বার্থে এক শ্রেণীর লেখক ঘটনাকে শব্দের কৌশলী বুনটে উপস্থাপন করছেন অন্যরকমভাবে। এইসব তথ্য পেয়ে পাঠকরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন, আস্থা হারাচ্ছেন।

আশার কথা, গ্রন্থের জগতে একটি চিহ্নিত গোষ্ঠির যে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল তাতে বড় ধরনের ধাক্কা লেগেছে। আজকে বাংলাদেশের সাহিত্য অঙ্গনকে যেসব তরুণ সজিব রেখেছেন তাদের বেশিরভাগই বিশ্বাসী ধারার। নিজেদের লেখার মাধ্যমেই এসব তরুণ ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী লেখকদের জবাব দিচ্ছেন। যতোই দিন যাচ্ছে ততোই এসব বিশ্বাসী তরুণদের কলম আরো বেশি ধারালো হচ্ছে। এখন প্রয়োজন এসব তরুণদের পৃষ্ঠপোষকতা, তাদেরকে উৎসাহিত করা, পুরস্কৃত করা।

সংবাদপত্র : সবচেয়ে প্রভাবশালী মিডিয়া

সংবাদপত্রকে বলা হয় *ফোর্থ ইস্টেইট*। সংবাদপত্রকে এই নামে অভিহিত করার সঙ্গত কারণ বিদ্যমান আছে এবং বিশ্বের সম্ভবত সব গণতান্ত্রিক দেশেই সংবাদপত্র *ফোর্থ ইস্টেইট*-এর কাজটি করে। সরকারের আইন, বিচার আর নির্বাহী বিভাগের সাথে সাথে একটি গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা কার্যকরী রাখার প্রক্রিয়ায় সংবাদপত্রও পালন করে অপরিহার্য গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা। দিনে দিনে সরকারের কর্মকান্ড যতো বাড়ছে, যতো জটিল হচ্ছে, ততোই সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠছে সরকারের কোনো একটি ছোট্ট কর্মকান্ডকেও সংবাদপত্রের সাহায্য ও ব্যাখ্যা ছাড়া সহজভাবে বুঝে ওঠা এবং সে সম্পর্কে তার রায় জানানো।

অসংখ্যা দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার মধ্যে বাংলাদেশে ১৩টি দৈনিক ও ৬টি সাপ্তাহিক পত্রিকাকে মোটামুটি প্রায় সবাই চিনে। দৈনিকগুলো হলো : *ইত্তেফাক, যুগান্তর, সংবাদ, ভোরের কাগজ, আজকের কাগজ, প্রথম আলো, জনকণ্ঠ, ডেইলি স্টার, অবজারভার, মানবজমিন, ইনকিলাব, সংগ্রাম* ও *দিনকাল*। এছাড়া সম্প্রতি প্রকাশিত দুটি ইংরেজি *দৈনিক নিউজ টুডে* ও *বাংলাদেশ টুডে*ও ভালো করছে। পরিচিত সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো হলো: *ইংরেজি হলিডে, কুরিয়ার, সোনার বাংলা, যায় যায় দিন, ২০০০, পূর্ণিমা*।

পাঠকপ্রিয় দৈনিকগুলোর মধ্যে *মানবজমিন* একটু ব্যতিক্রম। এটি ট্যাবলয়েট আকৃতির, চরিত্রের দিক থেকে তাই। তবে এই পত্রিকাটি ক্যাসেট কেলেংকারী, এরশাদের নারী কেলেংকারীসহ সিরিয়াস সংবাদ পরিবশেন করে একটি গ্রহণযোগ্যতায় পৌছে গেছে। বাকি ১২টি দৈনিকের মধ্যে *ইনকিলাব, সংগ্রাম* ও *দিনকাল* ছাড়া অন্যগুলো বলতে গেলে একই ঘরানার পত্রিকা। *ইত্তেফাক* তার খবর পরিবেশনার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। পত্রিকাটির সংবাদ এখনও যে কোনো দৈনিকের চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য। প্রাচীন এই পত্রিকারটির জন্য এটি নিঃসন্দেহে একটি বড় ধরনের প্লাস পয়েন্ট।

www.pathagar.com

একটি সংবাদপত্রে কী কী থাকে। এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায় চারটি শব্দে : সংবাদ, মতামত, বিনোদন ও বিজ্ঞাপন। সংবাদপত্রে যা কিছু থাকে সব কিছুই এই চারটি বড় বিভাগের আওতায় চলে আসে। সংবাদপত্রের মূল আধেয় সংবাদ, মূলত এই সংবাদ থাকে বলেই একজন ক্রেতা প্রতিদিন সংবাদপত্র কেনেন এবং পড়ার চেষ্টা করেন।

সংবাদ পরিবেশনার ক্ষেত্রে আমাদের দেশের পত্রিকাগুলো অনেকটাই একপেশে। অনেক সময়ই সংবাদে মতামত ঢুকে পড়ে। দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সংবাদমূল্য নির্ধারণ করা হয়। কোনো ব্যক্তি কোথাও খুন হলে প্রথম খোঁজ হয় ব্যক্তিটি কোন দলের, আওয়ামী লীগ, বিএনপি নাকি জামায়াতের। এ এক নিষ্ঠুর মানসিকতা। এমনকি সংবাদপত্রগুলোর নিউজ দেখে এই ধারণাও জন্মে যে, পক্ষে-বিপক্ষের খুন-খারাবিতে পত্রিকাগুলো কখনো আনন্দ কখনো হতাশা পর্যন্ত প্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকাগুলোর নিউজ এখন অনেকটাই ভিউজ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ এটা সত্য যে, শুরু থেকেই যারা সংবাদপত্র প্রকাশ করেছেন তারা নিজেদের মতামতটির প্রচার করতে ছাড়েননি। জনমতকে প্রভাবিত করা কিংবা কোনো বিষয়ে বা ইসুতে জনমত গড়ে তোলার কাজে সংবাদপত্র ব্যবহৃত হয়ে চলেছে জন্মলগ্ন থেকে। একারণেই পত্রিকার *সম্পাদকীয়* শিরোনামে মতামত ছাপার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে *কলাম* নামে যা ছাপা হচ্ছে তাকে এখন অনেকেই রাজনৈতিক বক্তৃতা বলে চিহ্নিত করেছেন।

পত্রিকার কলাম ও কলামিস্টদের নিয়ে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ইদানিং নানা আলোচনা হচ্ছে। এর কারণও আছে। কলামিস্টরা কোনো তথ্য প্রমাণ ছাড়া যা ইচ্ছে তা লিখে যাচ্ছেন। এমনকি তারা কোনো যুক্তিরও ধার ধারেননা। তারা লিখে দিচ্ছেন, এটা ভালো, এটা খরাপ, এ সুশীল ও সন্ত্রাসী, এটা জনগণ চায় ওটা চায়না। কেন ভালো, কেন মন্দ, কেন সুশীল, কেন সন্ত্রাসী এর জন্য কোনো তথ্য প্রমাণ বা ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজনও অনুভব করেন না এসব কথিত কলামিস্টরা। তবে আশার কথা যে, কিছু সংখ্যক চিহ্নিত কলামিস্ট-এর নাম দেখলেই জনগণ বুঝে ফেলেন কার পক্ষে বা কার বিপক্ষে লিখবেন। এমনকি কী লিখবেন তাও জনগণ আগেভাগে বলে দিতে পারে। জনগণের এই সচেতনতা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। অন্যদিকে এই কলামিস্টরা একপেশে, পার্টিজান হয়ে লিখে লিখে নিজেদেরকেই খেলো করছেন।

দৈনিক পত্রিকাগুলোর ফিচার সেকশন এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। পাঠক ধরার জন্য প্রত্যেকটি পত্রিকার ফিচার বিভাগ তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে কাজ করছে। একটি দৈনিক পত্রিকা তো তাদের চমৎকার ফিচার বিভাগকে সামনে রেখেই সার্কুলেশনের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে। পাঠকরা এখন দৈনিক পত্রিকার মধ্যে ম্যাগাজিনের স্বাদ পেতে চায়। নতুন যারা মিডিয়ার জগতে আসবেন তাদেরকে এখন এ বিষয়টি মাথায় রাখতেই হবে।

আন্তর্জাতিক সংবাদ পরিবেশনার ক্ষেত্রে আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলোর বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এরা যে সব বিদেশী নিউজ এজেন্সি থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে সেসবের মালিক ইহুদী অথবা খৃস্টান। যে তিনটি প্রধান নিউজ এজেন্সি থেকে আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকাগুলো আন্তর্জাতিক সংবাদ সংগ্রহ করে সেগুলো হলো ঃ এএফপি, রয়টার্স ও এপি। এসব নিউজ এজেন্সি কট্টর মুসলিম বিরোধী। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তারা সংবাদ পরিবেশন করে। প্রয়োজনে সংবাদ পরিবেশন বন্ধ করে দিয়েও তারা তাদের

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য পূরণ করে। পাকিস্তানের সাম্প্রতিক নির্বাচনের খবর এসব নিউজ এজেন্সি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে পবিবেশন করেছে। কিন্তু যখন দেখা গেল ইসলামীপন্থী মুত্তাহিদা মজলিশে আমল (এমএমএ) ভালো ফলাফল করেছে তখন তারা পাকিস্তানের সরকার গঠনে যে প্রক্রিয়া চলছে তাতে আর গুরুত্ব দিচ্ছে না। এ সংক্রান্ত নিউজ পরিবেশনেও তাদের কৃপণতা চোখে পড়ার মতো। ফলে বাংলাদেশের পত্রিকাগুলোও এ সম্পর্কে ভালো নিউজ পরিবেশন করতে পারেনি। তবে বর্তমানে ইন্টারনেট এক্ষেত্রে অনেকটা সাহায্য করছে।

সাংবাদিকতার মানের দিক থেকে ডানপন্থী বলে পরিচিত পরিত্রকাগুলোর অবস্থা অত্যন্ত করুণ। এডিটিং একটি পত্রিকার মান বাড়ানোর জন্য অন্যতম শর্ত। কিন্তু এদের পত্রিকায় এর কোনো বালাই নেই। বানান ভুল, বাক্য ভুল, ভুল তথ্য-এসব পত্রিকার একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। নতুনত্ব কিংবা উদ্ভাবনীর প্রমাণ এসব পত্রিকায় তেমন একটা পাওয়া যায় না। বিশেষ করে তরুণদের কাছে ডানপন্থী পত্রিকাগুলো তাদের গ্রহণযোগ্যতা কার্যকরী অর্থে গড়ে তুলতে পারেনি। নিঃসন্দেহে এটি একটি বড় ধরনের ব্যর্থতা।

চলচ্চিত্র ঃ বর্তমানে অশ্লীলতাই যার প্রধান উপাদান

চলচ্চিত্র আধুনিক মিডিয়ার মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী একটি মাধ্যম। চলচ্চিত্রের প্রভাবনী শক্তি অসাধারণ। কারণ একই সাথে অনেকগুলো মিডিয়ার সমন্বয় ঘটানো সম্ভব চলচ্চিত্রে। একটি চলচ্চিত্র যখন শুরু হয় তখন ব্যবহার ঘটে প্রিন্ট মিডিয়ার। যেমন টাইটেলগুলো লেখা হয় শব্দে। পর্দার চমৎকার চমৎকার ফন্টের আকর্ষণীয় শব্দগুলো দর্শকদের মুগ্ধ করে। চলচ্চিত্রের ভিত্তি অর্থাৎ কাহিনী, সংলাপ ও চিত্রনাট্য তৈরি হয় হাতে লিখে ও কম্পোজ হয়ে অর্থাৎ প্রিন্ট মিডিয়ায়। অভিনেতা অভিনেত্রী যখন সংলাপগুলো বলেন তখন তা একই সাথে ছবি ও শব্দের মিলিত প্রকাশ ঘটে। চলচ্চিত্রে থাকে সঙ্গীত, যা আরেকটি মিডিয়া ফরম। চলচ্চিত্রে থাকে দৃশ্যের উপযোগী বিশেষ আবহসঙ্গীত। এছাড়া আরো কিছু মিডিয়াধর্মী উপাদান, যেমন গতি, আলো, ছায়া। সব মিলিয়ে চলচ্চিত্র বিপুল সংখ্যক মানুষকে আকর্ষণ করে আসছে।

চলচ্চিত্রের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা কিংবা এর বিকাশের বিস্তারিত বর্ণনায় আমরা যাবো না। বর্তমানে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের চেহারাটি কেমন সে সম্পর্কে আমরা সরাসরি আলোচনায় চলে আসতে চাই।

আশির দশকের পর থেকে এক শ্রেণীর রুচিহীন পয়সাওয়ালা লোক চলচ্চিত্রের নানা মাত্রা ও উপাদানে আকৃষ্ট হয়ে এই শিল্পে বিনিয়োগ শুরু করে। চলচ্চিত্র থেকে দেশের সমাজ, মানুষ, নিটোল জীবন ও শিল্প বিদায় নেয়। অশ্লীলতা, সন্ত্রাস, হিংস্রতা ও রুচিহীন বিকৃত বিনোদন এসে চলচ্চিত্রকে আঁকড়ে ধরে। এসব চলচ্চিত্রের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে ব্যবসা। মারপিট, উত্তেজক ও অশ্লীল নাচগান, ভাঁড়ামো ইত্যাদি স্থূল বিনোদনে ঠাসা থাকে এ ছবিগুলো। এসব ছবিতে না থাকে কোনো গল্প, যুক্তি, বাস্তবতা, জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতিফলন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা। ছবিগুলোর নাম শুনলেই ভয় পেতে হয়। যেমন : *ধর, খাইছি তোরে, ভয়ানক সংঘর্ষ, ক্ষ্যাপা বাসু, আমি গুণ্ডা, আমি মাস্তান, আজকের ক্যাডার, বিদ্রোহী মাস্তান* ইত্যাদি। আরো একটি তথ্য দিই, বর্তমানে যারা চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত তাদের চেহারা দেখলেও রীতিমতো আঁতকে উঠতে হয়। যেমন : *ডিপজল*। এই ভিলেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে অশ্লীল গালিগালাজ আমদানিতে চ্যাম্পিয়ন।

যে কোনো ছবি মুক্তি পাওয়ার আগে সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র লাগে। এই সেন্সর বোর্ডের

www.pathagar.com

নানান কীর্তিকলাপ নিয়ে পত্রপত্রিকায় কম লেখা হয়নি। কিন্তু দিন যতো যাচ্ছে ভূতের মতো সেন্সর বোর্ডও কেবল পেছনের দিকে হাঁটছে। চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের আটজন সদস্য সরকার বদলের সাথে সাথে বদলে যান। অর্থাৎ এই আটজন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিয়োগ পেয়ে থাকেন। এর জন্য চলচ্চিত্রের 'চ' বুঝারও দরকার পড়ে না।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে সেন্সর বোর্ডে যাদেরকে নিয়োগ দিয়েছেন তাদের মধ্যে চারজন সাংবাদিক রয়েছেন। এদের মধ্যে মাত্র একজন চলচ্চিত্র সম্পর্কে কিছুটা খোঁজ খবর রাখেন। বাকি তিনজনের অবস্থা অন্ধের হাতি দেখার মতো। জোট সরকার এমন একজন প্রযোজক ও পরিচালককে সেন্সর বোর্ডের সদস্য বানিয়েছেন যিনি অশ্লীল চলচ্চিত্র নির্মাণে একজন 'সফল' ব্যক্তি হিসেবে ইতোমধ্যেই নিজেকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। সেন্সর বোর্ডের এসব অশিক্ষিত সংস্কৃতি বিবর্জিত সদস্যদের উপস্থিতির ফল ইতিমধ্যে পাওয়া শুরু হয়ে গেছে। *ফায়ার* নামের ছবিটি দু'বার মুক্তি পাওয়ার পরও অশ্লীলতার অভিযোগে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু জোট সরকারের সেন্সর বোর্ড এই ছবিটিকে তৃতীয়বারে মতো ছাড়পত্র দিয়েছে। এর বিনিময়ে সেন্সর বোর্ডের সদস্যরা কি কি পেয়েছেন সে সম্পর্কে ঢাকার চলচ্চিত্র অঙ্গনে নানান কথা উড়ে বেড়ায়। তবে ঢাকা ক্লাবে মদের আসরটির কথা মোটামুটি সবাই জানে।

ইসলাম ধর্ম ও আলেমদের হেয় করে নির্মিত 'মাটির ময়না' ছবিটি বর্তমান সেন্সরবোর্ড ছাড়পত্র দিয়েছে। কীভাবে এটি ছাড়পত্র পেলো? বলা হচ্ছে, ইচ্ছে করলে বর্তমান সেন্সরবোর্ড থেকে যে কোনো ছবির ছাড়পত্র যোগাড় করা যায়। বাঁ হাতের ব্যাপারটি ঠিকমতো ঘটাতে পারলেই হলো।

এমন একটা সময় ছিল যখন সিনেমার পোস্টার তৈরি নিয়ে রীতমতো গবেষণা হতো। এটিকে একটি শিল্পকর্ম বলে ধরা হতো। সিনেমার পোস্টার দেখেই দর্শকরা উদ্বুদ্ধ হতেন হলে গিয়ে সিনেমাটি দেখতে। বর্তমানে প্রতিটি সিনেমার পোস্টারেই দেখা যায় নায়িকার অর্ধনগ্ন বৃষ্টিভেজা শরীর, খলনায়ক ও নায়কের রক্তাক্ত দেহ, বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্র ইত্যাদি। আর এগুলো দেখে সিনেমার ভেতরের সহিংসতাগুলো সহজেই অনুমান করা যা। এসব ছবি আমাদের শিক্ষা ও সুস্থ বিনোদনের পরিবর্তে কী দিচ্ছে? দিচ্ছে বিভ্রান্তি, কুরুচি আর মানুষের সুস্থ ও সুন্দর চিন্তায় ফেলছে অসুস্থ ও কুৎসিত ছায়া।

আমাদের চলচ্চিত্রের ভবিষ্যত কী? যদি বলি অন্ধকার তাও বোধ হয় সব বলা হয় না। একটা বিষয় লক্ষণীয় বিষয় যে, চলচ্চিত্রের অশ্লীলতা কিন্তু দর্শক টানতে পারেনি। একারণেই দেখা যায় দেশে একের পর এক সিনেমা হল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এটাও এক অর্থে ভালো লক্ষণ। কারণ সিনেমা হলগুলোতে পতিতা ও টিকেট কালোবাজারীদেরই দৌরাত্ম্য। হলিউড ও বলিউডকে বলা হয় চলচ্চিত্রের রাজধানী। এই দুটি স্থানে ভালো-মন্দ দু'ধরনের ছবিই নির্মিত হয়, বাংলাদেশের মতো কেবল খারাপ ছবি নয়। হলিউড ও বলিউডের ছবি গোটা বিশ্বেই ব্যবসা করে। বলতে গেলে এদের দাপট একচ্ছত্র হয়ে উঠেছে। ভারতের বলিউডের সিনেমা তো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে একচেটিয়া ব্যবসা করছে। ওখানে বলিউডের কাছে হলিউডও মার খাচ্ছে।

ঠিক এই যখন অবস্থা তখন ইরানী ছবি এক নতুন আলোকবর্তিকা হিসেবে হাজির হয়েছে। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পর পশ্চিমারা বলে বেড়াতে থাকে যে, ইরান থেকে

www.pathagar.com

চলচ্চিত্র উধাও হয়ে গেল। কিন্তু তাদের ওইসব বানানো মিথ্যা গল্পকে ছুঁড়ে ফেলে ইরানী চলচ্চিত্র দিনকে দিন এগিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে পুরস্কৃত হচ্ছে। বিশ্বখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ইরানী চলচ্চিত্রকে মুসলিম বিশ্ব মডেল হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।
এখন প্রশ্ন হলো, ইরানী মানের চলচ্চিত্র নির্মাণকারীদের মতো কোনো শিক্ষিত চলচ্চিত্রকার কি বাংলাদেশে আছেন?

টেলিভিশন ঃ সবচেয়ে শক্তিশালী মিডিয়া

টেলিভিশন এখন সারাবিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী মিডিয়া। টেলিভিশন প্রযুক্তিরও বিকাশ ঘটেছে অকল্পনীয়ভাবে। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের যে কোনো ঘটনা দুর্ঘটনাকে খুব অল্প সময়ের তৎপরতায় টিভি পর্দায় হাজির করা সম্ভব হচ্ছে এখন। এ কারণে গ্রহণযোগ্যতা ও ব্যবহার মাত্রায় এটি চলচ্চিত্রকেও হার মানিয়ে দিয়েছে।
চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন একই ধারার মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও প্রযুক্তিগত সুবিধাটা চলচ্চিত্রের চেয়ে টেলিভিশনের বেশি। টেলিভিশন তার পর্দায় চলচ্চিত্রকেও নিয়মিতভাবে নিয়ে আসতে পারছে। কিন্তু চলচ্চিত্র টেলিভিশনের ব্যাপক প্রচার তৎপরতার তাৎক্ষণিক উপস্থিতি ঘটাতে পারছে না। মানুষের ঘরে ঘরে চলচ্চিত্রের পর্দার প্রবেশ অসম্ভব যা টেলিভিশনের পক্ষে সহজ।
বাংলাদেশের নিজস্ব তিনটি টিভি চ্যানেল রয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি), চ্যানেল আই ও এটিএন। প্রথমটি সরকারি। বাকি দুটি ব্যক্তি মালিকানাধীন।
বিটিভি সরকারি হওয়ায় এর নানান সীমাবদ্ধতা আছে। আছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। ইচ্ছে করলেই বিটিভি'র কর্মকর্তারা বলতে গেলে কোনো কিছুই করতে পারেন না। অসংখ্য বাধা বিপত্তির মুখে একেবারেই ন্যুব্জ অবস্থা বিটিভি'র। বর্তমানে এর অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকের অনুষ্ঠানের সিডিউল পর্যন্ত তৈরি করতে পারেনি বিটিভি। মন্ত্রীদের সুপারিশে নানান অনুষ্ঠান প্রচার হচ্ছে। এগুলোতে না আছে মান, না আছে তথ্য, না বিনোদন। ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান প্রচারের নামে বিটিভিতে বর্তমানে এমন কিছু অনুষ্ঠান প্রচার হচ্ছে যেগুলোর মান এতো নিম্নে যে ৫০ মিনিটের অনুষ্ঠানে স্পন্সর পর্যন্ত পাচ্ছে না। বিটিভি'র কোনো ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান স্পন্সর ছাড়া প্রচারিত হচ্ছে তা ভাবাই যায় না।
বিটিভি'র খবর খুব কম লোকই বিশ্বাস করে। সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে সংবাদমূল্য অনুযায়ী সঠিক তথ্য ও ছবির অনুপস্থিতি, অপ্রয়োজনীয় তথ্য ও ছবির বাড়াবাড়ি এবং তথ্য ও ছবির উদ্দেশ্যমূলক ও পক্ষপাতমূলক উপস্থাপনের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ দর্শক-শ্রোতাদের প্রতারণা করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিটিভি'র নিউজ চরম ও পরমভাবে দলীয় করা হয়েছিল। এখনও সেই অবস্থাই যে চলছে না তা বলার সুযোগ নেই। তবে এটুকু বলা যায়, বিটিভি তার সংবাদ প্রচারের মান বাড়ানোর খানিকটা চেষ্টা যে করছে না তা নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারবে বলে মনে হয় না।
জনসচেতনামূলক অনুষ্ঠানে বিটিভি তার সাফল্য দাবি করতে পারে। বিশেষ করে বিশুদ্ধ পানি পান, পাকা পায়খানা ব্যবহার, বৃক্ষ রোপণ, শিশু শিক্ষা, মা ও শিশুর পরিচর্যা, বাল্যবিবাহ, গর্ভকালীন পরিচর্যা, নিরাপদ মাতৃত্ব, ডায়রিয়া, টিকাদান, কুষ্ঠরোগ, পুষ্টিকর খাবার, শিশু অধিকার, আর্সেনিক দূষণ এসব বিষয় বিটিভির প্রচারে দেশবাসী যেমন সচেতন

www.pathagar.com

হচ্ছে তেমনি উপকৃতও হচ্ছে। এর বাইরে বিটিভি সচেতনতামূলক সিরিজ, অনুশীলন ও নাটক প্রচার করে আসছে। এর মধ্যে 'মীনা' অতি জনপ্রিয় সিরিজ।

সুস্থ বিনোদনের মাধ্যমে সমাজসেবা এই শ্লোগান নিয়ে ১৯৯৯ সালের ১ অক্টোবর থেকে যাত্রা শুরু করে *চ্যানেল আই* নামের একটি বেসকারি টেলিভিশন। চ্যানেল আই ভালো করছে, বিশেষ করে সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে। অন্যান্য অনুষ্ঠান গতানুগতিক।

আরেকটি বেসরকারি চ্যানেল *এটিএন*। তারাও কিন্তু কিছু ভালো অনুষ্ঠান প্রচার করছে। বিশেষ করে এই চ্যানেল যেসব ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচার করছে তার জনপ্রিয়তা অবিশ্বাস্য। এই চ্যানেলের কয়েকটি অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করেছে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ কেমন অনুষ্ঠান দেখতে চায়। ভবিষ্যতে যারা টিভি চ্যানেল করতে আসবেন তাদেরকে এই বিষয়টি মাথায় রেখে এগুতে হবে। চ্যানেল আই ও এটিএন চ্যানেল দুটোর সমস্যা হলো ডিস ছাড়া দেখা যায় না। আর ডিশ-এর প্রসার এখনও গ্রামে ব্যাপকহারে ঘটেনি। এ কারণে দর্শক নেটওয়ার্কে বিটিভি থেকে অনেকখানিই পিছিয়ে আছে চ্যানেল দুটো।

১৯৯০ সালের আগে স্যাটেলাইট ভিত্তিক টেলিভিশন বিনোদন এদেশের মানুষের কাছে ছিল অনেকটা বিমূর্ত। কিন্তু এখন আর বিমূর্ত কি? প্রশ্নই উঠে না। স্যাটেলাইট টিভি'র অনুষ্ঠান, উপস্থাপনা নিয়ে বিতর্ক, আড্ডা এখন আর কেবল শহরেই সীমাবদ্ধ নয়- গ্রাম আর মফস্বল পর্যন্ত এসবের বিস্তার। কোন্ চ্যানেলের কোন্ অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য আর কোন্টিই বা উপভোগ্য নয়, তা নিয়ে সংবাদপত্রে লেখালেখি চলে। কোন্ চ্যানেলে কোন্ সময় কোন অনুষ্ঠানটি দেখাবে তার আলোচনায় এদেশের যুবক, গৃহবধু কেউ কি বাদ যায়? নিশ্চয়ই না। জাতীয় সংবাদপত্রগুলোতে বিভিন্ন চ্যানেলের অনুষ্ঠানমালা থাকে হয়তো পুরো পাতাজুড়ে। কোন্ অনুষ্ঠানটি আকর্ষণীয়, বিনোদনমূলক-এসব গাইডলাইনও থাকে পত্রিকার পাতা জুড়ে। ১৯৯২-১৯৯৫ এই ক' বছরে ১০টির বেশি চ্যানেল বাংলাদেশের আকাশে প্রবেশ করেছিল, এখন তো এর সংখ্যা একশ' ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিযোগিতা চলছে ক্যাবল সংযোগের। ইলেকট্রিসিটি, ওয়াসা'র লাইনের মতো মাসোহারা বিল দিলেই হলো। স্যাটেলাইট টিভি'র প্রায় একশটি চ্যানেলের দর্শক, শ্রোতা, গ্রাহক বেড়ে গেছে হু-হু করে। কিন্তু বাংলাদেশ টেলিভিশন ১৯৬৪ সালে জন্ম নিলেও দর্শক সংখ্যা এতটা সহজে বাড়েনি। টেলিভিশন এমনকি স্যাটেলাইট টেলিভিশন সম্পর্কে এ অঞ্চলের মানুষদের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। সেকালে টেলিভিশন ছিল সাধারণ জনমানুষের নাগালের বাইরে, ক্রয়মূল্য ছিল বেশি, কিনতে যেমন মানুষ পারেনি তেমনি বৈদ্যুতিক সুবিধার অভাবে তারা টেলিভিশনের দর্শক হতে পারেনি। অথচ বর্তমানে ৮০ শতাংশ লোক বাংলাদেশ টেলিভিশনের দর্শক, শ্রোতা, গ্রাহক। দেশের মোট আয়তনের ৭৯.০৬ ভাগ এলাকা বাংলাদেশ টেলিভিশনের সম্প্রচার-এর আওতাভুক্ত। হিসাবটি ছয় বছর আগের। বর্তমানে এর পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। স্যাটেলাইটের বিস্তার ও প্রভাব বহুগুণ বেড়েছে।

১৯৯২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর সিএনএন-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলাদেশের আকাশকে মুক্ত করা হলো। একই বছর ডিশ-এর অনুমোদন, বিবিসি টেলিভিশন, রেডিওতে বিবিসি'র অনুমোদন তথা মুক্ত আকাশ আমাদের জীবনে নতুন পরিবর্তন এনেছে। হিন্দী ভাষা আউড়াচ্ছে স্কুলগামী কিশোর-কিশোরী, উঠতি বয়সের তরুণ-তরুণীর মুখে হয়তো স্টার-এর উপস্থাপিকা কিংবা সিএনএন-এর ফ্যাশন শো-এর কথা। আসলে তথ্যমাধ্যম বিশেষজ্ঞ স্যাটেলাইট ভিত্তিক গণমাধ্যমে অব্যাহতভাবে বিদেশী সংস্কৃতির প্রচার, জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী প্রথা,

www.pathagar.com

জীবনযাত্রার সরল সহজ পদ্ধতি, সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষার এবং অর্থনৈতিক জীবনে ফাটল সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশও এর প্রভাব থেকে বাদ পড়তে পারে না।

স্যাটেলাইট ব্যবহার পুঁজিশাসিত হবে কি মানবশাসিত হবে এই জরুরি প্রশ্ন নিয়ে যে দ্বন্দ্ব সমাজের অন্যান্য দিকের মতো টেলিভিশনের প্রশ্নেও নিয়ত ক্রিয়াশীল। আন্তর্জাতিক টেলিভিশন অনুষ্ঠানাদি পৃথিবীর লোকগুলোকে এক বিশ্ববাসীতে পরিণত করলেও সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্বোপরি সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

স্যাটেলাইটের প্রভাব মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করে। দেশ ও সংস্কৃতির আলাদা অস্তিত্বকে ভুলিয়ে দেয়, স্থুল চিন্তাকে প্ররোচিত করে। ভাষা, রীতি-নীতি ঐতিহ্যে পরিবর্তন আনে। বাস্তব চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে মানুষকে পলায়নপর করে, শূন্যতায় কল্পবিলাসী করে তোলে। ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, পশ্চিমা দেশ বিশেষত উন্নত বিশ্বের পুঁজি ও প্রযুক্তি-নির্ভর এসব দরিদ্র দেশের প্রতিভা বিকাশ আমেরিকান দর্শনকে ঘিরে আবর্তিত। যেখানে হয়তো এশিয়া কিংবা আফ্রিকা অথবা ল্যাটিন আমেরিকার উঁচুমানের সাহিত্যের কোনো স্থান নেই।

স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো তথ্যের ঘুমপাড়ানিয়া নেশা ছড়াচ্ছে। বিভ্রান্তিকর, একপেশে তথ্যদিয়ে মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে রাখা হচ্ছে। *ইনফরমেশন রিচ* শাসন করছে *ইনফরমেশন পুওর* এলাকার মানুষদের। গুজরাটে মুসলিম হত্যা, ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলীদের বর্বর হামলা, টুইন টাওয়ার ধ্বংসকে কেন্দ্র করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের মুসলিম বিরোধী অপতৎপরতা-এই ঘটনাগুলো সম্পর্কে বিশ্ববাসী সঠিক তথ্য পায়নি। যারা তথ্য দিচ্ছে তারা তাদের নিজেদের সুবিধা মতো সেটা সরবরাহ করেছে। এতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে মাত্র, আসল খবরটি জানতে পারেনি। টুইন টাওয়ার ধ্বংসে ওসামা বিন লাদেন জড়িত কিনা তার প্রমাণ ওয়াশিংটন কখনই দিতে পারেনি। কিন্তু তথ্য আগ্রাসনের মাধ্যমে আমেরিকা ঠিকই বিন লাদেনকে গোটা বিশ্বে একজন 'সন্ত্রাসী' হিসেবে চিহ্নিত করতে পেরেছে।

ইন্টারনেট

আমাদের এই প্রবন্ধে ইন্টারনেটের টেকনিক্যাল দিকটি নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যায়নি। এর প্রধান কারণ এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা এখনো অনেক নীচে। তবে বাংলাদেশে ইন্টারনেটের অবস্থান এবং এটির কী ধরনের ব্যবহার হচ্ছে সে সম্পর্কে এখানে কিছু কথা বলা দরকার। বাংলাদেশে গোটা মিডিয়া ব্যবহারকারীদের মধ্যে ইন্টারনেট ইউজ করেন বড়জোর দেড় থেকে দুই শতাংশ মানুষ। তবে এটি ধীরে ধীরে তার বিস্তার ঘটাচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় এখন ইন্টারনেট সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। এরপরও ইন্টারনেট এখনো অনেকটাই রাজধানী ঢাকা কেন্দ্রিক। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা কম হওয়ার মূল কারণ অর্থনৈতিক। ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য কমপিউটার লাগে। আর এই কমপিউটার কজনের আছে? হ্যাঁ, এটা ঠিক মধ্যবিত্তের ঘরেও এখন কমপিউটার ঢুকছে। তবে গতি খুবই মন্থর। এটি এখনোও উচ্চবিত্তের যন্ত্র হিসেবেই সাধারণের কাছে চিহ্নিত।

ইন্টারনেটের বিস্তার এখনোও ব্যাপক না হলেও এর কু প্রভাবটির কিন্তু বেশ বিস্তার ঘটেছে। রাজধানী ঢাকাতে ব্যাঙের ছাতার মতো সাইবার ক্যাফে গজিয়ে উঠেছে। আমরা হলাম হুজুকের জাতি। কোনো একটা হুজুক উঠলো তো আমরা মেতে উঠলাম। এক সময় কোচিং সেন্টারের হুজুকে গোটা দেশ মেতেছিল। এরপর আসলো কমপিউটার প্রশিক্ষণ

www.pathagar.com

কেন্দ্র। এখন চলছে সাইবার ক্যাফের হুজুক। বর্তমানে সাইবার ক্যাফের ব্যবসাটি লাভজনক বলেই মনে হয়। লাভজনক না হলে এর প্রসার এতো দ্রুত নিশ্চয়ই ঘটতো না। কিন্তু সাইবার ক্যাফে কারা যান এবং কেন যান- এই প্রশ্নের জবাব কেবল নেতিবাচকই নয়, রীতিমত আতঙ্কজনক।

সাইবার ক্যাফের শতকরা ৯৫ ভাগ গ্রাহকই বয়সে তরুণ। এদের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগেরই বাসায় কমপিউটার আছে। এদের অনেকেরই ইন্টারনেট কানেকশন আছে। তাহলে এরা সাইবার ক্যাফে যায় কেন? যৌনতা ও অশ্লীলতার নিষিদ্ধ নেশাই তাদেরকে সাইবার ক্যাফে নিয়ে যাচ্ছে। রাজধানীর অনেক সাইবার ক্যাফে 'কেবিন' সিস্টেম রয়েছে। কেবিনে বসে একজন গ্রাহক নির্জনে একাকী বিভিন্ন ওয়েব সাইটে ঘুড়ে বেড়াতে পারেন। যৌনতা ও নগ্নতায় পরিপূর্ণ অসংখ্য ওয়েবসাইট রয়েছে। এসব ওয়েব সাইট ব্যবহারকারীর সংখ্যাই বেশি। তরুণরা তথ্যের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করে খুব কমই। এমন অসংখ্য সাইবার ক্যাফে ঢাকাতে রয়েছে যাদের কমপিউটার অন করলেই প্রথমে নগ্ন নারীর ছবি ভেসে ওঠে। সাইবার ক্যাফেগুলো এইভাবে তরুণদের মনমানসিকতাকে বিকৃতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

নওরীন সুলতানা কমপিউটার বিষয়ক পত্রিকা *সি নিউজ*-এ কাজ করেন। সাইবার ক্যাফে সম্পর্কে তিনি *সাপ্তাহিক যায়যায়দিন* পত্রিকার ২৯ নভেম্বর ২০০২ সংখ্যায় চিঠিপত্র কলামে লিখেছেন ঃ "গত এক দেড় বছরে ঢাকা শহরে তিনটি বিপ্লব হয়ে গেছে। এক. মোবাইল বিপ্লব, দুই. প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বিপ্লব, তিন. সাইবার ক্যাফে বিপ্লব। মোবাইল এখন সবার হাতে হাতে আর ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট হওয়া তো এখন কোনো ব্যাপারই নয়, টাকা থাকলেই হলো। এদিকে ঢাকা শহরের বোধ করি এমন কোনো এলাকা নেই যেখানে অন্তত একট সাইবার ক্যাফে খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুধু বেকার তরুণদের সাবলম্বী করাই নয়, ঢাকার সিটিজেনদের নেটিজেন করার পেছনে বিশাল ভূমিকা এই সাইবার ক্যাফেগুলোর। আজ আর তরুণরা এখানে সেখানে আড্ডা না মেরে চ্যাট রুমে আড্ডা মারতেই বেশি পছন্দ করে। কফি শপে নয়, বরং সাইবার ক্যাফেতে বসে কফির কাপে চুমুক দিয়ে ইন্টারনেটে সারা বিশ্বে ঘুরে আসাই তাদের বেশি পছন্দ।

কিছুদিন আগে যায়াযায়দিনে জাকারিয়া স্বপন আমাদের সাইবার ক্যাফেগুলোর সার্বিক মান ও ভূমিকা নিয়ে প্রশংসা করলেন। আসলেই তাই। মান ঠিক আছে। কিন্তু এর ব্যবহার নিয়ে আরো ভাবার আছে। মাসিক কমপিউটার ম্যাগাজিন *সি নিউজ*-এর আগস্ট সংখ্যায় *সাইবার ক্যাফেতে মেয়েরা* শিরোনামে রিপোর্ট করেছিলাম। রিপোর্টটি করতে গিয়ে আমাকে ঢাকার বেশ কিছু সাইবার ক্যাফেতে যেতে হয়, কথা বলতে হয়। সে সময়ে যে চিত্রটি দেখেছি তা আমার কাছে ভয়াবহ মনে হয়েছে। সাইবার ক্যাফেতে যারা যায় তাদের অধিকাংশ তরুণ এবং ছেলে। তারা অধিকাংশ সময়ই যা দেখে তা হলো পর্ণসাইট। ক্যাফে উদ্যোক্তরাও ক্যাফের ডেকরেশন এমনভাবে করে থাকেন যেন প্রাইভেসি পুরো বজায় থাকে। এমনকি তাদের বিজ্ঞাপনেও বলা থাকে ১০০% প্রাইভেসি দেয়া হয়। তাদের ব্যবসার রমরমা অবস্থার মূল কারণ হলো, তরুণদের কাছে পর্ণোর এই সহজলভ্যতা। যদিও অনেক সাইট ক্রেডিট কার্ড নাম্বার দিয়ে ঢুকতে হয় তবুও নেটে যতোটুকু ফ্রি পাওয়া যায় তাও অনেক। উদ্যোক্তরাও এ ব্যাপারে জানেন। এবং জানেন বলেই ১০০% প্রাইভেসির ব্যবস্থা তারা করেছেন। যখন প্রশ্ন করি কেন?

www.pathagar.com

উত্তরে তারা প্রায় একই রকম কথা সবাই বললেন, তারা প্রাইভেসি রক্ষায় বিশ্বাসী আর ভোক্তারাও তাই চায়। কারণ অনেকক্ষণ কাজ করতে করতে রিলাক্স-এর প্রয়োজন হয়। তখনই তারা পর্ণো সাইট ভিজিট করে থাকেন। রিলাক্স-এর কথা মনে হলে সবার আগে যে জিনিসটির কথা আমাদের মনে পড়ে তা হলো, গান। এটা পর্ণো কখনো হতে পারে তা জীবনে প্রথম শুনলাম!

সাইবরা ক্যাফের ব্যবসায় কারো লস হয়েছে এ কথা শোনা যায় না শুধু এই কারণে। তরুণ প্রজন্ম খুব সহজে স্বল্প মূল্যে দেখতে পাচ্ছে এগুলো। অথচ আমরা ভাবছি দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। একবার গ্রীন রোডের একটি সাইবার ক্যাফেতে যাই। সেখানে প্রতিটি পিসির ওপর স্টিকার লাগানো আছে যাতে লেখা কোনো পর্ণো সাইট দেখা সেখানে নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ক্যাফেটির উদ্যোক্তার আমাকে জানান, সামাজিক দায়িত্বশীলতা থেকে তিনি এ কাজটি করেছেন এবং নিজে ফিল্টার ব্যবহার করছেন। এতে ব্যবসায়িক লাভ তার এই হয়েছে যে, কমপক্ষে ৫০ শতাংশ ইউজার তার কমে গিয়েছে। তবুও তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবেন। কিন্তু কতোজন উদ্যোক্তা এই কাজ করবে? একটি হতে পারে যদি আইএসপিগুলো নিজেরা ফিল্টার বসায়।

ইন্টারনেটকে কাজে লাগানোর ধারণাটা আমাদের মধ্যে এখনো শুরু হয়নি। যা হচ্ছে তা শুধু পর্ণো সাইট দেখা, ই-মেইল এবং চ্যাটিং। চ্যাটিং আজকাল খুবই জনপ্রিয়। কারণ চাপামারার জন্য এর থেকে ভালো আর কিছু নেই। বাঙালি যারা চ্যাট করেন তাদের শতকরা ১০ শতাংশের একটিও সত্য কথা বলেন কি না সন্দেহ। আমি কিছুদিন চ্যাট করেছি। নিজের নামেই করতাম। সব সত্য কথা বলতাম। কিছুক্ষণ পর উল্টো আমাকেই জিজ্ঞাসা করা হতো যা বলছি তা সত্য কি না। রাগে এখন করি না। অথচ বিদেশীদের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যায় না। আমাদের ন্যূনতম সততাটুকুও আমরা জলাঞ্জলি দিয়েছি। এই সততা ও নৈতিকতার বিসর্জনের অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছে শহর জুড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠা সাইবার ক্যাফেগুলো। এখনই এ বিষয়ে সজেতন না হলে সামাজিক অবক্ষয় কোথায় গিয়ে দাড়াবে বলা মুশকিল।”

ইন্টারনেটের বিরুদ্ধাচরণ করার প্রশ্নই উঠেনা, আমরা এখানে কেবল বাংলাদেশের অবস্থাটা তুলে ধরলাম।

আসলে বাংলাদেশে ইন্টারনেট থেকে দুইটি গ্রুপ প্রকৃত উপকার পাচ্ছে। একটি পত্র-পত্রিকা। অপরটি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। দৈনিক পত্রিকাগুলো ইন্টারনেট ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে গোটা বিশ্বের খবর ও ছবি পেয়ে যাচ্ছে। এসব তারা পাঠকদের সামনে অতি সহজেই হাজির করতে পারছে। আর ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পণ্যের খোঁজ খবর নেয়ার সাথে সাথে বিশ্ববাণিজ্যের নানান খবর সংগ্রহ করতে পারছেন ইন্টারনেট থেকে।

বাংলাদেশের মিডিয়ার প্রধান ৫টি বৈশিষ্ট্য

ক. ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী : এ এক আশ্চর্য ও বিস্ময়কর প্রবণতা। আরো অবাক করার বিষয় হলো, এই ধরনের প্রবণতা প্রায় প্রত্যেকটি মুসলিম বিশ্বের মিডিয়ার মধ্যে সক্রিয়ভাবে বিদ্যমান। ভারতে কোনো মিডিয়া হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায় না। ইউরোপ-আমেরিকায় খৃস্টান ধর্ম নিয়ে কেউ নেতিবাচক কোনো কিছু প্রকাশ করে না।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের পত্রপত্রিকাগুলোর বেশিরভাগই ধর্ম-নিরপেক্ষতার নামে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজটিই করে থাকে। এসব পত্রিকা মুসলিম বীর ও নেতাদের চরিত্র হননে সর্বদা সক্রিয়। এরা পাশ্চাত্য মিডিয়ার অন্ধ অনুকরণ করে। এই জন্য এরা মুসলিম স্বাধীনতাকামীদের *জঙ্গী* বলে আখ্যায়িত করে। ইসলামপন্থীদের *মৌলবাদী* বলে গাল দেয়। অন্যান্য ধর্ম বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন দেব-দেবীর কথা এরা কিন্তু অত্যন্ত যত্ন নিয়ে ছাপে। কিন্তু নবী রাসূল কিংবা সাহাবীদের জীবনী, তাদের কর্মকাণ্ড এসব মিডিয়ায় স্থান পায় না।

তবে ইদানিং এর খানিকটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বেশ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন ধর্মীয় পাতা ছাপছে। যেখানে ইসলামের নানান বিষয় স্থান পাচ্ছে। তবে গোটা বিষয়টি ব্যবসায়িক। ইসলামের প্রতি তাদের কতটুকু দরদ তা নিয়ে যে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন। অনেকে অবশ্য এটাকে মন্দের ভালো বলে আখ্যায়িত করেছেন।

দেশের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত *একুশে টিভি* ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষীর দিক থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ওঠেছিল। তাদের প্রচারিত অসংখ্য নাটকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর জীবনাচার স্থান পেলেও সেখানে ইসলাম ও মুসলমানদের কোনো স্থান ছিল না। এই টিভি চ্যানেলটি ইসলামপন্থীদের নানাভাবে হেয় করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। বিশ্বের মুসলমানদেরকে বর্বর, মৌলবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করে হিংস্ররূপে দেখানোর চেষ্টা করেছে। এই টিভি চ্যানেলটি *দেহতরী* নামে একটি অনুষ্ঠান প্রচার করতো যেখানে মাজারকেন্দ্রিক জীবনধারা এবং নারী পুরুষ মিলে গান-বাজনাকে ইসলাম ধর্মের নিয়ম-নীতি হিসেবে তুলে ধরতো। এর একটাই লক্ষ্য ছিল, ইসলাম ধর্মকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনা এবং এর মাধ্যমে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করা।

খ. নীতিহীনতা : বালাদেশের মিডিয়ার কোনো নীতি নেই। তাদের একটাই নীতি সুবিধা আদায় করা। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রগুলোর ভূমিকা রীতিমতো লজ্জাজনক। তাদের ঘৃণ্য ভূমিকার প্রমাণ মেলেছে *একুশে টিভি* রায়ের পর। কয়েকটি চিহ্নিত পত্রিকা আদালত কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত *একুশে টিভির* পক্ষে *সম্পাদকীয়* পর্যন্ত লিখেছে। কাজেই এসব পত্রিকা নীতির দৌড় যে কতটুকু তা প্রমাণ হয়ে গেছে। এসব পত্রিকাই যখন সিভিল সোসাইটি, ট্রান্সপারেন্সি, একাউন্টিবিলি ইত্যাদি ভারি ভারি শব্দ ব্যবহার করে নানান দিক নির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা করে তখন তাদের এই বেহায়াপনা দেখে নিজেই লজ্জিত হতে হয়।

গ. দেশপ্রেমে ঘাটতি : বাংলাদেশে মেইনস্ট্রিম বলে পরিচিত প্রায় সবগুলো পত্রিকারই জাতীয় স্বার্থ নিয়ে কোনো ভাবনা নেই। এদের প্রধান ভাবনা হলো প্রথমত নিজেকে নিয়ে। এরপর বিশেষ কোনো গোষ্ঠী, বিশেষ কোনো দেশকে নিয়ে। এর জন্য অবশ্য মিডিয়ার ওপর একপেশে দোষ চাপিয়ে দেয়া ঠিক হবে না। কারণ দেশের রাজনীতিবিদদের দেশপ্রেম নিয়েই জনমনে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

আমাদের পাশের দেশ ভারতে কিন্তু এমনটি নেই। সেখানে জাতীয় ইসু, জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে প্রতিটি মিডিয়া এক ও অভিন্ন। এমনকি এসব বিষয়ে তাদের শব্দের ব্যবহারেও কোনো পার্থক্য নেই। কাশ্মিরীদের পক্ষে কিংবা উত্তর-পূর্ব ভারতের স্বাধীনতাকামীদের

www.pathagar.com

সমর্থন করে ভারতের কোনো মিডিয়া একটি শব্দও ব্যবহার করেনা। কিন্তু বাংলাদেশে এর চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। পার্বত্য চট্টগ্রাম, ফারাক্কা বাঁধের মতো জাতীয় ইসু নিয়ে মিডিয়া কখনো দুইভাগে, কখনো তিনভাগে এমনকি কখনো চার ভাগে ভাগ হয়ে যায়। আমাদের মিডিয়ার যদি দেশপ্রেম থাকতো তাহলে বর্তমানের রাজনীতির অস্থির ও অস্থিতিশীল চরিত্র অনেকখানিই ইতিবাচকতার দিকে সরে যেতো।

দেশপ্রেমিক মিডিয়ার সংখ্যা যদি বাড়তো তাহলে দেশের স্বার্থ বিরোধী মিডিয়া সতর্ক হতো। কিন্তু সেটি হচ্ছে কই? জোট সরকার এখন ক্ষমতায়। এই সময় নতুন মিডিয়ার আত্মপ্রকাশ ঘটলে ইতিবাচক ফল পাওয়া যেতো। কিন্তু তেমন কোনো নতুন মিডিয়া আসছে বলেও আমাদের জানা নেই।

ঘ. বিদেশী সংস্কৃতির আমদানি : একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বর্তমান বিশ্বে মিডিয়াই সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। মিডিয়ার কারণেই জেনিফার লোপেজ, ব্রিটনি এরা গোটা বিশ্বে পরিচিত। মিডিয়ার কারণেই ঐশ্বর্য, মাধুরী, শাহরুখ, আমির খান, ঋত্বিক এরা বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রবেশ করতে পেরেছে। বাংলাদেশের সংস্কৃতির জগতে যারা ছোট বড় সবার কাছে পরিচিত তাদের বেশিরভাগই একটি বিশেষ 'ঘরানা'র মানুষ। মিডিয়া এদেরকে সব সময় হাইলাইটস-এ রাখে। এর প্রভাব নানামুখী। তরুণ প্রজন্ম এদেরকেই তাদের হিরো হিসেবে গ্রহণ করে। এদের মতো হতে পারাকেই তারা জীবনের চরম ও পরম সাফল্য মনে করে। এক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতাপ ও প্রভাব সর্বগ্রাসী। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেয়া যাক। অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর আওয়ামী লীগের টিকিটে গত সংসদ নির্বাচনে এমপি হয়েছেন। তার সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রথম আলোসহ কয়েকটি পত্রিকার ভূমিকা যে কতটুকু কার্যকর হয়েছিল তা তার বিজয়ই প্রমাণ করে। নূরকে একজন মহৎপ্রাণ অর্থাৎ নায়কের চরিত্রের মতো মানুষ হিসেবে তুলে ধরেছে মিডিয়া। সাধারণ মানুষ প্রভাবিত হয়েছে। ফসল উঠেছে নূরের ঘরে।

ঙ) চরম দলীয় আনুগত্য : প্রত্যেকটি মিডিয়াই পার্টিজান। সাংবাদিকরা, সংস্কৃতিসেবীরা এখন এক একজন দলীয় কর্মীর ভূমিকায় নেমেছেন। এটি আমাদের মিডিয়ার জগতের জন্যে অত্যন্ত নেতিবাচক একটি দিক। প্রত্যেকটি মিডিয়ার মালিক দলীয় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। এর ফলে পাঠক দর্শকরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন। একই খবর বিভিন্ন মিডিয়ায় ভিন্ন ভিন্নভাবে পরিবেশিত হচ্ছে। ফলে জনগণ সঠিক খবর থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনগণ প্রকৃতপক্ষেই দারুণ অভাগা।

নানাভাবে বিভক্ত হয়ে পড়া মিডিয়ার কেউ কেউ আওয়ামী লীগের গুনগান গায়। কেউ বিএনপি'র। কেউবা আবার জামায়াতের। আওয়ামী মিডিয়া আওয়ামী লীগের ভালো ছাড়া খারাপ কিছু দেখে না। বিএনপি'র মিডিয়া ওই একইভাবে বিএনপি'র ভালো ছাড়া খারাপ কিছু দেখে না। বিরোধী দল চায় মিডিয়া এমনভাবে তথ্যগুলো উপস্থাপন করুক যাতে সরকারের বদনাম হয়, সুনাম ক্ষুন্ন হয়। কেউই চায় না যে, মিডিয়া বস্তুনিষ্ঠ সত্য খবর পরিবেশন করুক। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতির মারপ্যাচে পড়ে মিডিয়া তার সঠিক অবস্থান থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

এখানে বাংলাদেশের মিডিয়ার যে চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে তাতে অনেকেই যে হতাশ হবেন তা আমরা জানি। আমাদের এ লেখার উদ্দেশ্য কাউকে হতাশ করা নয়, প্রকৃত

www.pathagar.com

অবস্থাটি জানিয়ে সচেতন করা। আমরা আশা করছি কেউ না কেউ মিডিয়ার এই নেতিবাচক চিত্রটি পাল্টে দিয়ে ইতিবাচক করার উদ্যোগ নিবেন। এই বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা দরকার।

বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিকোণ থেকে মিডিয়ার কাজ হলো অবহিতকরণ (to inform),শিক্ষাদান (to educate), বিনোদন (to entertain), প্রভাবিতকরণ (to persuade) ও প্রেষণা সৃষ্টি (to motivate)।

এর মানে হলো যে মিডিয়া যতো বেশি মানসম্পন্নভাবে তথ্য পরিবশেন করতে পারবে তার গ্রাহক সংখ্যাও ততো বাড়বে। আর সেই অনুপাতেই সেই মিডিয়া জনগণকে প্রভাবিত করতে পারবে। অর্থাৎ এই ধরনের প্রভাবশালী মিডিয়া তার মতের দিকে গ্রাহকদের আনতে পারবে। সে রাজনীতি সম্পর্কে যা বলবে, অর্থনীতি নিয়ে যা লিখবে, সংস্কৃতিকে যেদিকে নিতে চাইবে তাই জনগণ শুনবে, পড়বে এবং অনুসরণ করবে। এটাই বাস্তবতা। গায়ের জোরে অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই।

এর প্রতিকার কি? কিংবা এ থেকে উত্তরণের উপায়ই বা কি? এক বাক্যেই এর জবাব দেয়া যায়। আর সেটি হলো ঃ প্রতিরোধ নয় বিকল্প-এই শ্লোগানকে সামনে রেখে নতুন নতুন মিডিয়া করা ছাড়া এ থেকে বাঁচার কোনো পথ নেই। আবার প্রশ্ন উঠতে পারে নতুন মিডিয়া কে বা কারা করবে? এগুলো চালানোর মতো যোগ্য লোক আছে কিনা?

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটির প্রথমে দেয়া যাক। হ্যাঁ যোগ্য লোক রয়েছে। তবে এরা সবাই বয়সে তরুণ। 'আমাদের লোক' বলে যারা পরিচিত তারা আবার কী এক উদ্ভট কারণে জানিনা তরুণদের ওপর ভরসা করতে পারেন না। কেউ কেউ বলেন, আসলে এরা তরুণদের ভয় পান। আর এই ভয়ের কারণ তরুণদের অনেকেই নাকি যোগ্যতার দিক থেকে তাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। আসলে এই ধরনের মন্তব্যের কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তরুণদের এগিয়ে নেয়ার কাজটি সিনিয়ররাই করেন। সহজ সমাধান হলো, সিনিয়র-জুনিয়র মিলেই এগুতে হবে। হয়তো সংখ্যাটা কম বেশি হতে পারে- এই যা।

নতুন মিডিয়া কীভাবে করা সম্ভব- ব্যক্তিগতভাবে, নাকি সংগঠনের মাধ্যমে? সংগঠনের মাধ্যমে প্রকাশিত মিডিয়া যে কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছতে পারেনি তা তো আর অস্বীকার করার উপায় নেই। আর সংগঠনই সব করে দেবে- এমন পশ্চাদপদ চিন্তা থেকে সরে আসার সময় অনেক আগেই হয়েছিল। কিন্তু উপলব্ধির ঘাটতির কারণে আমরা হয়তো তা বুঝে উঠতে পারিনি। একটু চারদিকে চোখ কান খোলা রেখে তাকালে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মিডিয়াই ভালো করছে। তারাই এখন মিডিয়া জগতের লিডিং পজিশনে অবস্থান করছে। কাজেই যাদের অর্থ তাদেরকেই নতুন মিডিয়া গড়ার কাজে এগিয়ে আসতে হবে। একই সাথে এটিকে ব্যবসা হিসেবে নিতে হবে। উন্নত দেশগুলোতে মিডিয়া কিন্তু তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে নয়, শিল্প মন্ত্রণালয়ের। এ থেকেই মিডিয়ার বাণিজ্যের দিকটি বুঝা যায়। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে মিডিয়া প্রকাশ করে এগুতে পারলে বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বিশ্বাস ও মতামতের প্রচারও করা যাবে। প্রশ্ন উঠতে পারে কোনটি আগে কোনটি পরে? ব্যবসা নাকি আদর্শ? উত্তর, দুটোই একসাথে। #

www.pathagar.com

বাংলাদেশের বর্তমান বিনোদন সংস্কৃতির স্বরূপ

রফিক মুহাম্মদ

সংস্কৃতি শব্দটার অর্থ নির্ণয় করতে ইংরেজি কালচার শব্দের প্রসঙ্গ টানা হয়। কিন্তু মুসলিম সমাজের সংস্কৃতি নির্ণয়ে যথার্থ শব্দ হচ্ছে তাহযীব-তমদ্দুন। যদিও সংস্কৃতি বলতে আরবি শব্দ 'সিকাফত' এর প্রচলনও রয়েছে। তবুও সংস্কৃতির প্রতিশব্দ তাহযীব শব্দটিই যথার্থ বলে অনেক ব্যক্তির মতামত রয়েছে। তাহযীব ও তমদ্দুন দু'টো আরবি শব্দ। তমদ্দুন শব্দটা এসেছে "দুন" থেকে। তা থেকে মাদানীয়াত অর্থাৎ নাগরিক বোধ। ব্যাপক অর্থে নগর জীবনভিত্তিক যে পরিশীলিত সভ্যতা গড়ে ওঠে তাকে তমদ্দুন বলা যায়। অন্যদিকে তাহযীব শব্দটা এসেছে হাযব থেকে। হাযবা বা তাহযীব মানে কেটে সমান করা। তাই তাহযীব অর্থ দাঁড়ায় মানুষের পরিশীলিত জীবনধারা। এভাবে সংস্কৃতি বলতে বুঝায় সুবিন্যস্ত ও পরিশীলিত জীবনধারা, জীবনাচরণ, জীবনবোধ ও জীবনপদ্ধতি। যে সব সুসজ্জিত কর্মকাণ্ড ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বহিঃপ্রকাশ, বৈশিষ্ট্য ও ভাবধারাকে চিহ্নিত করে তাই সংস্কৃতি। প্রখ্যাত মনীষী সৈয়দ আলী আহসান সংস্কৃতির সংজ্ঞায় বলেছেন, 'ব্যাপকতর অর্থে সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির অথবা সামাজিক গোত্রের বিশিষ্টার্থক আত্মিক, বস্তুগত, বুদ্ধিগত এবং আবেগগত চিন্তা ও কর্মধারার প্রকাশ। শিল্প ও সাহিত্যই কেবল সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বস্তু নয়, মানুষের জীবনধারাও সংস্কৃতির অঙ্গ। মানুষের অধিকার, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসও সংস্কৃতির অঙ্গ।'

সংস্কৃতির এই ব্যাপকতার মধ্যে একটি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা পরিচয় হিসেবে বর্তমানে যে সমস্ত বিষয়কে গণ্য করা হচ্ছে তা

www.pathagar.com

হলো সঙ্গীত, নাটক, চলচ্চিত্র, নৃত্য, আবিষ্কার এবং অনুসন্ধান কর্ম, ধর্মবোধ ইত্যাদি। অর্থাৎ অধিগম্য এবং অনধিগম্য সকল কর্ম মানুষের ভাব প্রকাশের ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি বিশ্বাস, ঐতিহাসিক নিদর্শন, নৃতত্ত্ব, গ্রন্থাগার, উপাসনালয় সবকিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কালচারের প্রতিশব্দ হিসেবে সংস্কৃতিকে এখন শুধুমাত্র চলচ্চিত্র, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য এসব বিনোদনের বিষয়গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখা হচ্ছে। সংস্কৃতিকে ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ থেকে দূরে রাখারই চেষ্টা হচ্ছে নানাভাবে। সংস্কৃতির ব্যাপকতার মধ্যে চলচ্চিত্র, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য এসব বিনোদন বিষয়গুলো এর একটা অংশ মাত্র। এই বিনোদন সংস্কৃতিই আজকের আলোচ্য বিষয়।

বিনোদন সংস্কৃতির একটি শক্তিশালী ও প্রভাবশালী। একটি জাতির ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে বর্তমানে ব্যাপকভাবেই প্রভাবিত করছে ওই জাতির বিনোদন। বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি তার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব বিনোদনের মাধ্যমে ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে ধ্বংসের চক্রান্ত করছে। একটি জাতির সংস্কৃতির মডেল হিসেবে তারা এখন শুধুমাত্র বিনোদনকেই চিহ্নিত করছে। আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বিনোদন গোটা সংস্কৃতিতে কীরূপ প্রভাব ফেলছে বা সংস্কৃতিকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করছে সে বিষয়টি অবশ্যই ভেবে দেখা প্রয়োজন।

বিনোদন মাধ্যমগুলো কি কি?

আমাদের দেশের বিনোদন মাধ্যমগুলোর মধ্যে চলচ্চিত্র, নাটক, সঙ্গীত, মডেলিং এগুলো প্রধান। এছাড়া নৃত্য, যাত্রা, পালাগান, বিভিন্ন খেলাধুলা এগুলোও রয়েছে। বিনোদনের এসব মাধ্যম সভ্যতার শুরু থেকেই সংস্কৃতির সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

চলচ্চিত্র

বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী এবং গতিশীল শিল্পমাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। সমাজ ও জীবনের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং জীবনবোধের প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব এই শিল্পের মাধ্যমে। শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে জীবন ঘনিষ্ঠ ও সমাজ সচেতন চলচ্চিত্র চিত্তবিনোদনের পাশাপাশি সামাজিক বিবর্তনে মূল্যবান অবদান রাখতে পারে। গড়ে তুলতে পারে সুষ্ঠু জীবনবোধ, ঐতিহ্য ও বিশ্বাসী চেতনার নান্দনিক সমাজ। জীবনের সুন্দর রূপায়ন হতে পারে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। বাস্তব ও সার্থকভাবে প্রতিফলিত হতে পারে একটি দেশ ও জাতির কৃষ্টি, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ। বিনোদনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে একটি দেশ বা জাতির কৃষ্টিকে দেশে এবং সারা বিশ্বে অতি সার্থকতার সাথে তুলে ধরা যায়। একইভাবে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে দেশাত্মবোধ, সামাজিক দায়িত্ব সচেতনতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা স্থাপনও সম্ভব।

১৯৫৬ সালের ৩ আগস্ট এক আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের লক্ষ্যে এদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলচ্চিত্রের বয়স প্রায় পঞ্চাশ হতে যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে এদেশের চলচ্চিত্রে এখন নৈতিক অবক্ষয় ও বিশ্বাসহীনতাই প্রস্ফুটিত হচ্ছে। চলচ্চিত্র এখন একটি সামাজিক ব্যাধির নাম। অশ্লীলতা চলচ্চিত্র শিল্পকে যেভাবে গ্রাস করেছে, তার পরিণতি অনেকটা ভয়াবহ বলা যায়। চলচ্চিত্র একটি প্রভাবশালী গণমাধ্যম। এর প্রভাব সমাজে খুব গভীরভাবেই পড়ে। বর্তমান চলচ্চিত্রের অশ্লীলতাও সমাজের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। যুব সমাজের

www.pathagar.com

নৈতিক অবক্ষয় থেকে শুরু করে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধও বিনষ্ট হচ্ছে। চলচ্চিত্রে এই অবক্ষয় শুরু হয় আশির দশকের পরে। নব্বই দশকের শুরুতেই মূলত 'চাঁদনী' ছবির মধ্য দিয়েই চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা ব্যাপকতর হয়। চলচ্চিত্র থেকে নীতি, নৈতিকতা, দেশ সমাজ জীবনের চিত্র, শৈল্পিকতা প্রভৃতি বিদায় নেয়। অশ্লীলতা, নগ্নতা, সন্ত্রাস, মারপিট, রুচিহীন গান ও নৃত্য এসব বিকৃত বিনোদন এসে চলচ্চিত্রকে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে শুরু করে। বিকৃত কুরুচির নাচ, গান এবং অশালীন সংলাপই হয়ে ওঠে ছবির মূল বিষয়।

এসব চলচ্চিত্রের শিল্পচর্চা নয় বরং ব্যবসাই মূল লক্ষ্য। চলচ্চিত্রের এ অবস্থার জন্য নির্মাতা শিল্পী, কুশলীরা যেমন দায়ী, তারচেয়েও বেশি দায়ী এদেশের সরকার। স্বাধীনতার পর এদেশে যত সরকার এসেছে সবাই এই বিশাল শিল্প মাধ্যম চলচ্চিত্রকে অনেকটাই উপেক্ষা করেছে। এর উন্নয়নে বলতে গেলে ধারাবাহিকভাবে কোনো সরকারই কাজ করেনি। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (বিএফডিসি) থাকলেও সেখানে উন্নয়নের ছোঁয়া তেমন নেই বললেই চলে। ক্যামেরা, সাউন্ড, এডিটিং, প্রিন্টিং এসব এখনো সেই মান্ধাতা আমলেরই রয়ে গেছে। অন্যান্য দেশ প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। সারা বিশ্বেই এখন ডলভি সাউন্ড, ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবহার করে চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো সেই মনো সাউন্ড এবং ৩৫ এম এম এর ক্যামেরা দিয়েই ছবি নির্মিত হচ্ছে। যে ল্যাবে ছবি প্রিন্ট হয় তারও দশা খুব করুণ। ফলে ছবি হয় ঝাপসা। টেকনিক্যাল উন্নতি না হলেও অশ্লীলতা, নগ্নতা এবং বিকৃত রুচির দিক থেকে বিশ্বসেরাই বলা যায়। এজন্য প্রধানত সরকার তথা সেন্সর বোর্ডই দায়ী। সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বিরোধী, রাষ্ট্রীয় বিরোধী কোনো ছবি যাতে না হয় তা দেখাশোনা করাই সেন্সর বোর্ডের দায়িত্ব। একটি ছবি নির্মাণের পর তা সেন্সর বোর্ডে জমা দেয়া হয়। সেন্সর বোর্ড সে ছবিটি দেখে প্রদর্শনের উপযোগী মনে করলে, অর্থাৎ এ ছবিতে রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মের উপর আঘাত আসতে পারে এমন কোনো উপকরণ না থাকলেই ছাড়পত্র দেয়। কিন্তু বর্তমানে যেসব ছবি মুক্তি পাচ্ছে তার প্রতিটিই সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের চরম ক্ষতিকারক।

তাহলে এসব ছবি কিভাবে ছাড়পত্র পাচ্ছে। এ প্রশ্নের উত্তরে খুব সহজেই বলা যায় যে, চলচ্চিত্রের মতো সেন্সর বোর্ডেরও নৈতিক অবক্ষয় হয়েছে। সেন্সর বোর্ড সদস্যদের কর্মকাণ্ড নিয়ে পত্রপত্রিকায়ও লেখালেখি হচ্ছে। চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের মোট সদস্যদের মধ্যে ৮ জন সদস্য সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ নিয়োগ দেয়া হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে সেন্সর বোর্ডে যাদেরকে নিয়োগ দিয়েছেন তাদের মধ্যে চারজন সাংবাদিক। এদের মধ্যে অধিকাংশই চলচ্চিত্র সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণাও রাখেন না, অথচ তারা সেন্সর বোর্ডের সদস্য। এ সদস্য তালিকায় এমন একজন প্রযোজক, পরিচালকও আছেন যিনি অশ্লীল ছবির নির্মাতা হিসেবে চিহ্নিত। যাকে অশ্লীল ছবির জনক বলেই চলচ্চিত্রাঙ্গণের সবাই জানেন। এ ধরনের ব্যক্তিদের সেন্সর বোর্ডের সদস্য হওয়ার ফলেই 'ফায়ার', 'কালা কাফন' এর মতো নিম্নমানের অশ্লীল ছবিও এখন মুক্তি পাচ্ছে। ফায়ার ছবিটি দু' দু'বার নিষিদ্ধ হওয়ার পরও মুক্তি পেয়েছে। এর বিনিময়ে সেন্সর বোর্ড সদস্যদের ভাগবাটোয়ারা কিছুটা বেশি হয়েছে এমন কথা চলচ্চিত্র পাড়ায় বেশ আলোচিত। এ ছবি মুক্তির লক্ষ্যে ঢাকা ক্লাবে যে মদের পার্টি হয় তাতেও সেন্সর বোর্ডের কোনো কোনো সদস্য উপস্থিত ছিলেন তা অনেকেরই জানা।

www.pathagar.com

আলেম সমাজ এবং ইসলাম ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করে নির্মিত 'মাটির ময়না' ছবিটি কি করে ছাড়পত্র পেল? 'মাটির ময়না' ছবিটি খৃস্টানদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছে। ইসলাম ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করাই এর মূল লক্ষ্য। ছবিটি সেন্সর ছাড়পত্র ছাড়াই প্রথমে 'কান' চলচিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়। ইসলাম ধর্মের বিরোধী বলেই সেখানে ছবিটিকে ক্রিটিক এওয়ার্ড দেয়া হয়। এ সবই খৃস্টানদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে হচ্ছে। এসব জেনেও সেন্সর বোর্ড এ ছবিটি এদেশে প্রদর্শনের ছাড়পত্র দিয়েছে। বিনিময়ে সেন্সর বোর্ডের সদস্যরা কি পেয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ছবিটি অস্কারের বিদেশী শাখায়ও প্রতিযোগিতার জন্য পাঠানো হয়েছে। এ নিয়ে অনেকেই খুব গর্বের কথাও বলছেন। কিন্তু যে ছবিটিতে আমার দেশের, সমাজের যে বিশ্বাস তাকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা হয়েছে তা কি এ দেশের মানুষের ধর্মবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করার সূক্ষ্ম চক্রান্ত নয়? এমনি সূক্ষ্ম চক্রান্তের জালে পড়ে আমাদের চলচ্চিত্র ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ হয়তো বিকল্পধারার চলচ্চিত্র অর্থাৎ আর্ট ফিল্ম বা শর্ট ফিল্মের কথা বলতে পারেন। বলতে পারেন যে বিকল্প ধারায় শৈল্পিক বা নান্দনিক ছবি নির্মিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, সে সব ছবির বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনায় আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিচয় বহন করে কিনা?

সাম্প্রতিক সময়ের আলোচিত তিনটি ছবির কথা উল্লেখ করলেই এ বিষয়টি পরিষ্কার হবে। তানভীর মোকাম্মেল নির্মাণ করেছেন 'চিত্রানদীর পাড়ে' ছবিটি। এতে মুসলিম কর্তৃক নির্যাতিত হিন্দুদের এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি কতটুকু সত্য? এটি কি আদৌ সত্য? বরং বলা যায়, অতি সূক্ষ্মভাবে এদেশের মুসলমানদের এ ছবিতে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত 'লালসালু' ছবিতেও একইভাবে মুসলমানদের ভণ্ড, প্রতারক, ধর্ম ব্যবসায়ী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আলাউদ্দিন আল আজাদের বিতর্কিত ছোটগল্প 'বৃষ্টি' অবলম্বনে নির্মিত 'বৃষ্টি' ছবিতেও পালিত পুত্রের সঙ্গে মায়ের অবৈধ যৌন মিলনের যে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে তা কি আদৌ আমাদের সামাজিক মূল্যবোধের বিষয়? বরং এসব ছবির মাধ্যমে অতিসূক্ষ্মভাবে এদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর আঘাত হানা হচ্ছে। অথচ এসব ছবিকে আমরা শৈল্পিক এবং নান্দনিক ছবি বলে বাহবা দিচ্ছি। মূলত এইসব বিকল্পধারার ছবিই অতি সন্তর্পণে এদেশের সংস্কৃতির চরম ক্ষতি সাধন করে যাচ্ছে। এদেশের মানুষের ধর্মীয় চেতনাকে বিনষ্ট করার গভীর চক্রান্ত হলো এসব বিকল্প ধারার ছবি।

চলচ্চিত্রের এই দূরাবস্থার জন্য সরকার তথা সেন্সর বোর্ডের পাশাপাশি নির্মাতারা ভিডিও পাইরেসিকেও দায়ী করেন। একটি ছবি বিভিন্ন সিনেমা হলে মুক্তির সাথে সাথেই অবৈধভাবে তা ভিডিও ক্যাসেট এবং সিডির মাধ্যমে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে নির্মাতারা ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হন। ভিডিও এবং সিডির মাধ্যমে ঘরে বসে ছবিটি দেখতে পারেন বলে দর্শক আর সিনেমা হলে যান না। এখানেও নির্মাতারা সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনৈতিকতাকেই দায়ী করেন। যারা ভিডিও পাইরেসি বন্ধে নিয়োজিত তাদের যোগসাজসে অবৈধ ভিডিও এবং সিডি বাজারে বিক্রি হয় বলে নির্মাতাদের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ছবি প্রচারেও তাদের ক্ষতি হয় বলে নির্মাতারা দাবি করেন। তবে এক্ষেত্রে বলা যায় যে টিভি চ্যানেলে যে সব ছবি

www.pathagar.com

প্রচার হয় তাতে নির্মাতাদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা তেমন একটা নেই। বরং সিনেমা হলের পরিবেশের কারণে এবং অশ্লীলতার ভয়ে যারা সিনেমা হলে ছবি দেখতে যান না, একটি ভালো ছবি টিভি চ্যানেলে প্রচারের ফলে সে সব দর্শক কিন্তু সে ছবিটি দেখতে সিনেমা হলে ভীড় করেন। এর প্রমাণ 'হঠাৎ বৃষ্টি' ছবিটি। এভাবে টিভি চ্যানেলগুলো বরং নির্মাতাদের প্রচারের সহায়ক বলেই মনে হয়।

মূলত বর্তমান চলচ্চিত্রের এই দূরাবস্থার জন্য দায়ী হলো- নীতিহীনতা, অনুকরণ প্রবণতা সর্বোপরি সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বিরোধী বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা। বর্তমানে চলচ্চিত্রের নির্মাতাদের মধ্যে রুচিশীল চিন্তা চেতনার বড়ই অভাব। তাদের নীতি হলো শুধু ব্যবসা করা। ছবির কোনো কাহিনী নেই, নায়িকার অর্ধনগ্ন শরীরের নাচের নামে লাফালাফি, খলনায়কের মুখে অশ্লীল-অশ্রাব্য ডায়লগ, প্রেমের নামে নায়ক-নায়িকার অশালীন জড়াজড়ি এইসব এখন চলচ্চিত্রের প্রধান বিষয়বস্তু। মৌলিক কোনো কাহিনীর ছবি একেবারেই এখন নির্মিত হয় না। বোম্বের ছবির কাহিনী থেকে শুরু করে ড্রেস, গানের সুর সবকিছুই নকল করে নির্মিত হচ্ছে। যাতে আমাদের সমাজের কোনো চিত্রই প্রতিফলিত হয় না। এসব নকল কাহিনীর বিকৃত রুচির ছবির মধ্যে ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী বিষয়বস্তুই বেশি থাকে। হলিউড এবং বলিউডে বর্তমানে ভালো মন্দ দু'ধরনের ছবিই নির্মিত হচ্ছে। তাদের ছবিতে তাদের সামাজিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। হিন্দি ছবিতে এখনো নায়িকাকে পুঁজা দিতে দেখা যায়। এ সময়ের আলোচিত 'কাভি খুশি কাভি গম' এবং 'দেবদাস' এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। হলিউডেও একইভাবে ছবিতে গীর্জা কিংবা নায়কের গলায় ক্রুস ঝুলতে দেখা যায়। অথচ আমাদের দেশের কোনো ছবিতেই মসজিদের দৃশ্য ভুলেও থাকে না। তবে দেখানো হয় পীরের মাজার। সেখানে পীরকে সৃষ্টিকর্তার উপর স্থান দেয়া হয় ধর্ম ব্যবসায়ী হিসেবে অথবা ধর্মের নামে অবৈধ কার্যকলাপের আখড়া হিসেবে। অর্থাৎ সূক্ষ্মভাবেই সেখানে ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। এ অবস্থায় মুসলিম সমাজ ও দেশের জন্য ইরানী চলচ্চিত্রই আশার আলো কিংবা দিকনির্দেশনা হিসেবে রয়েছে। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পর পশ্চিমা বিশ্ব প্রচার করতে শুরু করে যে, এখন আর ভালো চলচ্চিত্র নির্মিত হবে না। কিন্তু তাদের এসব অমূলক প্রচারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে ইরানী চলচ্চিত্র বিশ্বের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নিজের স্থানকে পাকাপোক্ত করে নিয়েছে। বর্তমানে ইরানী ছবি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে পুরস্কৃত হচ্ছে। ইরানী চলচ্চিত্র মুসলিম সংস্কৃতির মডেল হতে পারে বলে বিশ্বখ্যাত অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ মত প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে ইরানী চলচ্চিত্রের মতো রুচিশীল ও শিল্প মানসম্পন্ন ছবি নির্মাণ করার মতো যোগ্য নির্মাতা এদেশে আছেন কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন।

নাটক

নাটকও বিনোদনের এক শক্তিশালী মাধ্যম। টিভি নাটক এবং মঞ্চ নাটক- এই ধরনের একটি বিভাজন ইদানিং ব্যবহৃত হচ্ছে। টেলিভিশন এখন সারাবিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী মিডিয়া। প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে টিভি মিডিয়ারও অভাবনীয় বিকাশ ঘটেছে। টেলিভিশন এখন গোটা বিশ্বকে ধারণ করে রেখেছে। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের যে কোনো ঘটনাই এখন মুহূর্তের মধ্যে ঘরে বসে দেখা সম্ভব হচ্ছে। স্যাটেলাইট এখন গোটা বিশ্বকে এক গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত করেছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের বর্তমানে নিজস্ব তিনটি টিভি চ্যানেল রয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি), চ্যানেল আই ও এটিএন বাংলা। বিটিভি সরকারি এবং অপর দু'টি ব্যক্তি মালিকানাধীনে পরিচালিত।

বাংলাদেশ টেলিভিশন অর্থাৎ বিটিভি সরকারি হওয়ায় এর নানান সীমাবদ্ধতা আছে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার আবর্তে নিমজ্জিত এটি। বিটিভির কর্মকর্তারা বলতে গেলে তাদের ইচ্ছে মতো কোনোকিছুই করতে পারেন না। রাজনৈতিক প্রভাবে কর্মকর্তাদের বেহাল অবস্থা। পনের দিন আগেও বিটিভির কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানের সঠিক সিডিউল পর্যন্ত তৈরি করতে পারেন না। মন্ত্রী, এমপি থেকে শুরু করে পাতি নেতার সুপারিশ এবং হুমকি ধমকিতে নানান অনুষ্ঠান প্রচার হচ্ছে। এসব অনুষ্ঠানে না আছে তথ্য, না আছে শিক্ষণীয় কোনো উপাদান, না আছে সুস্থ রুচিশীল বিনোদন। প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানই মানহীন, যাচ্ছেতাই ধরনের। উদাহরণস্বরূপ বর্তমান সরকারের এক এমপির উপস্থাপনায় ও পরিচালনায় প্রচারিত 'আনন্দ ঘন্টার' কথাই বলা যায়। এক ঘন্টার এই 'আনন্দ ঘন্টায়' আনন্দের লেশমাত্রও থাকে না। উদ্ভট বিষয়বস্তুর মানহীন নাটক, ভালোবাসার গল্প নামে বেহুদা প্যাঁচাল, রুচিহীন কথার গান এসবই প্রচার হয় মাহি বি চৌধুরীর এ অনুষ্ঠানটিতে- যা দর্শকদের কাছে খুবই বিরক্তিকর। এরপরও এ অনুষ্ঠান চলছে। এ ধরনের অসংখ্য মানহীন অনুষ্ঠানই প্রচার হয় বিটিভিতে। বাংলাদেশের জাতীয় প্রচার মাধ্যম হিসেবে বিটিভির ভূমিকা হচ্ছে শিক্ষা, তথ্য এবং জাতীয় সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার ঘটানো। কিন্তু বিটিভিতে এসবের সঠিক উপস্থাপন একেবারেই হচ্ছে না। দলীয় কর্মকাণ্ডের প্রচার এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতেই নানা অনুষ্ঠান হচ্ছে। বিনোদন বলতে গান, নাটক এবং বিভিন্ন ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় যেগুলো একেবারেই নিম্নমানের। এদেশের মানুষের পছন্দের গান পল্লীগীতি, ভাটিয়ালী, মুর্শিদি, ভাওয়াইয়া এসব গান বিটিভিতে এখন অনেকটাই উপেক্ষিত। তারচেয়ে নিম্নমানের কুরুচিপূর্ণ কথার আধুনিক গান, পশ্চিমা সঙ্গীতের অনুকরণে ব্যান্ড সঙ্গীতের নামে বিরক্তিকর চেঁচামেচি- এসবই এখন বিটিভিতে প্রাধান্য পাচ্ছে। নজরুল রবীন্দ্রনাথের গানও এখন খুব অল্প সময়ই প্রচার হয়। বিটিভিতে যে সব নাটক প্রচার হয় তারও একই অবস্থা। বেশিরভাগ নাটকেই প্রেমের গদবাধা কাহিনী। এদেশের মানুষের সামাজিক জীবনের, তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের ছিটেফোঁটাও কোনো নাটকে থাকে না। বিটিভির নিজস্ব ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানগুলো এতই নিম্নমানের যে সেগুলো অনেক সময় স্পন্সর ছাড়াই প্রচারিত হয়। অথচ প্যাকেজের আওতায় নির্মিত 'ইত্যাদি'র স্পন্সরের কোনো অভাব হয় না।

সুস্থ বিনোদনের মাধ্যমে সমাজ সেবা, এই স্লোগান নিয়ে ১৯৯৯ সালের ১ অক্টোবর চ্যানেল আই নামের বেসরকারি চ্যানেলের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু এর মাধ্যমে কি সুস্থ বিনোদনের প্রচার হচ্ছে? মোটেই না। চ্যানেল আই-এর নাটকও নিম্নমানের। সমাজ এবং বাস্তবতাহীন কাহিনীর নাটকই বেশি প্রচার হচ্ছে। যাতে এ দেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ও জীবনযাত্রার বিন্দুমাত্রও প্রতিফলন দেখা যায় না। গান এবং ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানগুলোও অন্যান্য বিদেশী চ্যানেলের অনুকরণে সাজানো হয়। যার অবস্থা দাঁড়ায় কাকের ময়ূরপুচ্ছ ধারণের মতো। এটিএন বাংলার অবস্থা আরো করুণ।

এছাড়াও বর্তমানে স্যাটেলাইটভিত্তিক বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রায় ১৫-২০টি চ্যানেল নিয়মিত দেখছে এদেশের মানুষ। ১৯৯২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর সিএনএন-এর সাথে যুক্ত

www.pathagar.com

হয়ে বাংলাদেশের আকাশ প্রথম উন্মুক্ত হয়। একই বছর ডিশ এর অনুমোদনের ফলে বিদেশী সংস্কৃতির আগ্রাসনের মুখে পড়ে এদেশের সংস্কৃতি। স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোতে অনেক শিক্ষণীয় এবং উন্নতমানের রুচিশীল অনুষ্ঠান প্রচার হয়। কিন্তু সে সবের চেয়ে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধের পরিপন্থী অনুষ্ঠানগুলোর প্রতিই নতুন প্রজন্মের ঝোঁক। স্কুলগামী কিশোর কিশোরী কিংবা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ তরুণীরা স্যাটেলাইটের প্রভাবে এতটাই প্রভাবিত যে তারা এখন হিন্দী ভাষা আওড়ায়, মাইকেল জ্যাকসন, ম্যাডোনার গান গায়, ঋত্বিক রোশন, শাহরুখ খান, কাজল, কারিনার মতো স্টাইল করে। এই সর্বগ্রাসী স্যাটেলাইটের দাপটে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি হচ্ছে। তরুণ সমাজ আজ বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুগামী, অনুসারী হচ্ছে। আর এর কারণ হচ্ছে আমাদের নিজস্ব চ্যানেলগুলোর মানহীনতা, রুচিহীনতা। আমাদের চ্যানেলগুলোতে যদি আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির আলোকে মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান প্রচার হতো তাহলে তরুণ সমাজ বিজাতীয় বিদেশী সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হতো না। বর্তমানে ইন্টারনেটের কল্যাণে বিদেশী অপসংস্কৃতির নতুনমাত্রা 'ই-বিনোদন' যুক্ত হয়েছে। কিশোর কিশোরী, তরুণ তরুণীরা এখন অনেকটা নেশাগ্রস্তের মতো ইন্টারনেটের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। আর এরই সুযোগে সারা দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠেছে সাইবার ক্যাফে। এসব সাইবার ক্যাফেতে স্কুল কলেজ পালিয়ে ছেলেমেয়েরা ঘন্টার পর ঘন্টা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ঘুরে বেড়ায়। যে সব ওয়েবসাইট এসব তরুণ তরুণীরা উপভোগ করে তা অশ্লীল পর্ণগ্রাফী। এই ই-বিনোদন পর্ণগ্রাফী দেশের নতুন প্রজন্মের মানবিক গুণাবলী এবং ধর্মীয় মূল্যবোধকে একেবারেই বিনষ্ট করে দিচ্ছে। অথচ সরকার এ ব্যাপারে নির্বিকার। নিয়ন্ত্রিতভাবে ইন্টারনেট ব্যবহারের কোনো পদক্ষেপই সরকার গ্রহণ করছে না। ই-বিনোদন যেভাবে তরুণ সমাজকে বিপথের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এর প্রতিকার এখনই না করলে এদেশের নিজস্ব সংস্কৃতি, সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় চেতনা সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

মঞ্চ নাটক

বাংলাদেশের মঞ্চ নাটক বেইলী রোড এবং টিএসসিতেই বেশিরভাগ মঞ্চস্থ হয়। বর্তমানে মঞ্চ নাটককে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গ্রুপ তাদের কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন জেলা পর্যায়েও শুরু করেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও মঞ্চ নাটকের কার্যক্রম বেশ জোরদার হচ্ছে।

মঞ্চপাড়া অর্থাৎ বেইলী রোড, টিএসসি- এসব অঙ্গন সাধারণত প্রগতিবাদীদের পদচারণাতেই মুখরিত। যাদের ধ্যান-জ্ঞান সবকিছুই আস্তিকতা বিরোধী। ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে এসব প্রগতিবাদী নাট্যকর্মীরা বেইলী রোড, টিএসসিসহ সারাদেশে যে সব নাটক মঞ্চস্থ করে তার প্রতিটিই কোনো না কোনোভাবে ইসলাম ধর্মকে কটাক্ষ করে। স্বাধীনতার পর থেকে এদেশে অনেক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। সেগুলোতে মুসলমানদেরকে এদেশের স্বাধীনতা বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দাঁড়ি টুপি পরিহিত লোক মানেই স্বাধীনতা বিরোধী। এই বিষয়টি মূলত মঞ্চ নাটকের মাধ্যমেই বেশি প্রচারিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জেলা উপজেলা শহরে পথ নাটকের মাধ্যমেও এসব প্রগতিবাদী নাট্যকর্মীরা ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছে এবং এখনো চালাচ্ছে। সম্প্রতি রাজবাড়িতে মঞ্চস্থ একটি নাটক এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মূলত এদেশের ইসলামিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যে বিনোদন মাধ্যমটি কাজ করছে, সেটি হলো মঞ্চ নাটক, পথ নাটক। অথচ এই নাট্যাঙ্গণ থেকে

www.pathagar.com

বিশ্বাসী চেতনার সাংস্কৃতিক কর্মীরা যেন স্বেচ্ছায়ই নির্বাসিত। এ অঙ্গনকে নাস্তিক্যবাদী প্রগতিশীলরাই দখল করে রেখেছে।

সঙ্গীত

তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের ফলে সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসার মাধ্যমের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। এক সময় শুধু কলের গানের মাধ্যমেই মানুষ গান শুনতো। তাও সে কলের গান দু'তিন গ্রামের মধ্যে হয়তো একটি থাকতো। এরপর রেডিও আবিষ্কারের পর ধীরে ধীরে রেডিওর মাধ্যমে সঙ্গীত ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। বর্তমানে মাইক, অডিও ক্যাসেট, সিডি, ভিসিডি, টেলিভিশন প্রভৃতির মাধ্যমে গান হাটে, মাঠে, ঘাটে সর্বত্রই শোনা যায়। সঙ্গীত প্রচারের মাধ্যমের বিকাশ ঘটলেও এর মানের কোনো প্রসার বা উন্নতি ঘটেনি। বরং আধুনিক গানের কথা ও সুর আগের মতো কাব্যময় ও সুললিত হচ্ছে না। এখন সস্তা, চটুল ও হালকা কথার কুরুচিপূর্ণ গানের ছড়াছড়ি। মমতাজ, শেফালী, আশরাফ উদাসসহ এ ধরনের শিল্পীদের কণ্ঠে হালকা চটুল ও কুরুচিপূর্ণ কথার গানই বেশি হচ্ছে। আগেই বলেছি প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে এদেশে এখন গানের এক বিশাল মার্কেট তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে অডিও মার্কেটে এখন কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হয়। তাই সঙ্গীত শিল্পীরাও এখন সস্তা জনপ্রিয় কথার আধুনিক গান গেয়ে রাতারাতি বড়লোক। এরা জনপ্রিয় তারকা বনে যাচ্ছেন। এ মানসিকতার ফলে সঙ্গীতের এ অধঃপতন। এখন শুদ্ধ সঙ্গীত সাধনার মাধ্যমে কাউকে শিল্পী হতে হচ্ছে না। কোনো রকমে গলা ছেড়ে গাইতে পারলেই শিল্পী। তাইতো এখন গানের কথা হচ্ছে চটুল, কুরুচিপূর্ণ সুর হচ্ছে নকল বেসুরো। আশির দশক পর্যন্ত আধুনিক গানের কথায় কাব্যময়তা ছিল। উন্নত ভাবের কথার গান রচিত হতো তখন। আবু হেনা মোস্তফা কামাল, নজরুল ইসলাম বাবু, আব্দুল হাই আল হাদী, মনিরুজ্জামানসহ আরো অনেকেই ভালো গান লিখেছেন। কিন্তু এখন সে ধরনের কাব্যময় কথার গান এখন আর রচিত হয় না। আগে দেশাত্মবোধক, আধ্যাত্মবাদের গানও বেশ ভালো ভালো রচিত হতো। যেমন একবার যেতে দেনা আমার ছোট্ট সোনার গাঁয় ...'। কিংবা মরহুম সিরাজুল ইসলামের 'হলুদিয়া পাখি সোনারই বরণ...'। এ ধরনের বহু গান আছে যেগুলো মানুষকে উজ্জীবিত করতো, দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত করতো। পল্লীগীতি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি এসব গানও এখন প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। অডিও, সিডি, ভিসিডি এসব মাধ্যমে এখন শুধু হালকা চটুল কথার প্রেমের গান, পশ্চিমা সংস্কৃতির আদলে সঙ্গীতের নামে হেড়ে গলা ছেড়ে বিরক্তিকর চেঁচামেচির ব্যান্ড সঙ্গীতই প্রচার হচ্ছে। পল্লীগীতি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী এসবের ক্যাসেট, সিডি, ভিসিডি খুব কমই পাওয়া যায়। নজরুল ও রবীন্দ্র সঙ্গীতের চর্চাও এখন অনেকাংশে কমে গেছে। হামদ, নাত এসবও এই মাধ্যমে একেবারেই নগণ্য। রেডিও, টিভিতে অবশ্য পল্লীগীতি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী, হামদ, নাত মাঝে মধ্যে প্রচার হয় বলেই এসব গান আজো বেঁচে আছে, না হয়তো এতদিনে হারিয়ে যেত। অবশ্য এসবের বিপরীতে বিশ্বাসী চেতনার, সুস্থ, সুন্দর ও রুচিশীল গানের একটি ধারা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছে। এ ধারাটি এখনো এতই ক্ষীণ যে তা উল্লেখ করার মতো নয়। অথচ এই ধারার গানের কথা সমৃদ্ধ, কাব্যময় ও সুন্দর। অনেক গানের সুরও মনোমুগ্ধকর। কিন্তু বাজনা ছাড়া খালি গলার এসব গান শ্রোতাদের কাছে লবণ ছাড়া তরকারীর মতোই মনে হয়। তাই এসব সুস্থ, সুন্দর ও বিশ্বাসী চেতনার সঙ্গীতকে জনগণের কাছে, জনগণের হৃদয়ে পৌছাতে হলে বাজনাসহ গাওয়া উচিত। আসলে যা মানুষকে কল্যাণের পথে উদ্বুদ্ধ

www.pathagar.com

করবে তা করতে বাধা কোথায়? সময়ের প্রয়োজনে এ বিষয়টি এখন ভেবে দেখা উচিত। 'আল্লাহু আল্লাহু তুমি জাল্লে জালালুহু, শেষ করাতো যায় না গেয়ে তোমার গুণগান ...' আব্দুল আলীমের দরাজ কণ্ঠে বাজনাসহ এই হামদ কি স্রষ্টার প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে গাঢ় করে না?

মডেলিং

বিজ্ঞাপন চিত্র ছাড়া এখন কোনো পণ্যের প্রচার বা প্রসার যেন একেবারেই অকল্পনীয় ব্যাপার। একটা সময় পণ্যের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন শুধু প্রিন্টিং মিডিয়া ও বিভিন্ন বিলবোর্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে এ বিজ্ঞাপন চিত্র ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে বলা যায় অনেকাংশেই দখল করে নিয়েছে। বিজ্ঞাপন চিত্রে নারী পুরুষকে মডেল হিসেবে ব্যবহার করে যেভাবে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে উপস্থাপন করা হচ্ছে তা একেবারেই মুসলিম সমাজের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিরোধী। চলচ্চিত্র, নাটক এসবের মাধ্যমে যেমন সমাজের মূল্যবোধকে বিনষ্ট করা হচ্ছে, ঠিক তেমনি মডেলিং এর মাধ্যমেও সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে ধ্বংস করা হচ্ছে। বরং বর্তমানে চলচ্চিত্র ও নাটকের চেয়ে মডেলিং এর প্রভাব আরো তীব্র। পণ্যের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে যে বিজ্ঞাপন চিত্র এখন নির্মাণ করা হচ্ছে সেখানে মূলত নারীকে পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। মডেলিংয়ের নামে নারীকে উচ্চাভিলাসী করে করা হচ্ছে বিপথগামী। এর প্রমাণ হচ্ছে পাপড়ি ও তিন্নির মতো মডেলরা। এসব উচ্চাভিলাসী বিপথগামী মডেলদের অপমৃত্যুই হয়েছে শেষ পরিণতি। বিজ্ঞাপন চিত্রের মডেলিং এর মাধ্যমে নারীকে যেমন খোলামেলা পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, ঠিক তেমনি বিজ্ঞাপনের ভাষা, উপস্থাপন ঢং মানুষের শরম, লজ্জাকে অনেকটা কমিয়ে দিচ্ছে। টিভি পর্দায় জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর বিজ্ঞাপন অহরহই প্রচারিত হচ্ছে। এগুলো পরিবারের সকল সদস্য একত্রে বসে দেখছে। এতে করে লজ্জা অনেকটাই কমে যাচ্ছে। মেয়েদের বিশেষ সময়ের জন্য ব্যবহৃত নেপকিনের যে বিজ্ঞাপন চিত্রটি প্রচারিত হচ্ছে তার অবস্থাও একই রকম। অর্থাৎ মডেলিং এ দেশের সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

নৃত্য

নৃত্য এদেশের সংস্কৃতির, সমাজ জীবনের জন্য কল্যাণকর কোনো বিষয় নয়। আর অকল্যাণকর কোনো কিছুই মুসলিম সমাজের সংস্কৃতির বিষয় হতে পারে না। আমাদের দেশে যে সব নৃত্য প্রচলিত তার উদ্ভব মূলত হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান থেকে। হিন্দুধর্ম থেকে আগত এই নৃত্যকেই আজ এদেশের সমাজে সংস্কৃতির অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার পাঁয়তারা করা হচ্ছে। এদেশে নৃত্যশিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে ভারতীয় দূতাবাসের সহযোগিতায় সে দেশে থেকে নৃত্য শিল্পী এনে শিল্পকলায়, ভারতীয় দূতাবাসের সংস্কৃতি কেন্দ্রে বিভিন্ন সময় নানান ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হচ্ছে। নৃত্য থাকবে কি থাকবে না, কেন থাকবে না, থাকলে কীভাবে থাকবে তা নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে।

অন্যান্য

বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে বিনোদনের বিষয় হিসেবে এক সময় যাত্রা, পালাগান, বাউল গান, বিভিন্ন রকম খেলাধুলা প্রচলিত ছিল। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশের লক্ষ্যে এসব

www.pathagar.com

বিনোদনের বিষয় আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। বাংলাদেশে আজ থেকে দশ বারো বছর আগেও বিনোদনের বিষয় হিসেবে যাত্রা ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অশ্লীলতা এবং যাত্রার নামে জুয়া খেলা- এসব অপকর্মের ফলে যাত্রা এখন বিলুপ্তির পথে। এছাড়া সিনেমা, ভিডিওর বিকাশও যাত্রার অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করেছে। পালাগান বাউলগানেরও একই অবস্থা। গ্রামের তরুণরা এখন ভিসিআর ভাড়া করে নিয়ে সিনেমা দেখে, সচিত্র গান দেখে। তারা এখন আর পালাগান ও বাউল গান শুনতে চায় না। প্রযুক্তির মাধ্যমে এভাবেই বিদেশী অপসংস্কৃতির আগ্রাসনের ফলে আমাদের নিজস্ব বিনোদনের বিষয় হারিয়ে যেতে বসেছে। খেলাধুলার মধ্যে হা-ডু-ডু, গোল্লাছুট, দাঁড়িয়াবাঁধা, বউচি, কানামাছি এগুলো এখন আর নেই। জনপ্রিয় ফুটবলও এখন মৃত প্রায়।

কী করণীয়

প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়নের ফলে বিজাতীয় সংস্কৃতির যে আগ্রাসন তাকে রুখতে হলে বা প্রতিহত করতে হলে এই প্রযুক্তির মাধ্যমেই নিজেদের ঐতিহ্য, বিশ্বাস তথা সংস্কৃতিকে শৈল্পিকভাবে, নান্দনিকভাবে তুলে ধরতে হবে। প্রযুক্তিকে অস্বীকার করা মানেই আলো থেকে অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া। প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হলে নিজেদেরকে অবশ্যই যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। এখানে কারিগরি বিষয়ে যেমন প্রশিক্ষণ দেয়া হবে তেমনি নাটক লেখা, চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য নির্মাণ, এডিটিং এসব নানা বিষয়ও শেখানো হবে। একটি সুন্দর সুস্থ রুচিশীল নান্দনিক চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে হলে একজন নির্মাতাকে অবশ্যই চিত্রগ্রহণ, শব্দগ্রহণ, সম্পাদনা এসব টেকনিক্যাল বিষয়গুলো জানতে হবে। এরপর চিত্রনাট্য তৈরি, এর উপস্থাপন কৌশল এসব বিষয়ও জানতে হবে। তাহলেই একজন নির্মাতার পক্ষে একটি ভালো ছবি নির্মাণ সম্ভব। নাটকের ক্ষেত্রেও একই রকমভাবে যোগ্য নাট্যকার ও নির্মাতা গড়ে তুলতে হবে। মঞ্চ নাটকের ক্ষেত্রে প্রয়োজন ভালো নাট্যকার ও নির্দেশক। মঞ্চ নাটকে আমাদের প্রচুর দর্শক আছে। এর প্রমাণ অজেয় বসনিয়া বা অন্য কোনো নাটক মঞ্চস্থ হলে সেখানে দর্শকদের ঢল নামে। কিন্তু এসব দর্শকদের আমরা ভালো নাটক উপহার দিতে পারছি না। আমাদের নাট্যকার ও নির্দেশক প্রয়োজন। যোগ্য নাট্যকার ও নির্দেশক তৈরির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট ভালো ভালো গীতিকার, সুরকার এবং কণ্ঠশিল্পী রয়েছে। কিন্তু সঙ্গীতকে জনমনে ছড়িয়ে দিতে হলে আমাদের উপস্থাপন পদ্ধতি সম্পর্কে নতুন করে ভাবা খুবই জরুরী। নৃত্য, মডেলিং মুসলিম সমাজের সংস্কৃতির জন্য যে ক্ষতিকারক এ ব্যাপারেও সচেতন হতে হবে। পাশাপাশি বর্তমানে যে সব বিজ্ঞাপন চিত্র নারীদের মডেল করে নির্মিত হচ্ছে, এর চেয়েও উন্নতমানের বিকল্প বিজ্ঞাপন নির্মাণের জন্য যোগ্য ব্যক্তি গড়ে তুলতে হবে। এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য অবশ্যই প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। সরকারিভাবে এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য 'নিমকো' নামক একটি প্রতিষ্ঠান থাকলেও তার কার্যক্রম খুবই নগণ্য। তাই এদেশের সংস্কৃতিকে নান্দনিক ও শৈল্পিকভাবে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে হলে, বিশ্বমানের ছবি, নাটক, বিজ্ঞাপন, মিউজিক ভিডিওসহ সবকিছু নির্মাণ করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন যোগ্য ব্যক্তির। যোগ্য ব্যক্তি গড়ে তোলার জন্য অবশ্যই একটি উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক ইনস্টিটিউট প্রয়োজন। তা না হলে বিজাতীয় সংস্কৃতির ভয়াল আগ্রাসনের হাত থেকে এদেশের সংস্কৃতিকে বাঁচানো সম্ভব নয়। #

www.pathagar.com

বিশ্বব্যাপী মুসলিম বিরোধী আগ্রাসন ও প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা

মোস্তফা খালেদ, মেহেদী পারভেজ ও ইসমাঈল শহীদ

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান যন্ত্র সভ্যতার সময় পর্যন্ত কালের ধাপে ধাপে পা রেখে মানুষ চেষ্টা করছে অন্যকে জানতে, নিজের বোধ এবং অনুভূতিগুলোকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে। আর এই ছড়িয়ে দেয়া. জানতে চাওয়ার প্রবল আগ্রহই তাকে ভাব আদান প্রদানের মাধ্যম খুঁজতে শেখায়। ইঙ্গিত, অঙ্গভঙ্গি থেকে মানুষের মুখের ভাষায় এই ভাবের আদান প্রদান মোটামুটি একটা পূর্ণতার স্তরে উন্নীত হয়। মানব সভ্যতা এগিয়ে চলে অগ্রগতির দিকে। এক পর্যায়ে ব্যক্তিগত সংযোগের বাইরেও মানুষের গণসংযোগের প্রয়োজন পড়ে। ফলে বিভিন্ন সময়ে মানুষ গণসংযোগের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম খুঁজে নিয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সাথে সাথে যোগাযোগের মাধ্যম আরও উন্নত হয়েছে। গণযোগাযোগের মাধ্যমগুলো বিভিন্ন সময়ের চাহিদা পূরণ করে চলেছে। গণযোগাযোগের প্রধান মাধ্যম সংবাদপত্র থেকে শুরু করে রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, স্যাটেলাইট, ইন্টারনেটে উত্তোরিত হয়েছে। এই গণযোগাযোগের মাধ্যমগুলোকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক

www.pathagar.com

শক্তি নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করেছে। সেই সাথে বহুদিন ধরেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে আগ্রাসন চলছে এবং এ কাজে গণযোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমকে সহযোগী হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে মুসলিম বিরোধী পশ্চিমা আগ্রাসনের মুখে প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা একটি সময়ের দাবি।

পশ্চিমা সমাজে প্রচার মাধ্যমের প্রসার লগ্নে তার নিয়মনীতি, কার্যপ্রণালী ও সম্প্রচারের ধারণাগুলো পশ্চিমা শিল্প, বাণিজ্য ও পররাষ্ট্রনীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলো তাদের সকল প্রকার কার্যক্রম ও দৃষ্টিভঙ্গিকে নিরপেক্ষ বলে দাবি করলেও এর বিপক্ষে জোরালো প্রশ্ন তোলা যায়। স্বার্থকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলো হয়ে ওঠে ধর্মনিরপেক্ষতার দাবিদার।

বস্তুত পশ্চিমা মিডিয়ার উপর ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে যা তাদের শিল্পকলা, সৌন্দর্যবোধ, বিনোদন, সংবাদ এবং তথ্য প্রবাহ ইত্যাদিকে রূপায়িত করে। এ সেকিউলার চিন্তাধারাই পশ্চিমা মিডিয়াগুলোতে ফুটে ওঠে। ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পশ্চিমা প্রচারণাসমূহ তাদের প্রচার মাধ্যমের উৎকর্ষতার সুবাদে নিজেদের চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সমাজ ব্যবস্থাকে তুলে ধরার সুযোগ পায়। ধর্ম বর্ণ প্রশ্নেও তারা দেশে দেশে সমাজিক ও মানসিক সংঘাতের সৃষ্টি করে। তৃতীয় বিশ্বের এক বিশাল অংশের জনগণ সুশিক্ষিত নয়। পশ্চিমা প্রচারণা সম্পর্কে তারা ততটা সচেতনও নয়। ফলে মুসলিম বিশ্বের একটা বিশাল অংশ পশ্চিমা প্রোপাগান্ডা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের নেতিবাচক প্রভাবগুলো চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ধীরে ধীরে বিদেশী সংস্কৃতি তাদের চিন্তাধারা, আঞ্চলিকতা এবং স্বাতন্ত্র্যবোধকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র কোনো না কোনো সময়ের জন্য ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ছিল। বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালি ও নেদারল্যান্ডের অধীনে ছিল তৃতীয় বিশ্ব যার অনেকগুলোই মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র। ঔপনিবেশিক শাসকরা এসব রাষ্ট্রে তাদের দখলদারিত্ব চিরস্থায়ী করার জন্য পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার চালাতে থাকে। পশ্চিমা সভ্যতা মূলত একটি খৃস্টপ্রধান সভ্যতা। চার্চের গোঁড়ামির ফলেই পশ্চিমারা অনেক আগেই ধর্মের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। বিজ্ঞান বিমুখতা ও পরমত অসহিষ্ণুতার উদাহরণ হিসাবে চার্চের বিভিন্ন কুকীর্তির মধ্যে একটি হলো "পৃথিবী গোল, একথা বলার জন্য গ্যালিলিওর মতো বিজ্ঞানীকে চার্চ জনসমক্ষে হাটু গেড়ে বসে বলতে বাধ্য করেছিল পৃথিবী গোল না, সমতল"। এছাড়া যাজকদের বিভিন্ন সময়ের অনৈতিক কার্যকলাপ পশ্চিমাদের ধর্মবোধকে নাড়া দিয়েছে। ফলে পশ্চিমা জনগণ ধর্ম এবং ধর্মীয় নেতাদের প্রতি বিশ্বাস হারায়। অন্যদিকে মুসলিম বিশ্বে ধর্ম সংক্রান্ত ধারণা অনেকটাই স্পস্ট। ইসলাম সব সময়ই বিজ্ঞানকে উৎসাহিত করে এসেছে। ইসলাম ধর্মের শিক্ষা হলো সকল মুসলমানের জন্য পড়াশুনা বাধ্যতামূলক। শুধু মিডিয়া নয় মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসকরা সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। তাই এ ধর্মপ্রাণ মুসলমান যখন তাদের বিনোদনের উৎসগুলোতে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সৃষ্ট প্রচারণা, সংবাদ, সিনেমা, নাটক বিভিন্ন কমেডি সিরিজ দেখে তখন সেটা তাদেরকে এমন একটি পথের সাথে পরিচয় করে যেখানে ধর্ম নিতান্তই গৌণ, নীতি নৈতিকতা মূল্যহীন যার ভিত্তিই হচ্ছে বস্তুবাদ ও ভোগবাদ।

www.pathagar.com

ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পরও মুসলিম রাষ্ট্রগুলো কার্যত সেকিউলারই থেকে যায়। কলোনিয়ালিজমের বদৌলতে পাওয়া আইন ও প্রশাসনিক কাঠামো তাদের সংবিধানে স্থান পায়। তদুপরি শিক্ষা ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, অর্থনীতি এবং প্রচার মাধ্যমও ঔপনিবেশিক আদলেই গঠিত হয়। ঔপনিবেশিক শাসনামলে মিডিয়ার মালিকানা, প্রকাশনা, বিলিব্যবস্থা, প্রচার ও প্রসারের উপর প্রচুর আইন-কানুন রচিত হয় যা মিডিয়ার উপর ঔপনিবেশিক শাসকদের নিয়ন্ত্রণকে মজবুত করে। অধিকাংশ মুসলিম দেশে স্বাধীনতার পরও এসব আইন এখনো বিরাজমান। প্রথম দিকে রাষ্ট্রের শাসকরা মনে করেছিল বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য জরুরি কাজগুলো প্রথমে করা দরকার। তাই তারা তখন এই সমস্ত পশ্চিমা আইনের প্রতি ততটা গুরুত্ব দেয়নি, পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র স্থিতিশীল হলে সংশোধন করবে এই আশায়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়। রাষ্ট্র প্রধানরা পরবর্তীতে তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য এ সমস্ত বিধিবিধানকে তাদের অনুকূলে ব্যবহার করে।

প্রচার মাধ্যমের উপর পশ্চিমা আগ্রাসন খুবই ব্যাপক। একটি জাতির প্রাণ হচ্ছে সংস্কৃতি। মিডিয়ার মাধ্যমে জাতি তার সংস্কৃতির প্রাচুর্যকে ফুটিয়ে তুলতে পারে। মানুষের বাস্তবতা ও উপলব্ধিকে ছড়িয়ে দেয়ার বাহন হলো মিডিয়া। আমাদের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, শিল্পকলা, আহার, ফ্যাশন, বিনোদন স্বকীয়তা সবকিছুরই প্রতিফলন হয় মিডিয়াতে। মিডিয়া মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির রূপদান করে। আর এজন্যই হয়তো পশ্চিমারা তৃতীয় বিশ্বের প্রচার মাধ্যমগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে, যেখানে তারা তাদের নিজস্ব কালচারের প্রতিফলন দেখতে বদ্ধ পরিকর। তবে এক্ষেত্রে পশ্চিমাদের একচেটিয়া দোষ দেয়া যায় না, আমাদের ব্যর্থতাও দায়ী। মুসলমানরা তাদের নিজস্বতাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য পশ্চিমাদের মত বড় মাপের আকর্ষণীয় কোনো মিডিয়া আজও তৈরি করতে পারেনি। পারেনি নিজস্ব প্রচারমাধ্যমে স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজব্যবস্থা ও নৈতিকত মানদণ্ড গড়ে তুলতে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতাই যে একমাত্র কারণ তা নয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমা সভ্যতা তাদের নিজস্ব আর্থ-সামাজিক, ভূ-রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিডিয়াকে ব্যবহার করছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিডিয়ার এ অপপ্রয়োগের পেছনে অর্থনৈতিক কারণই প্রধান। অর্থনৈতিক কারণের সাথে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারটিও জড়িত। পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বাস, বিশ্বব্যাপী ইসলামের দ্রুত বিস্তার পশ্চিমাদের জন্য একটি হুমকিতে পরিণত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পশ্চিমা শক্তি তাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে ব্যবহার করে মুসলমানদের দমিয়ে রাখার প্রয়াস চালাচ্ছে এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রচার মাধ্যম এ আগ্রাসনে একটি পরোক্ষ শক্তি হিসেবে কাজ করছে। সভ্যতার অগ্রগতির পেছনে ধর্ম আজ একটি ফ্যাক্টর। ইসলাম তার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়েই আবার বিশ্বব্যাপী আলোক বর্তিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ। ইসলামের এই জাগরণকে পাশ্চাত্য তাদের ভোগবাদ ও বস্তুবাদের জন্য হুমকি মনে করছে। ফলে তারা আজ তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। এই অপতৎপরতাকে সহযোগিতা করতে মিডিয়া আজ সর্বগ্রাহী আগ্রাসী ভূমিকায় নেমেছে।

প্রচার যন্ত্র বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে আছে সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, সাহিত্য, পাঠ্যপুস্তক, রেডিও, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট বা আকাশ সংস্কৃতি, চলচ্চিত্র, নাট্যশালা ও নাটক, বিজ্ঞাপন শিল্প, সঙ্গীত নিকেতন, নাট্যশালা, আর্ট স্কুল, ফ্যাশন শো, মেলা, জাদু, ভাস্কর্য,

www.pathagar.com

শিক্ষাঙ্গণ, লাইব্রেরি, খেলাধুলা, সেমিনার, এনজিও, ধর্মাচরণ, স্মরণোৎসব ইত্যাদি। এখানে আমরা বিশ্বব্যাপী মুসলিম আগ্রাসনকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের নিরিখে বিশ্লেষণ করব এবং বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে অধিক গুরুত্বের দাবিদার হওয়ায় প্রিন্ট মিডিয়া, স্যাটেলাইট ও টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, ইন্টারনেট নিয়ে বিস্ত ারিত আলোচনা উপস্থাপন করব। বিশ্ববাস্তবতার নিরিখে অন্যান্য মিডিয়ার প্রভাব সীমাবদ্ধ হওয়ায় সেগুলোকে আমরাও এখানে সীমাবদ্ধ করেছি ।

রাজনৈতিক আগ্রাসন

পৃথিবীতে ইসলামের উত্থান ঘটে ৭ম শতকে। ৮ম শতকেই জেরুজালেমের দখল নিয়ে মুসলমানদের সাথে খৃস্টানদের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত, ইতিহাসে যাকে ক্রসেড বলা হয়। অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংঘটিত ৮টি ক্রসেডে ক্রমাগতভাবে মুসলমানদের সাথে খৃস্টানদের তিক্ততা বাড়তেই থাকে। তখন থেকেই মুসলমানদের সাথে খৃস্টান এবং একইসাথে ইহুদীদের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। এরপর বিশ্বের ক্রমাগত পট পরিবর্তনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শক্তি বিশ্বে পরাশক্তি রূপে আবির্ভূত হয়। এক সময় মুসলমানরা, তারপর কিংবদন্তীতুল্য বৃটিশ সাম্রাজ্য এবং সবশেষে এ আধুনিক যুগে আমেরিকা এক মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বের অবিসংবাদিত শিখণ্ডি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই দু'টি খৃস্টান সভ্যতার রাজত্বের সময়কালে মুসলমানদের সাথে তাদের বারবার সংঘাত ঘটেছে। অষ্টাদশ শতক থেকে বৃটিশরা ধীরে ধীরে বিশ্বের সব মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাকে তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এটা ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক আগ্রাসন।

মুসলিম দেশগুলোর উপর বৃটিশ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির চরম সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বৃটিশ এবং অন্যান্য ইউরোপীয়দের আগ্রাসন ছিল মূলত মিশনারী ও চার্চ কেন্দ্রিক। সে সময়টাতে তারা চেষ্টা করেছে দরিদ্র মুসলমানদের অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে খৃস্টান ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করতে এবং মুসলিম সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে। এজন্য বিজিত এলাকায় তারা তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের জাল বিস্তৃত করেছে। ধীরে ধীরে এই অর্থনৈতিক আগ্রাসনকে নিয়ে গেছে সামরিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসনের দিকে। এই ঘটনার সাক্ষী ভারতীয় উপমহাদেশ। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানরাই খৃস্টান ইংরেজদের হাতে বেশি নিগৃহীত হয়েছে। হিন্দুরা সব সময়ই ইংরেজদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে তাদের আখের গুছিয়ে নেয়। বিশ্বের অন্যান্য অংশে যেমন আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য প্রভৃতি এলাকায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ইসলামী বিশ্বের উপর সম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসী মনোভাব অনেক বেশি প্রকট হয়ে ওঠে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। খেলাফত অক্ষুণ্ন থাকায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে খৃস্টানরা মুসলমানদের উপর ততটা খড়গহস্ত হতে পারেনি। তবে সে সময় তারা মুসলিম বিশ্বের একটি অংশের সাথে খেলাফতের বিরোধ তৈরি করতে সক্ষম হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ওসমানী খেলাফত শাসিত তুরস্ক অক্ষশক্তিতে যোগ দেয়। কিন্তু যুদ্ধের পরই খেলাফতের অধীন সবগুলো মুসলিম রাষ্ট্র ইউরোপীয়দের দখলে চলে যায়। নাইজেরিয়া, মিশর, ইরাক, ইরান, মালয়েশিয়া সহ বেশিরভাগ রাষ্ট্রই ছিল বৃটেনের দখলে। এছাড়া তিউনিশিয়া ও আলজেরিয়া ফ্রান্সের কলোনিতে পরিণত হয়। ইটালির অধীনে ছিল লিবিয়া এবং নেদারল্যান্ডের অধীনে ছিল ইন্দোনেশিয়া। মোটামুটি পঞ্চাশ বা ষাট দশকের আগ পর্যন্ত এ দেশগুলো ছিল এই সব সাম্রাজ্যবাদের অধীন।

www.pathagar.com

মুসলিম বিশ্বে দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে এসব দেশে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিজাতীয় প্রভাব প্রকট হয়। স্বাধীনতা লাভের পর বেশিরভাগ দেশেই ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা চালু হয়। ধর্ম থেকে শাসন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলা হয়। সেই সাথে শিক্ষা, বিচার ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং গণমাধ্যমকে পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর আদলে গড়ে তোলা হয়। স্বাধীনতা উত্তর নব্য সরকারগুলো আশা করেছিল, এর ফলে তারা সল্পসময়ের মধ্যে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে সক্ষম হবে। কিন্তু তাদের প্রচলিত নতুন ব্যবস্থা আবহমান সামাজিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় ভাবধারা এবং মন-মানসিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ সব পশ্চিমা অনুকরণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে তুরস্ক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী প্রায় পাঁচ বছর (১৯১৮-১৯২৩) কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে সমগ্র তুরস্ককে ইউরোপীয় সেকিউলার আদলে গড়ে তোলার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালান। তার আনীত পরিবর্তনের মধ্যে অন্যতম ছিল আরবি বর্ণমালা বাতিল করে ল্যাটিন বর্ণ চালু, প্রকাশ্যে আযান বন্ধ করা, সকল প্রকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা, সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানে নারীদের হিজাব নিষিদ্ধ করা। অর্থাৎ তিনি তুরস্ককে একটি পশ্চিমা ভাবধারার দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার প্রচেষ্টা চরমভাবে ব্যর্থ হয়। তার প্রচেষ্টার ফলাফল এই দাঁড়ায় যে তুরস্ক *ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি* হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

ঔপনিবেশিক আমলে বিদেশী শক্তি করতলগত দেশের মিডিয়া, মালিকানা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রকার সম্প্রচার ও অনুষ্ঠানমালা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানা ধরনের দমনমূলক কালো আইন প্রণয়ন করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এসব আইন স্বাধীনতা পরও ওইসব দেশে বিদ্যমান ছিল। সাম্রাজ্যবাদী যুগের আরও যে কুপ্রভাব ওই দেশগুলোতে থেকে যায় তার একটি উদাহরণ হলো ভাষা। বিশেষ করে যেসব দেশে একাধিক জাতির লোকজনের আবাস (যেমন নাইজেরিয়া, মালয়েশিয়া) সেখানে সাম্রাজ্যবাদীদের ভাষাই পরবর্তীতে সে সব দেশের সাধারণের ভাষায় পরিণত হয়। যদিও স্বাধীনতা লাভের পর সেখানে প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে বিদেশী ভাষা বর্তমান থাকেনি, কিন্তু দেশের শিক্ষিত ও অভিজাত সমাজ বিদেশী ভাষাকে তাদের আধুনিকতার পরিচায়ক মনে করতে শুরু করে। মুসলিম বিশ্বে দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যমান খৃস্ট-সামাজ্যবাদের প্রভাবে জন্ম নেয় স্থায়ী রাজনৈতিক সমস্যা। এর মধ্যে অন্যতম হলো প্যালেস্টাইন যা খৃস্ট-জায়নবাদীদের দীর্ঘমেয়াদী ষড়যন্ত্রের ফল, যার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান দেশগুলোর মাঝখানে তাদের অনুগত একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখা এবং ইসলামের অগ্রগতি ও বিস্তারের ওপর আঘাত হানা।

মধ্যপ্রাচ্যের অতীত ইতিহাস এটাই প্রমাণ করে এখানে সমস্যা সৃষ্টি করা হয়েছে পরিকল্পিত ভাবে। জেরুজালেম মুসলমান, ইহুদী এবং খৃস্টান এই তিন ধর্মের লোকদের কাছে পবিত্র। তবে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত ফিলিস্তিন অঞ্চল মুসলমানদের দখলে ছিল এবং সেখানে মুসলমানরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ট। কিন্তু আমেরিকা ও বৃটেনে ইহুদীদের বাণিজ্যিক আধিপত্য থাকায় এবং মুসলমানদের উপর খৃস্টানদের ক্রুসেডীয় বিদ্বেষ মিটানোর জন্য উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে ইউরোপের ইহুদীরা ফিলিস্তিনে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৮৯৭ সালে বাসল কংগ্রেসে থিওডর হার্জলের নেতৃত্বাধীনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে। ইহুদীদের চাপের মুখে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

www.pathagar.com

জে এ বেলফোর ইহুদী নেতা লর্ড রথ চাইল্ডের কাছে লেখা একটি চিঠিতে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ঘোষণা করেন। এটি ইতিহাসে *বেলফোর ঘোষণা* নামে পরিচিতি লাভ করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলিম খেলাফতের পতন ঘটে। ১৯১৯ সালে প্যারিস সম্মেলনে সমগ্র আরব বিশ্বকে ইউরোপীয়রা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এ প্রেক্ষিতে বৃটেন ফিলিস্তিন শাসনের অধিকার লাভ করে। ১৯২১, ১৯২৯ এবং ১৯৩৬ সালে ফিলিস্তিনে তিনবার ইহুদী-মুসলমান দাঙ্গা হয়। এ প্রেক্ষিতে ইসরাইলের পক্ষে মাঠে নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এটি ছিল ইতিহাসের এক টার্নিং পয়েন্ট। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমেরিকা তখন ত্রিশ দশকের মন্দা কাটিয়ে বেশ শক্ত অবস্থায়। শেষ পর্যন্ত আমেরিকাই ইসরাইলের প্রধান সাহায্যকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়। আমেরিকার সমর্থনের পর ওই সময় বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার ইহুদী ফিলিস্তিনে আসতে শুরু করে। বৃটিশ সরকার এদের বসতি স্থাপনের সুযোগ করে দেয়। দাঙ্গা হাঙ্গামার মধ্য দিয়েই ১৯৪৮ সালের মে মাসে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর তৎকালীন বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ ব্যালফোর ঘোষণা করেছিলেন "আজ আমাদের ক্রুসেড সম্পূর্ণ হলো।" তার এই মন্তব্য থেকে এটাই সত্যে পরিণত হয় যে ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাটা ইঙ্গ-মার্কিনী জোটের কতটা গভীরে প্রোথিত খায়েশ। ১৯৪৯ সালে বৃটিশ ও আমেরিকান সমর্থনে ইসরাইল জাতিসংঘের অনুমোদন লাভ করে। এরপর শুরু হয় ফিলিস্তিনে বৈধ অধিবাসীদের উপর অত্যন্ত নৃশংশ অত্যাচার।

ফিলিস্তিন সমস্যাকে কেন্দ্র করে তিনবার আরব-ইসরাইল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্রে ঘোষণার সাথে সাথে আরবরা সম্মিলিতভাবে ইসরাইল আক্রমণ করে। কিন্তু পাশ্চাত্য সমর্থনপুষ্ট ইসরাইল পাল্টা আক্রমণ করে ফিলিস্তিনের দুই তৃতীয়াংশ দখল করে নেয়। ১৯৬৭ সালে মিশরের প্রেসিডেন্ট জামালউদ্দিন নাসেরের অনুরোধে ইসরাইলী ও মিশরীয় বাহিনীর মাঝে অবস্থানরত জাতিসংঘ বাহিনী সরে গেলে ইসরাইল মিশর আক্রমণ করে, এতে আরবরা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। মাত্র ছয় দিনের যুদ্ধে সিনাই অঞ্চল, গাজা উপত্যাকাসহ সুয়েজখাল ইসরাইল দখল করে নেয়। ১৯৭৩ সালে আরবরা সম্মিলিত হামলা চালিয়ে সিনাই অঞ্চলের বড় একটা অংশ সহ সুয়েজ এলাকা দখল মুক্ত করে। ১৮ দিন যুদ্ধ চলার পর যুদ্ধ বন্ধ হয়। ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের মধ্যস্থতায় মিশর ইসরাইলের সিনাই-১, সিনাই-২ এবং ১৯৭৮ সালের ২৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের মধ্যস্ততায় ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি ছিল আরবের মধ্যকার ঐক্য ভাঙার প্রথম পদক্ষেপ। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী, ডার ইয়াসিনের খুনি মোনাহিম বেগিন ও মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের মধ্যে। মোনাহিম বেগিনের মত একজন খুনির সাথে চুক্তি স্বাক্ষর ছিল আরব বিশ্বের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণার। একটি আরব রাষ্ট্রের ইসরাইলের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর ছিল এক অর্থে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়ার নামান্তর। এটা সম্ভব হয়েছিল আমেরিকার কারণে। আমেরিকার নানারকম প্রলোভনই মিশরকে এই চুক্তি স্বাক্ষর সম্মত করায়। পরবর্তীতে পিএলও সংগঠিত হয় এবং ধীরে ধীরে ফিলিস্তিন-ইসরাইল যুদ্ধে লেবানন ও জর্ডান জড়িয়ে পড়ে। এভাবে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য একটি উত্তপ্ত এলাকায় পরিণত হয়। সেই থেকে আমেরিকা নানাভাবে ইসলাইলকে সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে এবং ভাব দেখাচ্ছে যে তারা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি

www.pathagar.com

চায়। পাশাপাশি বিশ্বের সামনে আমেরিকা এটাও প্রমাণ করার চেষ্টা করে আসছে যে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড হচ্ছে ইহুদীদের প্রতিশ্রুত ভূমি। এটা তাদের ন্যায্য অধিকার এবং ফিলিস্তিনীরা একে অন্যায়ভাবে দখল করে রেখেছে। আমেরিকা ইসরাইলকে বাঁচাতে ১৯৯৭ সালের ৭ এবং ২১ মার্চ দু'বার জাতিসংঘে ভেটো প্রদান করে। অধিকন্তু আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য ইরাক-ইরান যুদ্ধে মদদ যোগায় এবং ইরাককে কুয়েত আক্রমণে উসকানি দেয়। আর এতে আমেরিকাসহ ইহুদী-খৃস্টান লবি তাদের সকল অবৈধ স্বার্থ রক্ষার জন্য মিডিয়ার সর্বোচ্চ ব্যবহারকে নিশ্চিত করে।

মধ্যপ্রাচ্য অর্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি খনিজ তেলে সমৃদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এ খনিজ তেলের গুরুত্ব অপরিসীম। খনিজ তেলের লোভে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের একটি শক্ত ঘাঁটি দরকার হয়ে পড়েছিল। ইসরাইল আমেরিকাকে সেই সুযোগ করে দেয়। আমেরিকা ইসরাইলের মাধ্যমেই মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর ওপর তার ক্ষমতার ছড়ি ঘুড়াচ্ছে। ফিলিস্তিন প্রশ্নে আমেরিকা সব সময়ই ইসরাইলের স্বার্থের প্রতি সহানুভূতিশীল। মধ্যপ্রাচ্যে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ জলপথ রয়েছে। তুরস্কের দার্দনেলিস প্রণালী এবং মিশরের সুয়েজ খাল সামরিক এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পাশ্চাত্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুয়েজখাল আক্রমণ ব্যর্থ হবার পর মধ্যপ্রাচ্যে *আইজেন হাওয়ার নীতি* ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের যে কোনো রাষ্ট্রকে সামরিক সাহায্যে দেয়ার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। এর ফলে পাকাপাকিভাবে আরব বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র তার প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পেয়ে যায়। ১৯৫৬, ১৯৬৭, ১৯৭৩ এবং তার পরের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আমেরিকা ইসরাইলের পক্ষ নিয়েছিল এবং প্রতিবারের যুদ্ধেই ইসরাইল সমবেত আরব শক্তিকে হারিয়ে নিজেদের সীমানা বহুদূর বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়।

ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পশ্চিমারাসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "মায়ের আদরে" ইসরাইলকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে ইসরাইলের সম্প্রসারণকে সমর্থন দিয়ে আসছে। ১৯৬৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত এর জন্য সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৮,৪৯০ কোটি ডলার। এছাড়াও রয়েছে পেন্টাগনের বাজেটে গোপন বরাদ্দ - প্রতিদিন দেড় কোটি ডলার এবং প্রতি ঘন্টায় ৬ লক্ষ ২৮ হাজার ডলার। এই বিপুল অর্থ ইসরাইলের আনবিক ও হাইড্রোজেন বোমা তৈরিতে সহায়ক হয়েছে। ১৯৯৫ সালের মাঝামাঝিতে ওয়াশিংটন ডিসির পপুলেশন ব্যুরোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৫৬ কোটি ৮০ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত সাব-সাহারার দেশগুলো বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছে প্রায় ২ হাজার ৪শ কোটি ডলার অর্থাৎ সাব-সাহারার প্রত্যেক আফ্রিকানের জন্য মাথাপিছু সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩ ডলার। অন্যদিকে ৪৮ কোটি ৬০ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৮২৫ কোটি ৪৪ লাখ ডলার। এর অর্থ হচ্ছে এ অঞ্চলে মাথাপিছু সাহায্যের পরিমাণ ৭৯ ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের এই সাহায্যের অর্থ ইসরাইলকে কখনও পরিশোধ করতে হয়নি। ইসরাইল এ অর্থ দিয়ে ফিলিস্তিনের নিরীহ নারী-পুরুষ ও শিশু নির্বিশেষে নির্যাতন ও হত্যা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন হতে পারে পঞ্চাশ বছর ধরে আমেরিকা ও বিশ্বের সাধারণ বিবেক কেন জাগ্রত হচ্ছে না? এর অন্যতম কারণ সমগ্র বিশ্বের উপর পাশ্চাত্য মিডিয়ার প্রভাব। সবগুলো প্রধান সংবাদ সংস্থা ইহুদী আমেরিকানদের নিয়ন্ত্রণাধীন। তারা প্রতিটি মুহূর্তে বিশ্বের সামনে ইহুদীদের রাষ্ট্র লাভের অন্যায্য অধিকারকে ন্যায্য হিসাবে উপস্থাপন করছে। ফিলিস্তিনী

www.pathagar.com

স্বাধীনতাকামীদের *সন্ত্রাসী* হিসেবে উপস্থাপন করছে এবং ইসরাইলী সৈন্যদের ব্যাপক গণহত্যাকে বিশ্বের সামনে আসতে দিচ্ছে না। ইহুদীরা তাদের শক্তিকে যখন যেভাবে খুশি ব্যবহার করছে। এখানে আরেকটি বিষয়ে আলোকপাত করা দরকার তা হচ্ছে তাদের এই যে প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি তার উৎস কি? আমেরিকা প্রবাসী মুসলিম বুদ্ধিজীবী ডক্টর আমীর আলীর মতে ইহুদীদের শক্তির উৎস হলো (১) রাজনৈতিক খাতে তাদের ব্যয়িত অর্থ, (২) রাজনৈতিক নেতাদের পদলেহন, (৩) মিডিয়ার উপর তাদের প্রভাব যার কারণ হলো ঃ ক) সংবাদ সংস্থার মালিকানা (যেমন সিএনএন এর মালিক ইহুদী) এবং (খ) ইহুদী সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ ও কাজের সুযোগ করে দেয়া (৪) জননেতাদের সাথে সুসম্পর্ক, তাদের চাটুকারিতা করা, (৫) ইহুদী মানসিকতার লেখকদের প্রবন্ধ ও নিবন্ধ দিয়ে মিডিয়াকে ভাসিয়ে দেয়া, (৬) ইহুদী লবিকে ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইলের মাধ্যমে গতিশীল করা। এভাবে তারা এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে আজকাল প্রেসিডেন্ট বুশ মাঝে মধ্যে স্বাধীন প্যালেষ্টাইন রাষ্ট্রের কথা বললেই তাকে হটিয়ে দেয়ার জন্য ইহুদীরা তৎপর হয়। হামিদ আবদুল করিমের *এণ্ড অব দি রোড ফর বুশ* থেকে জানা যায়, বুশই আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট নন যাকে ইহুদীরা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের কথা বলায় সরিয়ে দিতে চাইছে। রিচার্ড নিক্সন, জিমি কার্টার এবং বর্তমান বুশের পিতা জর্জ বুশ একই দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছিলেন। স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের কথা বলার পরও যিনি টিকে গিয়েছিলেন তিনি হলেন বিল ক্লিনটন। ইহুদীরা মনিকা লিউনেস্কির মাধ্যমে তাকে সরানোর জন্য চেষ্টা করলেও ক্লিনটন কোনোমতে টিকে গিয়েছিলেন।

হিলারি ক্লিনটনও স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের আহবান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অধিক দ্রুত পরিস্থিতি বুঝতে সক্ষম হন। নিউইয়র্কে সিনেটর নির্বাচন করার জন্য তার ইহুদীদের সমর্থন ও অর্থ সাহায্যের দরকার হয়ে পড়েছিল। তাই তিনি দ্রুত তার কথার মোড় পরিবর্তন করেন এবং ফিলিস্তিনের মানবাধিকার সংরক্ষণের মত তুচ্ছ বিষয়ে (!) কথা বলা বন্ধ করেন।

গত পঞ্চাশ বছরে মুসলমান দেশগুলোর সাথে আমেরিকানদের বিরোধের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে আমেরিকা বিশ্বের মুসলমানদের হত্যার জন্য কিভাবে রাজনৈতিক আগ্রাসন চালিয়ে আসছে। ১৯৮৬ সালে প্রেসিডেন্ট রিগ্যান 'দুষ্ট' গাদ্দাফিকে শায়েস্তা করার জন্য বৃটেনের ঘাঁটি থেকে লিবিয়ায় বোমা হামলার নির্দেশ দেন। এই বোমা হামলায় নিহতদের অধিকাংশই ছিল মহিলা ও শিশু। গাদ্দাফির ১৬ মাসের শিশু কন্যা এ সময় নিহত হয়। অথচ যুক্তরাষ্ট্র সর্বদা উচ্চ কণ্ঠে বলে বেড়ায় রাজনৈতিক কারণে নিরীহ বেসামরিক লোক হত্যা অন্যায় এবং তা শিষ্টাচার ও সভ্য আচরণের পরিপন্থী। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে শিষ্টাচার ও সভ্য আচরণের পতাকাবাহী বলেও দাবি করে থাকে। ১৯৮৬ সালের ৪ এপ্রিলে বার্লিনের একটি নৈশক্লাবে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় লিবীয় নাগরিক জড়িত থাকার কথিত অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র এফ-১১১ বোমারু বিমান থেকে লিবিয়ায় ২০০০ পাউন্ড ওজনের লেসার নিয়ন্ত্রিত ৩২টি বোমা নিক্ষেপ করে। বার্লিনের ওই নৈশক্লাবে মার্কিন সৈন্যদের হরহামেশা আসা-যাওয়া ছিল। বোমা বিস্ফোরণে ৩ জন নিহত এবং ২৩০ জন আহত হয়। এর প্রতিশোধে যুক্তরাষ্ট্র হত্যা করে অন্তত ৭০ জন লিবীয় নাগরিককে এবং এতে আহত হয় বিপুল সংখ্যক বেসামরিক লোক। অথচ ঘটনাটিতে লিবীয় নাগরিকের জড়িত থাকার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ বা যুক্তিগ্রাহ্য আলামত পাওয়া যায়নি।

www.pathagar.com

লিবিয়ার জনগণ এক্ষেত্রে পুরোপুরি নির্দোষ, একথা জেনেও নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই প্রেসিডেন্ট রিগ্যান লিবিয়ায় বোমা বর্ষণের নির্দেশ দেন। প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং নির্দোষ লোকেদের হত্যার জন্য তিনিই দায়ী।

আশির দশকে সংঘটিত ইরাক-ইরান যুদ্ধও ছিল এই অঞ্চলে মার্কিন আধিপত্য কায়েমের অন্যতম একটি পরিকল্পনা। এক্ষেত্রে আমেরিকা অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য দিয়ে ইরাককে ইরানের উপর আক্রমণ করতে উৎসাহিত করে। প্রায় ৮ বছর স্থায়ী এ যুদ্ধে ইরাক ও ইরান উভয় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক অবনতি ঘটে।

নব্বই দশকের পাশ্চাত্য-মুসলিম দ্বন্দ্ব নিয়ে আলোচনার পূর্বে কিছু বিষয়ে আগে বলে নেয়া দরকার। নব্বই দশকের শুরুতে বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে পাশ্চাত্যের জন্য সবচাইতে কার্যকর ও কৌশলগত পরামর্শটি প্রণয়ন করেন বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর স্যামুয়েল পি হান্টিংটন। আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা এবং হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ওলিন ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটিজিক স্টাডিজ এর পরিচালক হান্টিংটন নব্বই দশকের শুরুতে বিশ্ব রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে সমাজতন্ত্রের পতনের মাধ্যমে নাটকীয় পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে The Changing Security Environment and American National Interest শীর্ষক ইনস্টিটিউটের এক গবেষণা প্রতিবেদনে তার *Clash of Civilization* শীর্ষক কল্পনাপ্রসূত ফল ইসলামী মৌলবাদের জুজু পাশ্চাত্য দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করেন। তিনি এ প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, World politics is entering a new phase in which fundamental sources of conflict will be neither ideologic nor economic. It will be the Clash of Civilization. অর্থাৎ পরাশক্তিদ্বয়ের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর বিশ্ব রাজনীতি এমন এক পর্যায়ে অনুপ্রবেশ করেছে যেখানে সংঘাতের মৌলিক উৎস আর আদর্শ হবে না, অর্থনীতিও নয়। সেই সংঘাত হবে মূলত সভ্যতা সমূহের মধ্যে সংঘাত।

হান্টিংটন তার বর্ণনায় একদিকে কনফুসিয়ান প্রভাবাধীন চীন ও কোরিয়া এবং অপরদিকে ইসলামী পাকিস্তান, ইরান, লিবিয়া, সুদান ও আলজেরিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যের কতিপয় দেশের অব্যাহত সামরিক শক্তিবৃদ্ধিকে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় পশ্চিমা আধিপত্যের জন্য হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এরই সাথে যুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক জোট *ইকো* যারা মুসলিম বিশ্বে ইসলামী পুনর্জাগরণবাদীদের শক্তিবৃদ্ধিতে রাজনীতি ও সরকার ব্যবস্থাপনায় পাশ্চাত্য প্রবর্তিত প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে ইসলাম অনুমোদিত পদ্ধতি প্রবর্তনে আগ্রহী। তাই তিনি কনফুসিয়ান-ইসলামী মৈত্রীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সকল পাশ্চাত্য শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

হান্টিংটন আগামী বিশ্ব ব্যবস্থায় পারস্পরিক সমঝোতা ও সহাবস্থান নয় বরং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের এক নীল নকশা প্রণয়ন করেছেন। "সভ্যতার সংঘাত" বলতে এই আমেরিকান ইহুদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মূলত সভ্যতা শব্দের ছদ্মাবরণে পাশ্চাত্য খৃস্টান শক্তির সাথে প্রাচ্যের আপোষহীন ইসলামী সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্বের কথাই তুলে ধরেছেন। প্রফেসর হান্টিংটনের এই নিবন্ধ প্রকাশিত হবার পর থেকেই মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে একটি বিশেষ সেল খুলেছে এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম বিরোধী প্রচারণায় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে আসছে।

মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় সংকটের পিছনে ইরাকের যে ভূমিকা সেখানে আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিভূ হিসেবে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয় কেবলাত্র সুযোগের সদ্ব্যবহার করে একটি শক্তিশালী মুসলিম দেশকে ধ্বংস করে দেয়ার ইচ্ছা নিয়ে। কাশ্মীরে হাজার

www.pathagar.com

হাজার নিরীহ মুসলিম হত্যার নায়ক খুনি ভারতের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের কোনো আক্রোশ নেই। অথচ মধ্যপ্রাচ্যের আরব মুসলিম দেশগুলোর সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ একটি ব্যাপারে জাতিসংঘ নামক একটি বলির পাঠাকে কাজে লাগিয়ে ইরাকের উপর যুক্তরাষ্ট্রের অন্যায় হস্তক্ষেপ হান্টিংটন প্রসবকৃত ইসলাম বিরোধী পররাষ্ট্রনীতিরই নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। কুয়েতকে দখলমুক্ত করতে প্রেসিডেন্ট বুশ ও তার মিত্ররা রাসায়নিক অস্ত্র, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র এবং নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করে বহুসংখ্যক নিরীহ লোককে হত্য করতে দ্বিধা করেনি। মেডিকেল এডুকেশন ট্রাস্টের দেয়া তথ্যমতে যুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তী সামরিক ও অর্থনৈতিক হত্যাকাণ্ডে প্রায় ২ লাখ সাধারণ নাগরিক নিহত হয়। এটা ছিল গণহত্যার এক অসম যুদ্ধ। কেননা সৈন্যবল ও অস্ত্রে পশ্চিমা বিশ্ব ছিল ইরাকের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। পশ্চিমা জগতের মুসলিম বিরোধী মনোভাব আরও প্রকট হয় যখন দেখা যায় ইরাক কুয়েত থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়া সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র "ইরাকের কাছে বিধ্বংসী অস্ত্রের বিশাল মজুদ আছে" এই অসত্য অজুহাতে ইরাকের উপর অর্থনৈতিক ও সামরিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। অথচ এটা সর্বজন স্বীকৃত যে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্বের সর্ববৃহৎ একক অস্ত্রের মজুদ একমাত্র আমেরিকারই আছে। ইরাকের অস্ত্র নিয়ে এত লাফালাফি কিন্তু অপরদিকে ইসরাইলের বিশাল অস্ত্র ভাণ্ডার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে পশ্চিমা মিডিয়া *নিউজ* উইক ম্যাগাজিন ১১ সেপ্টেম্বর ২০০২ সালে মন্তব্য করেন, No evidence has been presented to support the claim that Iraq posses weapons of mark destruction, while former UK weapons inspector in Baghdad Scott Ritter has said there is no such evidence. But what we know is that Israel has weapons of mass destruction, no body mentions that.

বসনিয়া হার্জেগোভিনা, কসোভো, চেচনিয়া, এবং কাশ্মীরের ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা সুস্পষ্ট। ১৯৯২-৯৫ সালে সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট স্লোভাদান মিলোসেভিচের আরোপিত যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নাম করে বসনিয়া হার্জেগোভিনায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে অহেতুক কালক্ষেপণ করায় ২ লাখ মুসলমানকে সার্বদের হাতে প্রাণ দিতে হয় এবং ১০ লক্ষাধিক লোক গৃহহারা হয়ে দেশের ভেতরে ও বাইরে শরণার্থী হিসেবে থাকতে বাধ্য হয়। জার্মানী একাই বসনিয়া হার্জেগোভিনার ৩ লাখ ২০ হাজার উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দেয়। তৎকালীণ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে বলেন, "বৃটেন ইউরোপের মাটিতে কোনো মুসলিম দেশের অস্তিত্ব দেখতে রাজি নয়।" অথচ আরব ভূখণ্ডে একটি ইহুদী রাষ্ট্রের স্বপ্নে তারা কয়েকশত বছর বিভোর থেকেছে এবং লক্ষ লক্ষ আরবের প্রাণের বিনিময়ে তারা সেটা করেও দেখিয়েছে। আবার ঠিক বিপরীত ভূমিকায় দক্ষিণ এশিয়ার ভূখণ্ডে একটি খৃস্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিমারা পূর্ব তিমুরকে ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এ ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের গোপন পরিকল্পনা হচ্ছে বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়ার পাশে স্থায়ী পশ্চিমা সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা। তিমুরের তেলের প্রতি লোভ অস্ট্রেলিয়াকে ইন্দোনেশিয়া বিরোধী ভূমিকা নিতে উৎসাহিত করে।

বিগত ৫০ বছর যাবত কাশ্মীরে রক্তপাত হচ্ছে। অথচ মুসলিম কাশ্মীরের ভবিষ্যত নির্ধারণে জাতিসংঘের গণভোট অনুষ্ঠানের গৃহীত প্রস্তাবটি পশ্চিমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীর সমস্যা পশ্চিমা বিশ্বের সম্মানিত (!) সদস্য দেশ বৃটেনেরই সৃষ্টি।

www.pathagar.com

বৃটিশরা উপমহাদেশ ত্যাগ করার সময় পাক-ভারত স্থায়ী সংঘাত সৃষ্টির দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শাসক ও জনগণের ধর্মের ভিন্নতার সুযোগ নিয়ে কাশ্মীর সমস্যা সৃষ্টি করেছে। কাশ্মীর প্রশ্নে বৃটিশ ও মার্কিন কৌশলগত নীতি শান্তি ও বৈধতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

ফিলিপাইনের সবচেয়ে বড় মিত্র পশ্চিমারা এ পর্যন্ত মরো জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে মিন্দানাও সমস্যা সমাধানে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। কারণ মরোরা মুসলমান। সংঘাত যত দীর্ঘস্থায়ী হবে মুসলমানদের মৃত্যুর সংখ্যাও ততই বেশি হবে।

কসোভোয় যখন যুদ্ধের নামে সার্বীয় কর্তৃপক্ষ গণহত্যার মাধ্যমে জাতিগত শুদ্ধি (!) অভিযান চালাচ্ছিল তখন জাতিসংঘের উর্দি পরা ন্যাটো বাহিনী সেখানে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ফলে সেখানে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, নামে উদ্বাস্তুর ঢল। কসোভোর ৯০ শতাংশ মানুষ বর্ণবাদী ধাচের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। একে তো মুসলমানরা ছিল নিরস্ত্র, অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার ফলে তারা ন্যূনতম অস্ত্র সাহায্য পায়নি আত্মরক্ষার জন্য। কসোভো পরিস্থিতি প্রমাণ করে জরুরি পরিস্থিতিতে কূটনৈতিক কৌশল তখনই কেবল কার্যকরী হয়, যদি তার পিছনে বিশ্বাসযোগ্য শক্তি প্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে।

হেগ-এ অবস্থিত জাতিসংঘ যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনাল সার্ব প্রেসিডেন্ট শ্লোভোদান মিলোসেভিচকে অভিযুক্ত করলেও দীর্ঘদিন যাবৎ সে ট্রাইবুনালের সামনে হাজির হয়নি এবং পশ্চিমারা সে ব্যাপারে নির্বিকার থেকেছে, তাকে ট্রাইবুনালের সামনে হাজির করার জন্য কোনো রকম কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থেকেছে। কারণ পশ্চিমা শক্তি তথা আমেরিকা নিজেরাই অনেক যুদ্ধাপরাধীকে আশ্রয় দিয়েছে।

আমেরিকার রাজনৈতিক আগ্রাসনের সাম্প্রতিক উদাহরণ হচ্ছে আফগানিস্তান ও ইরাক এর বিরুদ্ধে একপেশে যুদ্ধ। ১১ সেপ্টম্বরের অনেক আগে থেকেই তথাকথিত ভিন্নমতাবলম্বী ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দেয়ার অভিযোগে আমেরিকা আফগানিস্তানের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করে। ১৯৯৯ সালে কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ায় বোমা বিস্ফোরণের পর থেকে আমেরিকা বিনা প্রমাণেই আফগানিস্তানের উপর ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয়দানের অভিযোগে নানাধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। অথচ এই ওসামা বিন লাদেনই ছিল স্নায়ু যুদ্ধের সময়কালে USSR এর বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে আমেরিকার অন্যতম বড় অস্ত্র। এ প্রসঙ্গে নেলসন মেন্ডেলা বলেন, US support for the mujahiden (including Osama Bin Laden) against the Soviet Union and its refusal to work with the United Nations after the Soviet withdrawal led to Taliban taking power. [*US Threatens World Peace, says Mandela, source: www. bbc.co.uk*]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া এক ব্যতিক্রমী ঐক্যমত্যের মাধ্যমে যৌথভাবে ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে নিরাপত্তা পরিষদে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রস্তাব উত্থাপন করে। নিষেধাজ্ঞার আওতায় আফগানিস্তানের আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয় এবং বিদেশে আফগান বিমান সংস্থার অফিস বন্ধ করে দেয়া হয়। এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে, যে দেশটি ২১ বছরের যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত এবং খরার কারণে সেখানকার ১০ লাখ অভুক্ত লোক আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তার উপর নির্ভরশীল। ইতিপূর্বে ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দানের অভিযোগ এনে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের কোনো তোয়াক্কা না করেই আফগানিস্তানে

www.pathagar.com

ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। এসব ঘটনার পর পরই ঘটে ১১ সেপ্টেম্বরের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এই ঘটনা *Clash of Civilization* এর স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে দেয়। কোনো রকম প্রমাণ ছাড়াই আমেরিকা একমাত্র তাদের মিডিয়ার জোরে এই ঘটনার সম্পূর্ণ দায়ভার আফগানিস্তান তথা ওসামা বিন লাদেনের উপর চাপিয়ে দেয় এবং আন্তর্জাতিক আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে আফগানিস্তানের নিরীহ মানুষের উপর আক্রমণ চালায়। এতে আমেরিকার পোষ্য বৃটেন আমেরিকাকে সর্বতভাবে সাহায্য করে। এর ফলস্বরূপ এ ঘটনা সমগ্র আমেরিকা ও ইউরোপে মুসলমানদের জন্য অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ডেকে আনে। কিন্তু এই ঘটনার একমাত্র ইতিবাচক দিক হলো সমগ্র বিশ্ব ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে ক্যাথলিক নান কারেন আর্মস্ট্রং মন্তব্য করেন, There is still a lot of hostility and anger directed against the Muslim community there. There is, however, some reason to believe that a change in the American perception is not impossible. On the East Coast where I spend most of my time, people descended enmasses on the book stores and took off the shelves everything they could find about Islam. While some did this to confirm old prejudices and fears - depending on who you choose to read - the majority was keen in learning about Islam. কারেন আর্মস্ট্রং এর নিজের লেখা *Understanding Islam* বইটি কেবলমাত্র আমেরিকার পূর্ব তীরে ২৫৫,০০০ কপি বিক্রি হয়। [*Source: www.ahram.org.eg/weekly*]

ওহাইও ডেমোক্র্যাট দলীয় কংগ্রেস সদস্য ডেনিশ কুচিনিচ গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২ সালে এক জ্বালাময়ী ভাষণে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেন "নিরীহ মানুষের রক্তের বদলা নেয়ার জন্য আফগানিস্তানের নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা করা হোক, তা আমরা চাইনি।" কংগ্রেসম্যান কুচিনিচই মার্কিন সরকারের আগ্রাসী নীতির প্রতিবাদকারী সর্বোচ্চ মার্কিন কর্মকর্তা। তার এই বক্তব্যের ব্যাপারে এডওয়ার্ড সাঈদ বলেন- "আমার মতে তার (কুচিনিচ) বক্তব্যে আমেরিকার নীতি ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছে। এজন্য আমি চাই যে, তার ভাষণটি আরবিতে পুরোপুরি প্রকাশিত হোক, যাতে আরববাসী মানুষ জানতে পারে, বুশ ও ডিকচেনিই যুক্তরাষ্ট্রের সবকিছু নয়।" বর্তমান মার্কিন নীতির সমালোচনা হচ্ছে এবং নানা কথা হচ্ছে। কিন্তু সরকার সেগুলো চাপা দেয়ার চেষ্টা করছে। বুশ এবং তার সহচরেরা বিশ্বাস করে, মার্কিন স্বার্থ ক্ষুণ্ন হলে ওয়াশিংটন যা খুশি তাই করতে পারে। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় মধ্যপ্রাচ্য প্রশ্নে মার্কিন নীতির ইসরাইলীকরণ ঘটেছে। ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন বুঝতে পেরেছেন, ফিলিস্তিনীদের হত্যার এটাই সুযোগ। তাই তিনি ফিলিস্তিনী জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

এভাবে সারা বিশ্বে আমেরিকা তার কূটনৈতিক ও সামরিক শক্তির মাধ্যমে মুসলিম দেশগুলোর উপর আগ্রাসন চালাচ্ছে। এ কাজে আমেরিকাকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করছে প্রচার মাধ্যম তথা মিডিয়া। আমেরিকার হাতে রয়েছে বড় বড় বিনোদন ও সংবাদ চ্যানেল, তাদের পক্ষে কাজ করছেন বড় বড় বুদ্ধিজীবী যার কোনোটিই মুসলমানদের নেই। প্রচার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ ইসলাম ও আরবদের ব্যাপারে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার জন্য বহু বিশেষজ্ঞ ও ভাষ্যকার নিয়োগ করা হয়েছে। এদের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দই ইসলামের প্রতি বৈরিতায় পরিপূর্ণ। শুধু তাই নয়, তারা মুসলমানদের ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও ভুল ধারণা দিচ্ছে।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক আগ্রাসন

পাশ্চাত্যের ইহুদী-খৃস্টান শক্তিজোট ইসলামের পুনরুত্থানকে বিশ্বব্যাপী তাদের পুঁজিবাদী আধিপত্যের অন্তরায় মনে করে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিপরীতে বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামী ব্যাংকের অব্যাহত অগ্রযাত্রা।

মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার দশটি মুসলিম দেশ নিয়ে গঠিত *ইকো* ৭০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ৩০ কোটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক সহযোগিতার বন্ধন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জামালুদ্দিন আফগানী এই এলকাসমূহ নিয়েই *প্যান ইসলামিজমের* স্বপ্ন দেখেছিলেন। এটি প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদে ভরপুর এমন একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল যার সম্পর্কে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা *সিআইএ* বহু পূর্বেই "বিশ্বের পরবর্তী ঝলকবিন্দু" হিসেবে মন্তব্য করেছিল (*এশিয়া উইক, ২৪ফেব্রুয়ারি '৯৪*)। *ইকো* গঠনের ভিত রচিত হয়েছিল ১৯৬৫ সালে তুরস্ক, ইরান ও পাকিস্তানকে নিয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থা *আরসিডি* গঠনের মাধ্যমে। ১৯৯৩ সালে তাদের সাথে এসে যোগ দেয় ইসলামী প্রজাতন্ত্র আফগানিস্তান ও মধ্যে এশিয়ার ছয়টি নব্য স্বাধীন প্রজাতন্ত্র কাজাকিস্তান, আজারবাইজান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজাকিস্তান এবং কিরঘিজিস্তান। খৃস্টান ইউরোপের আতঙ্ক তুরস্ক হচ্ছে এ উত্থানশীল ব্লকের প্রধান নায়ক।

প্রাথমিকভাবে অর্থনৈতিক ব্লক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও *ইকো* শেষ পর্যন্ত ইসলামী দেশসমূহ নিয়ে একটি রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি হিসেবে বিশ্ব রাজনীতিতে আবির্ভূত হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ ও ধর্মীয় নৈকট্যের কারণে ইকোভুক্ত দেশসমূহ আন্তর্জাতিক আসরে যৌথভাবে এমন কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে যা পশ্চিমা স্বার্থের জন্য হানিকর হতে পারে। উপরন্তু পশ্চিমা পুঁজিবাদী বিশ্বের অন্যতম প্রধান সমালোচক ও প্রতিদ্বন্দ্বী চীন ভৌগলিক দিক থেকে কাছাকাছি অবস্থানের কারণে এ অঞ্চলগুলোর ব্যাপারে বেশ আগ্রহ দেখিয়ে আসছে। ঐতিহ্যগতভাবে চীনের সাথে পাকিস্তান ও ইরানের রয়েছে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। পশ্চিম এশিয়ার দু'টি দেশকে আণবিক প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করছে বলে চীনের বিরুদ্ধে আমেরিকার অভিযোগ বহুদিনের। তাই চীন মধ্য এশিয়ার গড়ে ওঠা অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক ব্লকের সাথে নিজকে সম্পর্কিত করতে আগ্রহী হবে বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করছে। এভাবে ধীরে ধীরে এতদঞ্চলে একটি তেহরান-পিন্ডি-বেজিং অক্ষ গড়ে উঠতে পারে। তাই এ ব্যাপারে অমুসলিম বিশ্ব বিশেষত ইহুদী-খৃস্টান প্রভাবাধীন পাশ্চাত্য দুনিয়ার উদ্বেগের অন্ত নেই।

ইকো গঠন ও বিশ্বব্যাপী মুসলিম পুনর্জাগরণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে পুরো পাশ্চাত্য ও তাদের প্রাচ্যদেশীয় সহযোগীরা আজ ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম সংহতির বিরুদ্ধে এক ব্যাপক ধ্বংসাত্মক তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। পশ্চাতপদ মুসলিম বিশ্ব এভাবে অর্থনৈতিক জোট গঠনের মাধ্যমে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদীদের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে। আজ তারা চেষ্টা করছে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে দমিয়ে রাখার জন্য। এ কারণে তেল সমৃদ্ধ এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় ভরপুর ইরাকের উপর চাপানো হয় মার্কিন অবরোধ। এর আগে ইরাকের বিরুদ্ধে নয় বছরের নিষেধাজ্ঞার ফলে ১০ লাখ শিশুসহ ২০ লাখ ইরাকী নাগরিক নিহত হয়। ক্লিনটন ক্ষমতা থেকে বিদায়কালে যুগোশ্লাভিয়ার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেও ইরাকের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার বিষয়টি বেমালুম চেপে যান। এছাড়া ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর মুসলমানদের উপর পাশ্চাত্যের

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক আগ্রাসন সহ সব ধরনের আগ্রাসন বেড়েই চলছে। আমেরিকা কোনো প্রমাণ ছাড়াই সৌদি আরব সহ বিভিন্ন কোম্পানির সম্পদ বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করছে এই অভিযোগ যে ওসামা বিন লাদেনের সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে। এ অভিযোগ তুলে বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকগুলোর হিসাবপত্র নিরীক্ষা করে হচ্ছে, বিনিয়োগকারীদের হয়রানীর অসংখ্য ঘটনা ঘটছে। ফলে অনেক মুসলমানই ইসলামী ব্যাংকগুলোতে তাদের টাকা পয়সা জমা রাখতেও সাহস পাচ্ছে না।

আমেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণের পেছনেও রয়েছে সুদূর প্রসারী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। *দি ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল*-এ প্রকাশিত একটি রিপোর্ট হতে এটাই স্পষ্ট হয় যে আফগানিস্তানের উপর মার্কিন কর্তৃত্বের মাধ্যমেই আমেরিকার অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষিত হবে। জার্নালে বলা হয়, The Taliban, the players most capable of achieving peace. Moreover, they were crucial to secure the country us a prime trans-shipment route for the Export of Central Asia's vast oil, gas and other national resources. আমেরিকা তালিবানদের অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়েছে কিন্তু বিনিময়ে ইউনিকল কোম্পানিকে তাদের দেশে পাইপলাইন বসানোর ব্যাপারে জোর খাঁটিয়েছে। আমেরিকা নিজেই আফ্রিকার বিভিন্ন ভিন্নমতাবলম্বীদের আশ্রয়দাতা হলেও আমেরিকার এক কালের সোভিয়েত বিরোধী দোসর ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দানের অভিযোগে আমেরিকা ও রাশিয়া ২০০০ সালে এক ব্যতিক্রমী ঐক্যের মাধ্যমে আফগানিস্তানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। যায় ফলে সেখানকার ১০ লাখ লোক সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

ইরাকের ক্ষেত্রে আমেরিকা অর্থনৈতিক অবরোধ ও আগ্রাসনের চিত্র আরো ভয়াবহ। মেডিকেল এডুকেশন ট্রাস্টের দেয়া তথ্যমতে যুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তী সামরিক ও অর্থনৈতিক হত্যাকান্ডে প্রায় ২ লাখ সাধারণ ইরাকী নাগরিক নিহত হয়। জেনেভা চুক্তির ১নং বিধির ৫৪ নং ধারায় বলা হয়, "যুদ্ধের কৌশল হিসেবে সাধারণ মানুষকে অভুক্ত রাখা নিষিদ্ধ।" তা সত্ত্বেও ইরাকী ছেলেমেয়েরা এখনো শিশু খাদ্য ও পুষ্টিকর গুড়ো দুধ থেকে বঞ্চিত। ইরাকে এনেসথেসিয়া ছাড়া রোগীকে অপারেশন করা হচ্ছে। চিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম যেমন ব্যান্ডেজ, ক্ষতস্থান সেলাইয়ের সূতা, চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত সাকার, স্টেথোস্কোপ, এক্স-রে যন্ত্রপাতি, স্ক্যানার এবং পানি পরিশোধনের জন্য জরুরি চিকিৎসা সামগ্রীর সরবরাহ সেখানে বন্ধ। শিশুদের কাপড়চোপড়, স্যানিটারি টাওয়েল, বৈদ্যুতিক বাল্ব, পাঠ্যবই, কাগজ-পেন্সিল ইত্যাদি সবকিছুই ইরাকে সরবরাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি সেখানে এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সিনিয়র ইরাকে এই নিরব ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করেন। আর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর তাতে সমর্থন দেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের সমর্থন নিয়ে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন নিজেও সেই তৎপরতা চালিয়ে যান।

এসবের মাঝেও পৃথিবীতে ধীরে ধীরে ইসলামী অর্থনীতি সম্প্রসারিত হচ্ছে যা পাশ্চাত্য পুঁজিবাদীরা তাদের জন্য হুমকি বলে মনে করে। আজ বিশ্বের সামনে রয়েছে আর্জেন্টিনার ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতি এবং এনরনের মত জায়েন্ট কোম্পানির দেউলিয়াত্ব যা প্রকটভাবেই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা নির্দেশ করে। এমতাবস্থায় আরব বিশ্বে, যেখানে এতদিন কোনো প্রকৃত ইসলামী ব্যাংক না থাকায় জনগণ সেখানে আমেরিকান ব্যাংকে

www.pathagar.com

টাকা রাখতো, সেখানে লোকজন সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংকগুলোতে টাকা রাখতে শুরু করেছে। যার ফলে পাশ্চাত্যের ব্যাংকগুলোর ভবিষ্যত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় পাশ্চাত্যের একটি বড় ব্যাংক HSBC দুবাইতে তাদের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা খুলেছে। বাংলাদেশে অনেক বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকও তাদের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা খুলেছে। ফলে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক আগ্রাসন চালানোর পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া তাদের রয়েছে সামরিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন। এই পদ্ধতি চালু রয়েছে বহু বছর ধরে। এ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য কাজ করে দু'টি লক্ষ্যে - এক অস্ত্র বিক্রি, অন্যটি হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান ঐক্যে ফাটল ধরানো। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে কাজ করে সেটা হলো মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিবাদ তৈরি করে তাদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা, যা তারা করেছে ইরাক-ইরান যুদ্ধে। এক্ষেত্রে ইরাক যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র সাহায্য নিয়েই ইরানের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এতে করে দেশ দু'টির পারস্পরিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক দু'টোই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাঝখান দিয়ে আমেরিকা অস্ত্র বিক্রির একটি স্থায়ী বাজার লাভ করে। এভাবে আমেরিকা আফ্রিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সংঘাত সৃষ্টিতে লিপ্ত।

যুদ্ধ কখনো পরহিতার্থে সংঘটিত হয় না। রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্র সমষ্টি এবং ব্যবসায়িক স্বার্থই বেশিরভাগ যুদ্ধের উস্কানিদাতা। অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই বেশিরভাগ যুদ্ধের উদ্দেশ্য। বিশ্বায়ন বিষয়ক পুস্তক *দ্য লেক্সাস অ্যান্ড দি অলিভ ট্রি*-তে টম ফ্রাইডম্যান লিখেছেন, "বাজারের নেপথ্য হাত একটি লুকানো মুষ্টি ছাড়া কখনো কাজ করবে না। আর সেই লুকানো মুষ্টি সিলিকন ভ্যালির প্রযুক্তির জন্য বিশ্বকে নিরাপদ রাখে। এই লুকানো মুষ্টির অপর নাম মার্কিন সেনা, বিমান ও নৌবাহিনী এবং মেরিন কোর।" এটাই বিশ্বায়নের সময়োপযোগী বিশ্বস্ত ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। মুক্তবাজার বা মুক্তবাজার গণতন্ত্র সম্পর্কে বিলেতের *দি ইকোনোমিস্ট* পত্রিকার একটি সংখ্যায় বলা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাচ্ছে সারা বিশ্বে মুক্তবাজার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে। মুক্তবাজার বলতে বোঝায় কেনা-কাটার ক্ষেত্রে কোনো রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণ না থাকা। মার্কিন গণতন্ত্রে মনে করা হয়, গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হলো মুক্তবাজার অর্থনীতি। এভাবে মুক্তবাজারের লোভ দেখিয়ে আমেরিকা উন্নয়নশীল বিশ্বের একশটি দেশকে কুক্ষিগত করে চলছে। ধনী ও দরিদ্রের ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের প্রেক্ষাপটে মুক্তবাজারের লুকানো শক্তি কাজ করে চলেছে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো যে কোনো উপায়ে *সুইটহার্ট চুক্তি* বাগানোর চেষ্টায় ঘুরঘুর করছে। তারা এতটাই শক্তিশালী যে বিশ্বের ১০০টি বড় অর্থনীতির মধ্যে প্রথম ৫১টি স্থানে কোনো দেশের নাম নেই। যেখানে রয়েছে পশ্চিমা বহুজাতিক করপোরেশনগুলোর নাম। ফলে তারা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে এবং সেটাকে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। ঘটনাচক্রে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের মাটির নীচে সঞ্চিত আছে বিরাট পরিমাণ পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস। মুক্তবাজার গণতন্ত্র এবং এ সব বহুজাতিক কর্পোরেশনের নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হলো মুসলিম দেশগুলোকে তার নিজের নিয়ন্ত্রণে আনা।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সঙ্কট অত্যন্ত প্রকট। কিন্তু এ ছাড়াও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন দৃশ্যমান। অস্ত্র বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে ও ব্যবসায় মনোপোলি

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অত্যন্ত স্থূল ও সাধারণ দৃষ্টিতেই বুঝা যায়। কিন্তু সাংস্কৃতিক আগ্রাসন অতি সূক্ষ্ম। আপাত দৃষ্টিতে একে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে পারে কারণ সাধারণ মানুষ এর গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম নয়। অত্যন্ত সুকৌশলে ও সতর্কতার সাথে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে চলে এ আগ্রাসন।

কোনো জাতিকে পরাভূত করতে হলে তাকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করার দিন পুরানো হয়ে গেছে। আধিপত্যকে পাকাপোক্ত করতে হলে দরকার হয় মানুষের মনে প্রবেশ করা, হীনমন্যতা সৃষ্টি করা- তাদের নিজ শিক্ষণ, সভ্যতা ও আচার আচরণ সম্বন্ধে নীচু ধারণা ও হীনমন্যতা সৃষ্টি করা। যার ফলে একটি মানুষ নিজের সাত পুরুষের বিশ্বাস নিয়ে হয়ে ওঠে সন্ধিহান। নিজের চারপাশের মানুষগুলো, তাদের আচার-আচরণ সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করা শুরু করে। সে অন্যরকম হতে চায়, সভ্য হতে চায়, এমন মানদণ্ডে 'সভ্য' যার বাহক সেসব নব্য আধিপত্যবাদীরা। এভাবে যখন কোনো মানুষকে নিজের বিশ্বাস ও আচার-আচরণ সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ করে তথাকথিত 'সভ্য' করে তোলা যায়, তখনই আধিপত্যবাদীদের মিশন সফল হয়। বন্দুক বা চাবুক প্রয়োগ করে নয়, বরঞ্চ মানসিকতার পরিবর্তনের মাধ্যমেই আধিপত্যবাদীরা নিজস্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের তল্পীবাহী একদল মানুষ তৈরি করে নেয়।

স্বীকার না করে উপায় নেই, বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম দেশগুলোর জাতীয় জীবনে সবচাইতে ভয়াবহ সমস্যা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। আর এ অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য অনেকাংশে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ফ্যাক্টরগুলোই দায়ী। কিন্তু আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাব যে এসব আর্থ-রাজনৈতিক সমস্যার পেছনে কার্যকর রয়েছে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ। এসব সমস্যাকে মুসলমানেরা গুরুত্ব দেয় না বরং অবহেলা করে। বিরোধীশক্তি মুসলমানদের অবহেলার সুযোগ নিয়ে এ ক্ষেত্রে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করে চলছে। আর এখানেই প্রচার মাধ্যমগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পশ্চিমা শক্তিগুলো বিশ্বব্যাপী তাদের নিজেদের সমৃদ্ধির জন্য নানা তৎপরতা চালাচ্ছে। গত দুশতকের ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পর, শিক্ষা দীক্ষায় অবদমিত দেশগুলো ধীরে ধীরে জেগে ওঠেছে। শোষণের জন্য পশ্চিমাদের তাই প্রয়োজন হচ্ছে নতুন হাতিয়ারের। সে হাতিয়ার পররাষ্ট্র নীতি। আরো পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে জাতিসংঘ নামক সংগঠন, মুক্তবাজার অর্থনীতি, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জোট ও মেরুকরণ। কিন্তু এসবের প্রভাব মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে ফেলতে হলে দরকার হয় এমন কিছু লোক যারা বুঝে বা না বুঝে এসব নীতির পক্ষে কাজ করবে। সমর ক্ষেত্রে পদাতিক বাহিনীকে সাহায্য ও অপর পক্ষের মনোবলে ভাঙন ধরিয়ে দেয়ার জন্য গোলন্দাজ বাহিনী যে ভূমিকা পালন করে, ঠিক তেমনই এ নব্য সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে চলছে সাম্রাজ্যবাদী প্রচার মাধ্যমগুলো। প্রচার মাধ্যমগুলো নানা রকমের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমা কালচারের অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে এবং মুসলমানদের পশ্চিমা আচার গ্রহণে উৎসাহিত করছে।

এ প্রেক্ষাপটে মিডিয়ার ষড়যন্ত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের অবশ্যই ইসলাম ও অন্যান্য সভ্যতার দ্বন্দ্বের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে। ইসলাম একটি জীবনমুখী, সুস্থ, ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। পৃথিবীর যে অংশেই মুসলমানেরা থাকে না কেন বা যেখানেই

www.pathagar.com

তারা স্থায়ী হোক না কেন এই শ্রেষ্ঠতর জীবন ব্যবস্থা তাদের জীবন যাপন ও আচার ব্যবহারের উপর গভীর ছাপ রাখে। অন্য ধর্মের অনুসারীরা যখন আমেরিকা, বৃটেন বা অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে বসবাস শুরু করে তখন তারা সেখানকার আচার-আচরণ রপ্ত করে নেয়, তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিধিবিধান বা সংস্কৃতিকে তুচ্ছ করে পশ্চিমা ধারার জীবন যাপনের খাপ খাইয়ে নেয়। তারা নিজ ধর্মীয় উপাসনা-উৎসব ছেড়ে পশ্চিমা সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিলিন হয়ে যায়। পশ্চিমা সমাজের অংশে পরিণত হয়।

মুসলমানদের ব্যাপার কিন্তু একটু আলাদা। তারা পৃথিবীর যে কোনো অংশে গেলেও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। নিজ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উদার নৈতিকতা তাদের প্রতিটি জীবনাচরণে প্রতিফলিত হয়। মুসলমানেরা পশ্চিমা সমাজের অংশ হয়েও কিছুটা ভিন্ন থেকে যায়। নামাজ, রোজা প্রভৃতি ধর্মীয় আচরণকে বাদ দিলেও আরো অনেক ক্ষেত্রেই মুসলমানদের সাথে পশ্চিমাদের বৈসাদৃশ্য। ইসলামী নৈতিকতা মুসলমানদের মদ, জুয়া প্রভৃতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সবচাইতে বড় পার্থক্য দেখা যায় পারিবারিক পরিবেশে। মুসলমানদের মাঝে পরিবারের ভিত্তি সুদৃঢ়, পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়িত্ববোধ অনেক বেশি নিবিড়। পরিবার মানুষের জন্য আশ্রয়ের মতো, এখানে বিবাহ বিচ্ছেদের হার অনেক কম। অন্যদিকে মানুষের আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছ যৌনাচারকে অনুমোদন দেয়ার ফলে তথাকথিত 'আধুনিক জীবন ব্যবস্থা'র প্রভাবে পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। যার ফলে স্বামী-স্ত্রী'তে অবিশ্বস্ত সম্পর্ক বা নারী পুরুষের বিবাহ বহির্ভূত সহাবস্থান নানা ধরনের অনৈতিক ও সমস্যাকীর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। ইউরোপ আমেরিকায় তথাকথিত মুক্ত জীবন প্রতিষ্ঠা করার জন্য এসব অনুমোদন করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামী নৈতিকতার কারণে মুসলমানরা পাশ্চাত্যে বাস করেও এসব গ্রহণ করতে পারেনি। পশ্চিমা ব্যবস্থার সাথে এমনিভাবে ইসলামের জীবনদৃষ্টি ও আর্থ-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দূরত্ব থাকায় মুসলমানেরা পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহে বাস করেও তাদের সমাজভুক্ত নয়। পশ্চিমা আধুনিকতাবাদের প্রবক্তাদের দৃষ্টিতে এটি একটি ঘোরতর সামাজিক সমস্যা। মুসলমানরা একই পশ্চিমা সমাজে বাস করেও নিজ আচার ঐতিহ্য ও বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে রাখা তাদের দৃষ্টিতে 'পশ্চিমা আধুনিক' সমাজ ব্যবস্থার জন্য হুমকিস্বরূপ।

ইতিহাস থেকে প্রতীয়মান যে মুসলমানদের সাথে ইহুদী ও খৃস্ট সভ্যতার গভীর দ্বন্দ্ব রয়েছে। এ সময়েও ইসলাম একটি চ্যালেঞ্জ। ধর্ম বিষয়ক আলোচনায় যে বিষয়টি প্রথম বিবেচ্য তা হলো আধুনিক জীবনের সাথে ধর্মের খাপ খাইয়ে চলার মতো ঐশি প্রত্যাদেশ থাকা বা না থাকা। বৌদ্ধ, খৃস্টান, ইসলাম, সনাতন হিন্দু ও ইহুদীর সম্বন্ধে এ প্রেক্ষিতে এটুকুই বলা যথেষ্ট যে হিন্দু ধর্ম তার অন্ধ সংস্কার ও বাড়াবাড়িমূলক নিয়মকানুনের জন্য অনুসারীদের কাছেই গ্রহণযোগ্যতা প্রায় হারিয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের বাণীতে স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না থাকায় তাও কালের পথ বেয়ে মানুষের জীবন থেকে ক্রমে দূরে সরে নাস্তিকতার জয় নিশ্চিত করেছে। বাকি থাকলো খৃস্ট, ইহুদী ও ইসলাম ধর্ম। এ তিনটির মধ্যে ইহুদী ধর্মের অনুসারী হবার জন্য একটি বিশেষ গোষ্ঠীর অংশ হওয়া শর্ত থাকায় তা কেবলমাত্র একটি মানব প্রজাতি বা জনগোষ্ঠীর মাঝেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ ইহূদীবাদ সে অর্থে আবেশী ধর্ম নয়। খৃস্টবাদ চার্চের অতিরিক্ত গোঁড়ামির ফলে নিজ অনুসারীদের কাছে আবেদন হারিয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে বাইবেলের বিকৃতির ফলেও তার অনেক আধুনিক ও জীবনমুখী প্রত্যাদেশ আজ বিস্মৃতির করাল গ্রাসে ধ্বংসীভূত।

www.pathagar.com

এভাবে পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম মানুষকে সঠিক পথ দেখিয়ে জীবনের প্রতিটি স্তরে শান্তি, নিরাপত্তা ও মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। যার ফলে মুক্তি পাগল মানুষ মুক্তির পথ খুঁজেছে। আর সে পথের দিশা নিয়ে এসেছে সর্বশেষ ঐশী ধর্ম ইসলাম। ইসলাম বর্তমান বিশ্বে সবচাইতে বিস্তারমান ধর্ম, পরিসংখ্যানগত দিক দিয়েও এ কথাটি প্রতিষ্ঠিত। আধুনিকতার দৃষ্টিতে এটিও পশ্চিমাদের আস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ।

তাই ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমা শক্তি এক অদৃশ্য যুদ্ধ শুরু করেছে। বিগত বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, কোনো জাতিকে হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। হিটলার ২ লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করা সত্ত্বেও তারাই বর্তমান বিশ্বের রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী নিয়ন্তা। মুসলমানদের যুদ্ধবিগ্রহে পাইকারি হারে হত্যা করলেও ইসলামকে ধ্বংস করা যাবে না, এটা পশ্চিমারা বুঝতে সক্ষম হয়েছে। ফলে তারা আরো ভয়ঙ্কর এক ধ্বংসযজ্ঞে মেতেছে, ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য মুসলমানদের জীবন ও চিন্তাচেতনা থেকে ইসলামী ভাবধারাকে মুছে ফেলার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। কারণ এভাবে ইসলামবিহীন মুসলমান তৈরি করতে পারলেই ইসলামের জয়যাত্রাকে রোধ করা সম্ভব। এটি সত্য যে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো নানাবিধ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের শিকার। মুসলিম দেশগুলোর রাজনীতি ও সরকার পশ্চিমা প্রভুরা নিয়ন্ত্রণ করছে। মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে মুসলিম দেশগুলোর উৎপাদন ব্যবস্থা ধ্বংস করে পরনির্ভরশীল অর্থনীতি তৈরিতেও পশ্চিমারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অর্থনীতি ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে মুসলমানরা আজ ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন। কিন্তু তার চাইতেও বড় সত্য হলো মুসলমানদের ঘোরতর সঙ্কট সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেই। কোনো জাতিকে নিয়ন্ত্রণ করা বা তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সবচাইতে সহজ উপায় তার সংস্কৃতির উপর আঘাত করা, শিকড় থেকে উপড়ে ফেলা।

মুসলমানদের সংস্কৃতি, ধর্ম-বিশ্বাস, আচার-আচরণ প্রভৃতির উপর আঘাত হানার জন্য পশ্চিমারা যে অস্ত্র ব্যবহার করছে তাদের মধ্যে নিরঙ্কুশভাবেই প্রধান হলো মিডিয়া। পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলো সুপরিকল্পিতভাবে ইসলামী সংস্কৃতি ও জীবন ব্যবস্থার উপর আক্রমণ করছে। বিশ্বের কাছে তাকে পশ্চাদপদ ও জীবন-বিমুখ হিসাবে চিহ্নিত করার প্রয়াশ চালিয়ে আসছে। পাশাপাশি মুসলমানদের মাঝে পশ্চিমা সভ্যতার উপাদান অনুপ্রবেশ করার লক্ষ্যে বিভিন্নরকম প্রচারণা চালাচ্ছে।

মিডিয়া তাদের বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডের নামে এমন বিষয় উপস্থাপন করে থাকে মুসলমানদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিবোধের সাথে বিরোধপূর্ণ। কিন্তু উৎকৃষ্টতা ও সুন্দর প্রকাশভঙ্গির জন্য এসব অনুষ্ঠান মুসলমানদের মাঝে গভীর ছাপ রাখে। সাধারণ মানুষ এতোটা সূক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন নয় যে নিজস্ব বোধ বা নীতির ভিত্তিতে এগুলোকে বিচার করার পর গ্রহণ বা বর্জন করবে। তারা অনেকটা না বুঝেই, বা চিন্তা না করেই এগুলোর চর্চা শুরু করে দেয়। এ ব্যাপারটির প্রকৃষ্ট উদাহরণ সুন্দরী প্রতিযোগিতা। দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমা বিশ্বে এ ধরনের প্রতিযোগিতা চলে আসছে। মিস ওয়ার্ল্ড, মিস ইউনিভার্স বা মিস এশিয়া-প্যাসিফিক নির্বাচন করে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। নির্বাচন পদ্ধতিটিই এমন যেখানে নিরাবরণ নারীদেহের প্রদর্শন করা হয়। বিচারকরা তাদেরকে দেহের উন্নততর গঠন ও আনুসঙ্গিক প্রকাশভঙ্গিমার জন্য পুরস্কৃত করে থাকেন। সাধারণ শালীনতার দৃষ্টিতেই এহেন আচরণ গ্রহনীয় নয়। ইসলামে তো অবশ্যই নিষিদ্ধ। স্যাটেলাইট, সংবাদপত্রসহ সমস্ত

www.pathagar.com

প্রচার মাধ্যম এ ব্যাপারটিকে এমনভাবে তুলে ধরছে যাতে মুসলমানেরা এর মাঝে খারাপ তো কিছু দেখছেই না বরঞ্চ আগ্রহী হচ্ছে, অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহী হচ্ছে। এসব প্রতিযোগিতায় অনেক মুসলিম মেয়েরা অংশ নিচ্ছে, মুসলিম দেশের প্রতিযোগিরা অংশ নিচ্ছে। এমনকি বিভিন্ন মুসলিম দেশে এ ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হিসাবে বাংলাদেশে শুরু হয়েছে ফটোসুন্দরী প্রতিযোগিতা। এভাবে ইসলামের নীতি ও আচার পদ্ধতির সাথে সাংঘর্ষিক অনুষ্ঠান নিরবে মুসলমানদের সমাজ জীবনে অনুপ্রবেশ করছে, যার ফলে মুসলমানরা নিজেদের উৎকৃষ্ট সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করে পশ্চিমা অপসংস্কৃতিকেই শোভন ও নিজের বলে মনে করতে শুরু করছে।

কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতিকে বিচার বিশ্লেষণ করতে গেলে অবশ্যই পারিপার্শ্বিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয়। নেপাল বা ভুটানের মানুষের আচার আচরণকে ইউরোপীয় সভ্যতার মানদণ্ডে বিচার করলে তাদের অভদ্রই মনে হতে পারে। কিন্তু সেটি নিঃসন্দেহে হবে একটি ভুল ব্যাখ্যা। নেপাল বা ভুটানের একজন মানুষের আচার আচরণকে সে দেশের সংস্কৃতির মানদণ্ডে বিচার করেই কেবল ভদ্রতা বা অভদ্রতার সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। ঠিক এরূপ বিমাতাসুলভ আচরণ করা হয় মুসলমানদের সাথে। পশ্চিমা সভ্যতা দীর্ঘদিন যাবত ইসলাম ও মুসলমানদের নারীবিদ্বেষী বা নারীর অবমাননাকারী হিসাবে চিহ্নিত করে আসছে। আর তা যে কোনো উপায়ে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে পশ্চিম প্রচারমাধ্যমগুলো। নারীদের হিজাবের আড়ালে অন্তরীণ করার অভিযোগ এনে তালেবান সরকারকে উৎখাত করার যা একটি কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, সেখানকার সংস্কৃতি ও পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ না করেই *বিবিসি, সিএনএন* চ্যানেল তা প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে উত্থাপন করে। মুসলিম দেশগুলোতে নারীদের ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদার গতানুগতিক চিত্র অঙ্কন না করে ছিদ্রান্বেষীর মতো বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে বড় করে তুলে ধরার পেছনে পশ্চিমা মিডিয়ার জুড়ি নেই।

কয়েক মাস আগে একটি স্বনামধন্য ইংরেজি নিউজ চ্যানেল-এ পাকিস্তানে এক মহিলার নাক-কান কাটা ও চোখ উপড়ানো নিয়ে দেড়ঘন্টাব্যাপী প্রতিবেদন দেখানো হয়। যেই করে থাকুক না কেন এহেন চোখ উপড়ানো বা নাক-কান কাটার মতো কাজ অবশ্য নিন্দনীয় ও দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবি রাখে। কিন্তু তারপরেও কথা থেকে যায়। এ ঘটনাটিই কি সারাবিশ্বে মুসলমানদের নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক? নিঃসন্দেহে না। ব্যাপারটা আরো খোলাসা করা যাক। গত ৫/৬ বছর ধরে বাংলাদেশের এসিড নিক্ষেপ সংক্রান্ত অপরাধ অনেক বেড়েছে। এ ব্যাপারে সরকার ও সমাজের সকলের সচেতন হওয়া উচিত। কিন্তু এই প্রসঙ্গগুলো উত্থাপন করে প্রচার মাধ্যমে যদি এরূপ জনমত গঠন করার চেষ্টা চালায় যে বাংলাদেশী পুরুষেরা নারীদের প্রতি এসিড নিক্ষেপ করতে উৎসাহী বা এটা তাদের সমষ্টিগত চরিত্রের প্রতিচ্ছবি, তা কি সত্য হবে? নিশ্চয়ই না, কেননা এটি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নারীসমাজের প্রতি আচরণের প্রতিচ্ছবি নয়। কিন্তু প্রচার মাধ্যমগুলো দিনের পর দিন মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনার বরাত দিয়ে জনমত গঠন করে আসছে যে মুসলমানদের সমাজে নারীরা বঞ্চিত ও নিগৃহীত। দিনের পর দিন এসবের প্রচারের ফলে সাধারণ মানুষের (মুসলমান বা অন্য ধর্মের) মনে উক্ত ধারণাটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুসলমানরা যখন ইসলাম সম্বন্ধে এরকম ধারণা পোষণ করা শুরু করে, তখন

www.pathagar.com

তারা স্বভাবততই মা, বোন, কন্যা, স্ত্রী বা অন্যান্য মহিলা আত্মীয়দের প্রতি তাদের ইসলামসম্মত ব্যবহারের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন থাকে না। এ অসচেতনতা যেমন অনেক ক্ষেত্রে অসংযমী আচরণের জন্ম দেয়, তেমনি অপর দিকে মুসলমানদের মাঝে কিছু পশ্চিমা আচার-আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে সহায়ক হয়। যেমন পশ্চিমা সমাজ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নারীর ক্ষমতায়নের জিকির তুলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের ব্যবহার করছে। বিজ্ঞাপন এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র থেকে শুরু করে অতিবৃহৎ সবকিছুর বিজ্ঞাপনেই নারীদের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। টুথপেস্ট, ব্রাশ, থালা-বাসন, সাবান, সিগারেট থেকে শুরু করে পুরুষদের অন্তর্বাসের বিজ্ঞাপনেও নারী যেন অপরিহার্য। এ ব্যাপারটি অনেকটা বিনা চ্যালেঞ্জে মুসলমান দেশগুলোতেও মিডিয়ার মাধ্যমে ঢুকে পড়েছে। আবার আজকাল পশ্চিমা নাটক চলচ্চিত্রে অফিসের কর্তাদের রক্ষিতা হিসাবে চিত্রিত হচ্ছে তাদের ব্যক্তিগত সহকারীরা, যেটি পশ্চিমা সমাজের বর্তমান বাস্তবতার চিত্র। মুসলমান সমাজেও এ ধারণার ধীর বিকাশ লাভ করছে। বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকদের লেখা থেকেও এ ব্যাপারটি অনুধাবন করা যায়। পতিতাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে স্বীকৃতি দানের জন্য মিটিং মিছিল বা মহাসমাবেশ করা হচ্ছে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার নামে। কোন বিজ্ঞাপনে নারীর অংশগ্রহণ প্রয়োজন আর কোনটিতে প্রয়োজন নয় বা কোন পরিবেশ একজন মুসলমান মহিলার কাজের জন্য সঠিক তা নিশ্চিত করা দরকার। নারীদের ক্ষমতায়নের নামে যা করা হচ্ছে তা আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। আর ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতে গেলে পাশ্চাত্যের মিডিয়া মুসলমানদের নিজস্ব নীতিবোধ ও সংস্কৃতি থেকে কতটা দূরে নিয়ে যাচ্ছে তা প্রতীয়মান হয়।

বিনোদনের আরেকটি মাধ্যম হলো ফ্যাশন শো, যেখানে নারী-পুরুষ বিভিন্ন পোশাকে সজ্জিত হয়ে দর্শকদের সামনে বিভিন্ন ভঙ্গি প্রদর্শন করে। ফ্যাশন শো পোশাক ও ফ্যাশান শিল্পের প্রচারণার পদ্ধতি হিসাবে ব্যবগার করা হলেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এর ভিন্ন আবেদন সৃষ্টি করে। সজ্জিত মডেল তরুণীর ক্যাট ওয়াক আর বিভিন্ন ভঙ্গিমায় দাঁড়ানোর ফলে যখন দর্শকদের মাঝে উন্মত্ততা দেখা দেয়, ছেলেরা শিস দেয় বা অশালীন মন্তব্য করে, তাতেই দর্শকদের কাছে শো'র আবেদন উপলব্ধি করা যায়। তাছাড়া আজকাল ফ্যাশন শো কেবল ডিজাইনার বা পোশাক শিল্প উদ্যোক্তাদের ব্যবসার প্রয়োজনে যে করা হচ্ছে, তা নয়। নবীণবরণ, ঈদসহ বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে ফ্যাশন শো'র আয়োজন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কোনো পণ্যের বাজারজাতকরণ নয় বরং দর্শকদের বিশেষ চাহিদার জোগান দেয়াই এর উদ্দেশ্য। নিঃসন্দেহে ইসলামের জমিনে এই ফ্যাশন শো একটি ভয়ঙ্কর পশ্চিমা আগাছা। 'অসভ্য-বর্বর' মুসলমানদের 'সভ্য' করার জন্য পশ্চিমা মিডিয়া তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার বুলি শেখাচ্ছে। পারিবারিক পরিসরে এ পশ্চিমা ব্যক্তিস্বাধীনতা সভ্যতার প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান পরিবারকে ধ্বংসের ব্যবস্থা করেছে, সে কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। পশ্চিমা দেশগুলোতে পরিবারের অবস্থা বেহাল আর মুসলমানদের সমাজের তথাকথিত সভ্যকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ায় পশ্চিমা সমাজে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে 'বয় ফ্রেন্ড-গার্ল ফ্রেন্ড' কালচার, লিভ টুগেদার বা সমকামিতার মতো ক্ষত। মুসলমানদের সভ্যকরণের প্রক্রিয়ায় পশ্চিমা মিডিয়া মুসলমানদের সমাজেও এসব অনৈতিক সম্পর্কের বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

www.pathagar.com

ইসলামে পরকাল একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ ধারণা ও বিশ্বাস। মুসলমান হবার মৌল শর্তের মধ্যে একটি হলো পরকালের উপর বিশ্বাস। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে মৃত্যুর পর তারা পৃথিবীতে নিজ কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে। ফলে সে তার প্রতিটি কাজ ও আচার আচরণকে একটি নৈতিকতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ করতে সচেষ্ট হয়। অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকে। আর পশ্চিমা নাস্তিকতাবাদের বক্তব্যই হলো পৃথিবীর জীবনই শেষ। কোনো জবাবদিহির দরকার হবে না। নাটক-চলচ্চিত্র প্রভৃতির মাধ্যমে পশ্চিমা মিডিয়া সুকৌশলে এ ধারণাটি মুসলমানদের সমাজে ঢুকিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং আংশিকভাবে সফলও হয়েছে। বাংলাদেশের নাটক-চলচ্চিত্র বা সমকালীন কবিতা-উপন্যাস-এর একটি ভালো উদাহরণ হতে পারে। পরকালের ধারণা দুর্বল হয়ে যাবার ফলে সমাজে অপরাধ বেড়ে যায় ও সামাজিক শান্তি বিনষ্ট হয়। আজকের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে অবনতি তা পরকালের গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থতার একটি অন্যতম কারণ বলা যায়।

অপরদিকে মুসলমানরা ইসলামের অনেক উন্নত ব্যবস্থা বাদ দিয়ে নিকৃষ্টতর পশ্চিমা ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। যার একটি উদাহরণ হতে পারে বৃদ্ধনিবাস। বাংলাদেশেও আজকাল বেশ কিছু বৃদ্ধনিবাস গড়ে উঠেছে। আপাত দৃষ্টিতে মানবিক মনে হলেও এ বৃদ্ধনিবাস ধারণাটিই মানুষকে বৃদ্ধ পিতামাতা থেকে দূরে সরে যেতে শেখায়, পিতামাতা সম্পর্কে দায়িত্বহীন হতে শেখায়। অথচ ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় পিতামাতার যে অবস্থান তাতে তারা পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সম্মানের সাথে অবস্থান করেন। বিভিন্ন সামাজিক ও পারিপার্শিক কারণে বৃদ্ধ বয়স তাদের জন্য ক্লান্তিকর হয়ে দাঁড়ায় না এবং নতুন প্রজন্মের শিশুরাও দাদা-দাদী, নানা-নানীর আদর স্নেহ সহ একটি সুন্দর পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়।

বিদেশী চ্যানেল, পত্র-পত্রিকা, উপন্যাস, চলচ্চিত্র থেকে এমন অনেক কিছু মুসলমানরা শিখছে যা দৃশ্যমান নয়। অথচ এ ধরনের শিক্ষা একজন মানুষের চিন্তার প্রকৃতি পর্যন্ত বদলে দেয়। নাটক, চলচ্চিত্র, উপন্যাস-এর নায়ক নায়িকার আচার আচরণ থেকে আমরা সজ্ঞানে বা অগোচরে এ শিক্ষাই পাচ্ছি যে আমাদের পৃথিবীতে সুখি হতেই হবে, তা যে কোনো মূল্যেই হোক না কেন। ইসলাম যেখানে সামষ্টিক কল্যাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। সেখানে এই ব্যক্তিসুখের ধারণার ব্যাপ্তি ঘটানো হচ্ছে সুকৌশলে। এমনকি মুসলমান সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরাও তাদের লেখনীতে এই ব্যক্তি সুখের ধারণাকেই বড় করে তুলে ধরছেন। নতুন প্রজন্মের মুসলমানরা আজ আরো গভীরভাবে জীবনাচরণে এ ধারণাকেই গ্রহণ করছে। এবং প্রতিটি মানুষই হয়ে উঠছে পশ্চিমাদের মতো বিনয়ের আবরণে ঢাকা স্বার্থপরতার এক প্রতিমূর্তি। সমাজের মঙ্গলের জন্য তাদের কোনো চিন্তা নেই, বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে এদের কোনো প্রতিবাদ নেই, নিজের স্বার্থ ব্যাহত না হলে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধেও এদের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। নিজের সুখের জন্য সর্বব্যাপী ধ্বংসের মাঝেও এরা যেন ঘুমিয়ে আছে, মুখ লুকিয়ে আছে। নিজের সমৃদ্ধিই এদের দরকার, পরিবার বা বন্ধু-প্রতিবেশীর প্রতি সত্যিকার অর্থে এদের কোনো দায়বোধ নেই। এসব ধারণার প্রবক্তা পশ্চিমারাও তাই চায়। এভাবে ঘুমিয়ে থাকা জাতির গলায় পা দিলেও প্রতিবাদ করার লোক নেই। মাঝখান থেকে যথেচ্ছ অনাচার করে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করার পথ সুগম হচ্ছে। এভাবে স্বার্থপরতার বিকাশ ঘটানোর ফলে

www.pathagar.com

সমাজে দান করার ও সাহায্যের মনোবৃত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিতরা দান খয়রাত করাকে সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব বলে মনে করেন না বরং ভোগ বিলাসে ব্যয় করতেই উৎসাহী। সমাজে প্রলেতারিয়েতের প্রতি দায়িত্ব, দারিদ্র বিমোচন- এসব ব্যাপার শুধু তাদের মুখের ফাঁকাবুলি হিসেবেই বক্তৃতার মঞ্চ গরম করে। কার্যক্ষেত্রে তাদের আচরণ চরম স্বার্থপরের মতো।

ইসলামের অর্থব্যবস্থার একটি বড় অংশ চ্যারিটি - যার দ্বারা সমাজ কল্যাণ, শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি কাজ করা হয়। এ ব্যবস্থার সুফল বৃটিশ আগমণপূর্ব বাংলাদেশেই প্রমাণিত। চ্যারিটি কমে যাবার ফলে কার্যক্ষেত্রে সমাজকল্যাণের পথ সীমিত হয়ে আসে। আর যেটুকু সেবামূলক কাজ করা হয় তা জনসেবার চেয়ে প্রচারণার প্রয়োজনেই বেশি করা হয়। বন্যার্তের হাতে পরিধেয় বস্ত্র তুলে দেয়ার সময়ে ছবি তুলে রাখার প্রতিযোগিতার আচরণ তা প্রমাণ করে। আর নিজ সুখের এই কাঙালদের জন্যে পশ্চিমা মিডিয়া আকর্ষণীয় সব সুখ উপকরণ যোগাড় করে রেখেছে। নতুন মোবাইল ফোন, নতুন ফ্যাশনের পোশাক, নতুন আসবাব, নতুন বাড়ি, লেটেস্ট মডেলের গাড়ি এভাবেই চলতে থাকে চাহিদার চাকা। এ ক্ষুধাকে উসকে দেয়ার জন্য নতুন পণ্য আর প্রচার মাধ্যমের নতুন সব বিজ্ঞাপন তো আছেই। এভাবে এই বস্তুবাদী সুখ সন্ধানীরা আরো অধিক পাওয়ার আশায় সুখ খুঁজে বেড়ায়। পশ্চিমাদের ব্যবসায়িক, রাজনৈতিক সব ধরণের স্বার্থই তাতে উদ্ধার হয়। পত্র পত্রিকা বা লেখালেখি জগতেও পড়েছে পশ্চিমা প্রভাব। জনপ্রিয় পত্রিকাগুলো থেকে ইসলাম নিরবে বিদায় নিয়েছে। বিনোদনের নামে এসব প্রচার মাধ্যমে যা আসছে তার সবই যে আপত্তিকর তা নয়, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইসলামী ভাবধারাকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে।

ইসলাম সৌন্দর্যকে উৎসাহিত করে। সুন্দরের সৃষ্টি ও বিকাশে ইসলামের কোনো বাধা নেই। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মুসলমান সমাজে এ ধারণারই ব্যাপ্তি ঘটানো হচ্ছে যে ইসলামে কোনো বিনোদন নেই। গতানুগতিক আলেমরাও এই ধারণার পক্ষেই কথা বলছেন। ফলে সাধারণ মানুষ মনে করতে শুরু করেছে যে ইসলাম শিল্পকলা, খেলাধুলা, সঙ্গীত বা সাহিত্যকে সমর্থন করে না। তাই জীবন যাপনের প্রয়োজনেই তারা পশ্চিমা ভাবধারায় শিল্প বা সাহিত্য চর্চায় ব্রতী হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন ভালো ইসলামী সাহিত্য, গান বা শিল্পকলা সৃষ্টির পথ রুদ্ধ হয়েছে, আবার আরেকদিকে ইসলামী জীবনাচরণগুলো নিয়েও নানা বিভ্রান্তির জন্ম হয়েছে। যেমন বলা যেতে পারে রোজা ও ঈদের কথা। এ দুটো সম্পূর্ণ অর্থে অ্যান্টি থিসিস, রোজা ত্যাগ-সংযম আর ঈদ আনন্দ-উল্লাসের জন্য। কিন্তু আমরা এদের গুলিয়ে ফেলি। টিভিতে ঈদের অনুষ্ঠান প্রচারেও আকাশ থেকে নেমে আসা অপসংস্কৃতি ছেয়ে ফেলেছে সাংস্কৃতিক অঙ্গন- শালীনতা, নির্দোষ আনন্দের পথ সেখানে সঙ্কীর্ণ।

প্রিন্ট মিডিয়া

বিশ্ব গণমাধ্যম বর্তমানে কতিপয় সংস্থার হাতে কুক্ষিগত। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে এই কতিপয় সংবাদ সংস্থা বা কোম্পানিও পশ্চিমাঘেষা, ইসরাইল কেন্দ্রিক এবং মুসলিম বিদ্বেষী। আমরা যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলোকে নিয়ে পর্যালোচনা করি তাহলে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় পশ্চিমা সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ও বইপুস্তকে মুসলিম বিশ্ব, তার জীবন ব্যবস্থা, তার একান্ত ধর্মীয় বিশ্বাসকে অত্যন্ত

www.pathagar.com

সুকৌশলের সাথে নেতিবাচক ভাবে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। সেখানে মুসলিম বিশ্বের ইতিবাচক খবরের তুলনায় খারাপ খবরকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়।

প্রিন্ট মিডিয়ায় পশ্চিমাদের আধিপত্য, তৃতীয় বিশ্বের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রচারণা কৌশল অত্যন্ত একপেশে। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমা গণমাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম বিষয়ক কোনো সংবাদ পাওয়া গেলে তা নিয়ে অনেক গবেষণা হয় - সংবাদটি ছাপানো যাবে কি যাবে না। অনেক ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বকে ব্যঙ্গ করতে বা খারাপভাবে বিশ্ববাসীর সামনে ফুটিয়ে তুলতে কুণ্ঠাবোধ করে না। *দি রুটস অব মুসলিম রেইজ, দি মুসলিমস আর কামিং, ভায়োলেন্স, দি ইসলামিক কার্স, বম্বস ইন দি নেইম অব আল্লাহ্*- এই ধরনের শিরোনামে মুসলিম বিশ্বের সংবাদকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা হচ্ছে যা সাধারণ জনগণের মনে ও পশ্চিমা বিশ্বে মুসলমানদের সম্পর্কে খারাপ ধারণার সৃষ্টি করছে। তাদের এই উস্কানিমূলক সংবাদ পরিবেশনায় মুসলমানদের, বিশেষত মুসলিম হিজাব পরিহিতা মহিলাদের অনেক ধরনের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সর্বোপরি এ ধরনের সংবাদে মুসলমানদের প্রতি পশ্চিমাদের ঘৃণা প্রকাশ পায়, এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে সন্ত্রাস এবং মুসলিম নির্যাতন।

মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে পশ্চিমা পত্রপত্রিকাগুলোর প্রতিবেদন মুসলিম বিশ্বের প্রতি পক্ষপাত দুষ্টে দুষ্ট। পশ্চিমা সংবাদপত্রগুলো একটি বিষয় বারবার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে যে, ইসরাইল ফিলিস্তিনিদের অসমযুদ্ধে নিহতদের অধিকাংশই ফিলিস্তিনি। অত্যাধুনিক ট্যাংক ও অস্ত্রে সজ্জিত ইসরাইলী সৈন্যদেরকে ফিলিস্তিনিরা যখন আত্মরক্ষার জন্য ইটপাটকেল ছুঁড়ে তখন ফিলিস্তিনিদের সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। অথচ যখন তথাকথিত সন্ত্রাস নির্মূলের নামে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে তখন ইসরাইলের এই বর্বরতাকে বলা হচ্ছে *সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অভিযান*। পশ্চিমা গণমাধ্যম ইসলামকে পশ্চিমা সভ্যতার কল্পিত শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে লাগাতার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক ও গতানুগতির মনোভাবের কারণে পশ্চিমা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে ভুল ধারণা জন্ম নিয়েছে। *কাউন্সিল অন আমেরিকান ইসলামিক রিলেশান্স*-এর বর্ণনা মতে এই ভুল ধারণা ও বিরোধের স্বরূপ হল ঃ আমেরিকার কংগ্রেস প্রার্থী ও সিনেট সদস্যদের অনেকেই ইসলামকে 'খুনে ধর্ম' হিসেবে বর্ণনা করেন এবং ফিলিস্তিনিদের গণ্য করেন Lower than pond scum, ragheads, pieces of shit এবং turds হিসেবে (*Impact International, Dececmber 2000, Faisal Kutty; No Conspiracy, Just Monopoly*)

ইসলাম, মুসলিম বিশ্ব ও ফিলিস্তিনিদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট প্রচারণা চালানো ইহুদী লবির নির্লজ্জ আক্রমণের একটি বহিঃপ্রকাশ। প্রিন্ট মিডিয়ার একচ্ছত্র আধিপত্যের সুবাদে বিশ্ব বিবেককে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে। মূলত ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংকটকে দীর্ঘায়িত হওয়ার জন্য পশ্চিমা প্রেসের অসততাও অনেকাংশে দায়ী। বৃটেনসহ ইউরোপের অধিকাংশ দেশই ইহুদীদের পক্ষ নিয়েছে। ইউরোপীয় সংবাদপত্র ইসরাইলের বর্তমান মনোভাবকে সমর্থন দিয়ে আসছে। ফলে এ সংকটের অবসান হচ্ছে না।

মুসলমানদের প্রতি প্রিন্ট মিডিয়ার এই ধরনের পক্ষপাতমূলক আচরণের নেপথ্যে অন্যতম কারণ হিসেবে বিশ্বের সংবাদ সংস্থাগুলোর উপর পশ্চিমা মিডিয়ার একচেটিয়া প্রভাবকে দেখা যেতে পারে। পশ্চিমা গণমাধ্যমের অধিকাংশই সেকিউলার ও জায়নবাদী রাজনৈতিক

www.pathagar.com

মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। ফলে প্রিন্ট মিডিয়ার প্রচার ও প্রসার একটা নির্দিষ্ট শক্তির আয়ত্বাধীন হয়ে পড়েছে। আর একটা সীমিত পরিসরে ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা নিঃসন্দেহে সমস্যার সৃষ্টি করে এবং গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, এক্ষেত্রে মুসলমানদের দুর্বলতা চোখে পড়ার মতো। এশিয়ার কিছু ভালো পত্রিকা থাকলেও তা পশ্চিমাঘেষা এবং পুরোমাত্রায় মুসলিম স্বার্থবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত। বিশ্বের প্রিন্ট মিডিয়া বর্তমানে দু'ডজনের মত প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে যার অধিকাংশই কোনো না কোনোভাবে পাশ্চাত্য নিয়ন্ত্রিত। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হচ্ছে : Time Warner (Publishing, Movies, CNN, HBO, Time Magazine, People Magazine, etc), Disney (ABC, Disney, A&F, Publishing, Radio Stations, etc), Bertelsman (TV channels, 100 Newspapers and Magazines, Radio Stations, etc), Viacom (Radio Stations, TV, MTV, Nickelodeon. Publishing, etc.), Ges News Corporation (Fox, 132 Newspapers including London Times and New York Post, TV Guide, etc). এই ধরনের বড় বড় সংস্থাগুলোই মূলত বিশ্ব সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আমরা কি শুনব, বিশ্ব সম্পর্কে কতটুকু জ্ঞান রাখব, টিভিতে কি দেখব, কোনটি অনুসরণ করব, কোন কোন বিষয়গুলো সংবাদ উপযোগিতা পাবে - তা মূলত এই প্রতিষ্ঠানগুলোই নির্ধারণ করে থাকে। (*Impact, Kutty*)

প্রিন্ট মিডিয়ার আরও কয়েকটি হলো: *USA Today International* যা এক সঙ্গে হংকং, সিঙ্গাপুর এবং সুইজারল্যান্ড থেকে প্রকাশিত হয়। এর প্রতিদিনের বিশ্বব্যাপী গড়পড়তা সার্কুলেশন ৯০,০০০। এটি ইউরোপের সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকা। ওয়ার্ল্ড টাইম কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত *World Paper* ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে বহুল প্রচলিত পত্রিকা। এর সার্কুলেশন গড়ে ১০,০০০ এর বেশি। *The Financial* পত্রিকাটি বিশ্ব-অর্থনীতির উপর শ্রেষ্ঠ পত্রিকা। গোটা বিশ্বে যার সার্কুলেশন ৩ লাখেরও বেশি। *The Economist* এর প্রধান দপ্তর লন্ডনে হলেও পত্রিকাটি একত্রে ভার্জিনিয়া, লন্ডন ও সিঙ্গাপুর থেকে প্রকাশিত হয়। ৪ লাখের বেশি এর সার্কুলেশন। *The Wall Street Journal* ইউরোপ ও এশিয়াতে বেশ প্রসিদ্ধ পত্রিকা। এর গড়পড়তা সার্কুলেশন প্রতিদিন ৯০,০০০-এরও বেশি। এসব পত্রিকার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পত্রিকার মধ্যে রয়েছে *New York Times*, ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত *La Monde*, স্পেন থেকে প্রকাশিত *El Pais*। আর সংবাদ সংস্থাগুলোর মধ্যে *রয়টার্স, এসোসিয়েট প্রেস (এপি), এজেন্সি অব ফ্রান্স প্রেস (এএফপি), ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল (ইউপিআই), ইতারতাস* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ম্যাগাজিনসমূহের মধ্যে *রিডার্স ডাইজেস্ট* শীর্ষস্থানে, যা ১৫টি ভাষায় প্রকাশিত হয়। ১৯৯৫ সালে এই ম্যাগাজিনের গড় সার্কুলেশন ছিল ১৬.৫৫ মিলিয়ন। বিশ্বের প্রায় ১৯৫টি দেশে *টাইম ম্যাগাজিন* এর প্রায় ১.৫ মিলিয়ন সার্কুলেশন রয়েছে। অন্যান্য জনপ্রিয় ম্যাগাজিনের মধ্যে *এশিয়া উইক*, জাপানের *প্রেসিডেন্ট*, চীনের *ইয়াজহু আকন*, *বিজনেস উইক*, *ফরচুন* প্রভৃতি সমধিক পরিচিত।

এসবের তুলনায় বিশ্বের প্রকাশনা জগতে মুসলমানদের ভূমিকা যৎসামান্যই বলা চলে। মুসলমানদের কিছু আন্তর্জাতিক মানের পত্রিকা থাকলেও গ্লোবাল ভিলেজে এর নিজস্ব কোনো অবস্থান নেই। এক্ষেত্রে মিশর থেকে প্রকাশিত *আল আহরাম* পত্রিকার কথা বলা

www.pathagar.com

যেতে পারে যা শুধুমাত্র আরব বিশ্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত *ইমপ্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল* পত্রিকাও উল্লেখযোগ্য। পত্রিকাটি শুধুমাত্র মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আশার কথা এই যে বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম দেশে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও এর সার্কুলেশন রয়েছে। যদিও আর্থিক সংকটের কারণে গত ডিসেম্বর ২০০১ থেকে সেপ্টেম্বর ২০০২ পর্যন্ত ১০ মাস এর প্রকাশনা বন্ধ ছিল, সম্প্রতি পুনরায় এর প্রকাশনা শুরু হয়েছে।

গ্লোবাল মিডিয়ার এই পশ্চিমা আগ্রাসনই আজ মুসলিম উম্মাহর জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ব গণমাধ্যম আজ বিশ্ব রাজনীতি ও বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে। পাশাপাশি বিকল্প এমন কোনো শক্তি নেই যা পাশ্চাত্যের এই শক্তিশালী প্রচার মাধ্যমের সাথে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে। মুসলমানদের অজ্ঞতা, অসচেতনার সুযোগ নিয়ে বিশ্ব গণমাধ্যম মুসলমানদের মূল্যবোধ, নৈতিকতা, চিন্তাধারা, জীবন পদ্ধতি, সর্বোপরি তার অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে। পাশ্চাত্যের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক উভয় মিডিয়াই আজ অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

এবার আসা যাক মুসলিম বিশ্বের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ও তার উৎস সম্বন্ধে। মুসলিম দেশসমূহের জাতীয় পত্রিকার জন্য আন্তর্জাতিক সংবাদ কিনতে হয় পূর্বোল্লিখিত সংবাদ সংস্থাসমূহের কাছ থেকে যার পুরোটাই ইহুদী-খৃস্টান চক্র নিয়ন্ত্রণ করে। আর তারা ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডে অতিমাত্রায় পারদর্শী। তারা মুসলিম বিশ্বের ইতিবাচক সংবাদগুলো সচেতনভাবেই অগ্রাহ্য করে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে বিদ্রুপ করতে মোটেও দ্বিধা করে না। আরব বিশ্ব ও এশিয়ার নিজস্ব খবর প্রথমে পশ্চিমা সংবাদ দাতারা সংগ্রহ করে এবং পরে তা পশ্চিমা সংবাদ সংস্থাসমূহের ইসলামবিরোধী সাংবাদিকদের হাতে সম্পাদিত হয়ে পুনরায় এশিয়া, আরব বিশ্বে ফিরে আসে। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়। তাই তো ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর আফগানিস্তানের উপর আমেরিকার পরিচালিত হত্যাযজ্ঞ *সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অভিযান* হিসেবে সারা বিশ্বের পত্র পত্রিকায় তুলে ধরা হয়। কথিত সন্ত্রাসী সৌদি ধনকুবের ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দেয়ার অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। সেই সাথে সার্বভৌম রাষ্ট্র পাকিস্তানের আকাশসীমা লংঘন এবং আন্তর্জাতিক আইনের কোনো তোয়াক্কা না করেই আফগানিস্তানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়।

নিছক স্বার্থ রক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ লংঘন করছে। অনেক সময় মিত্রদের সহযোগিতায় ও জাতিসংঘের ছত্রছায়ায় তথাকথিত আন্তর্জাতিক স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার সমুন্নত রাখা, দারিদ্র্য বিমোচন, রোগব্যাধি নির্মূল ও সন্ত্রাস মোকাবিলার নামে তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলোর বিরুদ্ধে অন্যায় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। আফ্রিকার অধিবাসীরা যেখানে অনাহারে, অপুষ্টিতে মারা যাচ্ছে সেখানে আমেরিকা প্রতিবছর হাজার হাজার টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য এই দারিদ্র্য-পীড়িত তৃতীয় বিশ্বে না পাঠিয়ে সমুদ্রে ফেলে নষ্ট করছে। তৃতীয় বিশ্বকে দমিয়ে রাখার জন্যে আমেরিকা তথা পশ্চিমা শক্তির চেষ্টার কোনো অন্ত নেই। তাইতো আমেরিকা যখন তখন আন্তর্জাতিক আইন-লঙ্ঘন করছে। পশ্চিমারা যখন মুসলিম দেশগুলোর উপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালাচ্ছে তখন নিছক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা বা পশ্চিমা আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে প্রচেষ্টারত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সংগ্রামকে পাশ্চাত্য

www.pathagar.com

প্রিন্ট মিডিয়ায় *রক্তপিপাসু সন্ত্রাসী এবং মৌলবাদী* তৎপরতা হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এই পশ্চিমা আধিপত্যের বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্ব, বিশেষত মুসলিম দেশগুলোর সংগ্রামের যথাযথ মূল্যায়ন ও উপলব্ধির ব্যাপারে বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়া ভাষ্যকারদের অনীহার মনোভাব বর্তমান পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার একটি নেতিবাচক প্রবণতা।

যদিও ফিলিস্তিন, ইরাক, বসনিয়া, কসোভা, চেচনিয়া, সোমালিয়া, কাশ্মীর, মিন্দানাও সহ বিভিন্ন স্থানে মুসলমানরাই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সবচেয়ে নির্মম শিকার, তথাপি পশ্চিমা সংবাদপত্র মুসলমানদের কুখ্যাত সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করে চলছে। খার্তুম ও আফগানিস্তানের ধ্বংসাবশেষে পড়ে থাকা শরীরের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ মুসলমানদের, ফিলিস্তিনে গুলিবিদ্ধ নিহত যুবক মুসলমান, টেলিভিশনে ক্ষণিকের জন্য যে ভয়াবহ অগ্নিদগ্ধের দৃশ্য দেখানো হয় সেটাও তাদেরই। (*পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে মুসলিম বিশ্ব, শাহ্ আবদুল হালিম*)

জেমস জগবির মতে ১৯৮২ সাল থেকে এ পর্যন্ত আমেরিকায় ১৭৫টি সন্ত্রাসী ঘটনার তথ্য পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে ৭৭টি ঘটনার সাথে পুর্টোরিকান জাতীয়তাবাদীরা জড়িত, ৩১টি ঘটনার সাথে পরিবেশবাদী গ্রুপগুলো জড়িত, ২৩টি ঘটনার জন্য বামপন্থী সংগঠনগুলোকে দায়ী করা হয়, ১৮ টি ঘটনায় এফবিআই এর ভাষায় *ইহুদী চরমপন্থীরা* জড়িত এবং ১২টি ঘটনার সাথে ক্যাস্ট্রোপন্থী কিউবানরা জড়িত। পক্ষান্তরে এই ১৪ বছরে আরব বা মুসলমানদের দ্বারা সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে মাত্র ৩টি (*আরব আমেরিকান নিউজ ২৬ জানুয়ারি ১৯৯৬; দ্রষ্টব্য : Impact International, UK, April 1998*)। তারপরও মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্য মিডিয়ার বুলিতে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী হিসেবে দেখানো হয়।

পাকিস্তান যখন পারমাণবিক পরীক্ষা চালায় তখন পশ্চিমা প্রিন্ট মিডিয়া *হৈ চৈ* বাধিয়ে দেয় এবং পাকিস্তানকে *ইসলামী বোমা* বানানোর দায়ে অভিযুক্ত করে। অথচ ভারতের বোমাকে *হিন্দু বোমা* নামে নামকরণ করেনি। ইসরাইলের বোমাকে *ইহুদী বোমা* হিসেবে প্রচার করা হয়নি। ওসামা বিন লাদেন মুসলমান হওয়ায় পশ্চিমা সরকার ও গণমাধ্যমগুলো তাকে *ইসলামী মৌলবাদী* এবং *ইসলামী সন্ত্রাসী* বলে চিহ্নিত করে। কিন্তু তারা মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম চরমপন্থী খৃস্টান সন্ত্রাসী জর্জ হাবাসকে *খৃস্টান মৌলবাদী* বা *খৃস্টান সন্ত্রাসী* বলে না অথবা *আইআরএ*-এর সক্রিয় কর্মীদেরকে তারা *ক্যাথলিক সন্ত্রাসী* বা *খৃস্টান সন্ত্রাসী* বলে সনাক্ত করে না। (*পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে মুসলিম বিশ্ব, ঐ*)

প্রিন্ট মিডিয়া সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য দেয়া যাক। আমেরিকায় ১৫০০ সংবাদপত্রের মাত্র ২৫% হচ্ছে স্বাধীন মালিকানাধীন। বাকি বিশাল অংশ কতিপয় বড় বড় কোম্পানির হাতে পুঞ্জিভূত। Sulzberger পরিবার ৩৪টি সংবাদপত্রের মালিক, যার মধ্যে আছে *New York Times, Boston Globe*, ডজন খানেক ম্যাগাজিন, পাবলিশিং কোম্পানি, রেডিও ও টেলিভিশন স্টেশন। Washington Post Company - *Washington Post* ও *News Week* সহ আরও অন্যান্য ম্যাগাজিনের মালিক। এই দুই কোম্পানি আবার আন্তর্জাতিক পত্রিকা *International Herald Tribune* এর প্রকাশক। এই পত্রিকার সদর দফতর ফ্রান্সে তবে তা সিঙ্গাপুর, হংকং সহ বিশ্বের ১০টি শহর থেকে একই সাথে প্রকাশিত হয় এবং এর প্রতিদিনের সার্কুলেশন প্রায় ২,১০,০০০। এই ধরনের তথ্য অন্য মিডিয়া কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ২০০০ সালের প্রকাশিত এক পরিসংখ্যান অনুসারে কানাডায় ১০৫টি দৈনিক সংবাদপত্রের ৬১টি পত্রিকাই জায়নবাদী সংগঠন *Conrad Black* এর অধীনে ছিল, যেগুলোর মধ্যে *National Post, Ottowa Citizen* এবং *Montreal Gazette* উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

মজার ব্যাপার হলো কলম্বিয়ার ১৬টি দৈনিকের মধ্যে ১৪টিই তার অধীনে ছিল। *Conrad Black* কানাডা ছাড়াও আমেরিকা, বৃটেন এবং ইসরাইলের আরও শত শত সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ করে। এদের মধ্যে *Jerusalem Post, The Daily Telegraph* এবং *Chieago Sun-Times* এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (*Faisal Kutty*)

মুসলমানদের এই শোচনীয় পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালে *ওআইসি* কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল *International Islamic News Agency (IINA)* যা মুসলিম বিশ্বের বিশাল চাহিদা বিন্দুমাত্র পূরণ করতে পারেনি এবং বর্তমানে অকর্মণ্য নামমাত্র সংস্থায় পরিণত হয়েছে। সৌদি আরবের সবচেয়ে পুরনো দৈনিক পত্রিকা *আল বিলাদ* অর্থনৈতিক সংকটের কারণে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। জেদ্দাভিত্তিক পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশনা শুরু হয় ১৯৩২ সালে। তখন অবশ্য পত্রিকাটির নাম ছিলো *হেজাজের কণ্ঠস্বর*। ২৮ বছর পর এর নামকরণ করা হয় *আল বিলাদ*। প্রায় ৫ কোটি রিয়াল ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে সাংবাদিক-কর্মচারীদের ৫ মাস ধরে বেতন দিতে না পারায় পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। অর্থ সংকটে পড়ে গত এপ্রিলে *আল জাজিরার* সান্ধ্য দৈনিক *আল মাসাইয়া* বন্ধ হয়ে যায়। সৌদি আরবে ৭টি আরবি, ৩টি ইংরেজি ও ১টি অর্থনীতি বিষয়ক দৈনিক রয়েছে। এছাড়াও লন্ডন থেকে প্রকাশিত *দৈনিক আল হায়াত* ও *আল আসওয়াত* পত্রিকা দু'টি সৌদি আরবে বেশ চললেও এ সবগুলোই ব্যক্তি মালিকানাধীন। সৌদি সরকার বিভিন্ন সংস্থায় অবদান রাখলেও নিজস্ব কোনো পত্রিকা আজ অবধি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। *সিএনএন* বিশ্বে সংবাদ প্রচারে শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। *সিএনএন* প্রতিষ্ঠাতা টেড টার্নার একজন ইহুদী বিলিওনিয়ার। আজ মুসলমানদের মধ্যে এরকম বহু বিলিওনিয়ার রয়েছে কিন্তু তাদের মধ্যে কারোরই টেড টার্নারের মত চিন্তাভাবনা নেই। আদনান খাশোগি মধ্যেপ্রাচ্যের একজন বিলিওনিয়ার যার ব্যয়ের অন্যতম প্রধান খাত হচ্ছে ঘোড়া এবং বাড়িঘরের সাজসজ্জা। অথচ ইহুদী খৃস্টানদের মধ্যে এ ধরনের শিল্পোদ্যোক্তারাই বিশ্ব গণমাধ্যমকে ধরে রেখেছে ও নিয়ন্ত্রণ করছে।

কানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের একজন অন্যতম প্রধান রিপোর্টার অ্যালিসন স্মিথ ১৯৯৮ সালে অনুষ্ঠিত কানাডিয়ান ইসলামিক কংগ্রেসের সম্মেলনে বলেছিলেন: If Muslims feel that they are not getting balanced coverage then the community should encourage its children to join the enemy (media). Indeed, it seems increasingly clear that this may be the only option if minority communities wish to make any significant inroads into how the media view and portray it. (*Faisal Kutty*)

স্যাটেলাইট ও টেলিভিশন

প্রযুক্তিকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এমন একটা ডিভাইস হিসেবে যা মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আবেগিক অপূর্ণতাকে পূরণ করে। প্রযুক্তি সাধারণত নিরপেক্ষ কিন্তু এর ব্যবহারকারীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এটি ভালো, খারাপ বা পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে। অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে প্রযুক্তির অধিকারীরা প্রযুক্তিকে বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চাইছে। যাদের প্রযুক্তি নেই তাদের কেউ কেউ আগ্রহের সাথে প্রযুক্তি ধার করছে, আবার কেউ কেউ সাবধানতা অবলম্বন করে দূরে থাকছে।

কিন্তু তাই বলে উন্নত জাতিগুলোর প্রযুক্তিগত আগ্রাসন থেমে নেই। যার হাতে যত উন্নত প্রযুক্তি রয়েছে তার পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে অন্যকে প্রভাবিত, নিয়ন্ত্রিত ও উপনিবেশিত করা।

www.pathagar.com

ভিসিআর, স্যাটেলাইট, ডিশ কিংবা অন্যান্য তথ্যপ্রযুক্তির কোনো ভৌগলিক সীমানা বা সীমাবদ্ধতা নেই। এটি সহজেই মানুষের ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ছে এবং এ কারণেই অন্যান্য হাইটেক বঞ্চিত সংস্কৃতির তুলনায় পশ্চিমের সাংস্কৃতিক প্রভাব ও আধিপত্য হচ্ছে সুদূর প্রসারী। পৃথিবীর এমন কোনো প্রান্ত নেই যেখানে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব অনুভূত হচ্ছে না। এ প্রভাব কতখানি ভয়ঙ্কর, বিশেষত মুসলিম দেশগুলোর উপর পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব ও পরিণতি বুঝতে হলে প্রয়োজন পশ্চিমা সংস্কৃতির চরিত্র ও লক্ষণগুলো চিহ্নিত করা।

পশ্চিমা সভ্যতার সূতিকাগার হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, পশ্চিম ইউরোপ। এই সভ্যতার কমন ভাষা হিসেবে ইংরেজির অধিকার এখন সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ক্রমশ এটিই হয়ে উঠছে প্রধান আন্তর্জাতিক ভাষা। ভৌগলিকভাবে অস্ট্রেলিয়া ও ইসরাইলের মত অপশ্চিমা দেশ এবং জাপানীদের মত জনগণও এই সভ্যতার সাথে আত্মিকভাবে যুক্ত। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর সোভিয়েত রাশিয়াও এখন এই সভ্যতার দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো, যাদের রয়েছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, তারাও এ সভ্যতার চোরাবালিতে নিমজ্জিত হচ্ছে। কনজ্যুমারিজম হচ্ছে এ সভ্যতার মৌল বৈশিষ্ট্য। পুরো পশ্চিমী সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে পুঁজিবাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের উপর ভিত্তি করে। এই দর্শনে স্বাভাবিকভাবে নৈতিকতা কোনো গ্রাহ্য বস্তু নয়, আধ্যাত্মিকতার মূল্য নেই এখানে। টিভি, ভিসিআর, স্যাটেলাইট ইন্টারনেট, ফোন, ফ্যাক্স, মিডিয়া ওয়ার, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা কনজ্যুমারিজমের আগ্রাসী ও আধিপত্যমূলক মনোভাব প্রভৃতি অভিব্যক্তি এখন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ঘরে ঘরে স্যাটেলাইট টিভির দৌরাত্ম্য আজ আমাদের পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের ভয়ানক উপস্থিতি টের পাইয়ে দেয়।

বর্তমানে বিশ্বের বেশির ভাগ মুসলিম দেশই পাশ্চাত্য মিডিয়ার উপর নির্ভরশীল। এর দুটি কারণ- একটি হলো ভালো মানের বিনোদন এবং সংবাদ মাধ্যম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগে মুসলমানদের সদিচ্ছার অভাব এবং অন্যটি হলো স্থানীয় অনুষ্ঠানগুলোর নিম্নমান এবং তার ফলস্বরূপ কম জনপ্রিয়তা। ফলে আজকাল বেশিরভাগ সরকারই নিজেদের উপযুক্ত অনুষ্ঠানমালা তৈরি ও তার সম্প্রচারের চেয়ে প্যাকেজ অনুষ্ঠানমালা আমদানি করাকেই সহজ মনে করে (*Hamid Mowlana; Mass Media and Culture, Toward an Integrated Theory. p-57*)। পাশ্চাত্য সমাজের সাথে মুসলিম সমাজের মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ঐ সব কারণে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে পাশ্চাত্য মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য।

মজার ব্যাপার হলো পাশ্চাত্য মিডিয়া ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সম্পর্কে পাশ্চাত্য সমাজ অপেক্ষাও বেশি উদাসীন ও বিরূপ মনোভাবসম্পন্ন। পাশ্চাত্যের মিডিয়া কর্মীরা বেশিরভাগই সেকিউলার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন। আমেরিকার শতকরা ৫০ ভাগ মিডিয়া কর্মীর ধর্মের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই (*S. Abdullah Schleifer. 1986. Islam and Information: New Feasibility and Limitation of an Independent Islamic News Agency P-118*)।

মুসলিম দর্শকের মানসিকতার সাথে মেলে না এরকম অনেকগুলো মূল্যবোধ এসব বিদেশী অনুষ্ঠানে অত্যন্ত মোহনীয়ভাবে প্রচার করা হয়। যেখানে ইসলামের মূলধারায় মৌলিক আদর্শ হচ্ছে জীবনমুখী এবং ঐতিহ্যের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত সেখানে পাশ্চাত্যের দর্শন হচ্ছে উদারপন্থী (!) এবং তথাকথিত প্রগতিবাদী (*Suhaib Jamal al Barzinji; 1998.*

www.pathagar.com

Working Principles for An Islamic Model in Mass Media Communication)।
১৯৯১ সালে মালয়েশিয়ান টেলিভিশন কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে জানা যায় যে, আমদানীকৃত আমেরিকান অনুষ্ঠানমালা নিয়মিতভাবেই এমন সব বিষয় উপস্থাপন করে যা প্রকৃতিগতভাবেই স্থানীয় বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। এ ব্যাপারে কিছু উদাহরণ দিলে বিষয়টি হয়তো আরো স্পষ্ট হবে। *রেগস টু রিচেস* অনুষ্ঠানে যে সব বিষয় দেখানো হয় তার মধ্যে রয়েছে- বাচ্চারা বাবাকে নাম ধরে ডাকছে এবং পিতামাতার সাথে অহরহ তর্ক, ছেলে-মেয়ের সামনেই বাবা মায়ের অন্তরঙ্গতম সম্পর্ক, মেয়েদের পরনে দেখা যায় খুবই আঁটসাঁট জামা. উত্তেজক পোষাক। আরো ভয়ঙ্কর যা দেখানো হয় তা হলো বাবা মায়ের অবৈধ সম্পর্কের খাতিরে রাতেরবেলা লুকিয়ে ঘরের বাইরে যাওয়া ইত্যাদি। *ব্রনক্স জু*-তে দেখানো হয় স্কুলের শিক্ষকদের পরস্পরের মধ্যকার অবৈধ সম্পর্ক, জন্মনিয়ন্ত্রণের জিনিসপত্র বিনামূল্যে বিতরণের জন্য আন্দোলন, সমকামিতার অনুমোদন। সেখানে এই ধারণা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয় যে, ধর্মের সাথে প্রাত্যাহিক জীবন যাপনের কোনো সামঞ্জস্যতা নেই। আর দেখানো হয় যে, কিশোর-কিশোরীরা পরস্পরকে চুম্বন করছে এবং খোলামেলাভাবে সেক্স নিয়ে পরস্পরের সাথে আলাপ করছে। *২১ জাম্প স্ট্রীট*-এ দেখানো হয় মানুষ জন সব সময় চিউয়িং গাম খাচ্ছে। টিনএজারদের মাঝে মাদকাসক্তদের অবস্থা, পর্ণোগ্রাফির প্রলোভন দেখায় এমন সব দৃশ্য, পর্ণোগ্রাফিক সিনেমার চিত্রায়ন, একজন দলনেতার অধীনে একাধিক গ্যাংস্টারের ভ্রাতৃত্ব, ইচ্ছাকৃতভাবে ভায়োলেন্সের দৃশ্য, ইচ্ছাকৃতভাবে আইন আমান্য করা, পুলিশ কর্তৃপক্ষের বদনাম ও তাচ্ছিল্য করা ইত্যাদি। *ফ্যামেলি টাইস*-এ দেখানো হয়, বাবা মা বাচ্চাদের ডেটিংয়ে যেতে উৎসাহিত করছে এবং তাদের সন্তান ও তার বাগদত্তার মাঝে ভালোবাসার প্রকাশ পর্যন্ত অনুমোদন করছে। *ডিফারেন্ট স্ট্রোকস*-এ সন্তানরা তাদের পিতামাতার জন্য ডেট ঠিক করছে। *ডালাস* দেখাচ্ছে সব ক্ষেত্রে মদ, অ্যালকোহল ইত্যাদির ব্যবহার। এবং *এল এ ল*-তে দেখানো হয়, উকিল এবং মক্কেলদের অবৈধ সম্পর্ক। বিবাহিত বিচারকের এমনকি তাদের সৎ মায়ের অবৈধ যৌন সম্পর্ক (*Ranggasamy Karthigesu. 1991. US Television Programmes and Malaysian Audiences" P-105*)।
এছাড়া মুসলিম দেশের জনগণের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অন্যান্য হাতিয়ার হচ্ছে ভিস্যুয়াল সিম্বল–চিত্রকল্প, বিবৃতির স্টাইল, রূপক ইত্যাদি যা বিদেশী প্রোগ্রামের অনুকরণে নির্মিত দেশী অনুষ্ঠানগুলোতে দেখানো হয়। এই সমস্ত ধারণা হয়ত পাশ্চাত্যের দর্শকের জন্য উপযোগী, মুসলিম বিশ্বে প্রচারের জন্য এগুলো উপযোগী নয়। এগুলো মুসলমান দর্শকদের মাঝে নৈরাশ্যের জন্ম দেয়। এসবের ফলে স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক ধারণাগুলোর অবলুপ্তি ঘটে। এগুলো ধীরে ধীরে বিদেশী ধারণা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।
তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে পাশ্চত্যের শক্তিশালী মিডিয়ার প্রভাবের ফলে সৃষ্ট সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক ভি আর কৃষ্ননাইয়ার বলেছেন: "কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে শক্তিশালী মিডিয়া প্রায়ই ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাইকুনদের অপপ্রচারের হাতিয়ারে পরিণত হয়। বড় বড়, বিশেষ করে ভোগ্যপণ্য উৎপন্নকারী কোম্পানিগুলো বিশাল বাজেটের বিজ্ঞাপন করে থাকে, কারণ সেই দ্রব্যেরই গ্রাহক বেশি থাকে যা চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ভোক্তার সামনে তুলে ধরা হয়। যৌন আবেদন

www.pathagar.com

এবং অন্যান্য আকর্ষণকারী দ্রব্য বাজার দখল করার জন্য ব্যবহার করা হয়। আজকাল এই পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের যুগে বিভিন্ন কোম্পানির উদ্দেশ্যই হলো ব্যবসায়িক চাতুর্যের মাধ্যমে টাকাকে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ করা। ...বাস্তবিক অর্থে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে পাশ্চাত্যের ইচ্ছামত বলীদানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো তথ্যপ্রযুক্তিকে একটি ক্যাটালাইটিক কনভার্টারের মত ব্যবহার করে।"

টেলিভিশনের আসক্তিকর প্রভাব সম্পর্কে আরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভারতের সমাজবিজ্ঞানী দর্শন সিং। তার মতে: "অনুভূতি, মন এবং কল্পনার ক্ষতিসাধনের ক্ষেত্রে টেলিভিশনের সাথে অন্য কোনো মিডিয়া প্রতিযোগিতায় পারবে না। বিজ্ঞাপন চিত্রের সাথে নাড়ির বন্ধন সৃষ্টির হওয়ায় টেলিভিশনের বাণিজ্যিকরূপ একে বিভিন্ন কৌশলে মিথ্যা আকর্ষণের মাধ্যমে সাধারণ মন, বিশেষ করে শিশুদের মনকে আকর্ষণ করার যন্ত্রে পরিণত করেছে। টিভি শিশুদের জন্য একটি *ব্রেইন চকলেট*-এ পরিণত হতে পারে।"

পশ্চিমা নিউজ মিডিয়া হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সর্বাপেক্ষা বেশি জনপ্রিয় নিউজ মিডিয়া। এর কয়েকটি রূপ আছে যেমন *বিবিসি, সিএনএন, ফক্স নিউজ* এর মতো টিভি চ্যানেল, *বিবিসি* বা *ভয়েস অব আমেরিকার* মত রেডিও চ্যানেল এবং *রয়টার্স, এপি, এএফপি*'র মতো সংবাদ সংস্থা।

আমাদের মুসলমানদের প্রতি পাশ্চাত্য মিডিয়ার মনোভাব বোঝা দরকার। হামিদ আবদুল করিম তার প্রবন্ধ *দি হিপোক্রেসি অব ওয়েস্টার্ন মিডিয়াতে* লিখেছেন: "লন্ডন থেকে প্রকাশিত একটি খবরের কিছু অংশ দেখা যাক, 'একদল আমেরিকান উগ্রপন্থী হিজ ম্যাজেস্টির শান্তিরক্ষী বাহিনীকে আক্রমণ করে অনেক বৃটিশ সৈন্যকে হত্যা করেছে। সাম্প্রতিকতম এই সন্ত্রাসী হামলার খবরে প্রধানমন্ত্রী সব ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এবং মহামান্য রাজাকে এই বলে আশ্বস্ত করেছেন যতদিন পর্যন্ত না আমেরিকান সন্ত্রাসীরা তাদের দুষ্কর্ম বন্ধ করে আত্মসমর্পণ করছে ততদিন তিনি শান্তিতে বিশ্রাম নেবেন না।'- এই খবর একটু অদ্ভুত শোনাতে পারে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী প্রভু বৃটেনের বিরুদ্ধে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে হোয়াইট হল থেকে এরকম খবরই পরিবেশন করা হত। স্বাভাবিকভাবেই এ খবর শুনে সেই সময়ের আমেরিকাবাসীরা হেসেছিল। কিন্তু আজকে তারা হুবহু একই ধাঁচে *ইসলামী সন্ত্রাসবাদ* এবং *মুসলিম চরমপন্থী* নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে এবং বিশ্বকে তা বিশ্বাসও করাতে চাচ্ছে।"

উদাহারণ হিসেবে *সিএনএন* এর জেইন ভার্গির কথাই ধরা যাক। তিনি বলেছেন, ইসরাইলের ৭০ শতাংশ জনগণ ফিলিস্তিনে অ্যারিয়েল শ্যারনের গণহত্যাকে সমর্থন করে। কিন্তু প্রচার মাধ্যমে *ইসলামী সন্ত্রাসবাদ, হুমকির মুখে ইসরাইলের অস্তিত্ব* ইত্যাদি যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয় তাতে পরিসংখ্যান যে ১০০% আসেনি সেটাই ভাগ্য। ইসরাইল ইস্যুতে পশ্চিমা মিডিয়ার যে প্রোপাগান্ডা তা হিটলারের প্রচার সম্পাদক গোয়েবলস দেখলেও লজ্জা পেতেন। এ ব্যাপারে কিছু উদাহরণ দেয়া প্রয়োজন।

৮ মার্চ ২০০২ তারিখে *সিএনএন* এর ওয়েবসাইটে একটি ফটোগ্রাফ প্রদর্শিত হয় যেখানে দেখানো হয় "একজন ইসরাইলী সৈন্য ভারী মেশিনগান হাতে নিয়ে একটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং ইসরাইলী বুলডোজার বাড়িটি ভাঙছে। এই ঘটনাটিকে প্যালেষ্টাইনী 'সন্ত্রাসী' হামলার রিরুদ্ধে ইসরাইলী প্রতিবিধান হিসেবে দেখানো হয়। অথচ একই ঘটনা

www.pathagar.com

নিয়ে আইসল্যান্ডের একটি পত্রিকায় যে ছবি প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায় যে, একজন অসহায় প্যালেস্টাইনী মহিলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে এবং তারই চোখের সামনে তার ঘরটি ভাঙা হচ্ছে। এভাবে পাশ্চাত্য মিডিয়া প্যালেস্টাইনীদের মানবিক বিপর্যয়ের দিকগুলো লুকিয়ে ফেলছে (*www.witness-pioneer.org*)।

৩ জুলাই ২০০২ তারিখে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার *চ্যানেল ১৩ (ইউপিএন)*-এ ফিলিস্তিনিদের আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীদের উপর একটি পক্ষপাতমূলক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত অনুসন্ধানী প্রোগ্রাম প্রচারিত হয়। ১৫-২০ মিনিটের এই অনুষ্ঠানে দেখানো হয় ফিলিস্তিনি যুবকরা আল্লাহর নামে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছে। ওই অনুষ্ঠানে আরও দেখানো হয় যে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীর পরিবার তাকে শহীদ মনে করে এবং তাদের ছেলে মেয়েরাও তাদেরই মতো "শহীদ" হতে ইচ্ছুক। এই অনুষ্ঠানে ইসলামকে খুবই কদর্যরূপে উপস্থাপন করা হয় এবং দেখানো হয় যে, ইসলামী শিক্ষাই এসব মানুষকে বোমা হামলা করতে উদ্বুদ্ধ করছে। এই অনুষ্ঠানে ফিলিস্তিনিদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে অথচ তারা যে কতটা নির্যাতিত তা মোটেও বলা হয়নি। এমনকি ইহুদীদের আগ্রাসী মনোভাব এবং তাদের হাতে নিহত মুসলমানদের কোনো কথাই বলা হয়নি। (*www.dahuk.org*)

গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ইয়াসির আরাফাতকে পাশ্চাত্য মিডিয়া একজন সন্ত্রাসী হিসেবে উপস্থাপন করে, কারণ যুদ্ধপরাধী ও গণহত্যাকারী শ্যারন তাই বলে। যখনই শ্যারন কিছু বলে বুশ, ব্লেয়ার এবং পাওয়েল সাথে সাথে হাত তুলে বলে "ইয়েস স্যার" এবং ওয়েস্টার্ন মিডিয়াও তাদের কথায় সুর মেলায়। এছাড়াও পাশ্চাত্য মিডিয়া "অধিকৃত ফিলিস্তিন" যাকে তারা এখন অধিকৃত এলাকা আখ্যায়িত করে, তার ছবি আগের চেয়ে বেশি দেখায়। যখন প্রকৃত ঘটনার উপর কোনো প্রতিবেদন আসে তখনই দেখা যায় কোনো 'বিশেষজ্ঞ' বসে বসে ইসরাইলীদের গণহত্যাকে বৈধতা দিচ্ছে এবং ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিনিদের উপর চাপিয়ে দেয়া দুঃখ দুর্দশাকে 'কিছুই নয়' হিসেবে প্রমাণ করতে সচেষ্ট। যখন আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের মতো বিপর্যয় তাদের চোখের সামনে ফিলিস্তিনে ঘটে তখন ওয়েষ্টার্ন মিডিয়ার মুখ্য খবর হয়ে দাঁড়ায় "জার্মানীর চ্যান্সেলর গেরহার্ড শ্রোয়েডার তার চুলে কলপ লাগান নাকি লাগান না।" [*The Hypocrisy of Western Media By Hamid Abdul Karim, http://groups.yahoo.com/ group/discuss-Islam*]

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকাতে বিমান হামলার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে আমেরিকা আফগানিস্তানে বোমা হামলা করে। ওয়েষ্টার্ন মিডিয়া এ ব্যাপারে যা করে তা হলো এ ঘটনার পর কোনো রকম প্রমাণ ছাড়াই, কেবলমাত্র মিডিয়া প্রোপাগান্ডার জোরে ওসামা বিন লাদেনকে সকল অপকর্মের মূল হোতা বানায়। সকল আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের নিরীহ জনগণের উপর আধুনিক ভয়াবহতম অস্ত্রসজ্জা নিয়ে হিংস্র কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আমেরিকা কিভাবে ওসামা বিন লাদেনকে আফগানিস্তানের ঘটনার মূল হোতা প্রমাণ করল? ১১ সেপ্টেম্বরের পরপরই ওসামা বিন লাদেনের একটি ভিডিও বক্তৃতার অনুবাদ হোয়াইট হাউজ থেকে প্রচার করা হয় এবং জর্জ ডব্লিউ বুশ এটাকে 'অন্যায়ের স্বীকারোক্তি' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু ২০ ডিসেম্বর ২০০১ জার্মান টিভি চ্যানেল *ডাস এরস্টে*

www.pathagar.com

(চ্যানেল ওয়ান) ওসামা বিন লাদেনের ভাষণের 'হোয়াইট হাউস অনুবাদের' উপর একটি বিশ্লেষণধর্মী অনুষ্ঠান প্রচার করে। *মনিটর* নামে ঐ অনুষ্ঠানে দু'জন আলাদা অনুবাদক এবং প্রাচ্য ভাষায় বিশেষজ্ঞ একজন ব্যক্তি এই মতামত দেন যে, হোয়াইট হাউজের অনুবাদ কেবলমাত্র 'ভুল' তাই নয় সেটাতে ইউএসএ নিজেদের ইচ্ছামত বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করেছে। দু'জন অনুবাদকের অন্যতম আরবী ভাষাবিদ ডক্টর আবদুল আল এম হাসানী বলেন যে, "আমি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পেন্টাগনের অনুবাদ পরীক্ষা করে দেখেছি। এতে অনেক সমস্যা রয়েছে। অনুবাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যেখানে ওসামা বিন লাদেনের স্বীকারোক্তির কথা বলা হয়েছে তা মূল আরবির সাথে মেলে না।" হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়া-আফ্রিকা ইনস্টিটিউটের ইসলাম ও আরবি বিভাগের প্রফেসার গেরনট রোটার বলেছেন যে আমেরিকান অনুবাদক, যারা মূল আরবি টেপটি শুনেছে এবং সেটা থেকে অনুবাদ করেছে, তারা তাতে এমন অনেক কথা অন্তর্ভুক্ত করেছে যা তারা শুনতে চায় কিন্তু যতবারই বাজানো হোক না কেন মূল আরবি ভাষণে তা পাওয়া যাবে না।" [*www.spiegel.de/politik/aysland/01518 174025 00.html*]

পরবর্তীতে ২০ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে *ইউএসএ টুডে* পত্রিকা থেকে জানা যায়, কেন উক্ত অনুবাদ ভুল ছিল। মাইকেল, যিনি মূলত একজন লেবানিজ আরেকজন মিশরীয় কাশেম ওয়াহবাকে নিয়ে টেপটি অনুবাদ করেন। এই দুইজন ওসামা বিন লাদেনের সৌদি আরবীয় আরবি নিয়ে সমস্যায় পড়ে যান। (জার্মান চ্যানেল ওয়ান এ প্রচারিত মনিটর অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য *www.wdr.dle/tv.monitor/real. html?d=379*) আর এর ফলে আমেরিকা ও পুরো পাশ্চাত্য জুড়ে শুরু হয় গেছে দলমত নির্বিশেষে মুসলমানদের উপর নির্যাতন। এই বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায় এডওয়ার্ড সাঈদের লেখা থেকে- "আমি এমন একজন আরব অথবা মুসলমানকে জানি না যিনি এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রে নিজেকে শত্রু শিবিরের সদস্য হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন না। মুসলমানরা পরিকল্পিত বিদ্বেষের শিকার হচ্ছে এবং তাদের সঙ্গে শত্রুতামূলক আচরণ করা হচ্ছে। মাঝে মাঝে সরকারি পর্যায়ে বিবৃতিতে দাবি করা হয়, ইসলাম ও মুসলমানরা যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু নয়। তবে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন কথাই বলছে। শত শত আরব তরুণকে আটক করা হয়েছে এবং ফেডারেল গোয়েন্দা সংস্থা (*এফবিআই*) তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। মুসলিম অথবা আরবীয় নাম হলে রক্ষা নেই। এমন নামের লোক বিমানবন্দরে উপস্থিত হলেই তার প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয় এবং তাকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জামা কাপড় খুলেও পরীক্ষা করা হয়। এমনকি মহিলাদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই।"

জনৈক আমেরিকান মুসলিম মহিলা এক সাক্ষাৎকারে ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ এর পর পরবর্তী একটি সপ্তাহ তার কিভাবে কাটে তা বর্ণনা করেন। এতে নানা ধরনের নিগ্রহের চিত্র ভেসে ওঠে। প্রথমেই তার মনে যে ভয়টি জাগে সেটি হল তার বাড়ির উপর আক্রমণ। এই ভয়ে ওই মহিলার স্বামী সারারাত বন্দুক হাতে বাড়ি পাহারা দিতে বাধ্য হন। কিছু গুন্ডা প্রকৃতির লোক তাদের বাড়ি আক্রমণ করার পর উক্ত মহিলার স্বামী তাদেরকে বন্দুক দিয়ে স্রেফ ভয় দেখিয়ে আত্মরক্ষা করলে তাদের বাড়িতে পুলিশ আসে এবং পুলিশের এই আগমন ছিল তাদেরকে রক্ষা করার জন্য নয় বরং ব্যবহৃত বন্দুকটির বৈধ লাইসেন্স আছে কিনা সেটা দেখার জন্য। পুলিশ অফিসার মুসলিম পরিবারটির নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা

www.pathagar.com

তো নিলই না উপরন্তু গৃহস্বামীকে আর বন্দুক প্রদর্শন না করার 'পরামর্শমূলক আদেশ দেয়। এছাড়া মহিলা যেখানে চাকুরি করতেন সেখানেও বঞ্চনার শিকার হন। কেবলমাত্র মুসলিম হবার অপরাধে দিনের ব্যবধানে তিনি সবার অপরিচিতা হয়ে যান। এমনকি তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাকে কোনো যৌক্তিক কারণ না দেখিয়েই অফিসে আসতে নিষেধ করেন। এছাড়াও অফিসে যাতায়াতের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি রাস্তার অন্যান্য ড্রাইভার কর্তৃক টিটকারীর শিকার হন শুধুমাত্র তার হিজাবের কারণে। এমনকি উক্ত মুসলিম মহিলার খৃস্টান সহকর্মী তাকে হিজাব খুলে ফেলতে বলে। আরব ও মুসলমানদের প্রতি বৈষ্যম্যের এমন ভুরি ভুরি ঘটনা রয়েছে। কেউ আরবীতে কথা বললে অথবা আরবিতে লেখা কোনো কাগজপত্র পাঠ করলে তার প্রতি কটাক্ষ করা হয়। প্রচার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ, ইসলাম ও আরবদের ব্যাপারে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার জন্য বহু বিশেষজ্ঞ ও ভাষ্যকার নিয়োগ করা হয়েছে। এদের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দই ইসলামের প্রতি বৈরিতায় পরিপূর্ণ। এতটা করুণ ও দুর্বিসহ যখন আমেরিকান মুসলমানদের অবস্থা তখন *হলিউড ১১ সেপ্টেম্বর* নামে লেখক, প্রযোজক ও চলচ্চিত্র কর্মীদের একটি দল আমেরিকার একজন জাতীয় ব্যক্তিত্ব ও ভিয়েতনাম যুদ্ধের ট্রাজিক হিরো বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলীকে এক মিনিটের একটি বক্তব্য দেয়ার জন্য রাজি করায় যাতে আলী বলবেন যে, আমেরিকান মুসলমানরা শান্তিতে বসবাস করছে। আমেরিকানদের হাতে মিডিয়ার পূর্ণ শক্তি থাকায় তারা মোহাম্মদ আলীর এই বক্তব্যকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবে। অমুসলিম দেশে এই খবরের ফলাফল হবে, মুসলমানরা তাদের প্রাপ্য সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হবে এবং আরব বিশ্বে ফলাফল হবে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের প্রাপ্য ঘৃণা থেকে বঞ্চিত হবে।

প্রচার মাধ্যম আফগানিস্তানে তথাকথিত সন্ত্রাস বিরোধী লড়াইয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে ওঠে এবং কেবলমাত্র শক্তিশালী মিডিয়ার সাহায্যেই আমেরিকা সকল প্রকার আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে আফগানিস্তান আক্রমণ এবং সেখানে বিপুল বেসামরিক মানুষ হত্যাকে আইনসম্মত করে নিয়েছে। আফগানিস্তান আক্রমণের আগে থেকেই আমেরিকা সরকার এমন এক Intellegence wing-এর জন্ম দেয় যাদের কাজ হয় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে আফগানিস্তান সম্পর্কে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করা। এ সম্পর্কে www.fair.org ওয়েবসাইটে Pentagon Propaganda Plan is Undemocratic, Possibly Illegal নামে একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ পায়। ১৯ ফেব্রুয়ারির ২০০২ *দি নিউ ইয়র্ক টাইমস* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, Pentagon's Office of Strategic Influence (OSI) is developing plans to provide news items, possibly even false ones to foreign media organization in an effort to influence public sentiment and policy makers in both friendly and unfriendly countries.

আমেরিকা যখন ১১ সেপ্টেম্বরের পর চেচনিয়ার খুনি ভ্লাদিমির পুতিন, লেবানন গণহত্যা '৮২-এর নায়ক এরিয়েল শ্যারনকে সঙ্গে নিয়ে আফগানিস্তানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন আমেরিকান মিডিয়া তাদের স্তুতিকারীতে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে উদাহরণ দিতে গিয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের কথা বলা যায়, যেখানে কাবুলের লক্ষ্যবস্তু সংকট দেখে আমেরিকার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফিল্ড এক পর্যায়ে অধৈর্য হয়ে বলে ফেলেন, "প্রথম আমরা পুরনো লক্ষ্যবস্তুতে পুনরায় আঘাত করতে যাচ্ছি এবং আমাদের লক্ষ্যবস্তু শেষ হয়ে যায়নি। আফগানিস্তান যথেষ্ট বড় দেশ ..." ইত্যাদি। তার এই দানবসুলভ কথা

www.pathagar.com

শুনে আমেরিকান প্রেস আনন্দিত হয় এবং তার দৃঢ়তার ভূয়সী প্রশংসা করে। কিন্তু মৃতের সংখ্যা কেউ গণনা না করলেও প্রতিদিন আফগানিস্তানে নিরীহ মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। পেন্টাগন প্রতিজ্ঞা করেছিল যে তারা SMART বোমা ব্যবহার করবে এবং বেসামরিক গণহত্যা এড়িয়ে চলবে। কিন্তু বাস্তবে তারা ৬০০টি গুচ্ছ বোমা ব্যবহার করে যার প্রতিটিতে ২০০ টি করে বোমা থাকে এবং যেগুলো নোংরা তাঁবুর নিচে মাটিতে শুয়ে থাকা বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্ম দেয়। নিরীহ বেসামরিক হতাহত সংখ্যা কমিয়ে প্রদর্শন করার পেন্টাগনের পরামর্শ মার্কিন মিডিয়া অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। *ফক্স নিউজ* এর একজন "বিশেষজ্ঞ" মাইকেল ব্যারন মন্তব্য করেন "এটা কোনো সমস্যা নয়। বেসামরিক লোক নিহত হওয়াটা কোনো খবর নয়। মূল কথা হচ্ছে তারা যুদ্ধে মারা গিয়েছে।" এই যুদ্ধে আমেরিকা আরেকটি কাজ করেছে, তা হলো আফগান গণহত্যার একমাত্র সঠিক সংবাদদাতা *আল-জাজিরার* কাবুল স্টুডিওর উপর বোমাবর্ষণ। অথচ আমেরিকা আফগান জনগণের তালেবান শাসকদের হাত থেকে মুক্তির প্রতীক হিসেবে দেখাচ্ছে যে তারা টিভি দেখতে পারছে। *আল-জাজিরা* স্টুডিওতে বোমা বর্ষণের পর আফগানিস্তানের মানুষের হয় *সিএনএন*, নয় তো *ফক্স চ্যানেলের* উপর নির্ভর করতে হবে। পরে পেন্টাগন দাবি করে, একটি মিসাইল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে *আল-জাজিরা* স্টুডিওর উপর আঘাত হানে, যেমন ভাবে ১৯৯৯ সালে আরেকটি মিসাইল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সার্বিয়ান টিভি ভবনকে ধ্বংস করে দেয়!
বেসামরিক গণহত্যা কিভাবে কমিয়ে রাখা হয়েছিল সে প্রসঙ্গে রিচার্ড নেভিল (*www.richardneville.com*) রচিত *বেয়ন্ড গুড অ্যাণ্ড ইভিল* নামক নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে- "লাগাতার তিন মাস আফগানিস্তানে বোমাবর্ষণের পর সেখানকার বেসামরিক মৃত্যু সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, পরে নিউ হ্যাম্পসায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রফেসার মার্ক হেরেল্ডকে এই দায়িত্ব দেয়া হয়। তার রিপোর্ট অনুযায়ী বেসামরিক হত্যার সংখ্যা ৩৭০০ এবং সর্বোচ্চ হলে ৫০০০। তার এই রিপোর্ট ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ ও একচোখা। এতে গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে ১০ ডিসেম্বর সময়টুকুতে যারা সরাসরি বোমা হামলার নিহত হয়েছে কেবলমাত্র তাদের সংখ্যাই উল্লেখ করা হয়েছে অথচ যারা আহত হয়েছে এবং আঘাতের ফলে নিশ্চিতভাবে মৃত্যুপথযাত্রী তাদের কথা মোটেও উল্লেখ করা হয়নি। অথচ এমনই একটা অসত্য রিপোর্ট কেবলমাত্র মিডিয়ার জোরে ইউরোপ এবং আমেরিকায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়। মধ্য ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি ঝাওয়ার কিলি গ্রামের তিন ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য মিসাইল হামলা করা হয় কেবল মাত্র এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে যে, তাদের মধ্যে একজন লোক লম্বা এবং সে ওসামা বিন লাদেন হতে পারেন। এতো বিপুল বেসামরিক লোক হতাহত হয়। অথচ *ওয়াশিংটন পোস্ট* পত্রিকার একজন রিপোর্টার সেখানকার অবস্থার উপর রিপোর্ট করতে গেলে আমেরিকান সৈন্যরা তাকে বন্দুকের মুখে ফিরিয়ে দেয়। এভাবে আফগানদের দুঃখ-দুর্দশাকে জনসমক্ষে আসতে না দিয়ে আমেরিকা তাদের এই গণহত্যাকে বৈধতা দিতে চেষ্টা করে। [*www.theage.com.acc/articels/2002/04/15/1018 333477336.html*]
এসবের সাথে আরও যা ঘটেছে তা হল পাশ্চাত্য মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম ও রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে বিরূপ একটা ধারণা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে উদাহরণ দেয়া যাক- গত ৬ মে *বিবিসি নিউজ* এর একটি অনুষ্ঠানে শ্যারন সাদেহ নামে Ha'aret's

www.pathagar.com

Correspondent তার বক্তব্যে ইসলাম ও রাসূল (সাঃ)-কে প্রত্যক্ষভাবে অপমান করেন। তার আলোচনায় তিনি ইসরাইলের সাথে ইয়াসির আরাফাতের স্বাক্ষরিত চুক্তিকে কুরাইশদের সাথে রাসূল (সাঃ) এর চুক্তির তুলনা করেন। এটাও বলেন যে, রাসূল (সাঃ) কুরাইশদের সাথে একটি শান্তিচুক্তি করার পর নিজে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে কুরাইশদের আক্রমণ করেন, অর্থাৎ তিনি (নাউজুবিল্লাহ) কথার বরখেলাপ করেন (যেটা স্রেফ মিথ্যা)। আর উক্ত আলোচকের কথা হল ইয়াসির আরাফাতও একই কাজ করেছে অর্থাৎ নির্দোষ (!!) ইসরাইলীদের উপর আক্রমণ করছে। এটা কেবল ইয়াসির আরাফাত নয় বরং রাসূল (সাঃ) এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামকে অপমান করা। ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী প্রচারণার ঘৃণ্যতম নজির স্থাপন করেছে মার্কিন টিভি নেটওয়ার্ক *ফক্স নিউজ*। ফক্স নিউজের ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০২ তারিখে প্রচারিত *হেনিটি এন্ড কলমিস* প্রোগ্রামে ইসলাম ও মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে কুৎসা রটানোর জন্য ধর্মযাজক প্যাট রবার্টসনকে অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হয়। মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে রবার্টসন বলেন, "এই লোকটি একজন খাঁটি বুনো দৃষ্টির ফ্যানাটিক। সে ছিল একজন ডাকাত ও দস্যু ।" অনুষ্ঠানের হোস্ট সিয়ান হেনেটি উপরোক্ত বক্তব্যের প্রতিবাদ না করে বরং বলেন, "রেভারেন্ড এই ব্যাখ্যা কতটা ছড়িয়েছে বলে আপনি মনে করেন? এটাই মূলধারা বলে কি আপনি মনে করেন? অথবা, আপনি কি মনে করেন বেশিরভাগ মুসলমান এ পথের অনুসারী?" রবার্টসন ইসলামকে একটি 'স্মারক কেলেংকারি' হিসেবে অভিহিত করেন। এর জবাবে হেনিটি বলেন, "মানুষ প্রকাশ্যে যা বলতে চায়, ইসলাম যেহেতু তার চেয়েও বড় হুমকি, তাই আপনি কি মনে করেন বিশ্বে কোনো সংঘাত অথবা যুদ্ধ অনিবার্য?" প্রোগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়ে রবার্টসন বলেন, "কোরআন পুরোটাই যীশু খৃস্টের ধর্মতত্ত্বকে চুরি করে বানানো হয়েছে। আমি বলতে চাই, এই লোক (মুহাম্মদ সাঃ) ছিলেন একজন হত্যাকারী এবং মনে করি, কথিত এই শান্তির ধর্মটি জোচ্চুরিতে পূর্ণ।"

এভাবে কেবলমাত্র শক্তিশালী মিডিয়ার বদৌলতে মুসলিম বিরোধী পাশ্চাত্য শক্তি ন্যায়কে অন্যায় বানাতে পারছে বিনা বাধায়। চালু রাখতে পারছে তাদের আগ্রাসন। অপরদিকে মুসলমানরা যতই ন্যায়ের পথে থাকুক না কেন, যতই নির্যাতিত হোক না কেন তাদের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র মানুষ দেখতেই পায় না। ইসরাইলের প্রতিটি আত্মঘাতী বোমা হামলার পর দেখা যায় সংবাদ মাধ্যমে এবং টেলিভিশনে আক্রান্ত ইসরাইলী মা ও শিশুরা তাদের দুর্দশার কথা বর্ণনা করছে অথচ ফিলিস্তিনি শিশুদের দুরবস্থা কখনোই *সিএনএন* বা *ফক্স নিউজ*-এ দেখা যায় না। অথচ গত ৫০ বছর ধরে ফিলিস্তিনি শিশুরা কেবলমাত্র পাথর দিয়ে ইসরাইলী ট্যাংক এর মোকাবিলা করে যাচ্ছে এবং চরমতম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এভাবে মুসলমানরা কোনো প্রকারে সহানুভূতি ছাড়াই কেবলমাত্র মুসলমান হবার জন্য মৃত্যুবরণ করছে। মুসলমানরাও নিজস্ব কোনো শক্তিশালী মিডিয়ার অভাবে এই অবস্থা হতে পরিত্রাণ পাচ্ছে না।

মুহাম্মদ : দি বায়োগ্রাফি অব এ প্রোফেট বইয়ের লেখিকা ক্যারান আর্মস্ট্রং তার *দি ফিল অব রিলিজিয়ন* প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন: "মুসলমানদের মিডিয়াকে ব্যবহার করা উচিত। ইহুদীদের মতো মুসলমানদের লবিং করতে জানতে হবে এবং তাদের একটি মুসলিম লবির সৃষ্টি করতে হবে। আপনি যদি চান এটাকে জিহাদ বলতে পারেন। এটা এমন এক প্রচেষ্টা, এমন এক সংগ্রাম - যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনি মিডিয়াকে পরিবর্তন করতে চান তাহলে মানুষকে আপনার বুঝাতে হবে, ইসলাম রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক

www.pathagar.com

দিক দিয়েও একটি শক্তি। কিভাবে মিডিয়াকে ব্যবহার করতে হবে এবং মিডিয়াতে নিজেদের কিভাবে উপস্থাপন করতে হয় তা মুসলমানদের জানতে হবে।" [*www.ahram.org.eg/weekly*]

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে ভারতের মতো প্রতিবেশী থাকায় বাংলাদেশের টেলিভিশন এবং ডিশ কালচার কিছু অতিরিক্ত আলোচনার দাবিদার। বাংলাদেশের মানুষ স্যাটেলাইটের সুবিধা নিয়ে মূলত বিভিন্ন ভারতীয় চ্যানেলগুলোই দেখে থাকে। বাংলাদেশে ডিশ কালচারের ব্যাপক প্রসার শুরু হয় নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে। প্রথম দিকে ভারতীয় চ্যানেলগুলোর প্রাধান্য থাকলেও পরবর্তী হংকং ভিত্তিক স্টার গ্রুপের চ্যানেলগুলো যুক্ত হয়। বাংলাদেশে এসব চ্যানেলের জনপ্রিয়তা এতটা বেশি যে দেশীয় চ্যানেলগুলো আজকাল মানুষ দেখে না বললেই চলে। এর কারণ হিসেবে রয়েছে দেশীয় চ্যানেলগুলোর তুলনামূলক নিম্নমানের অনুষ্ঠান এবং কেবল অপারেটরদের মাধ্যমে সেসব চ্যানেলের সহজপ্রাপ্যতা।

বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর উপর এই ধরনের অনুষ্ঠানের প্রভাব ধীরে ধীরে বাড়ছে। আর উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সন্তানরা জন্মায়ই মিকি মাউসের ছবি সুশোভিত গৃহে। এখানকার মধ্যবিত্ত ধীমান বুদ্ধিজীবীরা তাদের সমাজের উপর পশ্চিমা প্রভাবের যতই সমালোচনা করুন না কেন, বর্তমানে আমাদের সন্তানরা ঠিকই জিন্‌স পরিধান করছে, বেসবল ক্যাপ মাথায় তুলে নিচ্ছে। তাদের হাতে শোভা পাচ্ছে কোকের বোতল আর তারা টেলিভিশনে AXN, Star Movies, কিংবা HBO দেখছে। তাদের যুক্তি হচ্ছে HBO বা AXN তো কোনো অশ্লীল কিছু দেখাচ্ছে না - যা মোটেও সত্য নয়। অনেক চ্যানেল হয়ত আপত্তিকর কিছু দেখায় না কিন্তু তারা এমন অনেক কিছু দেখায় যা আমাদের সংস্কৃতির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। বিভিন্ন বিদেশী চ্যানেল থেকেই বয় ফ্রেন্ড-গার্ল ফ্রেন্ড, ডেটিং ইত্যাদি অনৈতিক ধারণা আমাদের সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। আমাদের সমাজে অপ্রচলিত ও অননুমোদিত এ বিষয়গুলো ছেলেমেয়েরা যখন তাদের বাবা-মায়ের সাথে বসে একসাথে দেখছে তখন তাদের মনে এই চিন্তাই আসে যে যেহেতু তাদের বাবা-মা এগুলো দেখতে বারণ করছেন না সেহেতু এগুলো অনুসরণ করলে সেটাও তাদের বাবা-মা অনুমোদন করবেন। এর ফলে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। প্রথমত যেসব পরিবারে পিতামাতা এসব বিষয় অনুমোদন করছেন, সেসব পরিবারের সন্তানরা পুরোপুরি পশ্চিমা সংস্কৃতি ও সভ্যতার অনুসারী হয়ে উচ্ছন্নে যাচ্ছে। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত পরিবারে দেখা যায় সামাজিক প্রভাবের কারণে এসব ডেটিং বা ফ্রি মিক্সিং বাবা-মা অনুমোদন করছে না বলে সন্তান ও পিতামাতার মধ্যে গ্যাপ সৃষ্টি হচ্ছে।

আজকাল বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করাটা একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। কিছুদিন আগে দেশের মেধাবী ছাত্রদের স্বনামধন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নবীন ছাত্রদের বরণ করে নেয়ার জন্য সিনিয়ররা একটি কোরিওগ্রাফির আয়োজন করে, যাতে দেখা যায় মঙ্গলপ্রদীপ হাতে দশ/বারটি অর্ধউলঙ্গ ছেলের রবীন্দ্রনাথের "আনন্দলোকে, মঙ্গলালোকে" গানের সাথে অন্ধকারের মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি। এই দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছিল এ যেন কোনো দেবীর আরাধনা হচ্ছে। অথচ অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ ছাত্রই ছিল মুসলমান। উল্লেখ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে অগ্নি একজন দেবতা। হিন্দুদের বিশ্বাস অনুষ্ঠানের শুরুতে অগ্নিরূপী মঙ্গলপ্রদীপ যে কোনো অনুষ্ঠানের সার্থক সমাপনীতে সহায়তা করবে।

www.pathagar.com

অংশগ্রহণকারী মুসলমান ছেলেদের মনে একবারও এই চিন্তা আসেনি যে তারা কি করছে এবং যা করছে তা কি প্রকাশ করে। ভারতীয় চ্যানেল এবং হিন্দী সিনেমাগুলোতে মঙ্গলপ্রদীপ দেখতে দেখতে তাদের এমন অবস্থা হয়েছে. এটা মনেও আসে না যে, তারা বিজাতীয় সংস্কৃতির দাস হয়ে যাচ্ছে। ডিস চ্যানেলের মাধ্যমে থার্টিফাস্ট নাইট ও ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র মতো অপসংস্কৃতি আমাদের যুব সমাজকে বিপথগামী করছে। বিশেষ করে ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কো-এডুকেশান কলেজগুলোতে এমন কালচার সৃষ্টি হয়েছে যে প্রেমিক তরুণ তরুণীদের নানা ধরনের উপহার দিয়ে তাদের বন্ধুরা অভিনন্দন জানায় এবং রীতিমত উৎসবের আয়োজন করে। যেখানে ইসলাম ধর্মে অবিবাহিত ছেলেমেয়ের ফ্রি মিক্সিং নিরুৎসাহিত করা হয়েছে সেখানে ঐসব চ্যানেলের প্রভাবে দেশে ঠিক এর উল্টোটা হচ্ছে।

বর্তমানে আমাদের দেশে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, যার মধ্যে রয়েছে আশংকাজনক হারে খুন, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, বিবাহ বিচ্ছেদ, স্বামী-স্ত্রীতে দ্বন্দ্ব ইত্যাদি। ধর্ষণ ও এসিড নিক্ষেপের অন্যতম প্রধান কারণ প্রেমে ব্যর্থতা। স্যাটেলাইট চ্যানেলে যেসব সিনেমা দেখানো হয় মোটামুটিভাবে তার একমাত্র উপজীব্য বিষয় হচ্ছে প্রেম। ভারতের জনপ্রিয় সিনেমাগুলোর মূলমন্ত্র একটাই, আর তা হল প্রেমই জীবনের সব। এসব সিনেমায় দেখানো হয় - প্রেম করতেই হবে, জীবনে প্রেম ছাড়া কিছু নেই ইত্যাদি। আবার সিনেমায় এমন ঘটনা দেখানো হয় যেখানে প্রেমের জন্য মেয়ে বাবা মায়ের অবাধ্য হয়ে প্রেমিকের হাত ধরে ঘর ছাড়ছে, যা এদেশের কিশোর কিশোরীদের উৎসাহিত করে। এসব সিনেমা আমাদের দেশীয় সিনেমার উপরও প্রভাব বিস্তার করেছে। এসব সিনেমা একধরনের উন্মত্ততা সৃষ্টি করে যার ফলে তরুণ-তরুণীদের মাঝে, বিশেষ করে তরুণ যুবকরা 'আওয়ারা আশিক দিওয়ানা' হতে চায়। কিন্তু প্রেম নিবেদন করে যখন প্রত্যাখ্যাত হয় তখনই ঘটে ধর্ষণ এবং এসিড নিক্ষেপের মতো দুঃখজনক ঘটনা।

এছাড়া ভারতীয় চ্যানেলে যেসব নাটক দেখানো হয় তার বেশিরভাগের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের সংঘাত, বিবাহ বিচ্ছেদ কিংবা শাশুড়ি-বউয়ের পারিবারিক দ্বন্দ্ব। আবার অনেক ক্ষেত্রে সন্তান ও পিতামাতার মাঝে জেনারেশান গ্যাপ। এই সব নেতিবাচক ঘটনার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব এদেশের সমাজে ধীরে ধীরে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আমাদের শিশুদের উপর এসব চ্যানেলের প্রভাব আরও ভয়াবহ। *সনি এনটারটেইনমেন্ট* টিভিতে শিশুদের জন্য একটি প্রোগ্রাম *বুগি উগি* প্রচারিত হয়, যেখানে ছোট ছোট বাচ্চারা জনপ্রিয় হিন্দি গানের সাথে সিনেমার নায়ক নায়িকাদের মতো নাচানাচি করে থাকে। এর প্রভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ছোট ছোট শিশুরা হিন্দি সিনেমার জনপ্রিয় গানের সাথে অত্যন্ত উগ্র ও স্বল্প বসনে সজ্জিত হয়ে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে নৃত্য পরিবেশন করে, যা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। *নতুন কুঁড়ি*-র মতো অনুষ্ঠান এখন আর শিশুদের কাছে ততটা জনপ্রিয় নয় যতটা *বুগি উগি* কিংবা *ডিজনি আওয়ার*।

অধিকন্তু মারদাঙ্গা সিনেমা এবং সেক্স-ভায়োলেন্সের ছাড়াছড়ি থাকে এসব চ্যানেলের অনুষ্ঠানে। যার ফলে কোমলমতি ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকে দেখতে দেখতে নিজেদের সেরকম একজন ভাবতে শুরু করে।

ডিশ কালচারের প্রভাব তরুণ তরুণীদের পোশাকেও প্রকট। উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়েরা ওড়না তো অনেক আগেই ছেড়েছে, যেটুকু টিকে আছে তা একটি মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে নয় বরং পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের মডেলদের অনুকরণে একটা ফ্যাশন হিসেবে। আজকাল বিটিভিতে যত বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়, সেখানে পণ্য হিসেবে

www.pathagar.com

কিশোরী বা তরুণীদের ব্যবহার তো হচ্ছেই, যারাই পর্দায় সামনে আসছে (বিশেষ করে কিশোরীরা) তাদের বেশিরভাগই শার্ট-প্যান্ট বা সংক্ষিপ্ত পোশাক পরিহিতা। ভারতের অনুকরণে বিজ্ঞাপন নির্মাণ করতে গিয়ে অবস্থা এমন হয়েছে যে স্বল্প বসনে ছেলেমেয়েদের নাচানাচি ছাড়া আজকাল যেন আর বিজ্ঞাপনই হয় না। এই ভারতীয় নোংরা সংস্কৃতির জোয়ারে এদেশের মেয়েরা নিজেদের পোশাক তালিকায় স্কিন টাইট পোষাক, স্বচ্ছ পরিচ্ছেদ ও নানা ধরনের শর্টস অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছে। মেয়েদের এসব উত্তেজক পোশাক ব্যবহারও নানান দুষ্কর্মের জন্ম দেয়। হিন্দি নায়িকাদের অনুকরণ করতে গিয়ে এদেশের মেয়েরা এটা ভুলতে বসেছে যে, নারীর শ্রেষ্ঠত্ব নারীত্বেই। মেকি ফ্যাশনের মধ্যে নয়।
এভাবেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা বিষয় বিদেশী সংস্কৃতির কুপ্রভাবে পড়ে বিকৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের আবহমান মুসলিম সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে প্রয়োজন বিদেশী সংস্কৃতির কুপ্রভাব থেকে দেশকে রক্ষার জন্য নিজেদের শক্তিশালী মিডিয়া গড়ে তোলা। নিজেদেরকে সংস্কৃতি ও আবহমান ঐতিহ্যের লালন করা এবং সেই সাথে বিদেশী সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা।

চলচ্চিত্র

বিনোদন ও প্রচারের জন্য চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী মাধ্যম। স্বল্প বা অর্ধশিক্ষিত মানুষের কাছে বার্তা পাঠানোর এর চাইতে ভালো কোনো মাধ্যম নেই। মানুষ পড়ে শেখার চাইতে অনেক বেশি শিখতে পারে দেখে আর শুনে। এ বিষয়টি বোঝা যায় চলচ্চিত্রে। সিনেমার একটি মাত্র চরিত্র হয়ে উঠতে পারে একটি বিপ্লব সৃষ্টির আহ্বান। একটি চলচ্চিত্র কোনো জাতিকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে পারে বা কোনো মহান উদ্দেশ্য নিয়ে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানাতে পারে। প্রশ্ন হলো চলচ্চিত্র আগ্রাসন হিসাবে মুসলমানদের মাঝে কি ধরনের প্রভাব ফেলছে?
পশ্চিমা বিশ্ব 'ফ্রি সোসাল সিস্টেম' এর উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সেখানে চলচ্চিত্র নির্মাণে নৈতিকতার কোনো আবেদন নেই। একটি ছবিতে যা খুশি তা দেখানো হলেও কারো কিছু বলার নেই। ফলে অশ্লীলতার অবাধ বিস্ফোরণ ঘটেছে এবং তার ছায়া পড়েছে মুসলিম দেশ ও সমাজে। মানগত উৎকৃষ্টতার জন্য এসব সিনেমা মুসলমানদের ঘরে ঘরে প্রবেশ করেছে। মেল গিবস, আর্নল্ড সুয়ার্টজনিগার, জন ট্রাভোল্টা বা পিয়ারস ব্রসনন মুসলমান তরুণদের অনুকরণের পাত্রে পরিণত হয়েছেন। এদের মতো পোশাক, কথাবার্তা, চলাফেরা বা নায়কোচিত কাজ করার প্রচেষ্টা মুসলমান তরুণদের মাঝে যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এসবের ফাঁকে ফাঁকে আরো অনেক বিষয় তরুণদের চরিত্রকে প্রভাবিত করছে যা ইসলামী নৈতিকতা বা সংস্কৃতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বহুগামিতা বা বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক- এগুলোতে খুব সুন্দরভাবে চিত্রিত করা হয়। শৈল্পিক আবহে এসবের প্রদশর্নী মুসলিম তারুণ্যের অজান্তে তাদের মনে গভীর ছাপ ফেলে যায়। *টার্মিনেটর টু* বা *স্পীড* এত মত মারদাঙ্গা ছবির অব্যর্থ প্রভাবেই হয়ে থাকে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি। অস্ত্র হাতে একজন নায়ককে শৈল্পিকভাবে মারামারি বা ধ্বংসযজ্ঞে লিপ্ত থাকতে দেখা স্বাভাবিকভাবেই তরুণদের উৎসাহিত করে।
চলচ্চিত্র আবার সুকৌশলে বাজার দখল করার হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। *জেমস বন্ড* সিরিজের ছবিগুলোতে নায়কের ব্যবহৃত বিশেষ ব্রান্ডের চশমা বা ঘড়ি স্বাভাবিকতই ক্রেতাদের উৎসাহী করে। এছাড়া চলচ্চিত্র মিথ্যা প্রচারণা ও জনমত গঠনের হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। খিলাফতের বিরুদ্ধে হিজাজের যে লোকটি বিদ্রোহ করেছিল তাকে

www.pathagar.com

আমরা জানি বীর রূপে, *লরেন্স অব অ্যারাবিয়া* ছবির কল্যাণে! ইসলামের ঐতিহাসিক বীরদের বিশ্বের কাছে সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতেও সিনেমার ভূমিকা সুদূর প্রসারী। সম্প্রতি হলিউড থেকে মুক্তি প্রাপ্ত একটি ছবি *ব্লাক হাউক ডাউন*, যেখানে সোমালিয়ায় মার্কিন বাহিনীর সৈন্যদের বীর রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। যে সমস্ত মুসলমান ইতিহাস ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে ততটা সচেতন নয়, তারা অতি সহজেই এ ধরনের ছবি দেখে বিভ্রান্ত হতে পারেন। এভাবে ধাপে ধাপে, তিলে তিলে চলে মগজ ধোলাইয়ের প্রক্রিয়া। এভাবেই চলে নব্য আধিপত্যবাদের আগ্রাসন। নামে বা পারিবারিক পরিচয়ে একজন মুসলমানের চামড়ার ভেতরটা পশ্চিমাকরণ করা হয়। আত্মপরিচয় ভুলে সে তাদের মত হতে চায়। নিজেকে নিয়ে সে লজ্জাবোধ করে, হীনমন্যতায় ভোগে। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি নিজের পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ছেড়ে পুত্র কন্যার নাম রাখে রকি বা জিমি। নামাজ পড়ে, একথা স্বীকার করতে তার লজ্জাবোধ হয়। কর্মে-ধ্যানে সে হতে চায় সেকিউলার।

আর চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান স্মরণ করতে গেলে খড়ের গাদায় সুঁই খোঁজার মতই অবস্থা হয়। যে ক'টি উদাহরণ পাওয়া যায়, তাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মণি-মুক্তো নয়, বরং কার্যক্ষেত্রে নুড়ি পাথরের মত। যারা অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছেন তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুসলমানদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেননি বরং ক্ষেত্র বিশেষে অবজ্ঞা করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই পশ্চিমা সভ্যতার চাকচিক্যে নিজ স্বকীয়তা হারিয়ে বিরোধী শক্তির পক্ষে ইসলামের পরিপন্থী কাজ করেছেন। আবার অনেকের কীর্তি জাতি হিসেবে মুসলমানদের মাথা নত করে দিয়েছে। সালমা হায়েক বা দিয়া মির্জাদের মত অভিনেত্রীরা পশ্চিমাদের মতই নগ্নতায় জড়িয়ে নিজেদের জাতিগত পরিচয়কে কালিমালিপ্ত করেছেন।

আবার অন্ধকারের এই তিমিরে আলো নেই বললেও ভুল হবে। ইরানী চলচ্চিত্রকারেরা তাদের দেশকে বিশ্বের ক্যানভাসে নতুন রূপে চিত্রিত করেছেন। দশকের পর দশক ধরে পরিচালিত পশ্চিমা প্রোপাগান্ডা নস্যাৎ করেছেন। পৃথিবীর মানুষকে ও চলচ্চিত্র শিল্পকে একটি নতুন দিগন্ত উপহার দিয়েছেন। সুষ্ঠুভাবে ইসলামী নীতি ও অনুশাসন পালন করে মানুষের অন্তরের বিচিত্র যেসব অনুভূতি চিত্রিত করেছেন তা অনন্য। মানুষকে নির্দোষ বিনোদনের সুযোগ করে দিয়েছেন। পাশাপাশি দেশের ও সমাজের নানা সমস্যা নিয়ে কাজ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সমাজে অন্ধদের পাশে দাঁড়ানোর উদাহরণ দেখিয়েছেন। মানসিক প্রতিবন্ধী সমস্যার সমাধানকল্পে কাজ করেছেন। মাদকদ্রব্য বিরোধী ছবি করেছেন। ইতিহাস ভিত্তিক ছবি করেছেন। চলচ্চিত্রে গতানুগতিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা বা পারিবারিক জীবনের নানা সঙ্কট নিয়ে গঠনমূলক ছবি করেছেন। এ ছবিগুলো নগ্নতা মুক্ত, উদ্দাম-উত্তাল নাচ-গান এখানে অনুপস্থিত। জীবনের জৌলুস বা চাকচিক্য ইরানী সিনেমার উপজীব্য নয়। এসব ছবি দর্শকদের মোহ বা অসৎস্পৃহাকে দমিয়ে রাখতে পারে, মনকে প্রশান্ত করতে পারে বা চিন্তাশীলদের জন্য গঠনমূলক ভাবনার খোরাক যোগাতে পারে।

ইরানী ছবি তার চিত্রায়ন বা অন্যান্য আঙ্গিকে শিল্পমান সম্পন্ন হওয়ায় ফ্রান্সের *কান চলচ্চিত্র উৎসবে*'র মত বিশ্বের বোদ্ধাদের সমাগমেও প্রশংসা কুড়িয়েছে। তার চাইতেও বড় যে কাজটি করেছে তা হলো বিশ্ব জনমত গঠন। পশ্চিমা আগ্রাসনবাদীরা ইরানকে যতই 'শয়তানের অক্ষশক্তি' বলে গাল দিক না কেন তা সহজে পৃথিবীর মানুষের কাছে গ্রহণীয়

www.pathagar.com

হবে না। আজ বিশ্ব জানে ইরান কেমন। তার সমাজ ব্যবস্থা কেমন বা সেখানে নারী অধিকার ও মর্যাদা কেমন। তাই দূরভিসন্ধিমূলক ভাবে আফগানিস্তান আক্রমণ করা গেলেও ইরানের উপর আক্রমণ চালানো সহজ হবে না।

দুঃখের সাথে স্বীকার করতে হয় ইরানের এ ধরণের অর্জনের পরেও মুসলমানরা চলচ্চিত্র শিল্পে অনেক পিছিয়ে। এর কারণগুলোর মধ্যে ইজতিহাদের ব্যাপারটি অন্যতম। অনেকদিন পর্যন্ত, এমনকি এখনও ক্ষেত্র বিশেষে আলেমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মনে করেন চলচ্চিত্র ইসলামে বৈধ নয়। যার ফলে বুদ্ধিজীবীরা শিল্পজগতের এ অংশে কাজ করার চেষ্টা করেননি, দূরে সরে থেকেছেন। সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের চলচ্চিত্রে দুর্বলতার সুযোগে বিদেশী ছবি বাজার দখল করেছে। মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমা ধরনের ছবির চাহিদা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় নির্মাতা বা ব্যবসায়ীরা চাহিদা অনুসারে ছবি বানিয়েছেন, পশ্চিমাদের মত ছবি তৈরি করতে গিয়ে অশ্লীলতার স্রোতে গা ভাসিয়েছেন। অনুকরণপ্রবণ হয়েছেন এবং ব্যবসার প্রয়োজনে নিম্নমানের অনৈতিক ও কুরুচিপূর্ণ ছবি বাজারজাত করেছেন। এসব ছবির কারণে এক শ্রেণীর দর্শক প্রেক্ষাগৃহ বিমুখ হয়েছে, বিদেশী ছবির শরণাপন্ন হয়েছে বা ছবি দেখা বন্ধ করে দিয়েছে। আরেক শ্রেণীর দর্শক এসব ছবিকে গ্রহণ করেছে। এ ছবিগুলো তাদের রুচিবোধকে আরো নিম্নতর করেছে এবং নির্মাতারা সেই রুচির চাহিদানুসারে ছবি বানিয়ে চলেছেন। আলেমদের গৃহীত নীতির ফলে ইসলামী সংস্কৃতি অনুযায়ী ছবি তৈরি হয়নি বা ইসলামী চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা চলচ্চিত্র শিল্পকে প্রভাবিত বা ইসলামীকরণ করতে সচেষ্ট হননি। এতে মুসলমান দেশগুলোতে চলচ্চিত্র শিল্প সুষ্ঠুভাবে বিকাশ লাভ করতে পারেনি। দেশগুলো বিদেশী ছবির জন্য মুনাফার ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়েছে, চলচ্চিত্রও কলুষিত হয়েছে। তবে শিল্পটিকে অন্ধকারের পথ থেকে এখনো লাগাম টেনে ধরা সম্ভব।

এদিকে বাংলাদেশে চলচ্চিত্র শিল্প আকারে গড়ে ওঠার আগেই এখানে নির্মিত হয়েছে *জাগো হুয়া সভেরা, আজান, মাটির পাহাড়, সন অব পাকিস্তান, শহীদ তিতুমীর, নবাব সিরাজ উদ্দৌলা, জীবন থেকে নেয়া,* বা *সূর্য দীঘল বাড়ী*-র মতো আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র সহ মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে, আকতার জাংকারদারের *জাগো হুয়া সাভেরা* ছবিটি বিশেষভাবে পুরস্কৃত হয়। বিশিষ্ট অভিনেতা ও প্রাবন্ধিক আরিফুল হকের ভাষায় "৭১ এর আগে সীমিত কারিগরি সুযোগে যে ছবি নির্মিত হয়েছিল, সেগুলোর মান ছিল উন্নত। সে ছবিতে দেশের মাটি, মানুষের চেহারা দেখা যেতো। স্বাধীনতার পর দেশে সৃষ্টি হল নৈরাজ্য, আরাজকতা, তারই ঢেউ এসে লাগলো চলচ্চিত্র শিল্পে।" (চলচ্চিত্রে নিজের মুখ, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও প্রতিরোধ)এ প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর তার এক প্রবন্ধে লিখেছেন, "চলচ্চিত্রশিল্প বাংলাদেশের সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে, সেটা কালো টাকার ছায়া অর্থনীতি ক্ষেত্রে সৃষ্ট নৈরাজ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।" [*ইন্টারকাট ১৯৮৯*] ১৯৭১ সালের পারে 'মুসলিম থেকে বাঙ্গালী জাতি'তে উত্তরণের নামে এদেশের মানুষের চিন্তা-চেতনা ও ঐতিহ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিষ ঢুকিয়ে দেয়ার প্রভাবেই আজকের বাংলাদেশী চলচ্চিত্রের এ দশা। এ প্রেক্ষিতে ভারতীয় বা আর্য দর্শন সম্বন্ধে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন, কারণ এখানটাতেই ভারতীয় চলচ্চিত্রের সাথে বাংলাদেশী মুসলিম সংস্কৃতির বিরোধ। ভারতীয়রা বহুজাতিক রাষ্ট্র হলেও সেখানে শ্রেণীবদ্ধ সমাজ, যাতে

www.pathagar.com

ব্রাহ্মণ্য ধর্মই সবচাইতে বেশি শক্তিশালী এবং বছরের পর বছর ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের মুখে অন্যান্য ভারতীয় সংস্কৃতিগুলো নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে হিন্দু সমাজভুক্ত হয়ে যায়। আচার আচরণ বা সামাজিক রীতি নীতিতে তারাও শ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজের অংশে পরিণত হয়। এভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি হয়ে ওঠে আর্য ব্রাহ্মণদের সংস্কৃতি।

এই ভারতীয় সংস্কৃতির কিছুটা স্বরূপ বিশ্লেষণ করা দরকার। হিন্দু পুরাণ সমূহের বিভিন্ন কাহিনী পরীক্ষা করলে তার শব্দগত অর্থের বাইরে কি গুঢ় অর্থ পাওয়া যায়, তা পণ্ডিতেরা বলতে পারবেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটা বোঝা সম্ভব নয়। সেসব অশ্লীল লীলাখেলাই হাজার বছর ধরে আর্যদের ধর্মীয় কাহিনীর উপজীব্য ছিল। হিন্দু ঐতিহ্য একান্তভাবে পৌরানিক দেবদেবী ও অতিপ্রাকৃতিক অন্যান্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। ভগবত, পদ্ম পুরাণ, গৌর সংহিতা, শ্রী মহৎ মহর্ষি, কৃষ্ণ দৈপায়ন, বেদ ব্যাসের ব্রহ্মবৈর্ত পুরাণ প্রভৃতি হিন্দু ধর্মগ্রন্থের কৃষ্ণের যেসব প্রণয়লীলার বিবরণ দেয়া হয়েছে তাই হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতিকে নির্মাণ করেছে। সেখানে লিঙ্গপুজা, জেনিপূজাকে পবিত্র জ্ঞান করা যায়। শিবলিঙ্গম, রামলিঙ্গম, বৃহৎলিঙ্গম প্রভৃতিকে পৌরুষের প্রতীক বলে মনে করা হয়। পুরোহিতদের ভোগের জন্য যুবতী নারীদের দেবদাসী হওয়াকে পুণ্যাত্মা জ্ঞান করা হয়। মদ বা সোমরস জাতীয় উত্তেজক পানীয়কে দেবতাদের পানীয় জ্ঞানে পূজার অঙ্গ মনে করা হয়। নর-নারীর উলঙ্গ স্নানকে পুণ্যের কাজ মনে করা হয়। যে ভারতনাট্যমকে ভারতীয় সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ মনে করা হয়, তা অশ্লীলতার পুরাণ ঐতিহ্য। *ন্যাশনাল জিওগ্রাফি* চ্যানেলকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে স্বনাম খ্যাত ভারতীয় নৃত্য শিল্পী রুক্সিনী দেবী বলেছেন 'ভারতনট্যম নৃত্য আসলে ধর্মীয় বারবণিতা দেবদাসীদের পূজারী মনোরঞ্জনের ছলাকলা।' আর এসবের উপরেই গড়ে উঠেছে ভারতীয় সংস্কৃতি। সত্যজিৎ রায় ভারতীয় সঙ্গীতে মন্দিরের স্থাপত্যকলার মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, "আমাদের সঙ্গীতের সঙ্গে মন্দিরের স্থাপত্যকলার মিল আছে। যেমন মন্দিরের একটা বেস থাকে, যেটাকে আলাপ বলা যেতে পারে। তারপর মন্দির আস্তে আস্তে উপরে উঠতে থাকে, তখন সেখানে কারুকার্য আরো সূক্ষ্ম হয়, আরো জটিল হয়ে যেতে থাকে সেই রকম সঙ্গীতের তানকারি। তারপর চূড়াটা পয়েন্টেড হয়ে শেষ হয়।" এভাবে ধর্মের আবহে ভারতীয় চলচ্চিত্র, গল্প-কবিতা, নাচ-গান অশ্লীলতার উপর ভিত্তি করে অগ্রসর হতে থাকে। গত দু শতকের ইংরেজ শাসন ও বর্তমানের আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে এই নগ্নতা ও অশ্লীলতায় নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকে লাগামহীনভাবে ভারতীয় চলচ্চিত্রের অনুকরণের সাথে সাথে এই নগ্নতা, অশ্লীল নাচ-গান বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে ঢুকে পড়ে।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের দোষগুণ বিচার করতে গেলে তাতে ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রভাব স্পষ্টত ধরা পড়ে। নায়ক-নায়িকার নাচ, পোশাক, ডায়ালগ থেকে শুরু করে, নায়কের নাম পর্যন্ত বোম্বাইয়াদের অনুকরণে করা হয়। আগে যেখানে দেশের গীতিকার, সুরকারেরা কালজয়ী ও মর্মস্পর্শী গান উপহার দিতেন সেখানে আজকালকার গীতিকার ও সুরকারেরা যেন নকল প্রবণতার অদৃশ্য ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। বোম্বের ছবির গানের অনুবাদ আমাদের চলচ্চিত্রে একই সুরে একইভাবে পরিবেশন করা হচ্ছে। এমনকি টেলিভিশনের চলচ্চিত্র বিষয়ক অনুষ্ঠানে এসব গানের বাংলা ও হিন্দী চিত্রায়নকে পাশাপাশি উপস্থাপন করলেও নির্মাতারা লজ্জাবোধ করছেন না। প্রায় এক দশক ধরে চলচ্চিত্রাঙ্গনে লেগেছে

www.pathagar.com

নতুন হাওয়া- ভারতীয় হিন্দী ছবির বাংলা সংস্করণ তৈরি। জনপ্রিয় হিন্দী চলচ্চিত্রের হুবহু বাংলা প্রতিরূপ তৈরি করা হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছবিগুলোর কাহিনী দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। ভারতীয় নায়িকাদের অনুকরণে এদেশের স্থূলকায়া নায়িকাদের পোশাক পরিচ্ছদ ও উদ্বাহু নৃত্য খুবই বেখাপ্পা ও অশ্লীল দেখায়। ভারতের চিত্রতারকা সালমান খান, শাহরুখ খান বা আমীর খানের নামানুসারে আমাদের দেশের যেসব নায়কেরা তাদের 'নায়ক-নাম' নিয়েছেন, তারা নিজেদের হাস্যস্পদ করেছেন। নিজেদের আত্মমর্যাদাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছেন। এই একই ধারায় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পোশাক আশাকেও ভারতীয় হাওয়া লেগেছে, আর ভারতীয় ছবির পোশাকে পড়েছে পশ্চিমা প্রভাব। বাংলাদেশের ছবিতে নায়ক নায়িকার বাবা লুঙ্গী, পাঞ্জাবী, শার্ট প্যান্ট ছেড়ে আজকাল হাফ প্যান্ট পড়েন, মা ঘোমটা দিয়ে নামাজ আর সন্তানের জন্য দোয়ার শালীনতা ছেড়ে হাতাকাটা ব্লাউজ পড়ে পার্টিতে যান। গ্রামের ছেলে জিনস, টি শার্ট, বুট পড়ে ঘুরে বেড়ায় আর নায়িকারা তো নাটকীয়ভাবে রূপ বদলে শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ থেকে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপ, সেখান থেকে সংক্ষিপ্ত লেহেঙ্গা, আর সবশেষে শার্ট-প্যান্ট আর মিনি স্কার্টে শরীরের প্রদর্শনী চালাচ্ছেন।

এতো গেল চলচ্চিত্রে ভারতীয় প্রতিফলন। এবার ফিরে তাকানো যাক ঢাকার চলচ্চিত্রে এদেশীয়দের অবদানের দিকে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো আমাদের চলচ্চিত্র জীবনমুখী নয়, এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে বাস্তবতার সাথেও সাংঘর্ষিক। আমাদের গতানুগতিক জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সেখানে ফুটে ওঠে না। সমাজের কোনো স্তরকেই আমাদের চলচ্চিত্র তুলে ধরতে পারে না। যেসব কাহিনী দেখানো হয় তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উর্বর মস্তিস্কের সুদূর প্রসারী (!) কল্পনা। ব্যবসাভিত্তিক ছবিতে এমন সব কাহিনীর অবতারণা করা হয় যাতে আমাদের আশেপাশের মানুষেরা নেই, সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো নেই, অনাবিল আনন্দের উৎস নেই। গ্রামের পথে স্বল্পবসনা নায়িকার উদ্দাম নৃত্য ৮৮% মুসলমানের দেশের গ্রামের মেয়েদের প্রতিচ্ছায়া নয়। শহরের কলেজ কন্যারা পাশ্চাত্যের মতো, আঁটসাঁট খাটো পোশাক পড়ে শিক্ষালয়ে ঘুরোঘুরি করেন না, যেমনটি চলচ্চিত্রে দেখানো হয়।

কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশী চলচ্চিত্রে ইসলামের চিহ্নগুলো আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। দাড়ি-টুপী-পাঞ্জাবী, এগুলো হয়ে উঠেছে ভিলেনের বেশভূষা। ভদ্রলোকের ছেলের নাম রবিন আর চাকর বাকরের নাম আবদুল বা করিম চাচা। কোন পথে চলছে আমাদের চলচ্চিত্র? প্রখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা আরিফুল হক বলেছেন, "চলচ্চিত্রে, নাটকে খৃস্টান কায়দায় জন্মদিনের কেক কাটার দৃশ্য অহরহ দেখা যায়। কিন্তু, কখনও দেখা যায় না কোনো বাড়িতে ঈদের আনন্দ উৎসবের দৃশ্য। এ সবই ঐতিহ্য বিস্মৃতির ফল। এই বিস্মৃতি এক দিনে আসেনি। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই ৮৫ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এই বাংলাদেশে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নামে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের নামে মুসলমানদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির শিকড় উপড়ে ফেলার ষড়যন্ত্র চলে আসছে। দেশ ভাগ হয়ে মাঝখানে প্রাচীর সৃষ্টি হওয়ায় সে প্রয়াস কিছুদিন স্তিমিত হয়ে পড়েছিল মাত্র" (আমাদের সংস্কৃতিঃ সমস্যা ও প্রতিযোগিতা, আমাদের সংস্কৃতিঃ বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জ সমূহ, পৃ-৬২)।

www.pathagar.com

ইতিহাসে মুসলমানেরা কখনোই সুদের কারবারী বলে পরিচিত ছিল না। পশ্চিমা বা ভারতীয়রাও যেখানে মুসলমানদের সুদের কারবারী হিসাবে দেখায়নি, সেখানে ঢাকার চলচ্চিত্রে দাড়ি-টুপী পরা অভিনেতা সুদের কারবারী হিসাবে চিত্রিত হয়েছেন। গ্রামের দুশ্চরিত্র মাতবরকে দাড়ি-টুপী-পাঞ্জাবীতে দেখানো হয় যা ইসলামের প্রতি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। সমাজের আসল অবস্থা কি এরকম? দাড়ি-টুপী পরিহিতরাই কি সমাজে বিশৃঙ্খলা আর অপশক্তির প্রতিভূ? রাস্তার পাশে সিনেমার চাররঙ্গা পোস্টারের দিকে তাকানো যায় না। আর এই পরিমণ্ডলে সর্বশেষ সংযোজন হিসাবে এসেছে 'কাটপিস', যাকে ভদ্র সমাজে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। দেশে সেন্সর বোর্ড নামক একটি বিচিত্র (!) প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যার কাজ চলচ্চিত্র শিল্পের 'নৈতিক ছাকনী' হিসবে অশ্লীলতা ও অন্যান্য অসামাজিক উপাদান দূর করা। কিন্তু বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটির শিখণ্ডী হিসাবে এমন একজন ব্যক্তি কাজ করছেন যার কাছে কোনো ধরনের অশ্লীলতাই সম্ভবত অশ্লীল নয়। ফলে এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

ওবায়দুল হক সরকারের ভাষায়: "বাংলাদেশের কমার্শিয়াল ছবিতে যদি ধর্ম বা ধর্মের বিষয়বস্তু এসে পড়ে, তবে তা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এমন উদ্ভটভাবে উপস্থাপন করা হয় যে ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পায়। বলাবাহুল্য বাংলাদেশের ধর্মভ্রষ্ট বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা জনসাধারণকে ইসলাম বিরোধী করার জন্য তৎপর। এই ঘরের শত্রু বিভীষণের দল ইসলামের প্রতি হীনমন্যতার সৃষ্টি করে" (*সংস্কৃতি সংহার, আমাদের সংস্কৃতি: বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জ সমূহ, পৃ-৫২*)। এদেশে মানসম্পন্ন চলচ্চিত্র বলতে যা বুঝানো হয় তাদের মাঝে পড়ে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, *পদ্মা নদীর মাঝি, দুখাই* প্রভৃতি। সেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার জীবনযাত্রা বা ইতিহাস কোনোকিছুকেই প্রতিনিধিত্ব করে না। এখানে বড় একটা প্রশ্ন থেকে যায় তাহলে কি কেনো বিশেষ গোষ্ঠী বা ব্যক্তি এসব ছবির পেছনে কাজ করছে, যারা দেশের জনগণকে তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিস্মৃত করতে চায়?

বাংলাদেশে নানা প্রয়োজন ও পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সরকার ছবি নির্মাণ করেছে কখনো নির্বাচনী প্রয়োজনে জনগণকে ভোটদান পদ্ধতি শিখানোর জন্য, কখনো বা পরিবেশ সচেতনতা বাড়াতে বা জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে, বেকারত্ব নিরসনে। সেসবের সুফল দেশ আংশিকভাবে হলেও ভোগ করেছে। এসব উদ্দেশ্য প্রণোদিত চলচ্চিত্রের আরেকটি প্রকার আছে যাদের উদ্দেশ্য দুঃখজনক ও লজ্জার। সাম্প্রতিক *মাটির ময়না* ও *লালসালু* নামক দু'টো ছবি করা হয়েছে, যেখানে ইসলাম ও মুসলমানদের আচার অনুষ্ঠানকে হেয় করা হয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষিত ও সুধী সমাজ প্রেক্ষাগৃহ বিমুখ হওয়ায় এগুলোকে পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে বা মধুমিতার মত ব্যয়বহুল সিনেমা হলে (যেখানে বেশিরভাগ দর্শকই সমাজের উঁচু তলার মানুষ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র) দেখানো হয়েছে। কি উদ্দেশ্যে ও কাদের টার্গেট করে এটি করা হয়েছে তা অত্যন্ত পরিস্কার। ইসলামী চিন্তাশীলগন এসব ব্যাপারে এখন পর্যন্ত জোড়ালো কোনো ভূমিকা রাখেননি এখন পর্যন্ত। অথচ তাদের হাতে এই শিল্প হয়তো সমৃদ্ধ হতে পারত। সেই সাথে ইসলাম, জাতি ও দেশ উপকৃত হত।

www.pathagar.com

ইন্টারনেট

আধুনিক তথ্য প্রবাহের আরেকটি বাহন ইন্টারনেট যা গ্লোবাল ভিলেজ তৈরির ক্ষেত্রে অনেক পথ অতিক্রম করেছে। ইন্টারনেট প্রযুক্তির ব্যবহার বহুমাত্রিক। এর দ্বারা চিঠি পত্র আদান প্রদান, পত্রিকা-প্রকাশ, ব্যাংক ব্যবস্থা প্রভৃতির কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। তথ্য প্রবাহের দ্রুততর মাধ্যম হিসেবে এটি ইতমধ্যেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আজকাল প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্র, প্রতিটি টিভি চ্যানেল বা সিনেমা কোম্পানী এমনকি ব্যবসায়ীপ্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ওয়েবসাইট খুলছে যার মাধ্যমে ক্রেতা ও ব্যবহারকারীরা স্বল্পসময়ে তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারছে।

অন্য সব প্রচার যন্ত্রের ন্যায় এটিও ঠিক একটি ছুরির মত যা দিয়ে ভালো-খারাপ দু'রকম ব্যবহারই করা যায়। ইন্টারনেটের ব্যবহারকে ভালো ও খারাপ দু'ভাবেই করা যায়। যদি ইন্টারনেট এবং পশ্চিমা শক্তিদের নিয়ে বলতে হয় তাহলে স্বীকার না করে উপায় নেই যে তারা এর দু'ধরনের ব্যবহারই করছে। অবশ্যই মানতে হবে যে পশ্চিমারা ইন্টারনেটে বিভিন্ন লাইব্রেরি, সংবাদ সংস্থা, সংবাদের মত গঠনমূলক কাজের প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের নিজেদের এবং তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর জন্যেও অনায়াসে ব্যবহারের পথ তৈরি করেছে। অপরদিকে পশ্চিমা দেশগুলো তথাকথিত ফ্রি-সোসাইটি হওয়ায় ইন্টারনেটের কোন ধরনের ব্যবহার করা যাবে বা কোন ধরনের ব্যবহার করা যাবে না এতদসংক্রান্ত কোনো নীতিমালা প্রণয়ন করেনি। ফ্রি-সোসাইটির মত ইন্টারনেটেও অনুপ্রবেশ ঘটেছে অবাধ যৌনতা ও নগ্নতার। এর কু-প্রভাবে তাদের সমাজে অনাচার যেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি আমাদের মত উঁচু নৈতিকতার সমাজকেও তা ছাড়েনি। এছাড়া অন্য সমস্ত মিডিয়ার মত ইন্টারনেটও মিথ্যা ছড়াবার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্ব তাদের দূরভিসন্ধিসমূহ সফল করার জন্য ইন্টারনেটকে ব্যবহার করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আফগানিস্তান আক্রমণ করার আগে বিভিন্ন মার্কিন সংস্থা বা ব্যক্তির পক্ষ থেকে মুসলমানদের সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার জন্য হাজার হাজার ই-মেইল পাঠানো হয়েছে। চিঠিগুলোর বক্তব্য সঠিক তথ্য ভিত্তিক না হওয়া সত্ত্বেও মানুষ তাদের আবেগঘন ভাষায় আর্দ্র হয়েছে। এভাবে বিশ্ব জনমতকে নিজের পক্ষে নিয়ে নেয়ার ফলে আমেরিকার পক্ষে শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে আফগানিস্তান আক্রমণ করা সত্ত্বেও প্রতিবাদের কোনো জোরালো ধ্বনি ওঠেনি। অবশ্য এটি ইন্টারনেট প্রযুক্তির নিজের কোনো দোষ নয়, উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটি ব্যবহার মাত্র।

ইসলামী শক্তির কথা যদি বলি তাহলে প্রথমেই বলতে হবে যে, তারা এখন পর্যন্ত এর কোনো উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারেনি। খুব ছোট দু'তিনটি উদাহরণ ছাড়া তেমন কোনো অর্জন নেই। যে অল্প ক'টি ইসলাম ভিত্তিক ওয়েবসাইট রয়েছে সেগুলো যথেষ্ট আকর্ষণীয় নয়। ফলে তথ্য ও উপাত্তে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হলেও সেগুলো জনপ্রিয়তা পায়নি। এটাও ঠিক যে এই ওয়েবসাইট গুলো যথেষ্ট প্রচারণা পায়নি, যার কারণে সম্ভবত দু'টি ঃ প্রথমত, প্রচারণার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের অনীহা এবং আধুনিক যুগের প্রচারণা কৌশলের ব্যাপারে জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতা ও অযোগ্যতা। অপরদিকে প্রচার শিল্পের এই ক্ষেত্রে জায়েন্টদের পাশাপাশি টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা। আবার বেশিরভাগ ইসলামী ওয়েবসাইটই শরীয়তের তত্ত্বগত আলোচনা ভিত্তিক, যা সাধারণ মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট বোধগম্য বা হৃদয়গ্রাহী নয়। ইন্টারনেটের ইসলামী ওয়েবসাইটগুলোতে

www.pathagar.com

বিনোদনের যথেষ্ট সুযোগ না থাকার ফলে স্বাভাবিকভাবেই মুসলমান ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা পশ্চিমা ওয়েবসাইটগুলোর শরণাপন্ন হচ্ছে। অবশ্য স্বীকার না করে উপায় নেই যে শরীয়তের তত্ত্বগত আলোচনা ভিত্তিক ওয়েবসাইটগুলো একটি নীরব ও ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতেই হয় ইসলামী আর্দশের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মুখে এগুলোর অবদান যথেষ্ট নয়।

ইন্টারনেটের একটি আকর্ষণ হচ্ছে বিভিন্ন খেলাধুলার ওয়েবসাইট। আজকাল আমরা বিভিন্ন খেলাধুলার ওয়েবসাইটের কল্যাণ বিভিন্ন রকম মজার খেলা খেলতে পারছি। কিছুদিন ধরে এ ধরনের ওয়েবসাইটগুলো নানারকম যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা সরবরাহ করে আসছে। এ খেলাগুলোর মধ্যে পড়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এ ধরনের খেলায় মুসলমানদের মত বেশধারী লোকদেরকে খলনায়ক বানানো হয় এবং পশ্চিমা শক্তিকে নায়ক হিসেবে দেখানো হয়। খেলোয়াড়কে স্বভাবতই নায়কের পক্ষ নিয়ে খলনায়কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। এভাবে সারা পৃথিবীর শিশুদের, এমনকি মুসলমান শিশুদের চোখেও ইসলামের বীর যোদ্ধাদেরকে অপশক্তির প্রতিভূ হিসেবে চিত্রিত করা হচ্ছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে এটি একটি সামান্য ব্যাপার, কিন্তু বাস্তবে এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। একটি শিশু এভাবে খেলতে খেলতে যা শিখে তাতে পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতা বা অন্য কোনো কিছুই তাকে সহজে বদলাতে পারে না। এ ধরনের প্রচারণার ফলে মুসলমানদের মাঝে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বোধের চেতনা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। যার ফলে পৃথিবীর একাংশের মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালানো হলে অপর অংশ থেকে প্রতিবাদের জোরালো ধ্বনি ওঠে না।

পক্ষান্তরে মুসলমানরা তাদের সাংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন কোনো আকর্ষণীয় ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারেনি যা শিশুদের মনে ইসলামের বীরদের গৌরবোজ্জ্বল চেতনাকে গ্রথিত করতে পারে। এটি তো সম্পূর্ণ চিত্রের একটি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। কোনো বড় মাপের ইসলামী সংবাদ সংস্থার ইন্টারনেট সংস্করণ নেই যা মিথ্যা প্রচারণার বিরুদ্ধে সুদূর প্রসারী ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে যে চ্যানেলটির নাম বহুল আলোচিত সেই আল জাজিরা টেলিভিশনের ইন্টারনেট সংস্করণটি আরবিতে। ইংরেজি বা অন্য কোনো আন্ত র্জাতিক ভাষায় না হওয়ার ফলে তার ভূমিকাও যথেষ্ট সীমাবদ্ধ। উল্লেখ্য বিবিসি বা সিএনএন যেসব খবর টিভিতে সম্প্রচার করে তারই লিখিত আকার ওয়েবসাইটে দিয়ে থাকে। অন্যদিকে যে সব ওয়েবসাইটগুলো ইসলামী বিষয় নিয়ে কাজ করছে তারাও যে সব ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ভূমিকা পালন করছে তাও নয়। অনেক ক্ষেত্রে তারা আসল সমস্যাগুলোকে অবজ্ঞা করে অপ্রয়োজনীয় ও তুলনামূলক কম গুরুত্বের আলোচনায় ব্যস্ত থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও বাড়াবাড়িপূর্ণ।

মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ইন্টারনেট থেকে পাওয়া কিছু ই-মেইলে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে সালাফিরা কি মুসলমান, সৌদি বাদশাহ কি কাফের, ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা যাবে কি যাবে না জাতীয় অবান্তর কিছু প্রশ্ন অথচ সেখানে মুসলিম বিশ্বে আরো অনেক জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন। মুসলমানদের দু'তিনটি বাদে কোনো সুষ্ঠু মেইলিং নেটওয়ার্ক নেই যাতে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ছড়িয়ে কুসংস্কার মুক্ত ও গঠনমূলক জাতি গঠনে অবদান রাখতে পারে। অল্প যে ক'টি নেটওয়ার্ক কাজ করছে তাদের গ্রাহক

www.pathagar.com

সংখ্যা খুব বেশি নয়। ফলে সামাজিক বিপ্লব বা পরিবর্তন সাধনে তারাও বড় ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

ইন্টারনেট অশ্লীলতা ছড়াবার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু সবচেয়ে লজ্জা আর আক্ষেপের ব্যাপার হলো মুসলিম সরকার ও রাষ্ট্র এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন নয়। বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ বিশ্বের বিভিন্ন মুসলমান দেশে তাদের নিজ ভাষাভিত্তিক অশ্লীল ওয়েবসাইট এর উপস্থিতি লক্ষণীয়। সম্ভবত আমরা এদের দেখেও না দেখার ভান করছি। ইন্টারনেট ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই সুষ্ঠু নীতিমালা থাকা প্রয়োজন এবং প্রতিটি দেশের সরকারকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে করে জনগণের নৈতিক অধঃপতন রোধ করা সম্ভব হয়।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা ইন্টারনেট প্রযুক্তির ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষ ও গভীর জ্ঞান সম্পন্ন নই যার ফলে এর প্রকৃষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে সুফল ভোগ করতে পারছি না।

উপসংহার

মিডিয়ার ব্যাপারে আবারও এ কথাটাই বলতে হয় যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমের চক্রান্ত একটি অত্যন্ত ভয়াবহ ব্যাপার। মুসলমানেরা সংবাদপত্র, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, রেডিও, ইন্টারনেট প্রভৃতিকে বিরোধী গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চুপ বসে থাকলে পশ্চিমা সংস্কৃতির পদানত হয়ে থাকতে হবে, যা পরোক্ষভাবে মুসলমানদের ধর্মের জন্যও একটি চ্যালেঞ্জ। শুধু নামাজ, রোজা, জিকিরে আসকারে ব্যস্ত থাকলে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে বাধ্য, যা পরকালের শান্তিলাভের আশাকেও সঙ্কুচিত করে দেবে। ইসলামের জীবনমুখীতায় প্রতিটি ভালো কাজই একজন মুসলমানের জন্য এবাদত। পৃথিবীতে ভালো কাজ করা মানে পরকালের বিস্মৃতি নয়, বরঞ্চ এর মাধ্যমেই পরকালের সাফল্য অর্জন। তাই অপসংস্কৃতি থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষা করতে এখনই সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশও ডিশ আর ইন্টারনেটের আগ্রাসন থেকে মুক্ত নয়। পশ্চিমা প্রভুরা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাদের প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব বিপন্ন করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সাম্রাজ্যবাদ। আধিপত্যবাদের নীল শকুন আজ খামছে ধরেছে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা। কাজেই আজ মিডিয়ার ব্যবহার ও আগ্রাসন নিয়ে নতুন করে চিন্তা করার সময় এসেছে। সকল ধরনের গোড়ামী ও পশ্চাতপদ দৃষ্টিভঙ্গি ঝেড়ে ফেলে সৃজনশীল সংস্কৃতি চর্চায় মনোনিবেশ করার মাঝে নিহিত আছে এই একপেশে মিডিয়া যুদ্ধে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরার সম্ভাবনা।

কেবলমাত্র এ মিডিয়া যুদ্ধে বিজয়ই আমাদের বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে পশ্চিমা আগ্রাসন থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। আর এ মিডিয়াই পারে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় আমাদের অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতে। তাই এ ব্যাপারে সকলকে সচেতন হয়ে একতাবদ্ধভাবে প্রচার শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের জন্য সমস্ত বৈরিতাকে জয় করার প্রস্তুতি নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব কাজ শুরু করা হবে। #

www.pathagar.com

রিপোর্ট ঃ জাতীয় সংস্কৃতিক কমিশন ১৯৮৯

বাংলাদেশের সংস্কৃতি

দেশের সংস্কৃতি ক্ষেত্রের সামগ্রিক পরিচয়, তার বর্তমান চাহিদা ও উন্নয়ন এবং ভবিষ্যত বিকাশের লক্ষ্যে যথার্থ দিক নির্দেশনা, কর্মসূচী প্রণয়ন ও সুপারিশমালা পেশ করার জন্য সরকার ২৫ আগস্ট ১৯৮৮ সালে প্রাক্তন শিক্ষা উপদেষ্টা ও ভাইসচ্যান্সেলর প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসানকে চেয়ারম্যান এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি উপদেষ্টা প্রফেসর ডক্টর আলাউদ্দিন আল আজাদকে সদস্য সচিব করে নিম্নোক্ত সদস্য সমন্বয়ে বাংলাদেশ জাতীয় সংস্কৃতি কমিশন গঠন করে। সদস্যরা হচ্ছেন ঃ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন (সাংবাদিক ও সাহিত্যিক), অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (দার্শনিক), এস. কে. আলম চৌধুরী (সংসদ সদস্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য),বেগম লায়লা আরজুমান্দ বানু (সংগীত শিল্পী ও বিশেষজ্ঞ), ড. আশরাফ সিদ্দিকী (প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ), ড. আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন (সাবেক সচিব, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক), সাঈদ আহমদ (প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব ও নাট্যকার), ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল (মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী), ড. এনামুল হক (মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর), জনাব মুস্তাফা মনোয়ার (উপ-মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন), ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী (প্রফেসর, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) এবং আবদুর রাজ্জাক (প্রফেসর, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

এই জাতীয় সংস্কৃতি কমিশনের নির্বাহী সদস্যরা হলেন ঃ চেয়ারম্যান - প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান, সদস্য- ড. আশরাফ সিদ্দিকী, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ড. এনামুল হক, ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী, সদস্য সচিব- প্রফেসর ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ।

কমিশনের কাজের সুবিধার্থে ১১টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এগুলো হলো ঃ

১. **ভাষা ও সাহিত্য** ঃ আহবায়ক- ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সদস্য-বেগম জাহানারা আরজু, আব্দুস সাত্তার ও ড. আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ।

২. **প্রকাশনা ও গ্রন্থাগার** ঃ আহ্বায়ক- ফজলে রাব্বী, সদস্য- চিত্তরঞ্জন সাহা, মহীউদ্দীন আহমদ, আবদুর রাজ্জাক, শাহ মোহাম্মদ নাজমুল আলম, শামসুল আলম ও সাইফুল ইসলাম খান।

৩. **সঙ্গীত ও নৃত্য** ঃ আহ্বায়ক- মোবারক হোসেন খান, সদস্য- লায়লা আরজুমান্দ বানু, আবদুল আহাদ, আমানুল্লাহ চৌধুরী, বারীন মজুমদার ও আলতামাস আহমদ।

৪. **শিল্পকলা** ঃ আহ্বায়ক- অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, সদস্য- মুস্তাফা মনোয়ার, আমিনুল ইসলাম, মোবাশ্বের আলী, সৈয়দ জাহাঙ্গীর ও এ বি এম হোসেন।

৫. **নাটক ও চলচ্চিত্র** ঃ আহ্বায়ক- সাঈদ আহমদ, সদস্য- আলমগীর কবীর, আতিকুল হক চৌধুরী, আরিফুল হক, জ্যোৎনা বিশ্বাস, সৈয়দ সালাউদ্দীন জাকী ও সুকুমার বিশ্বাস।

৬. **ঐতিহ্য** ঃ আহ্বায়ক- অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, সদস্য- ডক্টর মোহাম্মদ আইউব আলী, স্বামী অক্ষরানন্দ, বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো, ডক্টর প্রণবকুমার বড়ুয়া, আর্চবিশপ অব ঢাকা ও ডক্টর সৈয়দ আলী নকী।

৭. **সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ** ঃ আহ্বায়ক- ডক্টর এনামুল হক, সদস্য- প্রফেসর আবু ইমাম, ডক্টর খন্দকার মাহবুবুল করিম, ডক্টর এ কে এম সামসুল আলম, ডক্টর নিজামুল হক ও ডক্টর মাহমুদ শাহ কোরেশী।

www.pathagar.com

৮. **লোক সংস্কৃতি ঃ** আহ্বায়ক- ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, সদস্য- ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ডক্টর আনোয়ারুল করিম, ডক্টর মোহাম্মদ শাহজালাল ও ডক্টর খন্দকার রিয়াজুল হক।

৯. **সংস্কৃতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ঃ** আহ্বায়ক- ডক্টর আবদুল্লাহ আলমুতী শরফুদ্দীন, সদস্য- প্রফেসর মোশাররফ হোসেন খান ও ডক্টর শমসের আলী।

১০. **সংস্কৃতি গবেষণা ঃ** আহ্বায়ক- ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সদস্য- দেবপ্রিয় বড়ুয়া, ডক্টর এনামুল হক ও ডক্টর মাহমুদ শাহ কোরেশী।

১১. **রেডিও ও টেলিভিশন ঃ** আহ্বায়ক- সাইফুল বারী, সদস্য- ম ন মুস্তফা ও মুস্তফা মনোয়ার।

২৯ জানুয়ারি ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত উক্ত কমিশন রিপোর্ট-এর অংশ বিশেষ এখানে ছাপা হলো।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাংস্কৃতিক নীতিমালা চিহ্নিত করতে গিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ইউনেস্কো কতকগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৮২ সালে মেক্সিকো শহরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সিদ্ধান্তগুলো বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসাক্ষরিত হয়। সংস্কৃতির ব্যাখ্যা সূত্রে সম্মেলন ঘোষণা করে ঃ

"ব্যাপকতর অর্থে সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির অথবা সামাজিক গোত্রের বিশিষ্টার্থক আত্মিক, বস্তুগত, বুদ্ধিগত এবং আবেগগত চিন্তা এবং কর্মধারার প্রকাশ। শিল্প ও সাহিত্যই একটি মাত্র সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বস্তু নয়. মানুষের জীবনধারাও সংস্কৃতির অঙ্গ। মানুষের অধিকার মূল্যবোধ, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসও সংস্কৃতির অঙ্গ।"

"সংস্কৃতি মানুষকে নিজের সম্পর্কে চিন্তা করার অধিকার এবং ক্ষমতা প্রদান করে। আমরা যে বিশেষভাবে যুক্তিবাদী মানুষ, যে মানুষের বিচার-বুদ্ধি আছে এবং ন্যায়ের প্রতি আনুগত্য আছে তা আমরা অনুভব করতে পারি সংস্কৃতির মাধ্যমে। সংস্কৃতির মাধ্যমেই আমরা মূল্য নিরূপণ করি এবং ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্বাচন করতে শিখি। সংস্কৃতির মাধ্যমেই নিজেকে প্রকাশ করে, আত্মসচেতন হয়, নিজের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে বোধ জন্মে, নিজের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বোধ জন্মে, নিজের কর্মকান্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শেখে, অনবরত নিজের সীমা অতিক্রম করে দক্ষতা অর্জন করে।"

উক্ত সম্মেলনে সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান বা আইডেনটিটি সম্পর্কে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ ঃ

১. প্রত্যেক সংস্কৃতি জাতিসত্তার ঐতিহ্যকে প্রকাশ করে এবং কতকগুলো পরিবর্তনীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রত্যেক জাতি তার সংস্কৃতির মাধ্যমে পৃথিবীতে তার উপস্থিতিকে সুচিহ্নিত করে।

২. সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানের সুনিশ্চয়তার মাধ্যমে একটি জাতি তার স্বাধীন বোধকে প্রমাণিত করে, অপরপক্ষে বিরোধী সংস্কৃতির আগ্রাসন জাতিসত্তার অভিজ্ঞান ধ্বংস করে।

৩. সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ তার অতীতকে আবিষ্কার করে, অতীতের প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ হয় এবং বাইরের পৃথিবীর কাছ থেকে কল্যাণপ্রদ বস্তু গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়। একটি

www.pathagar.com

জাতি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রেখে পৃথিবীর সকল অঞ্চল থেকেই শুভ ও কল্যাণকে গ্রহণ করে সৃষ্টিধর্মিতার মধ্যে অগ্রসর হতে পারে।

৪. পৃথিবীর সকল প্রকার সংস্কৃতিই মানবজাতির ঐতিহ্য। একটি জাতির সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান বলিষ্ঠ ও তাৎপর্যবহ হয় বিভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে। সংস্কৃতি এক প্রকার সংলাপের মত। সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি সমৃদ্ধমান হয়, বিনিময় না থাকলে যে কোনো সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৫. কোনো একটি একক সংস্কৃতি তার সর্বজনীনতা স্বীকৃত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। পৃথিবীর অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়তেই হবে এবং এ সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে সে তার নিজের অস্তিত্ব প্রমাণিত করবে। সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত।

৬. বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না, বরঞ্চ আদান প্রদান সহজ ও সুন্দর হয়। সংস্কৃতির বহুবচনতা যাকে আমরা ইংরেজিতে বলি প্লুরালিসম বৈচ্যিত্রকে গ্রহণ করেই তৈরি হয়ে থাকে।

৭. মানুষের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতিকে সম্মান করা এবং সংরক্ষণ করা।

৮. একটি জাতির সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা এবং অভিজ্ঞান সংস্কৃতির দ্বারাই চিহ্নিত হয়। মনে রাখতে হবে সংস্কৃতির মাধ্যমে আত্মিক, মানসিক এবং পার্থিব ইচ্ছার বিকাশ ঘটে থাকে। যথার্থ উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিটি মানুষের কল্যাণ। মনে রাখতে হবে সকল উন্নয়নের মূলে রয়েছে মানুষ। সুতরাং কোনো দেশের জন্য সাংস্কৃতিক নীতি-নির্ধারণ করতে গেলে সে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্খাকে এবং জীবনযাপনের ব্যবস্থাকে সম্মান করতে হবে।

৯. সংস্কৃতি জনগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হয় এবং জনগোষ্ঠীর কাছেই প্রত্যাবর্তন করে। সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা অধিকার সকল শ্রেণীর মানুষেই পাবে, কোনো একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষ নয়। সুতরাং সকল মানুষ যাতে সংস্কৃতির সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে সে কারণে সকলের জন্য শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করতে হবে এবং সকলকেই সমান সুযোগের অধিকার দিতে হবে।

১০. একটি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে যে সমস্ত বিষয় গণ্য হবে তা হচ্ছে শিল্পীদের সংগীত, নৃত্য শিল্পীদের নৃত্য ব্যঞ্জনা, বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার এবং অনুসন্ধান কর্ম, মানুষের ধর্মবোধ এবং সেই সমস্ত মূল্যবোধের সুকৃতি যা জীবনকে অর্থদান করে। অধিগম্য এবং অনধিগম্য সকল কর্ম, মানুষের ভাবপ্রকাশের ভাষা, সামাজিক রীতি-নীতি, বিশ্বাস, ঐতিহাসিক নিদর্শন, নৃতত্ত্ব, গ্রন্থাগার সবকিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

১১. পৃথিবীতে বহু দেশে অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে বহু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। শিল্পায়ন ও প্রযুক্তির অপরিকল্পিত প্রয়োগের ফলে সংস্কৃতিতে আঘাত লেগেছে। আবার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ঔপনিবেশিকতা, বৈদেশিক প্রভাব সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত করে। সুতরাং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি দেশ তার স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে।

ইউনেস্কোর উপরিউক্ত বিবেচনাগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা বাংলাদেশে আমাদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারি এবং মূল্য নির্ধারণ করতে পারি। যুগ যুগ ধরে

www.pathagar.com

আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি বলে যা গড়ে উঠেছে তা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। সেই সমস্ত সাংস্কৃতিক লক্ষণগুলোকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করা প্রয়োজন। আমাদের দৃষ্টিতে বহির্বিশ্ব তিনটি ঃ একটি হচ্ছে পাশ্চাত্য জগত, আরেকটি হচ্ছে প্রাচ্য জগত এবং তৃতীয়টি হচ্ছে মুসলিম জগত। এই তিনটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের আদান-প্রদানের প্রয়োজন। এই আদান-প্রদানের মাধ্যমে সংস্কৃতিগতভাবে আমরা লাভবান হব এবং আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আমরা সমৃদ্ধ করতে পারব। পৃথিবীর সকল দেশেই একক সাংস্কৃতিক অনুসন্ধান চলছে এবং ইউনেস্কো সেই অনুসন্ধানে সাহায্য করছে। এই অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে সক্ষম হব আবার সঙ্গে সঙ্গে আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজেদেরকে বর্তমান বিশ্বের সমকালীন করতে পারব। আমরা বর্তমানে যে পৃথিবীতে বাস করছি সে পৃথিবী দ্রুতভাবে আদান -প্রদানের দিক থেকে সংকুচিত হয়ে পড়ছে অর্থাৎ আমরা একে অন্যের খুবই নিকটবর্তী হয়ে পড়ছি। এই নিকটবর্তিতা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আমাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে সুচিহ্নিত করবার প্রয়াস পাব।

বাংলাদেশ কর্কটক্রান্তির ২০.৩৪ ও ২৬.৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮.০১ ও ৯২.৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। দেশটি ভারতীয় ভূখন্ড দ্বারা প্রায় সর্বাংশে পরিবেষ্টিত। দক্ষিণ-পূর্বদিকে বার্মার সঙ্গে বাংলাদেশের কিছুটা সংযোগ আছে। আবার সম্পূর্ণ দক্ষিণ সীমান্ত জুড়ে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার এবং এর প্রায় সবটাই সমতল। মূলত বাংলাদেশ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র মেঘনার একটি বদ্বীপ। বাংলাদেশে কিছুটা পাহাড়ি অঞ্চল আছে উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণে, প্রধানত চট্টগ্রাম এলাকায়। সমগ্র দেশটি বহু নদী এবং শাখা নদীতে পরিপ্লাবিত। বাংলদেশ গ্রীষ্মমন্ডলে অবস্থিত। বছরে গড়ে এর উত্তাপ ১৮.৯ সেলসিয়াস্ থেকে ২৯ সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়। বছরে বৃষ্টিপাত পশ্চিমাঞ্চলে ১৬০ সেন্টিমিটার থেকে ২০০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ও দক্ষিণ পূর্বে ২০০ থেকে ৪০০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত এবং উত্তর-পূর্বে ২৫০ থেকে ৪০০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত। বাংলাদেশে ছয়টি ঋতুঃ গ্রীষ্ম, বর্ষা শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত প্রতি দুই মাস নিয়ে এই ঋতু বিভাজন, তবে শরৎ ও হেমন্তের অবস্থান খুবই ক্ষণকালীন এবং গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ও বসন্তই মুখ্য ঋতু হিসেবে পরিলক্ষিত।

সমগ্র বাংলাদেশকে একটিমাত্র সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভিন্নতর সাংস্কৃতিক নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসহ কিছু নৃত্য ও গীত আছে যেগুলো মূল সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য এনেছে। সাংস্কৃতিক স্বভাব এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালায় একটি ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। অল্পবিস্তর কিছু পার্থক্য থাকলেও মূলত সমগ্র দেশটি একটি সাংস্কৃতিক বৃত্তে আবদ্ধ। ধর্মভিত্তিক বিভাজন ছাড়া এখানকার জনগোষ্ঠীকে নৃতাত্ত্বিকভাবে বিবিধ গোত্রে ভাগ করা যায় না। এদেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে এক বিস্ময়কর মিশ্রণ ঘটেছে যার ফলে বর্তমান শারীরিক গঠনের দিক থেকে, আচার অনুষ্ঠানের দিক থেকে, পারিবারিক ব্যবস্থাপনা এবং সম্পর্কের দিক থেকে খুব বেশি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। ভাষার দিক থেকে বাংলা ভাষাই সকল অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় এরকম আঞ্চলিক উপভাষা খুবই কম। একমাত্র চট্টগ্রামের

www.pathagar.com

আঞ্চলিক উপভাষার কিছু বিশিষ্টতা আছে। বস্তুতপক্ষে সকল আঞ্চলিক উপভাষার উৎস একই অর্থাৎ বাংলা ভাষা। শুধুমাত্র উপজাতীয়দের কিছু কিছু ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী রয়েছে। এই উপজাতীয়দের অধিকাংশই চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বিভিন্ন উপকরণের মিশ্রণ ঘটেছে। স্থানীয় লৌকিক উপকরণের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু উপকরণ সংমিশ্রণ হয়েছে। ধর্মীয় প্রভাবটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রধান এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্ম হিসেবে ইসলামের প্রভাব বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে একটি প্রবল প্রভাব। এর সঙ্গে হিন্দু প্রভাব, বৌদ্ধ প্রভাব এবং খৃস্টান প্রভাব মিলিত হয়েছে।

মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ১৯৮২ সালের সম্মেলনের একুশ সংখ্যক প্রস্তাবে বলা হয় যে, যুবকদের চরিত্র এবং মানসিকতা গঠনের জন্য ধর্ম এবং আত্মিক আদর্শ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর সকল দেশেই এই গুরুত্ব অল্প বিস্তর তারতম্যসহ বিদ্যমান। সেই কারণে ইউনেস্কো মনে করে যে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক চৈতন্যের মূলে ধর্মের প্রভাব আছে। সুতরাং পৃথিবীর সকল দেশের কর্তব্য হচ্ছে ধর্ম ও আত্মিক চৈতন্যকে যথার্থ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক নীতিমালা নির্ধারণের সময় ধর্মের স্থান সম্পর্কে সচেতনভাবে চিন্তা করা। সুতরাং এক্ষেত্রে ইউনেস্কোর প্রস্তাব হচ্ছে ঃ

১. একটি দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সে দেশের ঐতিহাসিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা।
২. সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আত্মিক চৈতন্যকে পূর্ণ মর্যাদা প্রদান।
৩. ধর্মের একটি আন্তর্জাতিক বিশিষ্টার্থক এবং সর্বমানবাদী রূপ আছে। সেই রূপকে সংরক্ষণ করা এবং তার সঙ্গে সংস্কৃতিকে সমন্বিত করা।
৪. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংস্কৃতিতে যে আত্মিক মূল্যবোধ বা স্পিরিচুয়াল ভ্যালুজ রয়েছে আপনাপন সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে সে মূল্যবোধকে মর্যাদা দেয়া।

ইউনেস্কোর সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, আমাদের দেশের সামগ্রিক জনসাধারণের কাছে ধর্মীয় বিশ্বাস সংস্কৃতির অঙ্গনে একটি জীবন্ত শক্তিরূপে সক্রিয়।

বাংলাদেশে প্রধানত ধর্মীয় বিশ্বাস এবং প্রেরণা সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃস্টান সকলের ক্ষেত্রেই ধর্মবিশ্বাসটি জীবনের প্রেরণার উৎস। এদেশের বিভিন্ন উৎসবের উৎস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, সেগুলো প্রায় সব কটিই ধর্মভিত্তিক। ধর্মভিত্তিক হয়েও সকল উৎসব আয়োজনের মধ্যে একটি উদারতা, সহনশীলতা এবং সকর শ্রেণীর মানুষকে এক সঙ্গে গ্রহণ করার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আমরা বাংলাদেশের ইতিহাস আলোচনা করে বাংলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্টসমূহ উপস্থাপনার প্রয়াস পাব।

সংস্কৃতি শব্দটির অর্থ অত্যন্ত জটিল। সংস্কৃতির সঙ্গে জীবনের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মানুষের জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্প, নীতিবোধ, আইনকানুন, প্রথা এবং আরো বহুবিধ বিষয় যার সাহায্যে মানুষ একটি সমাজ এবং একটি জাতির সদস্য হয়। মানুষের কর্মসাধনের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির স্বভাব নিহিত থাকে, মানুষের উচ্চারণের মধ্যে সংস্কৃতির স্বভাব নিহিত থাকে এবং মানুষের আদর্শের মধ্যে সংস্কৃতির প্রজ্ঞা বহমান থাকে। প্রতিদিন

www.pathagar.com

মানুষ যে জীবন-যাপন করছে সে জীবন-যাপনের কর্মপ্রভাবই সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। এভাবে মানুষের ক্ষমতা এবং অক্ষমতার প্রকাশিতভঙ্গির মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির রূপরেখা চিহ্নিত হয়। মানুষ দলবদ্ধভাবে বাস করে। অর্থাৎ মানুষের সামাজিক একটি জীবন আছে, সংসারের একটি প্রেক্ষাপট আছে। সংসার, সমাজ, জাতি এবং দেশের একটি পরিচয় নিয়ে মানব সংস্কৃতির উদ্ভব এবং বিকাশ।

এই সংস্কৃতির অনুসন্ধান করতে হলে মানবজাতির অতীত অনুসন্ধান করা কর্তব্য। যেহেতু সংস্কৃতির মাধ্যমে মানব সমাজকে সুনির্দিষ্ট সমাজ গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায় সেজন্য সংস্কৃতির একটি আঞ্চলিক রূপরেখা আছে। এই আঞ্চলিক রূপরেখার মধ্যে ইতিহাস-পূর্ব অতীত আছে, ঐতিহাসিক সময়ের উন্মেষ আছে, ক্রমধারা আছে, বহিরাগত ভাবপ্রবাহের স্পর্শ আছে, বর্তমানের চিত্র আছে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আছে। এভাবেই আমরা একটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ভূ-মন্ডল চিহ্নিত করে সংস্কৃতির ইতিহাস নির্মাণ করতে পারি। যে অঞ্চলের কথাই আমরা বলি না কেন সে অঞ্চলের সংস্কৃতির একটি বিবর্তন এবং ধারাপ্রবাহ আছে। ইতিহাস-পূর্ব যুগ যে স্বভাব প্রকাশিত ছিল, পরবর্তীতে সে স্বভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। আবার পরিবর্তিত স্বভাবের মধ্যে ক্রমশ বহির্বিশ্বের বিচিত্র কল্লোল এসে মিলিত হয়েছে। এভাবে দেখা যাবে যে কোনো সংস্কৃতির সীমিত রূপব্যঞ্জনা নেই। বর্তমানে সংস্কৃতির যে রূপরেখা পাই তা প্রাচীন কাল থেকে একক কোনো প্রবৃত্তিকে বহন করে প্রকাশিত নয়। নানাবিধ উপায়ে এবং কারণে সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। একটা বিশেষ অঞ্চলে কোনো এক মানবগোষ্ঠী কিছুকাল অবস্থান করে, পরে সেই অঞ্চলে নতুন সমাজ গঠিত হয়। এভাবে পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। এই পরিবর্তনের ফলে একটি অঞ্চলভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংগ্রহ গড়ে ওঠে যা ক্রমশ আমরা আবিষ্কার করি। কোনো একটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ভূ-দৃশ্য বহুকালের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর দ্বারা রচিত হয়ে ওঠে। একটি মানবগোষ্ঠীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা অতীত সংস্কৃতির পুঞ্জিভূত কিছু উপাদান পাই এবং ক্রমশ বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার সাহায্যে আমরা সংস্কৃতির ক্রমধারা এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বিবর্তনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারি। এভাবে একটি অঞ্চলের সংস্কৃতির ইতিহাস আমরা আবিষ্কার করি। যে কোনো দেশের সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করতে গেলে সে দেশের সংস্কৃতির ইতিহাস নির্ণয় করা একান্ত কর্তব্য। যে কোনো দেশের অথবা অঞ্চলের সংস্কৃতির একটি উৎস আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বিস্তারও আছে। বর্তমান সংস্কৃতির রূপরেখা নির্ধারণের জন্য এই উৎস সন্ধান করা একান্ত কর্তব্য। দেখা যাবে যে বিবিধ পরিবর্তন ঘটলেও যে কোনো অঞ্চলের অথবা দেশের সংস্কৃতির একটি প্যাটার্ণ বা ভঙ্গি আছে। শুধুমাত্র বর্তমানকে বিশ্লেষণ করলে সেই প্যাটার্ণকে আবিষ্কার করা যায় না। সেজন্য প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে আমরা অতীতকে খনন করি। প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যেই সংস্কৃতির উৎস এবং বিস্তার সংক্রান্ত নানাবিধ মূল্যবান তথ্য আমরা পেয়ে থাকি। খননকার্য চালিয়ে মাটির নিচ থেকে অট্টালিকা আবিষ্কৃত হয়েছে, দ্রব্যসামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বহুবিধ হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। আমরা অনুসন্ধান করে জানতে পারি অতীতে কোন বিশেষ পরিবেশে এগুলো নির্মিত হয়েছিল এবং কোন তাৎপর্যে এগুলো ব্যবহৃত হয়েছিল। যদিও প্রত্মতত্ত্বের অনেক অনুসন্ধান অনুমান নির্ভর কিন্তু বর্তমানে আমরা বহুবিধ অনুমানের নিরিখে একটি সত্যের উদঘাটন প্রায় করে ফেলেছি। বৈজ্ঞানিকভাবে উদ্ধারকৃত বস্তুর কাল

www.pathagar.com

নিরূপণের ব্যবস্থা হয়েছে। ইংরেজিতে যাকে ডেটিং বলে সেই কাল-নিরূপণ প্রত্নতত্ত্ববিদদের কাছে একটি বিরাট কৌশল। তারা একটি সংস্কৃতির উৎস এবং প্রসার কাল-নিরূপণের সাহায্যে করে থাকেন। অতীতের অঞ্চল বিভাগ এবং বর্তমানের অঞ্চল বিভাগ এক নয়। অতীতের ভৌগলিক সীমাবন্ধন সংকীর্ণ ছিল, কিন্তু বর্তমানে ভৌগলিক সীমাবন্ধন অত্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্তমান সীমাবন্ধন অতীতকে কেন্দ্র করেই প্রসারিত এবং চিহ্নিত। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ভূ-মণ্ডল তার অতীতের উৎস থেকে উদ্ভূত এবং বিকশিত। এদেশের বর্তমান সীমাবন্ধনটিও অতীতের সীমাবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। সুতরাং এদেশের সংস্কৃতির ভৌগলিক সীমাবন্ধন চিহ্নিতকরণ খুব বেশি অসুবিধার সৃষ্টি করে না। যদিও এক সময় বঙ্গ অঞ্চলের ভৌগলিক সীমারেখা তার নিজস্ব ত্রিসীমাকে অতিক্রম করে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এবং বঙ্গ অঞ্চলের সংস্কৃতি অন্যান্য অঞ্চলেও প্রভাব বিস্তার করেছিল, কিন্তু ক্রমশ ভাষাভিত্তিক গোত্রবদ্ধতায় এই সংস্কৃতির ভূ-খণ্ড সীমাবদ্ধ হয়। বর্তমানে বাংলাদেশকে সেই সীমাকরণের মধ্যে আবিষ্কার করছি।

আমরা বাংলাদেশের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখতে পাব যে এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক উপাদানের উৎপত্তির একটি কাল এবং স্থান আছে, দ্বিতীয়ত এই সমস্ত উপাদানের বিকাশ এবং বিস্তৃতির সময়কাল এবং প্রকৃতি আছে। তৃতীয়ত এখানকার সংস্কৃতি বিকাশের প্রবৃত্তির মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতির বিস্তার আছে। চতুর্থত এ অঞ্চলের সংস্কৃতির ভূ-দৃশ্যের একটি রূপরেখা এবং বৈশিষ্ট্য আছে। এভাবে এ অঞ্চলের সংস্কৃতির ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, কৃষি ও বিজ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মানুষ, সমাজ এবং সংস্কৃতি একই সঙ্গে বিকাশলাভ করে। অর্থাৎ মানুষের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের এবং সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটতে থাকে। এরা একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। এককভাবে কারোরই উদ্ভব সম্ভবপর নয়। মানুষ সংস্কৃতিকে নির্মাণ করে এবং সংস্কৃতির উপাদানগুলি আহরণ করে। মানুষ প্রথমে সমাজে বাসের উপযুক্ত হয় এবং সংস্কৃতিকে ব্যবহার করতে শেখে। এখানে কিছুটা সীমাবদ্ধতা অবশ্যই বিদ্যমান। অর্থাৎ মানুষ সংস্কৃতির কতটা গ্রহণ করতে পারবে অথবা সংস্কৃতিকে কিভাবে নির্মাণ করতে পারবে তার উপরই নির্ভর করছে একটি সংস্কৃতির সমৃদ্ধি। মানুষ কর্মক্ষম হয় এবং সংস্কৃতিকে ব্যবহার করতে শেখে। এই ব্যবহারের ফলে মানুষ তার সমাজকে নির্মাণ করে এবং সমৃদ্ধ করে। আমরা আমাদের দেশের প্রাগৈতিহাসিক কালের সুস্পষ্ট ইতিহাস জানি না, কিন্তু এটা জানি যে এতদঞ্চলের মানুষ ভিন্নতর সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। আর্যরা ভারতবর্ষে আগমন করেছিল একটি নতুন সংস্কৃতি নিয়ে। সমগ্র উত্তর ভারত তাদের করায়ত্ত হয়েছিল। তাদের প্রভাব ও অহমিকায় ভারতবর্ষে একটি নতুন সংস্কৃতির জন্ম হয়েছিল। তারা আনুগত্যের আহবান জানিয়েছিল সকল জাতিকে এবং মানবগোষ্ঠীকে। যে জাতি তাদের এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিল তা বঙ্গজাতি। এই প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে একটি দুর্দান্ত সাহস আমরা লক্ষ্য করি। আমাদের সংস্কৃতির উৎসমূলে বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেন তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল সে ইতিহাস আমাদের জানা নেই, তবে আমরা অনুভব করতে পারি যে আপন অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমাবন্ধনকে অক্ষুণ্ন রাখবার জন্য তারা নিজস্ব সত্ত্বার মধ্যে

www.pathagar.com

নিমজ্জিত থাকতে চেয়েছিল; যার ফলে এ অঞ্চলের সমাজ বন্ধন এবং ভাষার বিকাশ আর্যাবতের অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে ভিন্নতর হয়েছিল। এই ভিন্নতা সবসময় রক্ষা করা সম্ভবপর হয়নি, কিন্তু যতটা সম্ভব আপন স্বকীয়তা বজায় রাখার চেষ্টায় এতদঞ্চলের মানুষ অনেকটা সফলকাম হয়েছিল।

একটি সংস্কৃতিতে বিবিধ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। এই লক্ষণগুলি সৃষ্টি হয় সংস্কৃতির বিকাশের মাধ্যমে। আর্যদের আগমনের সময়ে বঙ্গভূমির লোকেরা আপন সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকবার চেষ্টা করলেও পরবর্তীতে এ অঞ্চলের সংস্কৃতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। পালদের আমলে বঙ্গ-সংস্কৃতির ভূ-খন্ড বিস্তৃতি লাভ করে। এই বিস্তারের ফলে ভৌগলিক সীমারেখা ভেঙে যায় এবং জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে এ অঞ্চলের সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রা অর্জিত হতে থাকে। আমরা জানি মানুষের অর্জিত আচরণ সংস্কৃতির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ে একটি নতুন সংস্কৃতি জন্মলাভ করতে পারে। বঙ্গবাসীরা তিব্বতে গিয়েছে, ব্রহ্মদেশে গিয়েছে, উত্তর ও পশ্চিম ভারতে নিজেদের প্রভাব বলয় বিস্তার করেছে। এর সাহায্যে অন্য সংস্কৃতিকে তারা দিয়েছেও যেমন, তেমনি নিজেরাও অর্জন করেছে অনেক কিছু। এভাবে বলতে পারি বিভিন্ন প্রলক্ষণ সমন্বিত হয়ে সেই প্রাচীনকাল থেকে এ অঞ্চলের সংস্কৃতির রূপরেখা নির্মিত হয়েছিল। বিশেষ করে এতদঞ্চলের চিত্রকলার কথা এক্ষেত্রে আলোচনা করা যায়। বঙ্গের চিত্রকলার বিশেষ কতকগুলি প্রলক্ষণ ছিল। সেগুলো পশ্চিম ভারত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং উত্তরে নেপাল ও তিব্বতের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। এই ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই চিত্রপদ্ধতিতে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয় এবং নতুন অর্জিত কৌশলে ক্রমশ এর রূপের পরিবর্তন হতে থাকে। আমরা যদি এ চিত্রকলার রং-এর ব্যবহার এবং আকৃতির গঠনতত্ত্ব পরীক্ষা করি তাহলে দেখব যে, প্রাথমিক রূপ থেকে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে এই চিত্রকলা নতুন শোভা ও প্রতাপের অধিকারী হয়েছে। এখানে বলবার কথা এই যে, একটি সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতির প্রবল গ্রাস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে এটা সত্য, কিন্তু আবার নিজেই যখন অন্য সংস্কৃতির দিকে প্রভাবিত হয় তখন তা নতুন নতুন প্রলক্ষণ অর্জন করে। প্রাচীনকালের বঙ্গসংস্কৃতিও নিজস্ব উৎসকে রক্ষা করেই বাইরের প্রভাবকে স্বকীয় করেছে এবং আপন সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রা সংযোজিত করেছে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ভাষা। মানুষের অনুভূতি এবং প্রতিক্রিয়া ভাষার সাহায্যে উন্মুক্ত হয়। যে পরিবেশে মানুষ বাস করে সে পরিবেশে প্রতিনিয়ত তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং এই প্রতিক্রিয়া ভাষা এবং উচ্চারণের মাধ্যমে বিকাশলাভ করে। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে একটি অঞ্চলের সংস্কৃতি সে অঞ্চলের ভাষার প্রকৃতিতে প্রভাব বিস্তার করে। এভাবে আমরা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতির একটা ইন্টাররিলেশন বা পারস্পরিক সম্পর্ক খুঁজে পাই। ভাষা একই সঙ্গে দুটি দায়িত্ব পালন করে–ভাষা যেমন মানুষের অভিজ্ঞতাকে বহন করে এবং অভিজ্ঞতার বিভিন্ন উপকরণকে ধারণ করে, আবার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিধর্মী প্রতীক ব্যঞ্জনা হিসেবে রূপলাভ করে অর্থাৎ ভাষাকে আমরা অভিজ্ঞতার সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকি। সংস্কৃতির উপকরণগুলো ভাষা বহন করে আবার সংস্কৃতিতে ভাষা নতুন নতুন চৈতন্য দান করে। বিখ্যাত ভাষাবিদ এডওয়ার্ড সাপির ভাষাকে এই দুটি প্রযুক্তিতে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। ভাষার সঙ্গে মানুষের পারসেপশন বা অনুভূতির নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। এই পারসেপশনগুলো কর্মভিত্তিক এবং

www.pathagar.com

উপকরণভিত্তিক। জীবন ক্ষেত্রে যে উপকরণগুলো থাকে এবং কর্মের দায়ভাগ থাকে সেগুলোকে স্পর্শ করেই একটি ভাষা সজীব এবং সক্রিয় হয়। বাংলা ভাষার আদি কবি সহরপার ভাষা পরীক্ষা করলে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলবে। সরহপা পূর্বী অপভ্রংশে তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। সেই কাব্যের মধ্যে আমরা তৎকালীন মানুষের আচার-নিষ্ঠার পরিচয় পাই, কুসংস্কারের পরিচয় পাই, জীবন-যাপনের বিভিন্ন উপকরণের সন্ধান পাই, আবার বিভিন্ন আদর্শের বিস্তার পাই। সব কিছু মিলে সরহপার ভাষা তার সময়কালের বঙ্গ-সংস্কৃতির চিহ্ন ধারণ করে আছে। সরহপা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং প্রথাগত ধর্মার্চনারও বিরোধী ছিলেন। তিনি সতত মানবতার সেবায় উন্মুক্ত ছিলেন। সরহপার বিচারে মানুষের একমাত্র পরিচয় তার মনুষ্যত্বের দ্বারা। সরহপা আরো বলেছেন যে একটি জীবনের কোনো কিছুই হারায় না। যেমন, নদীর পানি বাষ্প হয়ে মেঘ হয়, আবার বৃষ্টি হয়ে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে, তেমনি মানুষের জীবনের কর্মকাণ্ড মানুষকে নিয়েই। এখানে কোনো বিচ্যুতি এবং অপলাপ নেই। বৌদ্ধ ধর্মের বিনয়, সান্ত্বনা এবং ত্যাগ তাকে প্রভাবিত করেছিল এবং এভাবে আমরা সংস্কৃতির মধ্যে ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করি। সরহপা যে সমাজের বিবরণ দিয়েছেন সে সমাজে জাতিভেদ ছিল, কুসংস্কার ছিল, কিন্তু সরহপা এগুলোর মূলোচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন। তিনি কোনো ধর্মের প্রবর্তনার কথা বলেননি কিন্তু আচরণের সহিষ্ণুতার কথা বলেছেন। পরবর্তীতে বঙ্গভূমিতে বৈষ্ণব মতবাদ এবং সুফী মতবাদ যে প্রাধান্য পেয়েছিল তার পশ্চাতে সরহপার চিন্তা এবং ভাবনা কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। আমাদের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন যে এদেশের মানুষের নীতিবাদ এবং ধর্ম বিশ্বাসের পশ্চাতে কোন আদর্শ সক্রিয় ছিল। যুগ যুগ ধরে যে সহনশীলতা এখানকার ধর্ম আচরণের মূলে কাজ করেছে তার মধ্যে তিনটি বিশ্বাসই প্রধান-একটি হচ্ছে বৌদ্ধধর্মের সংক্ষুব্ধতাহীন আত্মনির্ভর, বিনয় এবং ত্যাগ, দ্বিতীয়ত বৈষ্ণবীয় প্রেম এবং অহমিকাশূন্য আত্মনিবেদন, তৃতীয়ত ইসলামের সুফী সাধনার স্বার্থহীনতা, প্রেম, আত্মত্যাগ এবং সমন্বয়বাদ। এটা সত্য বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিকাশের একটি পর্যায়ে বহিরাগত সেন রাজাদের একটি নিষ্ঠুর অহমিকা সংক্ষুব্ধ আগন্তুক হিসেবে এ অঞ্চলের সমাজব্যবস্থা বিনষ্ট করতে চেয়েছিল, কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খিলজির আগমনের ফলে সেনদের প্রভাব প্রশমিত হয় এবং একটি নতুন সংস্কৃতির সম্ভার আমরা অর্জন করি। সেনদের আমলে সংস্কৃতি ছিল এতদঞ্চলের মানুষের উপর শাসনের প্রভাবে আরোপিত একটি সংস্কৃতি। সেনরা এদেশে শ্রেণীভেদ প্রথা নতুন করে প্রবর্তন করেন, অপভ্রংশের পরিবর্তে সংস্কৃতিকে নতুন ভাষা হিসেবে প্রচলিত করেন এবং উপাসনার জন্য নতুন স্থাপত্যরীতির গৃহ নির্মাণ করেন। এগুলো এদেশের মৌল বিবেচনা এবং কাঠামোকে আঘাত করেছিল, কিন্তু তাই বলে এগুলো যে সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে তা বলা যায় না। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে আরোপিত সংস্কৃতিও মানুষ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অর্জন করতে থাকে এবং তার প্রলক্ষণগুলো সংস্কৃতির মধ্যে আবিষ্কার করা যায়। সংস্কৃতির একটি পরিচয় পাওয়া যায় স্থাপত্যশিল্পে এবং গৃহ-নির্মাণ প্রকল্পে। পালদের আমলে স্থাপত্যের নিদর্শন ছিল বৌদ্ধবিহার এবং স্তূপ। এগুলোর গঠন প্রণালীর দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে। বৌদ্ধরা নিঃসংশয়বাদী, সংসারত্যাগী এবং নির্জনতাপ্রিয়। সুতরাং তাদের সাধন ক্ষেত্রের সঙ্গে কোলাহল মুখরিত পৃথিবীর কোনো সম্পর্ক নেই। তারা যে সমস্ত

www.pathagar.com

বিহার, চৈত্য এবং স্তূপ নির্মাণ করেছিলো সেগুলোর গঠন পদ্ধতি এমন ছিল যে বাইরের আলো-বাতাস সেখানে প্রবেশ করতে পারতো না। তাদের জীবন দর্শন একথা বিজ্ঞাপিত করতো যে ধর্ম সাধনা বাস্তব পৃথিবী বিবর্জিত। সুতরাং পৃথিবীর কোলাহল এই সাধনায় যেন বিঘ্ন উৎপাদন না করে। হিন্দুদের মন্দিরের ক্ষেত্রে কিছুটা উন্মুক্ততা থাকলেও গর্ভগৃহের কিছুটা অবরুদ্ধতা ছিল, তবে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের কল্লোলে বাইরের মানুষকে আকর্ষণ করবার একটি ব্যবস্থা ছিল। বখতিয়ার খিলজির আগমনের পর এদেশে নতুন স্থাপত্য রীতির প্রবর্তন হয়। এক প্রকার উন্মুক্ততা স্থাপত্য রীতির নির্দেশনায় ব্যবহৃত হতে থাকে। মসজিদের মধ্যে বাইরে আলো-বাতসকে প্রবহমান রাখা একটি সামাজিক এবং ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা– এই উন্মুক্ততার অভ্যন্তরের অংশকে উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান করছে। নতুন রীতির স্থাপত্য এভাবে গঠিত হলেও পাল ও সেন আমলের নিরুদ্ধভঙ্গি একেবারে অন্তর্হিত হয়নি। এখানে আমরা মৌলিক রীতির সঙ্গে অর্জিত রীতির মিশ্রণ দেখি এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নতুন প্রলক্ষণের সংযোজন লক্ষ্য করি। আধুনিক কালে অবশ্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার দিক লক্ষ্য রেখে স্থাপত্য রীতির পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। কোনো কোনো স্থাপত্যরীতি পুরোপুরি ব্যবহারিক। এক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনার প্রয়োজন যে আমাদের নিজস্ব স্থাপত্যরীতি কোনটি এবং কিভাবে তা আধুনিক ব্যবহারিক রীতির সঙ্গে সমন্বিত হতে পারে।

সঙ্গীত এবং নৃত্যের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির প্রকাশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মানুষের ইচ্ছা ও আনন্দের সংকল্পকে সঙ্গীত ও নৃত্য বহন করে থাকে। প্রাচীন অতীত থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময় পর্যন্ত এ উভয়বিধ শিল্প মাধ্যম আমাদের সংস্কৃতিকে ধারণ ও পোষণ করেছে। এর ইতিহাস পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়নি। এই উপমহাদেশের সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে সঙ্গীত এবং নৃত্যের যে রূপরেখা বিদ্যমান তার সঙ্গে এতদঞ্চলের সঙ্গীত এবং নৃত্যের পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যকে স্মরণে রেখে এখানকার সঙ্গীত এবং নৃত্যের যথার্থ ভাবপ্রকল্পের উন্মোচন প্রয়োজন। দেখা যায় যে সরহপার সময় তার দোহাগুলো বিশেষ ভঙ্গিতে গীত হত। কিছু কিছু রাগ-রাগিণীর উল্লেখ সে সমস্ত দোহায় আছে। সমসাময়িক কালে এবং কিছুটা অব্যবহিত পরে চর্যাগীতিকায় বিভিন্ন রাগের অনুশীলন পাওয়া যায়। চর্যাগীতিকায় নৃত্যেরও উল্লেখ আছে। এগুলো কতটা ভারতীয় মার্গসঙ্গীত এবং নৃত্যের সহগামী অথবা পৃথক তা নির্ধারণ করা আমাদের কর্তব্য এবং নির্ধারিত হলে এগুলোর চর্চা এবং অনুশীলনের কি ব্যবস্থা হবে তারও নির্দেশনা প্রয়োজন। আধুনিক কালে বর্তমানতার শাসনে সঙ্গীত এবং নৃত্যের ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রবৃত্তি জন্মলাভ করেছে সেগুলো কতটা সমীচীন এবং সমর্থনযোগ্য তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। আমরা লক্ষ্য করি যে পৃথিবীতে সর্বদাই সাময়িকতার প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়। এগুলো অধিকাংশ সময়ই হারিয়ে যায়। কিন্তু কখনো কখনো মোহগ্রস্ত হয়ে আমরা এগুলো আঁকড়ে রাখবার চেষ্টা করি। একটি জাতির সংস্কৃতির দিক-নির্দেশনার ক্ষেত্রে এই আধুনিকীকরণকে কতটা সমর্থন যোগ্য বিবেচনা করা যায় তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। আমাদের ধ্রুপদীসঙ্গীত এবং নৃত্য কোন স্বভাবের এবং তাৎপর্যের তা নির্ধারণ করা যেমন প্রয়োজন তেমনি এগুলোর প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলনের ব্যবস্থাপনা ও রূপ রীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

লোকসংস্কৃতি আমাদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আধুনিক সভ্যতার প্রতাপে এবং শাসনে লোকসংস্কৃতি ক্রমশ অন্তর্নিহিত হচ্ছে। এজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লোকসংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে। সুইডেন, নরওয়ে, জার্মানী, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

www.pathagar.com

সকলেই চেষ্টা করছে আপনাপন দেশের লোকসংস্কৃতি আবিষ্কারের জন্য এবং সংরক্ষণের জন্য। বিভিন্ন দেশে লোকসংস্কৃতির ভূগোল এবং অঞ্চল চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। আমাদের দেশে যদিও পাশ্চাত্যের অনুপাতে বিজ্ঞান এবং যন্ত্রের প্রতাপ খুব বেশি নয় তবু কালক্রমে আধুনিকীকরণের প্রয়াসে আমাদের লোকসংস্কৃতিও ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে। এক্ষেত্রে আমাদের সংস্কৃতির রূপরেখা নির্ধারণের জন্য লোকসংস্কৃতি বিষয়ে প্রচুর গবেষণা এবং অনুসন্ধানের প্রয়োজন। মানুষের খাদ্য স্বভাব, খাদ্য আহরণ, কৃষি, বনভূমি সংরক্ষণ, নদী এবং মানুষের সঙ্গে নদীর সম্পর্ক, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সংস্কার এগুলো নিয়ে আমাদের লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। সুতরাং লোকসংস্কৃতি অনুসন্ধানের সাহায্যে আমরা একটি জাতির চৈতন্যকে উদ্‌ঘাটন করতে পারি। বর্তমানে লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং প্রচারের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থাপনা আছে তা কতদূর শক্তিশালী তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এ সমস্ত ক্ষেত্রে নতুন কি কি ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা কর্তব্য তাও আমাদের চিন্তা করতে হবে। একটি জাতি তার জনসমষ্টিকে নিয়েই বেঁচে থাকে এবং জনসমষ্টির জীবনযাপনের এবং আনন্দ উৎসবের উপকরণগুলো ক্রমশ স্খলিত হয়ে যাক তা আমরা চাই না। জনসাধারণকে গ্রহণ করে একটি মানবগোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিকাশ এবং বিস্তার। আমাদের সংস্কৃতির যথার্থ রূপরেখা নির্ধারণকল্পে আমাদের লোকসংস্কৃতি অনুসন্ধান করা কর্তব্য এবং আধুনিক সমাজ জীবনের মধ্যে এ সংস্কৃতির ধারাপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখা কর্তব্য।

প্রত্নসম্পদ তথা সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের সাহায্যে আমরা একটি জাতির ইতিহাসকে যেমন ধারণ করি তেমনি ঐতিহাসিক বিবেচনাকে নতুন মূল্যমান দিয়ে থাকি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য যাদুঘর সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এক্ষেত্রে মিশরের প্রত্নতত্ত্ব অনুন্ধানের প্রক্রিয়া এবং যাদুঘরের কাহিনী বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচ্য। মিশরের একটি বিরাট অতীত আছে সে অতীতের অনুসন্ধান নিয়ে খনন কার্য নিত্যই চলছে। সে অতীত এত দীর্ঘ অতীত যে বর্তমানকালের আঘাতে তাকে কোনোক্রমেই নিশ্চিহ্ন করা যায় না। মিশরীয় সভ্যতা তার অতীতকে গ্রহণ করেই সমৃদ্ধ, বিপুল এবং অবক্ষয়হীন। বর্তমান কাল অতীতকে প্রবলভাবে ধরে রেখেছে এবং তাকে একটি সুনিশ্চয় প্রত্যয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমাদের দেশে এখনও প্রত্নতত্ত্ব এবং যাদুঘরের প্রতাপ পরিলক্ষিত হয় না। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। সেজন্য আমাদের সংস্কৃতির রূপরেখা নির্ধারণের জন্য প্রত্মানুসন্ধান বিষয়ে গভীর সমীক্ষা প্রয়োজন। কোন প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় এই কার্যধারায় গতিবেগ সঞ্চার করা যায় এবং কিভাবে এদের কার্যপ্রণালীর দুর্বলতা দূর করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে যাদুঘর গড়ে তোলা এবং সেগুলোকে সমন্বিত প্রশাসনের মধ্যে নিয়ে আসা একান্ত কর্তব্য। যাদুঘর একটি জাতির ইতিহাসকে ধারণ করে এবং শ্লাঘার কারণ হিসাবে সকল বিশ্বকে প্রদর্শন করায়। এক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে যাদুঘরকে সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন। যাদুঘর বিকাশের বিভিন্ন দিক আছে। এ সমস্ত দিকের প্রতি আমাদের লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। কি বিন্যাসে একটি যাদুঘর গড়ে উঠবে সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন।

সংস্কৃতিকে শাসন এবং পরিবর্তন করে মানুষের কর্মদক্ষতা। সেই কর্মদক্ষতা আবার নির্ভর করে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উপর। মানুষ যে প্রকৃতির উপর তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অনবরত বৃদ্ধি করে চলেছে তার সাহায্যে সে তার পরিবর্তন সাধন অব্যাহত রেখেছে।

www.pathagar.com

আদি মানুষ তার কর্ম সম্পাদনের একমাত্র উপকরণ হিসাবে পেয়েছিল প্রস্তর ও শিলাখণ্ড। সুতরাং সেই আদিমকালে তার বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ছিল প্রস্তরভিত্তিক। তাই আমরা মানব সংস্কৃতির প্রাথমিক ধারায় প্রস্তর যুগকে পাই। প্রস্তর যুগের মানুষ তার যন্ত্রপাতি হিসেবে যা কিছু নির্মাণ করেছে তার অধিকাংশই সে প্রস্তর ও শিলাখণ্ড দ্বারা নির্মাণ করছে। অবশ্য হাড়ের ব্যবহারেরও প্রচলন ছিল। হরিণের সিং, হাতীর দাঁত এবং পশুর হাড় তারা ব্যবহার করতো। এভাবে আদি মানুষের সংস্কৃতি তৎসময়ের বিজ্ঞানের দ্বারা শাসিত হয়েছে। এ সংস্কৃতির একটি প্রাচীনতম যুগ আছে। যাকে আমরা প্রাচীন প্রস্তর যুগ বলে থাকি এবং পরবর্তী একটি যুগ আছে যাকে নব্যপ্রস্তর যুগ বলা হয়। এরপরে ক্রমশ তাম্র, ব্রোঞ্জ, লৌহযুগ এসেছে। এই ইতিহাস সকলেরই জানা। আধুনিককালে বিজ্ঞান ও প্রাযুক্তিক উন্নয়নের ফলে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে বিশেষ করে কৃষি প্রধান দেশগুলোতে কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ একটি কৃষি বিপ্লবের সূচনা করেছে। আমাদের দেশ প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোর মত বিশেষ উন্নতিলাভ করতে পারেনি তবুও স্বাভাবিক ভাবেই বিজ্ঞান এসে উপস্থিত হয়েছে এবং তার সাহায্যে আমাদের জীবন ধারার পরিবর্তন ঘটছে। সংস্কৃতির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কতটা কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে তা অনুসন্ধান করা আমাদের কর্তব্য এবং অনুসন্ধানের সাহায্যে আমরা আমাদের সংস্কৃতির নতুন রূপরেখা নির্ণয় করতে সক্ষম হব।

শস্য উৎপাদনের মধ্যে মানব সংস্কৃতির একটি বিশেষ বিকাশ আমরা লক্ষ্য করি। যে মানুষ আদিকালে বন্য পশু শিকার করে খাদ্য সংগ্রহ করতো সেই মানুষ ক্রমশ পরিকল্পিত উপায়ে শস্য উৎপাদনের জ্ঞান অর্জন করে। এ ঘটনা একদিনে ঘটেনি, বহু বছরের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মানুষ শস্যের ব্যবহার সুনিশ্চিত করেছে এবং কিছু কিছু পশুকে গৃহপালিত করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানবগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে শস্য উৎপাদন করেছে। বর্তমানে শস্য উৎপাদনের সকল জ্ঞানই মানুষের জানা, এক্ষেত্রে পার্থক্য সূচিত হয় শুধুমাত্র জমির আয়তন, আদ্রতা এবং উর্বরতার উপর। বর্তমানে আমাদের দেশে খাদ্যশস্য সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য বিদেশী প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সমস্ত প্রযুক্তির ব্যবহারে এবং অনুশাসনে মানুষের জীবনধারার পরিবর্তন ঘটছে এবং চিন্তাধারারও পরিবর্তন ঘটছে। এক সময় কৃষিকে কেন্দ্র করে যেসব উৎসব অনুষ্ঠিত হত আজকের দিনে সে উৎসবগুলো অবিকল আগের মত নেই। দ্বিতীয়ত নগরের নিকটস্থ অনেক গ্রাম নাগরিক রীতিনীতিতে পরিকীর্ণ হয়েছে। তার ফলে শস্যভিত্তিক যে উৎসবগুলো আগে ছিল সেগুলো এখন আর নেই অথবা এগুলোর পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের অনুসন্ধান করে জানতে হবে আমাদের বিভিন্ন সংস্কৃতির উৎসবের উৎসভূমি কোথায় এবং বর্তমান তাদের স্বরূপই বা কি। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবের কর্মধারা পরিচালিত হয় সেই সব প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক দক্ষতা কতটুকু তাও নির্ণয় করা দরকার। এছাড়া উৎসবগুলো যাতে হারিয়ে না যায় এবং সুশৃঙ্খল আবহে বর্তমান সময়েও বিকশিত থাকতে পারে সেই চেষ্টা করাও আমাদের কর্তব্য।

কৃষির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামীণ জীবনের এবং গ্রামীণ সংস্কারের পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রামের পথঘাট, জলাশয়, বৃক্ষরোপণ এবং গৃহ নির্মাণ এগুলোর পরিবর্তন হয়েছে। নাগরিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে গ্রামীণ জীবনেও পরিবর্তন এসেছে। একদিকে যেমন নগরবিপ্লব হচ্ছে এবং নগরায়ন ঘটছে, তেমনি নগরের প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান গ্রামেও

www.pathagar.com

প্রবেশ করছে। পাশ্চাত্য দেশে গ্রামের কোনো আদিম ধারণা নেই। তাদের জীবনটা নগরভিত্তিক এবং গ্রামগুলো নগরেরই প্রত্যন্ত এবং প্রসারিত অঞ্চল মাত্র। সেসব দেশের সমস্যা হচ্ছে পরিবর্তন সত্ত্বেও গ্রামীণ জীবনধারা ও জীবনদর্শনকে সংরক্ষণ করা। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি নানাভাবে সাহায্য করতে পারে। যেমন, নগরের গৃহনির্মাণ প্রকল্প এবং গ্রামের গৃহনির্মাণ প্রকল্প এক রকম হবে না, তেমনি নগরের বৃক্ষরোপণ এবং গ্রামের বনায়ন এক রকম হবে না। আরো অধিক বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে নগরের পথঘাটের ব্যবহার এবং গ্রামের পথঘাটের ব্যবহার, নগরের পানির ব্যবহার এবং গ্রামের পানির ব্যবহার এক রকম নয়। প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা এই পার্থক্যগুলিকে সুন্দরভাবে বিকশিত করতে পারি এবং উভয় অঞ্চলের জীবনকে স্ব স্ব অঞ্চলের মানুষের জন্য স্বাভাবিক করে গড়ে তুলতে পারি।

পাশ্চাত্যের প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান অনেক সময় জীবনধারায় বিঘ্ন উৎপাদন করেছে, এ বিঘ্ন কেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন। অনেক সময় বিদেশের প্রযুক্তি আমাদের স্বভাবের এবং আদর্শের বিরোধী হতে পারে সে ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমাদের প্রয়োজনকে চিহ্নিত করা এবং সেইসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রাযুক্তিক ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করা।

মানবজাতি যে হিসেবে জাতি হিসেবে চিহ্নিত তাকে ইংরেজিতে বলা হয় স্পেসিস অর্থাৎ প্রজাতি। কিন্তু এই মানব প্রজাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের পার্থক্য দেখা যায়- রঙ এর পার্থক্য, শরীর গঠনের পার্থক্য এবং আকৃতির পার্থক্য। এই পার্থক্যের ভিত্তিতে পৃথিবীতে মানুষকে বিভিন্ন বর্ণ-গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এই সমস্ত বর্ণগোষ্ঠী কেন গড়ে উঠছে তার নানাবিধ কারণ আছে, এই কারণগুলির কোনোটা ভৌগলিক আবার কোনোটা বংশগত মানুষের গায়ের রঙ, চুলের আকৃতি, নাসিকার গঠন– এ সমস্ত শারীরিক বৈশিষ্ট্য মানুষ বংশানুক্রমের লাভ করে থাকে। বংশগতভাবে যে উপরকরণটি পিতা থেকে সন্তানে বাহিত সে উপকরণটিকে 'জীন' বলে। মানবজাতির বর্ণ-গোষ্ঠীর উৎপত্তিতে এই জীনের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মানুষ সুনির্দিষ্ট কোনো বর্ণগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এখানে বহু জাতির মিশ্রণ রয়েছে। আদিম যে সম্প্রদায় এখানে ছিল তাদের সঙ্গে আর্যদের মিশ্রণ ঘটেছে এবং এভাবে বহুবিধ জাতির মিশ্রণে বাঙালি জাতি সত্তার সৃষ্টি। পৃথিবীতে কোনো জাতিরই স্থায়ী কোনো রূপ নেই। আমরা যেহেতু সতত পরিবর্তনশীলতার মধ্যে বাস করি সুতরাং সেক্ষেত্রে অপরিবর্তনশীল কোনো গোত্রই কল্পনা করা যায় না। বাংলাদেশে তো নয়ই, এখানকার মানুষের মধ্যে বর্ণগত আকৃতি ও গঠনগত বিস্ময়কর পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং সুস্পষ্টভাবে কোনো বিশেষ প্রকৃতি বিশিষ্ট একটি রেস বা বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করে বাঙালি হিসাবে কোনো সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট জাতিসত্তা কল্পনা করা সম্ভবপর নয়। তাই কোনো মৌলিক নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক বাঙালি নরগোষ্ঠী চিহ্নিত করা যায় না। বাঙালি বলতে আমরা বুঝি মূলত বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠী। কখনও কখনও বিতর্ক উত্থাপিত হয় এই জাতিতত্ত্ব নিয়ে, এই বিতর্কের সুযোগ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে খুব বেশি নেই। তাছাড়া বর্তমান কালে ভৌগলিক সীমাবন্ধন জাতি নির্ণয়ের পক্ষে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। বর্তমানে ভৌগলিক প্রত্যয় জাতিসত্তা নির্ধারণের একটি নতুন বিকল্প হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

www.pathagar.com

মানুষের বেঁচে থাকবার প্রেরণা থেকেই মানুষের স্বাভাবিক কতকগুলো প্রয়োজন জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষ গড়ে ওঠে। এই প্রয়োজনগুলো হচ্ছে খাদ্য, আশ্রয়, প্রজনন, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সহযোগিতা। এটাই সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয়তা যা পৃথিবীর সর্বক্ষেত্রে সমান। এই প্রয়োজনীয়তা সম্পাদনের জন্য মানুষ সংস্কৃতিকে তার উপায় হিসেবে বেছে নেয়। অর্থাৎ প্রতিটি প্রয়োজনের জন্য চিন্তা, পরীক্ষা এবং কর্মসাধনা আছে। এই চিন্তা পরীক্ষা এবং কর্মসাধনার ক্ষেত্রেই জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে সাংস্কৃতিক বিভাজন গড়ে উঠেছে। একটি উদাহরণ দিলে কথাটি স্পষ্ট হবে। পৃথিবীর সকল মানুষই খাদ্য গ্রহণ করে এবং এক্ষেত্রে মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু বিবিধ প্রকার খাদ্য বিভিন্ন আকারে মানুষ গ্রহণ করে থাকে এবং খাদ্য প্রস্তুতকরণ এবং পরিবেশন প্রক্রিয়ার দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য গড়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়াটি সংস্কৃতির অঙ্গ। এই পদ্ধতি কখনও সার্বজনীন নয়। তেমনি আশ্রয়ের প্রয়োজন সার্বজনীন। আমরা আশ্রয় চেয়ে থাকি বৃষ্টি থেকে, বরফ থেকে, শীত থেকে, বাতাস থেকে এবং সূর্য থেকে। কিন্তু আশ্রয় নির্মাণ পদ্ধতিটা এককে অঞ্চলে এককে রকম। উপকরণের ব্যবহারে এবং আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্যের কারণে আশ্রয়স্থলে পরিবর্তন ঘটেছে। পৃথিবীর সকল অঞ্চলের মানুষ এক ধরনের আশ্রয় নির্মাণ করে না। এই আশ্রয় নির্মাণের মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে এবং সাংস্কৃতিক উপকরণ হিসেবে এবং বিশেষ ধরনের সাংস্কৃতিক পার্থক্য হিসেবে এই আশ্রয় নির্মাণটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই কারণে গৃহনির্মাণ এবং স্থাপত্যরীতি সংস্কৃতির একটি অঙ্গ। বর্তমানে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য স্থাপত্য রীতি প্রচলিত হতে চলেছে। এই রীতি আমাদের ব্যবহার-উপযোগিতা, জীবন-ধারণ পদ্ধতি এবং আবহাওয়ার ক্ষেত্রে কতটা সমীচীন তা বিবেচনা করা কর্তব্য। আমাদের গৃহনির্মাণ প্রকল্পে একটি সুনির্দিষ্ট দেশগত সাংস্কৃতিক রূপরেখা হবে এটাই আমরা কামনা করি।

আমরা আমাদের আলোচনায় দেখেছি, বৈদিক আর্যদের সময়ে যে অঞ্চল নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশ সে অঞ্চলের সঙ্গে আর্যদের কোনো ঘনিষ্ঠতা ছিল না। বৈদিক সূত্রে এ অঞ্চলের উল্লেখ নেই। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' এ অঞ্চলের লোকদের 'অনার্য এবং দস্যু' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' পুন্ড্র বলে একটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। এই পুন্ড্র ছিল উত্তরবঙ্গের নাম। তেমনি 'ঐতরেয় আরণ্যকে' এ অঞ্চলের লোকদের সম্পর্কে নিন্দা সূচক উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগের শেষে রচিত 'বৌধায়ন ধর্মসূত্রে' পুন্ড্র এবং বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে যেখানে বলা হয়েছে যে আর্যরা ওসব অঞ্চলে গেলে তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বৈদিক যুগের এ সমস্ত শাস্ত্রীয় উল্লেখের সাহায্যে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে বঙ্গদেশ আর্য প্রভাবের বাইরে ছিল। স্থানীয় লোকেরা তাদের নিজস্ব সত্তা নিয়ে বহিরাগত আর্যদের প্রতিহত করেছে। কিন্তু যেহেতু আর্যরা সাম্রাজ্য বিস্তারে জন্য ভারতের সর্বত্র অগ্রসর হয়েছিল সুতরাং এ অঞ্চলের লোকেরা আর্যদের সাথে সর্বদাই সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতো। পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর ভারতের আর্যগণ বহুবার এ অঞ্চলকে করায়ত্ত করতে চেয়েছে। কখনও কখনও সফলকামও হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে রাখতে পারেনি। সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে বঙ্গ অঞ্চলের আদিম অধিবাসীগণ আর্যজাতীয় ছিলেন না। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র সেন, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ বাংলা ভাষার রূপকল্প বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে আর্যগণ এদেশে আসবার পূর্বেই বিভিন্ন জাতি এদেশে বসবাস করতো তার স্বাক্ষর বর্তমান

www.pathagar.com

বাংলাভাষাতেও বিদ্যমান। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো কোল, মুণ্ডা, শবর, পুলিন্দ, আড়ী, ডোম প্রভৃতি যে সমস্ত জাতি দেখা যায় এরা সেই আদিম অধিবাসীদের বংশধর এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষায় মুণ্ডা প্রভাবের কথা বলেছেন। কালক্রমে এ অঞ্চলের তিব্বতী মোঙ্গলরা এসেছে, বর্মীরা এসেছে এবং সেমেটিক জাতিভুক্ত আরবরা এসেছে। সংস্কৃতি এবং ভাষার ক্ষেত্রে এ সমস্ত জাতি প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। চর্যাগীতিকা এবং সরহপার 'দোহাকোষে' শবর, ডোম, হাড়ী, চণ্ডাল এবং নিষাদ জাতীয় মানুষদের কথা আছে। অবশ্য ব্রাহ্মণ্যবাদের কথাও আছে। সরহপার রচনায় ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপক কোনো উক্তি নেই।

নৃতত্ত্বে মানুষের করোটির আকৃতি পরীক্ষা করে জাতি নির্ণয় করা যায়। এ পরীক্ষার ক্ষেত্রে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়, একটিকে বলে Dolichocephalic এবং অন্যটিকে Brachycephalic। প্রথমটির বাংলা করা যায় 'দীর্ঘ-শির' বলে দ্বিতীয়টি 'খর্ব-শির'। প্রথমটির অর্থ হল এমন একটি করোটি যার প্রস্থ দৈর্ঘ্যের চার-পঞ্চমাংশ কম এবং পরেরটির অর্থ হল এমন একটি করোটি যার প্রস্থ দৈর্ঘ্যের অন্তত চার-পঞ্চমাংশ। বাংলাদেশ তথা সমগ্র বঙ্গভূমির আদিম অধিবাসীরা 'খর্বশির' কিন্তু বৈদিক আর্যগণের প্রাধান্য ভারতের যে সমস্ত অঞ্চলে ছিল সেখানকার অধিবাসীরা দীর্ঘ-শির। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন যে, মস্তিষ্কের গঠনপ্রণালী থেকে নৃতত্ত্ববিদগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে বাঙালি একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট জাতি। এমন কি বাংলাদেশের ব্রাহ্মণের সঙ্গে ভারতের অপর কোনো প্রদেশের ব্রাহ্মণের চেয়ে বাংলার কায়স্থ সদগোপ, কৈবর্ত প্রভৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ।

কেউ কেউ দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে বাঙালি জাতির সম্পর্ক নির্ধারণের চেষ্টা পেয়েছেন। তাদের বক্তব্য হল যে খৃস্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগের সিন্ধুনদের উপত্যকায় এবং মধ্যভারত ও রাজস্থানের কিছু কিছু অঞ্চলে যেমন তাম্র যুগের সভ্যতা ছিল বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে সেই ধরনের মনুষ্যগোষ্ঠী বাস করতো। এরা চাষাবাদ করতো, নানা নকশায় শোভিত মৃৎপাত্র ব্যবহার করতো, শম্বর নীল গাই প্রভৃতি পশু শিকার এবং শুকর পালন করতো। এখানকার সর্বপ্রাচীন অধিবাসীরা প্রস্তর ও তাম্র ধাতু ব্যবহার করতো এবং ক্রমান্বয়ে লোহার সঙ্গে পরিচতি হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় অজয় কুমুর এবং কোপাই নদীর তীরে ভূগর্ভ খননের ফলে প্রাচীন যুগের যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তার উপর ভিত্তি করে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত কোনো কোনো প্রত্নতত্ত্ববিদ করেছেন। তবে এই সিদ্ধান্তগুলো সর্বজনমান্য ও সম্মানিত হয়নি।

তবে একটি সত্য দিবা/দ্বিপ্রহরের মতো সুস্পষ্ট তা হচ্ছে, আর্যদের সঙ্গে বঙ্গ অঞ্চলের মানুষের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বৈদিক ধর্মের অনেক নীতি এবং নির্দেশনা বঙ্গ অঞ্চলে অনুপস্থিত ছিল এবং অদ্যাবধি অনুপস্থিত। এই অঞ্চলে যে সমস্ত পূঁজা প্রণালী বিভিন্ন আদিম জাতির মধ্যে চলে আসছে এবং আপামর হিন্দু সাধারণের মধ্যে প্রচলিত সেগুলো বৈদিক হোম ও যাগযজ্ঞের বিরোধী। বিভিন্ন লৌকিক ও ব্রত আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহে হলুদ সিঁদুর প্রভৃতির ব্যবহার, ধুতি শাড়ি প্রভৃতির ব্যবহার বাঙালি জাতির নিজস্ব সত্তার পরিচয় বহন করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে গ্রামীণ ভূভাগের স্থানিক নাম বিশুদ্ধ আর্য নাম নয়। এ সমস্ত অঞ্চলের

www.pathagar.com

জনপদের নামের বিস্তারিত কোনো আলোচনা হয়নি। আলোচনা হলে ধরা পড়তো যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতেও আর্য সভ্যতা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পূর্ণভাবে প্রবেশ করতে পারেনি।

নানা ধরনের গল্প এই বঙ্গ অঞ্চল সম্বন্ধে প্রাচীন মহাভারতে আছে। মহাভারতে বাংলাদেশের কয়েকটি রাজ্যের কথা আছে। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন ঃ

"মহাভারত রচনার যুগে - এমনকি তাহার পূর্ব হইতেই বাংলাদেশ অনেকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। কখনও কখনও কোন পরাক্রান্ত রাজা ইহার দুই তিনটি একত্র করিয়া বিশাল রাজ্য স্থাপন করিতেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের সহিতও বাংলার রাজাগণের রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল এবং তাহাদের শৌর্য ও বীর্যের খ্যাতি বাংলার বাহিরেও বিস্তৃত ছিল।"

"অঙ্গরাজ কর্ণের অধীনে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অধিকাংশ ভাগ মিলিয়া একটি বিশাল রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল- মহাভারতের এই উক্তি কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা বলা কঠিন। কিন্তু খৃষ্ট পূঃ ৩২৭ অব্দে যখন আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন যে বাংলাদেশ এইরূপ একটি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল, সমসাময়িক গ্রীক লেখকগণের বর্ণনা হইতে তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। গ্রীকগণ গণ্ডরিডই অথবা গঙ্গারিডাই নামে যে এক পরাক্রান্ত জাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহারা যে বঙ্গদেশের অধিবাসী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন লেখক গঙ্গানদীকে এই দেশের পূর্বসীমা এবং কেহ কেহ ইহাকে পশ্চিম সীমারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। প্লিনি বলেন, গঙ্গানদীর শেষভাগ এই রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই সমুদয় উক্তি হইতে পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গঙ্গানদীর যে দুইটি স্রোত এখন ভাগীরথী ও পদ্মা বলিয়া পরিচিত এই উভয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশে গঙ্গারিডই জাতির বাসস্থান ছিল।"

"এই গঙ্গারিডই জাতি সম্বন্ধে একজন গ্রীক লিখিয়াছেন ঃ ভারতবর্ষে বঙ্গজাতির বাস। তন্মধ্যে গঙ্গারিডই জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ [অথবা সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী]। ইহাদের চারিসহস্র বৃহৎকায় সুসজ্জিত রণহস্তী আছে, এই জন্যই অপর কোনো রাজা এই দেশ জয় করিতে পারেন নাই। স্বয়ং আলেকজান্ডারও এই সমুদয় হস্তীর বিবরণ শুনিয়া এই জাতিকে পরাস্ত করিবার দুরাশা ত্যাগ করেন।"

"গ্রীকগণ প্রাসিয়য় নামক আর এক জাতির উল্লেখ করেন। ইহাদের রাজধানীর নাম পালিবোথরা [পাটলিপুত্র-বর্তমান পাটনা] এবং ইহারা গঙ্গারিডই দেশের পশ্চিমে বাস করিত। এই দুই জাতির পরস্পর সম্বন্ধ কি ছিল, গ্রীক লেখকগণ সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকাংশ প্রাচীন লেখকই বলিয়াছেন যে এই দুইটি জাতিই গঙ্গারিডই এর রাজার অধীনে ছিল এবং তাহার রাজ্য পাঞ্জাবের অন্তর্গত বিপাশা নদীর তীর হইতে ভারতের পূর্বে সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্লুতর্ক এক স্থলে এই দুই জাতিকে গঙ্গারিডই রাজার অধীন এবং আর এক স্থলে দুই জাতির পৃথক রাজার উল্লেখ করিয়াছেন।"

"অধিকাংশ গ্রীক লেখকের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া মোটের উপর এই সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন হইবে না, যে সময়ে আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, সেই সময়ে বাংলার রাজা মগধাদি দেশ জয় করিয়া পাঞ্জাব পর্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। গ্রীক ও লাতিন লেখকগণ এই রাজার যে নাম ও বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে অনেকেই অনুমান করেন যে, ইনি পাটলিপুত্রের নন্দবংশীয় কোন রাজা। ইহা সত্য হইলেও পূর্বোক্ত

www.pathagar.com

সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে। কারণ নন্দরাজা বাংলা হইতে গিয়া পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করিবেন, ইহা অসম্ভব নহে। পরবর্তীকালে বাঙালি পালরাজাগণও তাহাই করিয়াছিলেন। পুরাণে নন্দরাজবংশ শুদ্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ইহাও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে। কারণ বাংলাদেশ বহুকাল পর্যন্ত আর্য সভ্যতার বহির্ভূত ছিল এবং ইহার অধিবাসী আর্য ধর্মশাস্ত্র অনুসারে শুদ্র বলিয়া বিবেচিত হইবেন ইহাই খুব স্বাভাবিক।"

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এটা উপস্থিত করা যায় যে বঙ্গ অঞ্চল অতীতে আপন স্বাতন্ত্র্যে এবং নিজস্ব সত্তায় বিদ্যমান থাকতে চেয়েছে এবং আর্যদের প্রতাপকে মান্য করেনি। মূলত পাল রাজত্বের সময় থেকেই বাংলাদেশে নিজস্ব স্বাধীন সত্তা দীর্ঘকালের জন্য গড়ে ওঠে। পাল রাজ্য শাসন স্থাপিত হওয়ার পূর্বে বঙ্গ অঞ্চলে সুস্থির প্রশাসনিক ব্যবস্থা সীমিত উদাহরণ ব্যতীত ছিল না বললেই চলে। একমাত্র পাল রাজত্বের আমলেই সুদীর্ঘ চার বছর একটি রাজ্যধারায় বঙ্গভূভাগ শাসিত হয়েছিল। এক পর্যায়ে পাল নৃপতিদের সমান্তরালভাবে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের প্রায় ১৫০ বছর স্থায়ী চন্দ্র বংশের নৃপতিদের অব্যাহত শাসনের কথা জানা যায়। এ অঞ্চলের প্রাচীন যুগের রাজা ও রাজবংশের নিম্নরূপ কাল বিজ্ঞাপন সূচী করা যায় ঃ

৪র্থ ও ৫ম শতাব্দী	-	গুপ্ত সাম্রাজ্য
৫ম শতাব্দী	-	গোপচন্দ্র
		ধর্মাদিত্য
		সমাচারদেব
৬০০-৬৩৮ খৃস্টাব্দ	-	শশাঙ্ক
৬৫০-৭০০ খৃস্টাব্দ	-	খড়গ ও রাতবংশ
৭৫০-১১৬০ খৃস্টাব্দ	-	পালবংশ
৯০০ -১০৫০ খৃস্টাব্দ	-	চন্দ্রবংশ
১০৭৫-১১৫০ খৃস্টাব্দ	-	ধর্মবংশ
১০৯৫ -১২৫০ খৃস্টাব্দ	-	সেনবংশ

বঙ্গের প্রথম প্রধান স্বাধীন নরপতি হিসাবে শশাঙ্কের নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে। রমেশচন্দ্র মজুমদার শশাঙ্ককে বাঙালি জনগণের মধ্যে প্রথম সার্বভৌম নরপতি বলে সাব্যস্ত করেছেন। আমরা জানি না শশাঙ্ক কোন বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং সত্যি বাঙালি ছিলেন কিনা। রমেশচন্দ্র মজুমদার স্বীকার করেছেন যে বঙ্গরাজ্য শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত ছিল কিনা নিশ্চিত বলা যায় না। হিউ-য়েন-সাঙ এর বিবরণে পাওয়া যায় যে শশাঙ্কের মৃত্যুর পরপরই সমতল অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্যের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। যে রাজা সমতটে রাজত্ব করতেন তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ঐ রাজবংশের শীলভদ্র নামক একজন পণ্ডিত হিউ-য়েন-সাঙ এর আগমনের সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। বঙ্গ অঞ্চলে অন্য একটি রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত বংশের নাম খর্গ বংশ। এই খর্গ বংশের রাজাগণ সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাদের রাজ্য দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গে বিস্তৃত ছিল। অনুমান করা হয়ে থাকে যে, তাদের রাজধানীর নাম ছিল কর্মান্ত। কর্মান্ত হচ্ছে বর্তমানে কুমিল্লার নিকটবর্তী বড় কামতা নামক একটি স্থান। সপ্তম শতকে বঙ্গ অঞ্চলে বহিরাগত আর্যদের আক্রমণ এবং অন্যবিধ বহিঃশত্রুর আগমনে বাংলার রাজতন্ত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। সমগ্র দেশে কোনো স্থির শাসন ছিল না। এর ফলে লোকের দুঃখ দুর্দশার সীমা ছিল না।

www.pathagar.com

দেশে অরাজকতা ছিল প্রবল এবং দুর্বলের উপর অত্যাচার অনবরত হত। এই বিশৃঙ্খলা অবস্থা থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য বঙ্গদেশীয় জনসাধারণ যে বিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা পৃথিবীর ইতিহাসের বিরল। দেশের প্রবীণ নেতাগণ স্থির করেন যে পরস্পর বিবাদ বিসংবাদ ভুলে তারা একজনকে রাজপদে নির্বাচন করবেন এবং সকলেই স্বেচ্ছায় তার শাসন মেনে নেবেন। দেশের জনসাধারণ এই সিদ্ধান্ত মেনে নিল। এর ফলে গোপাল নামক এক ব্যক্তি বাংলাদেশের রাজপদে নির্বাচিত হলেন। গোপালই প্রথম যথার্থ বঙ্গবাসী যিনি পাল রাজবংশদের প্রতিষ্ঠা ঘটান এবং একটি স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের উদ্ভব ঘটে। এই পাল রাজবংশের সময়েই বাংলাদেশের ভাষা, সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের ব্যাপক উন্নতি ঘটে।

বাংলাদেশের অতীত নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন এজন্য যে, প্রায় সকল আলোচনায় এই সময় কালটিকে অগ্রাহ্য করা হয় অথবা তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। আমরা দেখেছি যে, বাংলাদেশের অতীত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত এবং প্রজ্ঞাপিত। এর মধ্যে মোটামুটি তিনটি যুগ আমরা পাই- একটি হচ্ছে পালপূর্ব যুগ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে পালযুগ এবং তৃতীয়টি হচ্চে সেনযুগ। অবশ্য পালযুগে চন্দ্রদের কথাও স্মরণে রাখতে হবে। বাংলার সংস্কৃতি নির্মাণে পালপূর্ব যুগের তেমন কোনো ভূমিকা নেই, কেন না এ সময়ে দেশে বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল এবং বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আর্যপ্রভাব অস্বীকারের প্রবণতা ছিল। আর্যরা জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তন করেছিল, স্বাধীনতার বিরুদ্ধচারণ করেছিল এবং গণতন্ত্রের অধিকার লুপ্ত করেছিল। আর্যদের সময়ের জাতিভেদ এ অঞ্চলে দানা বাঁধতে পারেনি। এদেশের মানুষ জাতি পরিবর্তনের এক বিস্ময়কর নমুনা রেখে গেছেন। এ অঞ্চলের মানুষ ব্রাহ্মণ থেকে শুদ্র হয়েছে, আবার শুদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে। ক্ষিতিমোহণ শাস্ত্রী তাঁর 'জাতিভেদ' গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ সমস্ত কারণে এ অঞ্চলের সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে পাল-পূর্ব যুগকে আমাদের বিবেচনায় আনা বিশেষ প্রয়োজন পড়ে।

পালযুগটি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়কালে জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সাধন ঘটে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়, গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন ঘোষিত হয়, বিস্ময়কর চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য এ অঞ্চলে গড়ে ওঠে, সর্বোপরি, বৌদ্ধ বিনয়, তৃষ্ণাহীনতা, সাম্য এবং সমতার একটি আদর্শ এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উপর ছিল ভাষা। জনসাধারণের সহজাত আনন্দ এবং আগ্রহকে বহমান করবার জন্য একটি পূর্ব অপভ্রংশ এখানে গড়ে উঠেছিল। এই জনসাধারণের ভাষা এখানকার সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হয়েছিল। অর্থাৎ এক কথায় এ অঞ্চলের মানুষের মানসপ্রক্রিয়া গঠনের জন্য একটি বহমান এবং প্রকাশিত রাখে। এ সময়কার দোহা-বন্ধগুলো এবং গীত-বন্ধগুলো এখানকার সংস্কৃতিকে রূপ দিয়েছে এবং সজীব করেছে। বাংলাদেশের পরবর্তী কালের সংস্কৃতিকে অনুভব করতে হলে পাল রাজত্বকালের সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করতে হবে। চন্দ্রদের সময়েও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল।

পালদের পরে বহিরাগত সেনরা এসে এ দেশকে নিজেদের অধিকারে রেখেছিল। খুব দীর্ঘকাল না হলেও প্রায় পঁচাত্তর বছর তারা এ অঞ্চলে শাসন করেছিল। এখানকার মানুষকে স্বধর্মচ্যুত করবার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, কর্ণাটক এবং কর্ণকুঞ্জ থেকে সংস্কৃতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ এনে এ অঞ্চলের সংস্কৃতির প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছে।

www.pathagar.com

অত্যন্ত নিষ্ঠুর আকারে জাতিভেদ প্রথা পরিবর্তন করে এবং বৌদ্ধদের উৎখাত করার চেষ্টায় সকল শক্তি নিয়োগ করে তারা যে কঠোরতার নিদর্শন রেখে গেছে তা বাংলা সংস্কৃতির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ ক্ষেত্রে যে প্রভাবটি প্রচণ্ড এবং প্রবলভাবে অভিব্যক্ত তা হচ্ছে, কবি জয়দেবের ললিতমধুর কাব্য 'গীতগোবিন্দ'। জয়দেব শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিধারার মাঙ্গল্য গান রচনা করলেন এবং এর প্রভাব বাঙালি জীবনে সদূরপ্রসারী হয়েছিল। জয়দেবের সঙ্গীত পরবর্তীতে বৈষ্ণব সঙ্গীতের জন্ম দেয় এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাঙালি সমাজ জীবনে তা সম্মোহন বিস্তার করে। নৃত্যের ক্ষেত্রে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারতের 'ভারতনাট্যম' জয়দেবের সঙ্গীতের প্রেক্ষাপটে সমৃদ্ধি লাভ করে। এ সময়ের সংস্কৃতির চিত্রকে নিম্নরূপে চিহ্নিত করা যায় ঃ

রাজ্যকাল	রাজনৈতিক অবস্থা	সংস্কৃতির পরিচয়
পাল-পূর্বযুগ	বিশৃঙ্খল অবস্থা	অস্থির
পাল ও চন্দ্রযুগ	স্থিতিশীলতা, গণতন্ত্রায়ন, লোকহিত	সাম্য, শান্তি ও বিনয়ের প্রতিষ্ঠা, চিত্রকলার উদ্ভব; সঙ্গীত ও নৃত্যের ব্যবহার; কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সাধন; ভাষা ও কাব্যের বিকাশ
সেন যুগ	বহিরাগত শাসন, স্বৈরতন্ত্র	উচ্চবিত্তের আসরে সংস্কৃতির বিকাশ, সংস্কৃত ভাষার প্রভাব, নৃত্য সঙ্গীতের রাগানুগ ব্যবস্থা

অল্প সময়ের মধ্যে সেন রাজাদের শাসনে রাজ দরবারের গৃহীত নীতি হিসাবে সংস্কৃত উচ্চবিত্তের আসরে স্থান লাভ করে। রাজ দরবারে সংস্কৃতি ভাষার কবি, সঙ্গীতজ্ঞ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের স্থান হয় এবং রাজ আনুকূল্যে একটি সম্ভ্রান্ত এবং সচেতন সংস্কৃতি এদেশের উপর আরোপিত হয়। আরোপিত সংস্কৃতি হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে বেশি কিন্তু হারিয়ে গেলেও কিছুটা রেশ যে রেখে যায় না তা নয়। একটি বিশেষ কারণে এই রেশ বিদ্যমান ছিল। জয়দেব যে সংস্কৃত ভাষায় তার কাব্য রচনা করেছিলেন তার ভঙ্গি ছিল সহজবোধ্য এবং আকর্ষণীয়, জয়দেবের কাব্যের ললিত তরল ভঙ্গি জনসমাজে সম্মোহন সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। একে তো রাজআনুকূল্য এবং প্রচারণা বিদ্যমান ছিল, তদুপরি জয়দেবের নিজস্ব নাগরিক বৃত্তি এবং কৌশল তাকে জনসমর্থনের সুযোগ দিয়েছিল। তাঁর 'গীতগোবিন্দ'কে অবলম্বন করে এ অঞ্চলে ধ্রুপদী সঙ্গীত এবং নৃত্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এগুলোর নিদর্শন পরবর্তীতে হারিয়ে গেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এক সময় যে ছিল তা ধারণা করা যায়। বঙ্গ অঞ্চলে মনিপুরী নৃত্য জয়দেবের প্রভাবে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে রাজনৈতিক কারণে সেন রাজাদের অবক্ষয় ঘটে এবং ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজির আগমনের পর সেনদের প্রভাব ক্রমশ মুছে যেতে থাকে।

www.pathagar.com

বখতিয়ার খিলজি একটি নতুন বিশ্বাস এবং চৈতন্য বঙ্গ অঞ্চলে নিয়ে আসেন যার সঙ্গে এই ভূখণ্ডের লোকদের ঘনিষ্ঠ কোনো পরিচয় ছিল না। এদেশে মুসলমানরা এসেছে পূর্বেই, কিন্তু ব্যাপকভাবে তাদের প্রভাব অনুভূত হয়নি। এই প্রথম বার একটি সম্পূর্ণ নতুন সভ্যতার সঙ্গে বঙ্গবাসীর পরিচয় হল। মুসলমানদের আগমনের ফলে এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন মাত্রা সংযোজিত হল। একটি নতুন স্থাপত্য রীতি এদেশে গড়ে উঠলো যা দৃশ্যত শোভন এবং ব্যবহার উপোযোগিতার আদর্শস্থল। সারা দেশে মসজিদ নির্মিত হতে লাগলো এবং মসজিদের গঠন প্রণালী একটি নতুন স্থাপত্য রীতির প্রবর্তন করলো।

মুসলমানরা বঙ্গ ভূখন্ড দখল করবার পরে এ অঞ্চলের সংস্কৃতির বিপুল পরিবর্তন ঘটে। সেন আমলে সংস্কৃত ভাষার যে প্রভাব ছিল সেই প্রভাব দূরীকৃত হয় এবং তার পরিবর্তে আরবী ভাষার প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি। আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা স্থাপিত হয় এবং ধর্ম সাধনার জন্য 'খানকাহ' এবং মসজিদ স্থাপিত হয়। বখতিয়ার খিলজি তাঁর স্বল্প সময়ের রাজত্বকালে এই পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বখতিয়ার খিলজির আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে নতুন নতুন নগর নির্মাণ। এভাবে নগর নির্মাণের সাহায্যে একদিকে যেমন নতুন সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছিলেন অন্যদিকে তেমনি এদেশীয় গ্রামীণ সংস্কৃতিধারার মধ্যে পরিবর্তন এনেছিলেন। সেন আমলে জাতিভেদে প্রথার প্রভাবে নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষরা খুবই উৎপীড়িত ছিল। মুসলমান আগমনের ফলে এই উৎপীড়ন বন্ধ হবার সুযোগ ঘটে এবং সমাজে মানুষে ভেদাভেদ অসমর্থিত হতে থাকে। এটা ধারণা করা অসম্ভব নয় যে বখতিয়ার খিলজির আগমনকে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা স্বাগত জানিয়েছিল। কতকগুলো কারণে নিম্নবর্ণের মানুষদের ক্ষোভ ছিল লক্ষ্মণ সেনের শাসনের প্রতি। প্রথমত সেনরা ছিল বহিরাগত এবং তারা বহিরাগত ব্রাহ্মণ এনে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় বিঘ্ন উৎপাদন করেছিল। দ্বিতীয়ত দেশী মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চার বিরুদ্ধে এদের কঠোর নির্দেশ ছিল। নরকে নিক্ষিপ্ত হবার ভয় দেখিয়ে দেশী ভাষার চর্চা থেকে এরা মানুষকে বিরত রাখবার চেষ্টা করে। তৃতীয়ত রাজ দরবারের ভাষা হিসাবে সংস্কৃত ভাষা প্রতিষ্ঠা পায় এবং এর ফলে সংস্কৃতির নতুন একটি উচ্চমার্গ জন্মলাভ করে যার সঙ্গে নিম্নবিত্ত মানুষদের সংস্কৃতির কোনো যোগাযোগ ছিল না। চতুর্থত নগরের যে পরিকল্পনা এদের ছিল সে নগর ছিল সীমাবদ্ধ এবং সংকীর্ণ। নিম্নবিত্তদের বাসস্থান ছিল নগরের বাইরে অর্থাৎ নগর ছিল সম্মানিত মানুষদের জন্য এবং ব্রাহ্মণদের জন্য। এভাবে সাধারণ মানুষকে দেশের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার যে প্রবণতা গড়ে ওঠে সে প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবেই সাধারণ মানুষ বখতিয়ার খিলজির আগমনকে স্বাগত জানিয়েছে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে, এ অঞ্চলের সংস্কৃতি বখতিয়ারের আগমনের পর একটি নতুন রূপব্যঞ্জনা লাভ করে।

বর্তমান বাংলাদেশের সমগ্র ভূ-খণ্ড ১৩০০ খৃস্টাব্দের দিকে মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হয়। মোঘল সম্রাট আকবর ১৫৭৬ খৃস্টাব্দে পাঠান দাউদ শাহকে পরাজিত করে সমগ্র বঙ্গ ভূখণ্ডকে পদানত করেন। ১৬০০ খৃস্টাব্দের দিকে সমগ্র বঙ্গ ভূখন্ড মোঘল শাসনের অধিকারে আসে। মোঘলদের পূর্বে অল্প সময়ের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে এ অঞ্চলে

www.pathagar.com

পর্তুগীজদের আগমন ঘটেছে। ইংরেজি, ওলন্দাজ এবং ফরাসী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান মোঘল আমলে এদেশে ব্যবসা উপলক্ষে আগমন করেছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর বঙ্গ অঞ্চলে শাসনকর্তা হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে।

মুসলমান শাসন আমলে এদেশে দেশীয় ভাষার চর্চা হতে থাকে। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশের মূলে মুসলমান শাসনকর্তাদের সমর্থন ও সহায়তা ছিল। গৌড়ের সুলতান সিকান্দার শাহ মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি চন্ডীদাসের আশ্রয়দাতা ও সমর্থক ছিলেন। সিকান্দার শাহের সময়কাল ছিল ১৩৫৭ থেকে ১৩৮৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। সিকান্দার শাহের পুত্র গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের আমলে শাহ মোহাম্মদ সগীর কাব্য চর্চা করেন। গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের সময়কাল ছিল ১৩৮৮ থেকে ১৪১০ খৃষ্টাব্দ। গৌড়ের সুলতান জালাল উদ্দীন মোহাম্মদ শাহের আমলে কৃত্তিবাস 'রামায়ণ' রচনা করেন। জালাল উদ্দীনের সময়কাল ছিল ১৪১৮ থেকে ১৪৩১ খৃষ্টাব্দ। মালাধর বসু 'ভগবত পুরাণ'কে অবলম্বন করে 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচনা করেন। শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের আমলে [১৪৭৪-'৮১ খৃস্টাব্দ]। ইউসুফ শাহ মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি দিয়েছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর 'মহাভারত' রচনা করেছিলেন গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের আমলে [১৪৯৩-১৫১৯ খৃষ্টাব্দ]। পরমেশ্বরের সমর্থক ও আশ্রয়দাতা ছিলেন হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ। এই নিদর্শনগুলি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মুসলমানদের শাসন আমলে এদেশে সংস্কৃতির নতুন দ্বারা উন্মোচিত হয় এবং পাল আমলের মত নতুন করে মাতৃভাষার চর্চা চলতে থাকে। পালদের ধর্মীয় ভাষা ছিল পালি, ধর্মীয় অনুশাসন এবং ধর্মগ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে পালিভাষা ব্যবহার করলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁরা লোক ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। তেমনি মুসলমান আমলে ধর্মীয় ভাষা 'আরবী' এবং দরবারের ভাষা 'ফারসী' হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যের ভাষা হিসাবে বাংলার চর্চায় মুসলমান রাজন্যবর্গ উৎসাহ প্রদান করেছেন। এই সময়কালেই বাংলা ভাষার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফারসী শব্দ এবং ফারসীর মাধ্যমে আরবী এবং তুর্কী শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করতে থাকে। এভাবে দুহাজারের অধিক ফারসী, অরবী ও তুর্কীশব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে।

মুসলমান আমলে বঙ্গভূখণ্ড সংস্কৃতির যে পরিবর্তন সূচিত হয় তার স্বভার ও প্রকৃতি নিম্নরূপ ঃ

১. মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূরীকরণের মাধ্যমে একটি সাম্যবাদী প্রবৃত্তির প্রতিষ্ঠা।
২. নগর নির্মাণ ও নগরায়নের মাধ্যমে সংস্কৃতির গ্রামীণ প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন সাধন।
৩. স্থাপত্য শিল্পে নতুন মাত্রা সংযোজন এবং মসজিদ ও দুর্গের স্থাপত্য রীতির প্রবর্তন।
৪. শিল্পক্ষেত্রে ক্যালিগ্রাফি বা আরবী হস্তলিখন রীতির প্রবর্তন।
৫. দেশজ ভাষার চর্চায় উৎসাহ প্রদান এবং একটি উদার অসাম্প্রদায়িক ভাব প্রকল্পের জন্ম দান।
৬. বাংলা ভাষার রূপ ও রীতির পরিবর্তন এবং প্রচুর পরিমাণে ফারসী-আরবী তুর্কী শব্দের অনুপ্রবেশ।

সেন আমলে সংস্কৃতি ছিল মন্দিরভিত্তিক এবং রাজসভা ভিত্তিক। সেন রাজারা এদেশের মানুষের সংস্কৃতিগত প্রেরণাকে অগ্রাহ্য করে শাসকবর্গ এবং মন্দিরের পুরোহিতদের জন্য একটি সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল যার ফলে ধ্রুপদী সঙ্গীত ও নৃত্য রাজসভা এবং মন্দিরের অভ্যন্তরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। মুসলমান আমলে এই সংস্কৃতির প্রচারে বিঘ্ন উপস্থিত

www.pathagar.com

হয় এবং জনজীবন ভিত্তিক একটি নতুন সংস্কৃতির রূপলাভ করতে থাকে। এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন আমরা দেখি সুলতান হোসেন শাহের আমলে। হোসেন শাহের আমলেই চৈতন্যের আবির্ভাব এবং হিন্দুদের সনাতন শাসন থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তি ঘটে। চৈতন্য নিজে উচ্চবর্ণের হলেও সাধারণ মানুষের নিকটে এসেছিলেন এবং তাদের মধ্যে প্রেমধর্মের একটি প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছিলেন, হোসেন শাহ চৈতন্যের ধর্ম সাধনায় সহায়তা করার জন্য 'রামকেলি' নামক একটি গ্রাম চৈতন্যের ধর্ম প্রচারের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। মানুষে মানুষে ঐক্য এবং সম্প্রীতির ব্যঞ্জনা চৈতন্য নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন এবং সেক্ষেত্রে রাজ আনুকূল্য তিনি পেয়েছিলেন। হোসেন শাহের ঔদার্যে এবং সহানুভূতিতে এদেশের সকল সম্প্রদায় মিলিতভাবে বসবাস করতে সক্ষম হয়েছিল। সে কারণে তাঁকে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা 'নৃপতি তিলক' এবং 'গজতভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। হোসেন শাহের দরবারে সনাতন এবং রূপ গোস্বামী মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছিলেন। এরাই পরে শ্রীচৈতন্যের শিষ্য হন এবং সুফী মতবাদের সঙ্গে বৈষ্ণব মতবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। রূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বল নীল মনি' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের সাধন পদ্ধতিকে এমন একটি রূপরেখা দান করেন যা মূলত সুফী সাধন পদ্ধতির এই মিশ্রণটি অভূতপূর্ব। চৈতন্যের নৃত্য গীত সাধারণ মানুষকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল। সেন আমলের কুসংস্কার এবং বন্ধন দশা থেকে হিন্দু সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য চৈতন্যের চেষ্টা চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এক প্রকার সমন্বয়কারী সংস্কৃতি হোসেন শাহের আমলে চৈতন্যের প্রভাবে গড়ে ওঠে। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এর প্রভাব সদূরপ্রসারী হয়েছিল।

বঙ্গ দেশের মুসলিম শাসন ছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে স্বাধীন সুলতানী আমল এবং মোঘল শাসন ছিল। মোটামুটিভাবে এই সময়ের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ, জীবন চেতনা অনুসন্ধিৎসা, সামাজিক ব্যবহার বিধি, রাজনৈতিক প্রশাসন এবং বিশিষ্ট ধরনের শিল্পচর্চা এদেশের জীবনে রূপলাভ করে, বাংলা ভাষার পরিবর্তন ঘটে এবং বাংলা ভাষায় বর্ণিত জীবন কাহিনীর মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ এবং জীবন চেতনার স্বাক্ষর ধরা পড়ে। এক কথায় বলতে গেলে ইসলাম পরিপূর্ণভাবে এদেশের সমাজব্যবস্থার মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রথম থেকেই ধর্ম প্রচারণার ক্ষেত্রে মুসলমান সুফী সাধকরা এদেশে এসেছিলেন। তাঁদের ঔদার্য, মানবহিতৈষণা, জনকল্যাণ সকল মানুষের প্রতি সমদৃষ্টি এদেশের প্রজ্ঞায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। হিন্দু মসুলমানের মধ্যে একটি সমন্বয়সূত্র এঁরাই আবিষ্কার করেছিলেন। যার ফলে ধর্মার্চনায় মৌলিক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও আত্ম নিবেদনের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটেছিল। এর ফলেই এদেশেরই বৈষ্ণবসঙ্গীত, মরমীসঙ্গীত এবং বাউল সঙ্গীতের উদ্ভব ঘটে। এ সমস্ত সঙ্গীতের মধ্যে সাধন পদ্ধতির বিবিধ আচরণের কথা নেই, কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের কথা আছে। অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হচ্ছে অথবা জীবাত্মা পরমাত্মার সাথে মিলিত হচ্ছে। মিলিত হচ্ছে এই ভঙ্গিটিই এসমস্ত গানে প্রবল। এই কারণেই আমাদের সংস্কৃতিতে সমন্বয়বাদিতা প্রবল। যে ধারাক্রম অনুসারে এখানে বিভিন্ন ধর্ম বিকাশ লাভ করেছে সেই ধারাক্রমে প্রাথমিক পর্যায়ে বৌদ্ধ ধর্ম আসে।

www.pathagar.com

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবক্তা এবং প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধার্থ ছিলেন নেপালের পাদদেশে অবস্থিত এক আঞ্চলিক রাজ্যের রাজপুত্র। মানুষের জীবনে জন্ম, জরা, বার্ধক্য এবং মৃত্যু লক্ষ্য করে তার মনে বিভিন্ন প্রশ্ন উদিত হয়। জিজ্ঞাসা জাগে, কেন মানুষের জন্ম হয় যদি মৃত্যুতেই তার অবধারিত শেষ, কেন যৌবনময় সুঠাম দেহধারী মানুষ বার্ধক্যে অথর্ব হবে, কেন অবশেষে মৃত্যু এসে জীবনকে নিঃশেষ করবে? এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি গৃহত্যাগ করেন। অবশেষে সিদ্ধিলাভ করে গৌতমবুদ্ধ বলে পরিচিত নন। গৌতমবুদ্ধ বিনয়, অহিংসা এবং সমন্বয়বাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষে মানুষে জাতিভেদ প্রথা বিলোপ করে সকল মানুষকে তিনি একই পংক্তিতে দাঁড় করিয়েছিলেন। তিনি জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সাধন করেন এবং সকল মানুষকে একই সম্ভ্রমের আসনে অবস্থিত করেন। তাঁর মূলবক্তব্য ছিল যে, মানুষের মুক্তির প্রয়োজন– সর্বপ্রকার বেদনা থেকে মুক্তি, সংকট থেকে মুক্তি, দারিদ্র থেকে মুক্তি এবং অহমিকা থেকে মুক্তি। তিনি এই মুক্তির নামকরণ করেন 'নির্বাণ'। এই 'নির্বাণ' লাভের জন্য কয়েকটি প্রক্রিয়ার তিনি নির্দেশ দেন। এই নির্দেশগুলো সংক্ষেপে হচ্ছে- আত্মজ্ঞান লাভ করা অর্থাৎ নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা, কামনা, লালসাকে জয় করা, বিনয়কে লভ্য করা, বিশুদ্ধতাকে জীবনে আনয়ন করা, সততার প্রতিষ্ঠা ঘটানো এবং অহিংসাকে অবলম্বন করা। বৌদ্ধধর্ম সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে নিরুত্তর। কিন্তু মানুষের মুক্তির জন্য সর্বস্ব ত্যাগের কথা উক্ত ধর্মে বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম পাল রাজত্বকালে পূর্ণ প্রতাপের সঙ্গে বিদ্যমান ছিল এবং পাল রাজত্বকালে গণতন্ত্রায়ন ও মানুষে মানুষে বৈষম্য দূরীকরণ বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শকে প্রকাশ করে। পাল রাজত্বের পর সেনদের আমলে বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার চলতে থাকে। তখন বৌদ্ধরা হিন্দু তান্ত্রিকদের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। চর্যাগীতিকায় বৌদ্ধদের এই তন্ত্রসাধনার ব্যাখ্যা আছে। এক সময় আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে বাংলাদেশ থেকে বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ দীপংকর আমন্ত্রিত হয়ে তিব্বত গিয়েছিলেন সেখানকার বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার সাধনের জন্য। সে সময় বাংলাদেশে বৌদ্ধদের মহাযান মতবাদটি প্রবল ছিল। বর্তমানকালে বাংলাদেশে হীনযান মতধারাই প্রতিষ্ঠিত।

বৌদ্ধদের ধর্মীয় ভাষা 'পালি' এবং পালি ভাষাই ধর্মীয় প্রজ্ঞা এবং নির্দেশাবলী সাধারণত রচিত হলেও বাংলাদেশের স্থানীয় ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা চলেছিল। আমরা পাল আমলের যে সমস্ত 'দোহাকোষ' পাই সেগুলো সবই পূর্বী অপভ্রংশ রচিত এবং এভাবে দেখা যায় যে ধর্মবোধ সাহিত্য বোধের জন্ম দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য বোধের মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি রূপলাভ করেছে। আমরা বৌদ্ধ মতবাদের মাধ্যমে 'ক্ষণিকত্ববাদ', 'শূন্যবাদ', এবং 'পরিনির্বাণ'-এর কথা জেনেছি। এগুলো কাব্য ও সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণে অনেক সময় ব্যবহার হয়েছে। তাছাড়া পালি ভাষা থেকে বাংলা ভাষার অনেক শব্দের উৎপত্তি আমরা নির্ণয় করতে পারি। যেমন লাপু থেকে লাউ, উধধান থেকে উনান, ঝাম থেকে ঝামা, গাবী থেকে গাভী, দরথ থেকে দরদ, সিম্ব থেকে শিমুল ইত্যাদি। একথাগুলো বলা হলো একারণে যে বৌদ্ধদের অবস্থান এবং বিকাশের কারণে বঙ্গ-অঞ্চলের সংস্কৃতির বিপুল পরিবর্তন ঘটেছিল। বৌদ্ধরা মানুষের মনকে ভ্রমপাশ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং শাস্ত্র অপেক্ষা যুক্তির প্রাধান্য ঘোষণা করেছিলেন। বৌদ্ধদের মূল বিশ্বাস হচ্ছে কর্মফল,

www.pathagar.com

তারা কর্মফলবাদী। তাদের মতে কর্মশুদ্ধিই নির্বাণ লাভের একমাত্র উপায়। বুদ্ধদেবের একটি কথা এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, যেমন গঙ্গা, যমুনা, সরযু, অচিরবতী প্রভৃতি নদী সকল সমূদ্রে পড়ে নিজ নিজ নাম হারায় এবং সমুদ্রেই অংশীভূত হয়, সেইরূপ ক্ষয়িত্র, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শুদ্র সংঘে প্রবিষ্ট হলে তাদের আর জাতিগত পার্থক্য থাকে না। বৌদ্ধরা বলে থাকেন যে নির্বাণ লাভ করতে হলে চিত্তে অকুশল চিন্তা প্রবেশ যাতে না করে সেই চেষ্টা করতে হবে, শ্রদ্ধা ভক্তি অর্জন করতে হবে, চিত্তে প্রীতি ও প্রশমতা লাভ করতে হবে কায়িক, বাচসিক সংযম আরাধ্য করতে হবে। মোটকথা বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন আদর্শগুলো বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাপনের ভিত্তিমূলে কাজ করেছে এবং এদেশের মানুষের মানসিকতা নির্মাণে সহায়তা করেছে।

বাংলাদেশ অঞ্চলে আর্যরা পূর্বে এলেও এ অঞ্চলে তারা প্রথমে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেনি। সেনদের আমলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হিন্দুধর্ম বাংলাদেশে বিকাশ লাভ করে। উচ্চবর্ণে বহিরাগত ব্রাহ্মণ্যদের আগমন ঘটে এবং সমাজে মন্দিরের অধিকার এবং শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। সঙ্গীত ও নৃত্যে ধ্রুপদি মন্দিরের উপাসনা পদ্ধতিতে প্রবেশ করে এবং সংস্কৃতির একটি নতুন রূপরেখা দানা বাধতে থাকে। আমরা জানি যে হিন্দু ধর্মের কোনো প্রবর্তক বা প্রতিষ্ঠাতা নেই এবং দৈবপ্রাপ্ত কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, মানুষের একমাত্র কর্ম করবার অধিকার আছে। এই কর্মই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের মৌলিক মতবাদ। এই মতবাদের সঙ্গে পুনর্জন্ম মতবাদের প্রত্যক্ষ যোগ আছে। পুনর্জন্ম মতবাদে বলা হয়ে থাকে যে, সকল প্রাণী একটি আনুক্রমিক শ্রেণী বিভাগের সদস্য এবং নিজ কর্মফল অনুযায়ী পরবর্তী জীবনে প্রতিটি প্রাণী উচ্চতর বা নিম্নতর প্রাণীতে পুনর্জন্ম লাভ করবে। এছাড়া হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকলেই কোনো না কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত। এই জাতিভেদের ফলে হিন্দু ধর্মের মানুষ বিভিন্ন বর্ণ বা গোত্রে বিভক্ত হয়েছে। বাংলাদেশে বৌদ্ধ মতবাদের সংস্পর্শে এসে এবং পরবর্তীতে ইসলামের সংস্পর্শে এসে হিন্দুদের মধ্যে নতুন ধরনের চিন্তা জন্মলাভ করে। সুফী মতবাদের সংস্পর্শে আসার ফলে বৈষ্ণব মতবাদ একটি সমন্বয়বাদী মতবাদে পরিণত হয়। বৈষ্ণবদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা নেই। যে মহূর্তে একজন বৈষ্ণব গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করেছে সে মুহূর্তেই হিন্দু হিসাবে তার যে শ্রেণীভাগ ছিল সেগুলো বিলুপ্ত হচ্ছে। তেমনি বাউল ও মরমী মতবাদ এদেশে প্রচার লাভ করে যার কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এদেশের হিন্দুরা নিজেদের সংস্কার এবং পূঁজা-পার্বনের মধ্যে অবস্থান করেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এমন কতকগুলো নিদর্শন সৃষ্টি করে যার সঙ্গে অন্য ধর্মাবলম্বীর কোনো বিরোধ ছিল না। মুসলমানদের খাদ্য স্বভাবে, বিবাহে লৌকিক আচরণ, নারীদের অংলকার বিভূষণে এদেশের হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। তেমনি আবার ইসলামের মানবপ্রীতি এবং মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের ফলে এদেশের বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির সার্বক্ষণিক কর্মকাণ্ডগত চৈতন্যের রূপ। এই চৈতন্যের মধ্যে ইসলাম, বৌদ্ধ এবং হিন্দু প্রতিটি ধর্মই কিছু না কিছু দান করেছে। এ অঞ্চলের প্রধান ধর্ম হিসেবে ইসলাম এদেশে সমাজ জীবনে বিবিধ কর্মকাণ্ডের যে স্বরূপ নির্মাণ করেছে তার সঙ্গে অন্য ধর্মের কিছু কিছু চৈতন্য এসে যোগ দিয়েছে। কিন্তু তদসত্ত্বেও এটা বলতে হয় যে, এখানে মূলত ইসলাম ধর্ম হিন্দু ধর্মকে প্রতিস্থাপিত করেছে অর্থাৎ হিন্দু ধর্মের স্থানে ইসলাম ধর্ম প্রধান প্রেরণা হিসাবে জাগ্রত হয়েছে।

www.pathagar.com

ধর্ম হচ্ছে সংস্কৃতির একটি প্রধান উপাদান। ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। ইসলাম ধর্মের মূল বিশ্বাস হচ্ছে বিশ্বস্রষ্টা সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্বে শ্রদ্ধাবনত বিশ্বাস। হিন্দু বহু দেবদেবীবাদী কিন্তু তারাও এক পরম পিতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এই অর্থে যে দেবদেবীদের মাধ্যমে এই পরম পুরুষের আস্বাদ লাভ করা যায়। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে ধর্ম এখানে কেবলমাত্র ধর্মীয় রীতিনীতি এবং অনুশাসনই নিয়ন্ত্রণ করেনি, বরঞ্চ মানুষের সামগ্রিক জীবনধারাকেও প্রভাবিত করেছে। এছাড়া প্রাত্যহিক জীবনেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মের অনুশাসন কার্যকর ব্যবস্থা হিসাবে বিদ্যমান থাকে। মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনে ধর্ম একটি বিশেষ শক্তি হিসেবে বিদ্যমান থাকে। মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনে ধর্ম একটি বিশেষ শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। ধর্মের সাহায্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন এবং ঐক্য সম্ভব হয়েছে। মানুষের জীবন যাপন এবং সামাজিক কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে ধর্ম এদেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশ অঞ্চলের ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব অনস্বীকার্য। পালি ভাষা, সংস্কৃত ভাষা এবং আরবী ভাষা বাংলা ভাষাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। বৌদ্ধ, হিন্দু এবং ইসলাম ধর্মের ব্যাপক বিস্তারের ফলে এ অঞ্চলের ধর্মীয় ভাষাগুলো গুরুত্ব পেয়েছিল। এদেশের কৃষি কর্মের মধ্যে ধর্মীয় আচার প্রবেশ করেছে। যেমন শস্য রোপণ বা ফসল কাটার সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন এদেশে আছে। খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধেও এদেশে ধর্মের কারণে বিভিন্ন রীতি ও প্রথা প্রচলিত হয়েছে। এভাবে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখবো যে আমাদের জীবনে বহু খুঁটিনাটি বিষয়ে ধর্মের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে।

এদেশে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর খৃস্টান ধর্ম এ অঞ্চলে অংশত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। খৃস্টান ধর্মের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্যের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের বিকাশ ঘটে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মাধ্যমে বাংলা গদ্যের একটি লিখিত রীতি প্রবর্তিত হয় যার ফলে এদেশের সাহিত্য সংস্কৃতিতে একটি বিপ্লব সৃষ্টি হয়। বিদেশী খৃস্টানগণ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন সন্দেহ নেই, কিন্তু বাংলা গদ্য সৃষ্টির ফলে পরবর্তীতে এদেশের মানুষ সামগ্রিকভাবে উপকৃত হয়। ইংরেজি ভাষার প্রচলন এদেশের সংস্কৃতিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। আমাদের পোশাক পরিচ্ছদে পরিবর্তন আসে, আমাদের খাদ্য গ্রহণ এবং খাদ্য পরিবেশন পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আসে। কিন্তু একটি কারণে খৃস্টান ধর্ম এদেশে অন্য কোনো ধর্মের স্থান অধিকার করতে পারেনি; সে কারণটি হচ্ছে, যে খৃস্টান ধর্ম এদেশে এলো সে খৃস্টান ধর্ম পাশ্চাত্যের বিধিব্যবস্থায় সংগঠিত। খৃস্টান ধর্মের উদ্ভব মধ্যপ্রাচ্যে হলেও মূলত এর গঠনপ্রকৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটে প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যে রোমক শাসন কালে। খৃস্টান ধর্ম প্রবলভাবে রোম এবং গ্রীসে প্রবর্তিত হয়। খৃস্টীয় চতুর্থ শতকে রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন খৃস্টধর্ম গ্রহণ করার পর খৃস্টধর্ম সমগ্র ইউরোপে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। রোমকদের বিশ্বাস এবং চিন্তার দ্বারা খৃস্টান ধর্মের আচরণ বিধিতে অনেক পরিবর্তন আসে এবং এই সমস্ত আচরণ বিধিকে সমুন্নত রাখবার জন্য খৃস্টান ধর্ম গীর্জার শাসনের অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। আমাদের দেশে যে খৃস্ট ধর্ম আসে সে খৃস্টান ধর্ম এই গীর্জার অনুশাসনবদ্ধ খৃস্টান ধর্ম এবং সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয় মেজাজের। এর ফলে খৃস্ট ধর্মাবলম্বীরা এদেশের সমাজ জীবনের সাথে ওতপ্রোত হতে পারেনি। উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা লক্ষ্য করি যে, সাধারণ মানুষের বিচারে খৃস্টান ধর্ম ছিল রাজার ধর্ম এবং

www.pathagar.com

সেই অর্থে সম্মানের ভূষণ। দ্বিতীয় হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার ফলে যে অন্ত্যজ শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল তাদের জন্য খৃস্টান ধর্ম এনেছিল মুক্তির বরাভয়। তৃতীয়ত আধুনিক জীবনের সমৃদ্ধির সঙ্গে খৃস্টান ধর্মের যোগসূত্র রয়েছে- এই বিশ্বাস সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল ছিল। চতুর্থত আমাদের দেশে যে বিদেশী শাসন ছিল সে বিদেশী শাসন ছিল খৃস্টানদের। এই সমস্ত কারণে উনবিংশ শতাব্দীতে খৃস্টান ধর্ম আমাদের দেশের নাগরিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেনি। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসনের অবসানের পর থেকে এই প্রভাব কমে যেতে থাকে এবং বর্তমানে সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবনে খৃস্টান ধর্মের প্রভাব ক্ষীণ।

খৃস্টান ধর্ম ত্রিত্ববাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই বিশ্বাস ভগবানের তিনটি স্বরূপ অভিব্যক্তি- একটি হচ্ছে, পিতা রূপে ভগবান; একটি হচ্ছে পুত্ররূপে ভগবান; আরেকটি হচ্ছে পবিত্র আত্মারূপে ভগবান। এই বিশ্বাসটি মুসলিম চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই কারণে বর্তমানে আমরা লক্ষ্য করি খৃস্টান ধর্মাবলম্বীরা তাদের নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। গণ্ডীর পরিধি তারা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের বিশ্বাসের প্রতিবেদন মুসলমান সমাজে সাড়া জাগায়নি। আমাদের দেশে খৃস্টান ধর্মের প্রচলনের পথে কোনো বাধা নেই এবং ধর্ম প্রচারেও কোনো বিধি নিষেধ নেই কিন্তু সামাজিকভাবে কোনো সমন্বয় ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের নেই। পটভূমিটি স্মরণে রেখে আমরা লক্ষ্য করি যে ধর্মগত বৈচিত্র্য আমাদের সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। খৃস্টানদের বিবিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান এই বৈচিত্রকে সুচিহ্নিত করে। তাছাড়া আমাদের জাতীয় জীবনের সামাজিক বিবর্তনে ধর্ম একটি প্রধান শক্তিরূপে কাজ করে চলেছে। এভাবে আমরা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব যে, আমাদের সংস্কৃতিতে বৌদ্ধ এবং হিন্দু বিশ্বাসের ক্রমধারা আছে, ইসলামের প্রবাহমান ঐতিহ্য আছে, এবং খৃস্টান ধর্মের সাহায্যে একটি আন্তর্জাতিক স্বভাবের সভ্যতার ধারা আছে। আমাদের সংস্কৃতি প্রসারের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের সকল ধর্মের ধর্মীয় ভাষাগুলি চিরদিন গুরুত্ব পেয়েছে এবং এই গুরুত্বের নিদর্শন বাংলা ভাষার মধ্যেই আমরা পাই, যেখানে পালি, সংস্কৃত আরবী-ফারসী প্রবেশ করে ভাষার নবরূপায়ন ঘটিয়েছে। ইংরেজি ভাষাও আমাদের ভাষার প্রকৃতিতে পরিবর্তন এনেছে, আমাদের দৃষ্টিতে ইংরেজি ভাষা খৃস্টান ধর্মের ভাষা। যদিও ক্রমান্বয়ে বাংলা ভাষার মাধ্যমে খৃস্টান ধর্ম প্রচারের কারণে ধর্মীয় ভাষা হিসাবে স্বভাবের অহংকার ইংরেজি ভাষার ততটা নেই যতটা পূর্বে ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উন্নত এবং অনুন্নত কথাটি প্রচারিত হয়েছিল। তার কারণ শাসকগোষ্ঠী তাদের সভ্যতার অনুকূলে এদেশের জীবনযাত্রার মান গড়ে তুলতে চেয়েছিল। সে সময় সমৃদ্ধির সোপানে আরোহন করার জন্য এবং সমাজে সম্মানিত বলে গ্রাহ্য হবার জন্য অনেক লোক খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বর্তমানে এটা আমরা বিশ্বাস করি যে মানব সভ্যতার ঐতিহ্য নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠী এবং ধর্ম সম্প্রদায়ের দান রয়েছে। এক্ষেত্রে কেউ কারও কাছে থকে উন্নত বা অনুন্নত নয়। বর্তমান সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা অন্তর্গত হয়েছে। কিন্তু এই অন্তর্ভুক্তি কোনো বিশেষ ধর্মীয় শিক্ষা নয়, সেখানে সকল ধর্মের শিক্ষাই বিদ্যমান রয়েছে। এক্ষেত্রে

www.pathagar.com

যে আদর্শটা সক্রিয় তা হচ্ছে; সকল বিদ্যার্থী একটি আস্তিক্যবাদে যেন গড়ে ওঠে। হিন্দুদের জন্য হিন্দুধর্ম শিক্ষা, বৌদ্ধদের জন্য বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা, মুসলমানদের জন্য ইসলাম ধর্মশিক্ষা এবং খৃস্টানদের জন্য খ্রিস্টীয় ধর্ম শিক্ষা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান। এখানে সহাবস্থানের একটি প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। সকল ধর্মের সারতত্ত্ব নিয়ে নীতিশিক্ষার প্রচলন এখানে ঘটেনি, কিন্তু ধর্মাবলম্বী আপনাপন ধর্মীয় গণ্ডীতে বিশ্বাসী হয়ে যাতে গড়ে ওঠতে পারে সেই চেষ্টা এখানে আছে। সুতরাং এটাকে এক ধরনের মিশ্রিত ধর্মশিক্ষা বলা যায়। টি.এস, ইলিয়ট তিন ধরনের ধর্মীয় শিক্ষার কথা বলেছেন ঃ প্রথমত একটি একক ধর্মীয় শিক্ষা যা রাষ্ট্রীয় ধর্ম, যদি রাষ্ট্রে কোনো ধর্ম থেকে থাকে। দ্বিতীয়ত সকল ধর্মের সারতত্ত্ব নিয়ে একটি মাত্র নীতি শিক্ষার প্রবর্তন এবং তৃতীয়ত একটি মিশ্রিত ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা যেখানে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর নিজস্ব ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। টি.এস. ইলিয়ট প্রতিটি ব্যবস্থার সুবিধা অসুবিধারই কথা বলেছেন, কিন্তু তিনি মূলত বলতে চেয়েছেন যে ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রশ্রয় না থাকলে কোনো শিক্ষাব্যবস্থা বিদ্যার্থীদের জীবন গঠনে যথার্থভাবে সহায়তা করে না।

আমাদের দেশে মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা রয়েছে, খৃস্টানদের জন্য মিশনারী স্কুল রয়েছে, হিন্দু ও বৌদ্ধদের জন্য নিজস্ব ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা চালু আছে কিন্তু তা জীর্ণ প্রায়। এক সময় বৃটিশ আমলে হিন্দুদের ধর্মশিক্ষার জন্য টোল ছিল, বর্তমানে তা গুরুত্ব হারিয়েছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজন এবং বিধিবদ্ধ নিয়ম-শাসনের মধ্যে আনয়নের প্রয়োজন।

প্রধান কয়েকটি ধর্ম ছাড়া আমাদের দেশে উপজাতি আদিবাসীদের কিছু প্রাকৃতিক ধর্ম আছে যে ধর্মগুলো বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে খুব লঘুভাবে হলেও কিছু বৈচিত্র্য এনেছে। তাদের ধর্মীয় আচার নিষ্ঠার সঙ্গে কিছু সামাজিক কর্মকাণ্ড গড়ে উঠেছে যেগুলো সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে। কেননা, উপজাতি আদিবাসীদের ধর্ম এবং সামাজিকতার সঙ্গে এগুলো অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। তাদের সঙ্গীত এবং নৃত্য তাদের ধর্ম সাধনায় অঙ্গীভূত। সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এগুলো ক্রমশ হারিয়ে যাবে। সুতরাং এ সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

মানুষ নিজেকে জানতে চায় এবং পৃথিবীর সঙ্গে তার সম্পর্ককে জানাতে চায়। এই জানার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট কোনো উত্তর যখন সে খুঁজে পায় না তখন সে কতকগুলো বিশ্লেষণের অবলম্বন করে। এই বিশ্বাস প্রচারিত কোনো বিশ্বাস হতে পারে অথবা আপনাপন সমাজ থেকে উদ্ভূত কোনো বিশ্বাস হতে পারে। সুতরাং মনে রাখতে হবে প্রত্যেক সংস্কৃতির মধ্যে প্রতিষ্ঠানগত ধর্ম বিশ্বাসের স্থান রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি আপনাপন মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে থাকে। প্রত্যেক সমাজের মধ্যে ধর্ম আছে, কিন্তু ধর্মে বিশ্বাস এবং আচরণের মধ্যে পার্থক্য আছে। কোনো সামাজিক মানুষ তাদের পূর্বপুরুষদের পূঁজা করে, আবার কোনো সমাজে প্রাকৃতিক কোনো শক্তিকে পূঁজা করে, প্রাণীকে পূঁজা করে এমন সমাজও আছে। আমাদের সমাজে ইসলাম ধর্মের প্রবল প্রভাব থাকলেও উপজাতি আদিবাসীদের এই সমস্ত বিচিত্র বিশ্বাসকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এবং সংস্কৃতিতে তারা বৈচিত্র্য এনেছে এবং আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমাদের সংস্কৃতিতে বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব নিম্নরূপ চিহ্নিত করবার চেষ্টা করা যায়।

www.pathagar.com

[এদেশে বিভিন্ন ধর্মের প্রকাশকাল হিসেবে ধারাক্রম করা হয়েছে] ঃ

ধর্ম	ধর্মের স্বভাব এবং প্রকৃতি	জীবনাদর্শ	সাংস্কৃতিক লক্ষণ
বৌদ্ধ	মঠাশ্রয়ী ধর্ম, ভিক্ষু জীবন, জাতিভেদ বিলোপ	বিনয় এবং নির্বাণ	অহিংসা, সমন্বয়বাদ, ধর্মীয় ভাষার সৃষ্টি, সাহিত্যে মানবতাবোধ, বিশিষ্ট ধরনের স্থাপত্য
হিন্দু	সমাজভিত্তিক, দেব-আরাধনা, জাতিভেদ, পুনর্জন্ম	লালসা-মুক্তি, ভক্তি, ল দেব-শরণ পূঁজার্চনা	সংস্কৃত ভাষার বিকাশ, সঙ্গীত এবং নৃত্য, পোশাক ও খাদ্যের বিশিষ্টতা, মন্দির স্থাপত্য
ইসলাম	একেশ্বরবাদ, অলৌকিক গ্রন্থ-ভিত্তিক	বিশ্বাস এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সুফীদের বিনয়	স্থাপত্য ও হস্তলিখন শিল্পের বিকাশ, দেশজ ভাষার বিকাশ, পোশাক ও খাদ্যের বিশিষ্টতা, সুফী সাধনায় সঙ্গীতের ব্যবহার
খৃস্টান	ত্রিত্ববাদ, আদি-পিতার পাপ এবং সেজন্য মুক্তির সাধনা, গীর্জাশ্রয়	অহিংসা ও ভ্রাতৃত্ব	বিজ্ঞান চর্চা, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, বিশিষ্ট ধরনের স্থাপত্য, পোশাকের বিশিষ্টতা, আন্তর্জাতিকতা

উপজাতি/আদিবাসীদের ধর্ম আমাদের সংস্কৃতিতে লোকবিশ্বাস এবং উক্ত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে সঙ্গীত ও নৃত্যের বিশিষ্ট ধরনের পরিচর্যা এসেছে।

আমাদের সংস্কৃতি একটিমাত্র একক ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতি নয়। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে কখনও কখনও একক ধর্মে আনুশাসনটি বিদ্যমান থাকে। যেমন-খৃস্টান ধর্মে নিজস্ব মন্ডলীবদ্ধ সামাজিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক আচরণ অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীদের জন্য সত্য নয় তেমনি আবার হিন্দু ও বৌদ্ধদের নিজস্ব পূঁজা-অর্চনা বিধি আপনাপন মন্ডলীর জন্যই সত্য। এগুলো হচ্ছে বিশেষ বিশেষ ধর্মের নিজস্ব সীমাবন্ধনের শাসন। এসমস্ত সত্ত্বেও আমাদের জীবনযাত্রার মধ্যে একটি সমন্বয়বাদী সংস্কৃতির প্রশ্রয় দেখা যায়।

পলাশীর যুদ্ধের পর এদেশে পূর্ণভাবে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনভার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজেদের হাতে গ্রহণ করে। এদেশের সংস্কৃতির মধ্যে তখন থেকেই পরিবর্তন আসতে থাকে। ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা রাজভাষা রূপে গৃহীত হয়। প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন ঘটে।

দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের ফলে মুসলমান সমাজ অনেক পিছিয়ে পড়ে। তারা বাস্তব অবস্থাকে অনেক দিন স্বীকার করে নিতে পারে না। অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাঙালি হিন্দু সমাজকে উদার আহ্বান জানান রামমোহন। তিনি সমাজ ও ধর্মসংস্কারের এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় সে যুগে যে তীক্ষ্ণ মুক্তবুদ্ধি ও মনীষার পরিচয় দেন, নব্য হিন্দু ভারতে তার তুলনা খুব বেশি নেই। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সিভিলিয়ানদেরকে এ দেশের রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত করার এবং এ দেশের ভাষা শিক্ষা দেবার জন্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ [অধুনা প্রেসিডেন্সী কলেজ]। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষকতা এবং বাংলা গদ্য সৃষ্টির কাজ উপলক্ষে এ দেশের হিন্দুদের কিছু সংখ্যক লোক ইংরেজদের সংস্পর্শে আসে। এর পরে হিন্দু কলেজে বাঙালি হিন্দুদেরকেই লেখাপড়া শিখতে দেখা যায়। মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর এবং পশ্চাদপদ হয়ে পড়ে। তদুপরি সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রভূমির পরিবর্তন ঘটে। পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত রাজধানী মুর্শিদাবাদ ছিল সমগ্র বাংলাদেশের প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। রাজশক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রীক সাংস্কৃতিক জীবন নিঃশেষিত হয় এবং নতুন রাজধানী কোলকাতাকে কেন্দ্র করে নতুন সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে উঠে। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ব্যবধান প্রবল হতে থাকে এবং সাংস্কৃতিক পটভূমিতে হিন্দুদের প্রাধান্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দীর্ঘকাল ইংরেজ শাসনের ফলে আমাদের সমাজ জীবনে পাশ্চাত্য প্রভাব এসেছে এবং দেশীয় সংস্কৃতির মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। আমাদের গৃহনির্মাণ, প্রকল্প, উৎসব আনন্দ, খাদ্য স্বভাব, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা ব্যবহার সকল ক্ষেত্রেই পরিবর্তন এসেছে। পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক চিন্তা, রাজনৈতিক প্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট আমাদের জীবনের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেক মানুষ যে আপন স্বদেশীয় বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও বিশ্ব নাগরিক হতে পারে সেই বোধ আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়। সংস্কৃতিকে এখন আর খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধ করে দেখা সম্ভব হয় না। সাংস্কৃতিক আপন গতিবিধিতে সমগ্র বিশ্বকে স্পর্শ করতে থাকে। ইংরেজ শাসনের যে কয়টি শুভ ফল আমরা পেয়েছি তার মধ্যে একটি হচ্ছে ভাষার সাহায্যে সংস্কৃতির বিকাশ। এই আমলে বাংলা ভাষার গ্রহণ ক্ষমতা এবং প্রকাশ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। দেশের সমাজ জীবন থেকে অন্ধ বিশ্বাস এবং কুসংস্কার দূরীভূত হতে থাকে এবং শুধুমাত্র পশ্চাদমুখিতা থেকে মুক্ত হয়ে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে শেখে। যদিও সামগ্রিকভাবে সমগ্র দেশের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়নি এবং সেটা সম্ভবপরও ছিল না, কিন্তু এদেশের মানুষ অতি দ্রুত মধ্যযুগীয় ভাবাদর্শ থেকে আধুনিক সমাজ জীবনে এই সময়েই প্রবেশ করে।

পাশ্চাত্যের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের ফলে আমাদের দেশে সংস্কৃতির মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। পৃথিবীর প্রতিটি সংস্কৃতি অনবরত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। সংস্কৃতি যেহেতু গতিশীল, সুতরাং কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির মধ্যে পরিবর্তনশীলতা আসে, নব নব উদ্ভাবন ঘটে, সমন্বয় ঘটে, পরিহারও ঘটে। সংস্কৃতির এই গতিশীলতা কখনও সময়কালের প্রেক্ষাপটে নির্দিষ্ট হয়ে যায় না। বিভিন্ন সময় ও অঞ্চলে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে এবং হারে সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটে এবং এই রূপান্তরের মাধ্যমে সংস্কৃতির নিজস্ব পুষ্টি সাধিত হয়। কোনো কোনো সংস্কৃতির বিকাশ ও রূপান্তর অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সংঘটিত

www.pathagar.com

হয়েছে; যেমন ইউরোপীয় সংস্কৃতি, আবার অনেক সংস্কৃতি বহুকাল পর্যন্ত মোটামুটি স্থিতিশীল ও অপরিবর্তিত থাকে; যেমন উপজাতি/আদিবাসীদের সংস্কৃতি। শেষোক্তরা সাধারণত কোনো উদ্ভাবন বা নব প্রবর্তনকে সহজে মান্য করতে চায় না। তাদের সংস্কৃতির অভ্যন্তরে সহজে এই ধরনের উদ্ভাবন বা নব প্রবর্তন আসে না। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সংশ্রবের ফলে উপজাতি/আদিবাসীদের জীবনে পরিবর্তন এসে থাকে এবং এ পরিবর্তন ঘটে সামাজিক স্বীকৃতির মাধ্যমে এবং সমন্বয় প্রক্রিয়ার মাধমে। মূলত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে সংস্কৃতির পরিবর্তন দ্রুত সংগঠিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে সংস্কৃতির মধ্যে নতুন উদ্ভাবন জন্মলাভ করে। বিজ্ঞানের কারণেই মানুষের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসে, সামাজিক জীবনে এবং আচার ও প্রথার পরিবর্তন সৃষ্টি হতে পারে। এদেশে ইংরেজদের আগমনের পরে মুদ্রণ শিল্পের উদ্ভাবন এবং বিকাশ ঘটে। এই মুদ্রণ শিল্পের ফলে এদেশের সংস্কৃতিতে প্রকৃত পরিবর্তন সাধিত হয়। ইংরেজি ভাষার সঙ্গে আমাদের পরিচয় সম্পর্ক ঘটে এবং অনুবাদের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষার বিভিন্ন গ্রন্থ এদেশে পরিচিত হয়। এমনকি শেকস্‌পীয়ারের একটি নাটকের কাহিনী আমাদের লোককাহিনীতেও প্রবেশ করেছে। তাছাড়া ভারতীয় বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটে। এক কথায় বলা যায় মুদ্রণ শিল্পের প্রবর্তনের ফলে আমাদের সংস্কৃতির প্রসার ঘটে যাকে বলে 'ডিফিউশন' বাক পরিব্যাপ্তকরণ। মুদ্রণ শিল্পের সাহায্যে তার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। এভাবে আমাদের সংস্কৃতিতে সাংস্কৃতিক ঋণের একটি প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা ঘটে। ক্রমশ অন্যান্য অঞ্চলের প্রলক্ষণগুলো বাংলাদেশ অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করে।

১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্তমান বাংলাদেশ পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল হিসাবে প্রথমে পূর্ববঙ্গ ও পরে পূর্বপাকিস্তান নামে অভিহিত হয়। যদিও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিক রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের সৃষ্টি, কিন্তু এর পিছনে বিরাট অর্থনেতিক কারণ ছিল। জমিদার শ্রেণী এবং ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যেই পাকিস্তান আন্দোলন আরম্ভ হয়। তখন এই জমিদার, ব্যবসায়ী এবং পুঁজিপতিদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং আন্দোলনটি এক সম্প্রদায় বিরুদ্ধে অন্য সম্প্রদায়ের আন্দোলনে পরিণত হয়। প্রচণ্ড বিদ্বেষ, বিক্ষোভ এবং সংঘর্ষের পরিণতিতে পাকিস্তানের জন্ম হয়। এর ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িক মানসিকতা বিদ্যমান থাকে। তাই আমরা লক্ষ্য করি যে, তখন পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ একই আদর্শ এবং একই সাংস্কৃতিক প্রজ্ঞার মধ্যে সমগ্র পাকিস্তানকে আবদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। যার ফলে অল্প দিনের মধ্যে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ভাষাভাষীদের সঙ্গে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। প্রথম সংঘর্ষ বাধে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। সমগ্র পাকিস্তানকে একক সাংস্কৃতিক গ্রন্থিতে আবদ্ধ করবার অবাস্তব পরিকল্পনা উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করবার চেষ্টার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধতা জাগে এবং বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন রূপলাভ করে। এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিরোধ ও সংঘাতের মধ্য দিয়েই আমরা অগ্রসর হতে থাকি এবং সামগ্রিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে আমাদের বিরোধ প্রধান ও প্রবল হয়ে ওঠে। এরই

www.pathagar.com

ফলে স্বাধিকার আন্দোলনের দীর্ঘ পথ ধরে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয় এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের সংস্কৃতির আদর্শ ও প্রত্যয় সম্পর্কে আমরা যে নীতিমালা চিহ্নিত করতে পারি তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

আমাদের আবহমান ঐতিহ্যের অনুসরণ; জনগণের ধর্মবিশ্বাসের ও ধর্মচেতনার অনুষঙ্গরূপে প্রাপ্ত নৈতিক চেতনাকে সমুন্নত রাখার প্রয়াস।

ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত বাংলাদেশের মানুষের মানবতাবোধের সঙ্গে বিশ্ববোধের ঐক্যসাধন।

আমাদের লিখিত-অলিখিত সুদীর্ঘ সংগ্রামী ইতিহাস, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের মহান আদর্শ যাতে জাতীয় জীবনে অবিনশ্বর রূপ লাভ করে তার ব্যবস্থা গ্রহণ।

জাতীয় জীবনে সহনশীলতার ভাবধারাকে জোরদার করে কার্যকর গণতান্ত্রিক বোধের বিকাশ সাধন, বিদেশী সংস্কৃতির সুকৃতি গ্রহণ ও অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বন্ধ করা।

সর্বাধিক উপায়ে জাতীয় সংস্কৃতির অবক্ষয় রোধ এবং সংস্কৃতির সঙ্গে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন।

বাংলাদেশে বিদ্যমান সকল ধর্মাবলম্বীদের ধর্মচর্চা ও অনুষঙ্গী কার্যক্রম পরিকল্পনার ও বাস্তবায়নের অবাধ সুযোগ রয়েছে এবং থাকবে। তবে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়েরই এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে যার দ্বারা অন্য সম্প্রদায়ের মনমানসিকতা আহত হবার সম্ভাবনা থাকে। সাম্প্রদায়িকতাশূন্য বর্তমান বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সম্প্রীতি পরিপূরক কার্যক্রমের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করতে হবে। #

www.pathagar.com

একজন মুসলমানকে চলমান বিশ্ব সম্পর্কে জানতেই হবে

ইউসুফ আল কারযাভী

আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী বর্তমান বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ। আর এ কথাটা একালের বহু বিখ্যাত মনীষীই অকপটে স্বীকার করেছেন। তার লিখিত অসংখ্য বিশাল ভলিউমের গ্রন্থ তার ব্যাপক পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় বহন করছে।

ইউসুফ আল কারযাভীর জন্ম মিসরে। বর্তমানে থাকেন কাতারে। গোটা মধ্যপ্রাচ্যে তাকে এক নামে সবাই চেনে। মুসলিম বিশ্বেও তিনি পরিচিত এবং জনপ্রিয় একজন লেখক। সমসাময়িক যে কোনো সমস্যা বা বিষয়ে ইসলামের ব্যাখ্যা কি, কোরআন হাদীসের আলোকে তিনি তা অবলীলায় বলে দিতে পারেন। কোরআনের ওপর তার অগাধ পাণ্ডিত্য দেখলে বিস্মিত হতে হয়। আল্লামা কারযাভীর তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থের সঙ্গে মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম বাংলাভাষীদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তিনি কারযাভীর '*ইসলামে যাকাত বিধান*' ও '*ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*' গ্রন্থ দুটি অনুবাদ করেছেন। মাওলানা রহীমের '*উন্নত জীবনের আদর্শ* গ্রন্থটিও কারযাভী'র একটি মূল্যবান গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

ইউসুফ আল কারযাভী'র '*ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*' গ্রন্থটি যেমন ব্যাপক আলোচনাপূর্ণ তেমনি এর তুলনা দুনিয়ার আরবী, উর্দু ও অন্যান্য কোনো ভাষাতেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই গ্রন্থটি সম্পর্কে ইউসুফ আল কারাযাভী নিজেই বলেছেন: 'হারাম-হারাম বিষয়ে এ গ্রন্থখানি বিশ্ব ইসলামী সাহিত্যের সর্বোচ্চ সংযোজন।' কেউ কেউ এ গ্রন্থটিকে ইসলামী বিষয়াদির 'বিশ্বকোষ' বলে মন্তব্য করেছেন।

ইউসুফ আল কারযাভী আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গত মার্চ মাসে বাংলাদেশে এসেছিলেন। কারযাভী'র ঢাকায় অবস্থানকালে **সাপ্তাহিক সোনার বাংলা**'র পক্ষ থেকে হোটেল সোনারগাঁয়ে তার একটি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। সাক্ষাৎকারে তিনি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ'র সমস্যা ও সমাধান এবং স্পর্শকাতর কয়েকটি বিষয়ে খোলাখুলি বক্তব্য রেখেছেন। প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে তিনি কোরআন হাদীসকে তার উত্তরের ভিত্তি হিসেবে নিয়েছেন। প্রতিটি প্রশ্নের জবাব তিনি যেরকম বলিষ্ঠতার সঙ্গে দিয়েছেন তাতে এটাই স্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলামের প্রতিটি শাখায় তার জ্ঞান যেমন অপরিসীম ও গভীর তেমনি বিস্ময়কর। আল্লামা কারযাভী'র এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন : **জয়নুল আবেদীন আবদুল্লাহ, সরদার ফরিদ আহমদ ও হারুন ইবনে শাহাদাত।**

প্রশ্নঃ *আপনি আপনার এক গ্রন্থে লিখেছেন, বর্তমান দুনিয়ায় সত্যিকার ঈমানদার থাকতে হলে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি এই তিনটি বিষয়ে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করবেন?*

ইউসুফ আল কারযাভী ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আমাদের নেতা ও

www.pathagar.com

অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব, আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি, তাঁর পরিবার ও অনুসারীদের প্রতি। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। জীবনের প্রতিটি বিষয়েই রয়েছে ইসলামের নির্দেশনা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ইসলাম মানুষের জীবনকে নিয়ম-শৃংখলায় বেঁধে দিয়েছে। এমনকি বাচ্চা যখন গর্ভে থাকে তখন মা ও বাচ্চার জন্যও রয়েছে বিধিবিধান। আর মৃত্যুর পরও রয়েছে বিধিবিধান, যেমন- মুরদাকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো, দাফন করা, মরহুমের কর্য পরিশোধ করা, তার ওসিয়ত বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি। ইসলাম মানুষের ব্যক্তি জীবনকে সুশৃংখলভাবে পরিচালিত করেছে তার বাড়িতে, পথেঘাটে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সরকারি অফিসে, বিচারালয়ে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে।

একজন ব্যক্তির পারিবারিক সম্পর্ক কেমন হবে সে সম্পর্কেও ইসলাম স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পিতা-মাতার সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সমাজের বিত্তবান শ্রেণীর সঙ্গে দরিদ্র জনগণের সম্পর্ক, বিচারাধীন লোকের প্রতি বিচারকের কর্তব্য, অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্কের স্পষ্টতা প্রমাণ করে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এই জন্যই আমরা দেখতে পাই, মহান প্রভু তাঁর রাসূলকে (সাঃ) লক্ষ্য করে বলেন ঃ "আমরা আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে প্রতিটি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। আর তা মুসলমানদের জন্য পথপ্রদর্শক, রহমত এবং সুসংবাদদাতা।" ইসলাম শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কালেমা, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত এগুলো ইসলামের স্তম্ভ অবশ্যই, কিন্তু শুধু এগুলোরই নামই ইসলাম নয়। সুতরাং একজন মুসলমানের কর্তব্য হলো যে, সে ইসলামের ব্যাপকতা ও সার্বজনীনতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে। তাকে চলমান বিশ্ব সম্পর্কে জানতে হবে। মক্কায় মুসলমানদের সংখ্যা যখন খুবই নগণ্য ছিল তখনও তারা সে সময় পারসিক ও রোমানদের মধ্যে যে সংঘাত ও যুদ্ধ চলছিল তার খোঁজ-খবর রাখত। এতেই বুঝা যায় যে, তারা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করেনি।

প্রশ্ন ঃ *বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের দুরবস্থার কারণ কি? এ থেকে মুক্তির উপায়ই বা কি?*

কারযাভী ঃ নিঃসন্দেহে মুসলিম উম্মাহ আজ গভীর সংকটে, গোটা দুনিয়ার মুসলমানরা আজ যে দুর্দশায় নিমজ্জিত এতে কোনো সন্দেহ নেই। এর কারণ হচ্ছে সঠিক ইসলাম থেকে অধিকাংশ মুসলমানের দূরে থাকা। পশ্চিমারা যখন মুসলিম দেশগুলোতে তাদের উপনিবেশ কায়েম করে তখন তারা মুসলমানদের জীবন থেকে ইসলামকে পৃথক করে ফেলে। তারা ইসলামী আইনকে পরিবর্তন করে মানব রচিত আইন চালু করে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা এমন করে পরিবর্তন করা হয় যে, মুসলমানরা ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নানা ধরনের পরিবর্তন আনা হয়। আর তাতে করে ইসলামী জীবন ধারায় চলা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এমনকি যারা ইসলামী কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে চায় তারাও বৈরী পরিবেশের প্রভাবে সংকটে পড়ে যান। ফলে বর্তমানে মুসলমানরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। মুসলমানরা ইসলামী শিক্ষা পেলেও বাস্তবে কোনো ইসলামী পরিবেশ পাচ্ছে না।

কমিউনিস্টরা দেখতে পাচ্ছে যে, কমিউনিজমের ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র পাচ্ছে। কিন্তু মুসলমানরা ইসলামী শিক্ষা পেলেও বাস্তবে ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো মডেল পাচ্ছে না। এখানেই মুসলমানরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আজকের বিশ্বে কোনো কোনো রাষ্ট্রে কিছুটা ইসলাম রয়েছে,

www.pathagar.com

কোনো রাষ্ট্র আবার ইসলামী রাষ্ট্রের কাছাকাছি। কেউ আবার ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেছে। কোথাও আবার কোনো কোনো মুসলিম রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিছু কিছু মুসলিম রাষ্ট্র ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। যেমন, তুরস্ক, তিউনিসিয়া- সেখানে ইসলামের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা রীতিমতো খগড়হস্ত। নামায পড়াই সেখানে মনে হয় অপরাধ। মেয়েরা মাথায় স্কার্ফ পড়লে সেটাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। তিউনিসিয়ার অবস্থা এতো ভয়াবহ যে, সেখানে কোনো মেয়ে মাথায় স্কার্ফ পড়লে তাকে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ঢুকতে দেয়া হয় না। এমনকি স্কার্ফ না খুললে কোনো মেয়েকে মেডিকেল কলেজে পর্যন্ত এডমিশন দেয়া হয় না। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধরনের অবস্থানের কারণে মুসলমানদের মানসিক যন্ত্রণাও বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ *গান একটি শক্তিশালী মাধ্যম। গানের ব্যাপারে ইসলামের ব্যাখ্যা কি? গানের কথার সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের বিষয়ে ইসলাম কি বলে?*

কারযাভী ঃ ইসলামী সঙ্গীত মানুষের মনকে চাঙ্গা করে, মনোবলকে বাড়িয়ে দেয়। ঈমানকে দৃঢ় করে, দ্বীনি বিশ্বাসকে উজ্জীবিত করে। আমরা দেখেছি রাসূলের (সাঃ)-এর সময় থেকেই ইসলামী সঙ্গীতের ব্যবহার হয়ে আসছে। যখন মসজিদে নববী তৈরি করা হচ্ছিল তখন সাহাবারা গান গেয়েছেন। তাদের গানের ভাষা ছিল এরকম ঃ

হে প্রভু, প্রকৃত জীবন তো আখিরাতের জীবন
সুতরাং ক্ষমা করুন আনসার ও মুহাজিরদেরকে

এভাবেই সাহাবীরা খন্দকের যুদ্ধে এবং অন্যান্য জিহাদে ইসলামী গান গাইতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) গাইতেন ঃ

হে প্রভু, তুমি না থাকলে পথ পেতাম না
সদকা নামায কিছুই করতাম না
তাই শান্তি নাজিল করো আমাদের ওপর
আমাদের পা মজবুত করো
শত্রুর মুকাবিলায়।
যারা আমাদের ওপর চড়াও হতে চায়
তারা যে ষড়যন্ত্রই করুক না কেন
আমরা তার বিরুদ্ধাচরণ করবোই।

আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন যুদ্ধে মুসলমানদের এসব গান গাইতে। সুতরাং যুদ্ধে আমরা দেখি আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ও অন্যান্য সাহাবীদের গান গাইতে ঃ

হে জান্নাতের অনুরাগী, জান্নাত নিকটে এসে গেছে
তার পানীয় অতি উত্তম, কোমল ও ঠাণ্ডা।

সুতরাং ইসলামী গান ও তার মাধ্যমে মনকে চাঙ্গা করা, উজ্জীবিত করা একটি বৈধ বিষয়। কিন্তু কেন জানি মুসলমানরা গান গাইছে না। কবি ইকবালের একটি বিখ্যাত গান এরকম ঃ

চীন আমাদের, ভারত আমাদের
আরব আমাদের
আমরা মুসলমান
সারা বিশ্বই আমাদের।

www.pathagar.com

এই গানটি আরবী ভাষায় অনুবাদ হয়ে ব্যাপক বিস্তৃতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আরব বিশ্বে মুস্তফা সাদেক আর রাফয়ীর বিখ্যাত কবিতা *উনসুদাতুল উরুবা*। মুসলমানরা এটি মুখস্ত করে গানের সুরে গেয়ে থাকে। এর প্রথম কয়েকটি চরণ এরকম ঃ

হে প্রভু, তোমার কাছে প্রার্থনা করি
আমাদের সাহায্য কর
যার ওয়াদা তুমি করেছ
আমরা তোমার সন্তুষ্টি চাই
তুমি যা চাও আমরা তাই চাই।

ইখওয়ানুল মুসলেমিন তাদের সূচনালগ্ন থেকে ইসলামী সঙ্গীতের ব্যবহার ও প্রয়োগ অব্যাহত রেখেছে। সংগঠনের তরুণ যুবক কর্মীদের চাঙ্গা ও উজ্জীবিত করতে তারা এসব গান পরিবেশন করে থাকে। তাদের অসংখ্য জনপ্রিয় গান রয়েছে। আমি নিজেও অনেক ইসলামী গান লিখেছি। আমার দুটি গানের বইও প্রকাশিত হয়েছে। গানে 'দফ' নামক ঢোল ব্যবহারের কোনো অসুবিধা দেখি না। কেননা রাসূলের (সাঃ) যুগে বিয়েতে দফ বাজান হতো। এমনি কিছু কিছু বাদ্যযন্ত্র গানে ব্যবহার করা যায়।
আমি মিসরের একটি ছোট গানের কথা বলি। এটি রচনা করা হয়েছিল যখন মিসর ত্রিশক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। গানটির শিরোনাম 'আল্লাহু আকবার।'

আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান,
সব আগ্রাসীদের ষড়যন্ত্রের ওপরে তিনি
আল্লাহ নির্যাতিতদের জন্য উত্তম সাহায্যকারী
আমি আমার বিশ্বাস ও অস্ত্রের মাধ্যমে
দেশকে মুক্ত করবোই
আমি সত্যের আলো
হাতে নিয়ে জ্বালাবোই।

এই গানটিতে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করাতে এটি এতো বেশি আবেদনময় হয়ে ওঠে যে, এতে মানুষ দারুণভাবে উজ্জীবিত হয়। এ গান শত্রু বিতাড়নের আন্দোলনে বিরাট প্রভাব ফেলে। তাই আমার মতে, গানে কিছু কিছু বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারে কোনো আপত্তি নেই। এ ব্যাপারে আমার লেখা "ইসলামের দৃষ্টিতে গান ও বাদ্যযন্ত্র" নামে একটি গ্রন্থ রয়েছে সেটি পড়ে দেখা যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ *মহিলাদের ক্ষমতায়ন কথাটি তৃতীয় বিশ্বে খুব বেশি করে উচ্চারিত হচ্ছে। এই বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?*
কারযাভী ঃ আমার মতে জায়েয। বিশেষ করে যদি তারা অভাবী হয়, তার হয়তো স্বামী মারা গেছে বা পরিবারটি খুবই নিঃস্ব। আমরা কোরআনে দেখতে পাই মুসা (আঃ) যখন মাদায়েনে যান সেখানে মেয়ে দুটিকে দেখে বলেন, "তোমাদের কি ব্যাপার?" তারা বলল, আমরা আমাদের ভেড়াকে পানি খাওয়াবো সবার পরে, আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ (আল কাসাস)। অর্থাৎ তাদের পিতা বৃদ্ধ, অন্য কোনো লোক নেই। যার কারণে মেয়ে দুটি নিজেরাই ভেড়ার পাল নিয়ে চরাতে বের হয়েছে। মুসা (আঃ) তাদের সাথে কথা বলেছেন, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সমাজে এর প্রয়োজনও রয়েছে। যেমন- শিক্ষকতা পেশার জন্য মহিলা দরকার, মহিলা রোগীর জন্য মহিলা ডাক্তার প্রয়োজন। এ জন্যে কতিপয় শর্ত

www.pathagar.com

রয়েছে ঃ (১) কাজটি যেন বৈধ হয়, এটি সবার জন্যই (মহিলা ও পুরুষ) প্রযোজ্য। (২) মেয়েরা যেন পোশাক-পরিচ্ছদে শালীন হয়। (৩) কথা-বার্তায় যেন ন্যাকামী না হয়। (৪) কাজের ক্ষেত্রে নির্জন সঙ্গ যেন কারো সাথে না ঘটে। যেমন কারো ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে কোনো মহিলার কাজ না করা। কারণ এতে তার সাথে একান্তে কাজ করতে হবে, একাকী নির্জনে কথাবার্তা বলতে হবে। মোটকথা কাজটি যদি বৈধ হয়, কারো সাথে নির্জনে বা একাকী কাজ করতে না হয়, তাহলে সে কাজ হোক সরকারি বা বেসরকারি তাতে মহিলাদের জন্য কোনো বাধা নেই। মহিলাদের সরকারি পদ গ্রহণ যেমন জায়েয তেমনি মন্ত্রিত্বের পদেও মহিলারা বসতে পারেন। তবে শর্ত হলো তিনি যেন শালীন হন, বেপর্দা না হন, পর পুরুষের সঙ্গে নির্জন সাক্ষাৎ না ঘটে এবং তিনি যেন দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন। ফৌজদারী ব্যতীত যেমন পারিবারিক বিচার, ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে মহিলাদেরকে বিচারকের পদে নিয়োগ দান জায়েয বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। ইমাম তবারী মহিলাদের সব বিষয়েই বিচারক নিয়োগ বৈধ বলেছেন। ইমাম ইবনে হামাম আজ্জাহেরীও জায়েয বলেছেন। সুতরাং বিষয়টি জায়েয।

প্রশ্ন ঃ *চলচ্চিত্র এবং নাটকে মহিলা চরিত্রে অভিনয়ের ব্যাপারে আপনার মতামত কি? ইরানে কিন্তু এটি হচ্ছে।*

কারযাভী ঃ বিষয়টি ব্যাপক স্টাডির দাবি রাখে। এ ব্যাপারে যথেষ্ট পর্যালোচনার প্রয়োজন। মেয়েদেরকে পুরোপুরি নিষেধ করা যাবে না। আবার তাদেরকে বেপর্দা করে উত্তেজক দৃশ্য দিয়ে অশ্লীলতা ছড়ানোও কোনো মতেই জায়েয হবে না। কোনো ঘটনাই কি মেয়েদের বাদ দিয়ে? মেয়েদের বাদ দিয়ে তো কোনো ঘটনাই নেই। আদম ও হাওয়ার ঘটনার কথাই ধরুন, "তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর, খাও এবং সর্বত্র ঘুরে বেড়াও (এখানে নারী ও পুরুষ আদম ও হাওয়া)।" কুরআনে তো মেয়েদের কথা বার বার এসেছে। ইব্রাহীম (আঃ) ও সারার ঘটনা, ইসমাঈল (আঃ) ও তার মায়ের ঘটনা, নূহ (আঃ) ও তার স্ত্রীর ঘটনা, লুত (আঃ) ও তার স্ত্রীর ঘটনায় তো মেয়েদের উপস্থিতি রয়েছে। মুসার (আঃ) জন্মলগ্ন থেকেই তার মায়ের ঘটনা এসেছে "তুমি তাকে দুধ পান করাও, তাকে নদীতে ভাসিয়ে দাও আর তুমি চিন্তা করো না।" মুসার ঘটনায় ফেরাউনের স্ত্রীর কথা, "একে হত্যা করো না।" মুসার বোনের প্রসঙ্গ "যাও, দেখ কি ঘটে।" শোয়ায়েব (আঃ)-এর দুই মেয়ের ঘটনা, যাদের একজনের সাথে মুসার বিয়ে হয়েছিল। ঈসা (আঃ)-এর মায়ের ঘটনা। আমাদের নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রী খাদিজা ও অন্যান্য স্ত্রীদের ঘটনা। সব ক্ষেত্রেই মহিলাদের কথা এসেছে। এ জন্যই আমাদের জীবন থেকে মহিলাদের বাদ দেয়া সম্ভব নয়।

কাজেই আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে, কিভাবে অভিনয়ের ক্ষেত্রে আমরা মহিলাদের অংশগ্রহণ করাতে পারি। তবে পশ্চিমাদের মতো করে তো অবশ্যই নয়। এ জন্য চিন্তাশীল ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চিন্তা গবেষণা করতে হবে। তবে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মহিলাদের অংশগ্রহণ যেন উত্তেজনা না ছড়ায়, যৌনতা না নিয়ে আসে ইত্যাদি।

হ্যাঁ, ইরানী অভিজ্ঞতাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি, এ থেকে আমরা ফায়দা নিতে পারি।

প্রশ্ন ঃ *আচ্ছা, মুসলিম দেশগুলোতে গণতন্ত্র না থাকাটা কি মুসলমানদের বর্তমান দুরাবস্থার কারণ?*

www.pathagar.com

কারযাভী ঃ আমরা ইসলামের শূরা ভিত্তিক (পরামর্শ সভা) রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে। আমরা মনে করি, সত্যিকারের গণতন্ত্র ইসলামের কিছুটা কাছাকাছি। তবে 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস' গণতন্ত্রের এই দর্শন আমরা গ্রহণ করতে পারি না। জনগণ আল্লাহর বিধানকে রহিত করে অন্য বিধান চালু করতে পারে। এজন্য আমরা বলি, ইসলামে গণতন্ত্রের পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে, জনগণের মতামত নেয়া হবে, তবে তা অবশ্যই ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান লঙ্ঘন করে নয়। গণতন্ত্র একনায়কতন্ত্রের বিপক্ষে, কিন্তু তা অবশ্যই আল্লাহর বিধানের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত হবে না। একজন মুসলমান আল্লাহকে তার বিধানদাতা, রাসূলকে (সাঃ) আদর্শ নেতা ও কুরআনকে সংবিধান মেনে এরপর গণতন্ত্রের পদ্ধতি ব্যবহার করবে। এতে জনগণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে, তাদের স্বাধীন মতামত জানাতে পারবে। আজ দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, অধিকাংশ মুসলিম দেশে গণতন্ত্রের নামে জনগণকে হারাম কাজে বাধ্য করা হচ্ছে। অশ্লীলতায় জড়ানো হচ্ছে। এটা ইসলামী গণতন্ত্রে একেবারেই সম্ভব নয়। এইজন্যই যে মুসলিম দেশগুলোতে গণতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে সেখান প্রকৃত গণতন্ত্র নেই, আছে মিথ্যা গণতন্ত্রের দাপট। মুসলিম দেশের অধিকাংশ জনগণই ইসলামী বিধান চায়, কিন্তু তাদেরকে তা দেয়া হচ্ছে না। আজ গণতন্ত্রের বড় প্রবক্তা আমেরিকা। কিন্তু আমেরিকা চায় মুসলিম দেশগুলোতে একনায়কতন্ত্র টিকে থাকুক। এমন নজীরও তো আছে যে, মুসলমানরা ভোট দিয়ে ইসলামী শক্তিকে বিজয়ী করল, কিন্তু সেনাবাহিনী জোর করে ওই নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে দেশ শাসন করতে লাগল, আর পশ্চিমারা একে সমর্থন করল। আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলো এটাই করছে।

প্রশ্ন ঃ *আফগানিস্তানে আমেরিকান আধিপত্যের বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন? এর শেষ পরিণতিই বা কী হতে পারে?*

কারযাভী ঃ প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা বর্তমানে ইসলামী জাগরণ ও ইসলামপন্থীদের ব্যাপারে খড়গহস্ত। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনাকে পুঁজি করে তারা গোটা বিশ্বে ইসলামপন্থীদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। আমি এক বিবৃতির মাধ্যমে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার নিন্দা করেছি এবং আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবি জানিয়েছি। বলেছি, গোটা বিশ্ববাসী যেন এ তদন্তে শরীক হতে পারে এবং অপরাধীর বিচার করতে পারে। অথচ আমেরিকা একজনকে দোষী সাব্যস্ত করল, যদিও এর পেছনে কোনো প্রমাণ তারা দেখাতে পারেনি। যদি ধরে নেয়া যায় যে, সেই করেছে, তাহলে গোটা মুসলিম উম্মার কি অপরাধ? আফগান জনগণের কি অপরাধ যে তাদেরকে এভাবে নির্মূল করতে হবে? প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলে আমেরিকা তার প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও খনিজ সম্পদ কুক্ষিগত করার লক্ষ্যেই এখানে এসেছে। আফগানদেরকে একে অপরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছে যাতে তারা আমেরিকার অনুগত হয়। যখন রাশিয়া আফগানিস্তানে আক্রমণ করে তখন আমেরিকা এসেছিল আফগানদের সাহায্য করতে। আবার রুশরা পরাজিত হয়ে যখন আফগানিস্তান থেকে বিতাড়িত হলো তখন আমেরিকা জিহাদ ও জিহাদকারীদের বিরুদ্ধে লেগে গেল।

আজ মুসলমানরা এক সংকটজনক অধ্যায়ে অবস্থান করছে। বিশেষ করে ফিলিস্তিনে। সেখানে প্রতিটি বিষয়েই আমেরিকা ইসরাইলের পক্ষে। যদি আমেরিকান সমর্থন, অস্ত্র ও রাজনৈতিক আশ্রয় না পেত তাহলে ইসরাইল এভাবে হত্যা, নির্যাতন, বিতাড়ন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ মুসলমানরা ও আরবরা সত্যিই

www.pathagar.com

এমন এক অসহায় অবস্থায় রয়েছে, যা দেখলে করুণা হয়। ইসরাইল ১৯৬৯ সালে যখন মসজিদুল আকসা পুড়িয়ে দেয় তখন গোটা দুনিয়ার মুসলমানরা ক্ষেপে ওঠে এবং মুসলিম নেতারা ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) সম্মেলন করতে বাধ্য হন। আজ মসজিদুল আকসা ভেঙে পড়ার উপক্রম, কিন্তু না আরবরা আর না অন্য মুসলমানরা এর জন্য সোচ্চার ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ঃ *মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের পথে প্রধান বাধা কোথায়? আর ওআইসি'র নিষ্ক্রিয় ভূমিকার কারণ কি?*

কারযাভী ঃ এর পেছনে কারণ মুসলমানদের দুর্বলতা। নবী করীম (সাঃ) বলেন, 'তোমাদের এমন সময় আসবে যখন অন্যান্য জাতিরা তোমাদের নিধন করবে এমনিভাবে যেমনিভাবে খাবার টেবিলে লোকজন খানা খায়। সাহাবীরা বললেন, এটা ঘটবে কি আমাদের সংখ্যা কম থাকার কারণে? রাসূল বললেন, না। বরং তোমাদের সংখ্যা হবে অনেক। কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে সমুদ্রের ফেনার মত। তোমাদের মধ্যে ওয়াহান থাকবে। সাহাবীরা বললেন, ওয়াহান কি? তিনি বললেন, দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুর ভয়।' আজ মুসলমানদের মধ্যে দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব প্রকট। মুসলিম বিশ্বের এমন কোনো শাসক নেই যিনি আল্লাহর হাতে হাত রেখে রুখে দাঁড়াবে। ১৯৪৮ সালে আরব রাষ্ট্রপ্রধানরা ফিলিস্তিনিদের বলেছিলেন, তোমরা আমাদের জন্য ময়দান ছেড়ে দাও, আমরা ইসরাইলীদের প্রতিহত করবো। কিন্তু সাতটি আরব রাষ্ট্রের সৈন্যরা ইসরাইলের হাতে মার খেল, পরাজিত হলো। ইমাম হাসানুল বান্নার মত ছিল ফিলিস্তিনিদের অস্ত্র সজ্জিত করা এবং তাদেরকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করা, আর স্বেচ্ছাসেবী সৈন্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া এবং অন্যদের এতে অংশগ্রহণের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু কেই তাঁর কথা শুনেনি। আজ ইসরাইল সব দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়েছে, তারা আণবিক শক্তির অধিকারী হয়েছে। আর এই অবস্থায় ফিলিস্তিনিদেরকে সবাই একাকী ছেড়ে দিয়েছে। কেউ কেউ তো ইসরাইলের সঙ্গে চুক্তিও করেছে, যেমন- মিশর ও জর্দান। এদেরকে ইসরাইল যুদ্ধের ময়দান থেকে বের করে দিয়েছে। এরা এখন মধ্যস্থতার ভূমিকায় নেমেছে। এই দুর্বলতা আজ ইসলামী উম্মাহর মধ্যে বিরাজ করছে।

তবে ইসলামী সংগঠনগুলো আশার সঞ্চার করছে। আজ কতিপয় ইসলামী সংগঠন যেমন হামাস, ইসলামী জিহাদ, শহীদ আকসা ব্রিগেড এবং ফাতাহ-এর কয়েকটি গ্রুপ এবং লেবাননে হিজবুল্লাহ বাহিনী এরা উম্মতের মধ্যে আশা জাগিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি একমাত্র প্রতিরোধ জিহাদের মাধ্যমে ফিলিস্তিন মুক্ত করা সম্ভব। শক্তি বলে যা কেড়ে নেয়া হয়েছে তা শক্তির মাধ্যমেই মুক্ত করে আনতে হবে।

প্রশ্ন ঃ *ওআইসি সক্রিয় নয় কেন?*

কারযাভী ঃ ওআইসি মুসলিম দেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব করছে। এটি একটি আয়নার মতো। এতে মুসলিম দেশগুলোর শক্তি ও তাদের পরস্পরের সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটছে। যদি তাদের মধ্যে ইসলামের জন্য আগ্রহ থাকতো, থাকতো কোনো লক্ষ্য- তাহলে একটা ফলাফল আশা করা যেতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাসূল যেমন ইঙ্গিত করেছেন যে, তারা হবে ফেনার মতো, পানিতে ভাসমান খড়কুটোর মতো, যার কোনো মূল্য নেই, নেই চলার কোনো গন্তব্যস্থল। আজ মুসলিম উম্মার সেই ভাসমান অবস্থা। পানির চলার পথ রয়েছে, পানি তার উৎপত্তিস্থল থেকে সাগরে গিয়ে পড়ে। কিন্তু ভাসমান খড়কুটোর কোনো নির্দিষ্ট

www.pathagar.com

লক্ষ্য নেই। মুসলিম উম্মাহ যেন খড়কুটো। মুসলিম বিশ্বে আজ এমন কোনো শক্তিশালী নেতা নেই, যার ডাক সবাই শুনবে, যার ডাকে সবাই সাড়া দেবে। যেমন ছিলেন মরহুম বাদশা ফয়সল। তাঁর একটি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে তার একটি বিশাল অবস্থান ছিল। তিনি যখন জীবিত ছিলেন তখন মুসলিম বিশ্বে দূত পাঠিয়ে সকলকে ডাক দিয়েছিলেন, তাঁর ডাকে আফ্রো-এশিয়ার সব মুসলিম দেশই সাড়া দিয়েছিল। আজ তেমন কোনো শক্তিশালী নেতা নেই যে যার ডাকে সবাই সাড়া দেবে। তাছাড়া আজ কোনো নেতারই ইসলামী লক্ষ্য নেই। সবাই নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। এরই প্রতিফলন ঘটেছে ওআইসিতে।

সবার মূল লক্ষ্য যদি এক হয় অর্থাৎ কুরআন হয়, ইসলামী শরীয়ত যদি রাজনৈতিক দর্শন হয় তাহলে তাদের মধ্যে ভিন্নতা থাকার কথা নয়। কিন্তু আজ তাদের কেউ আমেরিকার, কেউ ফ্রান্সের, কেউবা ইংল্যান্ডের বন্ধু। আবার মুসলমানদের কেউ নিজেদেরকে বলছে আমি তুর্কী, আমি ভারতীয়, আমি আরবীয় ইত্যাদি। আজ ইসলামী পরিচয়ের চেয়ে ভূমণ্ডলগত পরিচিতি বড় হয়ে গেছে। যখন উম্মাহ একই উদ্দেশে কাজ করবে, জাতীয় স্বার্থই যখন বড় হয়ে দেখা দেবে, তখনই তাদের জন্য কল্যাণকর কিছু আসবে। তাই আজ ইসলামী সংগঠনগুলোই উম্মতের জন্য আশার আলো। দোয়া করি, আল্লাহ উম্মতের অবস্থাকে ভালো করুন।

প্রশ্ন ঃ *মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থানান্তর জায়েয কি না?*

কারযাভী ঃ হ্যাঁ, কতিপয় নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থানান্তরকে ফিকহ একাডেমি (রাবেতা) জায়েয বলেছে। যেমন, অসুস্থ ব্যক্তির যেন সত্যিই এর প্রয়োজন থাকে। অঙ্গ যে দিবে সে যদি জীবিত হয় তাহলে সে যেন দানকারী হয়, বিক্রেতা নয়। কেননা মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর দেয়া নিয়ামত, এটা বিক্রির বস্তু নয়। তাছাড়া এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, অঙ্গ দানকারী যেন শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং আশা করা যায় যে, যাকে অঙ্গটি দেয়া হচ্ছে সে এর দ্বারা উপকৃত হবে। আর যদি মৃত ব্যক্তির হয় তাহলে যাদের ব্রেন ডেড হয়ে যায়। যেমন কেউ দুর্ঘটনায় মারা গেলে তার কিডনি, চোখ ইত্যাদি নেয়া যেতে পারে। এগুলো মৃত ব্যক্তির জন্য সদকা হবে। তবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মতামত নিয়ে এটি করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ *পিতা মারা যাবার পর দাদা রয়েছেন, এই অবস্থায় এতিমদের সম্পত্তি প্রাপ্তির ব্যাপারে বিধান কি?*

কারযাভী ঃ এই বিষয়টি গবেষণা করে মিশরীয় ও সিরীয় উলামাগণ রায় দিয়েছেন যে, দাদাকে ওসিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব যে, তিনি তার পৌত্রদের জন্য অবশ্যই কিছু দিয়ে যাবেন। এ ব্যাপারে কোরআনে বলা হয়েছে সম্পদ বণ্টনের সময় যখন নিকট আত্মীয় উপস্থিত হয় তখন তাদেরকে কিছু দাও এবং উত্তম কথা বলো। এরা তো এতিম, দুঃস্থ ও নিকট আত্মীয়, তাই তাদেরকে অবশ্যই কিছু দিতে হবে। এতিমদের সম্পত্তি দেয়ার জন্য মিশর ও সিরিয়ায় আইন রয়েছে। আমি এটাকে সমর্থন করি। কারণ এতিমরা কি না খেয়ে মারা যাবে? এটা হতে পারে না। #

www.pathagar.com

না ট ক

ইশারা

ফয়সাল বার্ক ও
গোলাম রব্বানী তোতা

জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন-২০০২ এ সাংস্কৃতিক পর্বে এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি পরিবেশন করে সাইমুম থিয়েটার। এটি তাদের নবম প্রযোজনা।

নাটকটির নির্দেশনা দেন মুহাম্মদ মুস্তাগিছুর রহমান মুস্তাক, তার সহকারী ছিলেন বদিউর রহমান সোহেল। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন আমিনুল ইসলাম।

সাইমুম থিয়েটারের পক্ষ থেকে নাটকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "১৯৭১ সালে এই দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এদেশ এখনো পরাধীন। পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতি এদেশকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। তাই পরতে পরতে ভোগবাদী সংস্কৃতির ছোবল। শিক্ষা ক্ষেত্রে নকলের প্রবণতায় ছাত্র/ছাত্রীরা জাতিকে মেরুদন্ডহীন করে তুলছে। অপর দিকে সুযোগ বুঝে কুচক্রী প্রতিষ্ঠানগুলো চালিয়েছে অপতৎপরতা। বার বার লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে ব্রাহ্মণ্য ও খৃষ্ট সাম্রাজ্যবাদ। পলাশীর অনেক পরও আবার নীল নকশা চালিয়ে যাচ্ছে দেশকে গ্রাস করার জন্য। আর এই সামান্য উদাহরণ নাটক *ইশারা*।"

নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে যারা অভিনয় করেছেন তারা হলেন ঃ উপস্থাপক- সানজিদ মাহমুদ/মারুফ/রাজু, মৌলভী-কাজী উমর ফারুক/মেহেদী, শামীম-রেজওয়ান, বিপ্লব-চয়ন, তরমুজ-সাগর/আফসার, শাহীন-নেওয়াজ, শিক্ষক-বদিউর রহমান সোহেল/রলী, হাদী-রফিকুল ইসলাম রলী/ফয়সাল, মীর-নয়ন, সাত্তার-ফরহাদ/বেলায়েত, ১ম বয়স্ক-আঃ গনী বিদ্বান/শাহেদ, ২য় বয়স্ক-শাহীন/মারুফ, ৩য় বয়স্ক-আমিনুল ইসলাম/স্বাধীন/হাছান, ১ম যুবক - তানভীর আহমদ রিজভী, ২য় যুবক - হুমায়ুন কবীর/ লাল্টু, ৩য় যুবক- হাছান ইমাম/উৎপল কুমার ভাওয়ান/সোহেল, সিরাজউদ্দৌলা-মুস্তাগিছুর রহমান মুস্তাক ও গোলাম হোসেন-রাজু।

কলাকুশলী ছিলেন ঃ মিলনায়তন ব্যবস্থাপনা-আজিজুর রহমান, শৃংখলা-মুস্তাফিজুর রহমান, মঞ্চ ব্যবস্থাপনা-কাজী উমর ফারুক, মঞ্চ পরিকল্পনা-মুস্তাগিছুর রহমান, আলোক পরিকল্পনা-বদিউর রহমান সোহেল, আলোক সরবরাহ-শওকত হোসেন, সেট পরিকল্পনা-হুমায়ুন কবীর, সেট সরবরাহ-আবুল কালাম মুন্সি, দ্রব্য সামগ্রী ব্যবস্থাপনা-রফিকুল ইসলাম রলী ও হাসান, পোশাক ব্যবস্থাপনা-আঃ গনী বিদ্বান, মেকাপ-বাবুল/সুবল, আবহ সংগীত- সাইমুম শিল্পীবৃন্দ ও রাজু (মিউজিক)।

www.pathagar.com

মঞ্চে কিছু কুচক্রীমহল ইসলামকে ধ্বংস করার নমুনা প্রদর্শন করবে কোরিওগ্রাফির মাধ্যমে।

উপস্থাপক ঃ সম্মানিত দর্শকমন্ডলী, ইতিহাস পড়ছিলাম। এতক্ষণ আপনাদের সামনে একটি জাতির মেরুদন্ড ভাঙার দৃশ্য দেখানো হল। কিছু বুঝতে পেরেছেন কি? অবশ্য না বুঝারই কথা। কারণ- একটি জাতির মেরুদন্ড ভাঙার দৃশ্য এত সহজে বুঝানো সম্ভব নয়। আসলে আমাদের সমাজে এসব ঘটনা খুব সূক্ষ্মভাবে সুকৌশলে ঘটানো হচ্ছে। কিন্তু তা আমরা বুঝতে পারছি না।

(মার্চ পাস্ট-এর তালে তালে তিনজন বৃদ্ধ মঞ্চে প্রবেশ করবেন। তাদের কণ্ঠে বাজবে "কারার ঐ লৌহ কপাট" গানটা। তারা গান গাইতে মঞ্চের এক কোণে দাঁড়াবেন। গানটি চার লাইন গেয়ে ফ্রিজ হয়ে যাবে।)

উপস্থাপক ঃ ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করেছি। তখন কিন্তু এই "কপাট ভাঙাচোরা" ব্যাপারটা এক্সট্রিমে ছিল। এ ধরনের গান শুনে বাংলা মায়ের হাজারো সন্তান সে দিন লাল সবুজের পতাকা বুকে নিয়ে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিল তাদের জীবন। কিন্তু আজ এত বছর পর এ সব শুনলে কেমন যেন অন্য রকম মনে হয়। বেখাপ্পা লাগে। তাই নজরুল-ফররুখের এ ধরনের গান-কবিতা এখন বিস্মৃতি প্রায়, তাইনা? (ফ্রিজ)

"মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি" এ গানটি গাইতে গাইতে মঞ্চে অবস্থানরত সবাই বেরিয়ে পরবে। (৩ জন বৃদ্ধ ছাড়া)

উপস্থাপক ঃ এরা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। বিভিন্ন সেক্টরে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন। এখন এদের বয়স কত? আনুমানিক ৫৩ কি ৫৪। ৩১ বছর আগে এরা ছিলেন তারুণ্যে ভরপুর। যৌবনের উচ্ছলতায় অগ্নিদীপ্ত। আজকে প্রৌঢ়ত্বে দাঁড়িয়েও তারা কিন্তু গত আন্দোলনের লাগামহীন বাঁধনকে ধরে রাখতে চান তাদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহারে। চলুননা দেখা যাক তারা কেন কপাট ভাঙতে চান? যুদ্ধ করতে চান?

১ম বয়স্ক ঃ (ভাষণের ভঙ্গিতে) বন্ধুরা আমার! আমরা বছরের পর বছর ধরে একটি স্বার্থক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখছি। গণতন্ত্রকে এ দেশে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য সংগ্রাম করেছি। সুখী সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার জন্য সাগর পরিমাণ রক্ত দিয়েছি। কিন্তু আজও সেই অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারিনি।

২য় বয়স্ক ঃ কেন পারিনি বন্ধুগণ? একের পর এক সরকারের পরিবর্তন আর তাদের অদূরদর্শিতা এর প্রধান কারণ। সব নেতা হতে চায় রাষ্ট্র নায়ক। ওনারা ব্যস্ত নিজেদের পকেট ভর্তে।

৩য় বয়স্ক ঃ তাইতো দেখা যায় বন্ধুগণ! যারা কলম ধরতে জানেনা তারা দু'নম্বরের ঠেলায় বানিয়েছে আকাশচুম্বি দালান। আবার টাকার বদৌলতে বড় বড় দলের নমিনেশন কিনে নিয়ে হতে চাচ্ছে এমপি, মন্ত্রী।

১ম বয়স্ক ঃ আশ্চর্য হয়ে যাই বন্ধুগণ যখন দেখি যোগ্যতার মাপকাঠিতে এখন আর কোনো বাছবিচার হয়না। কালো টাকা মামু-খালু আর তোষামোদই সব

www.pathagar.com

কিছুর চাবিকাঠি। আর কর্তা ব্যক্তিরা তো নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত।

(অপর উইংস দিয়ে তিনজন যুবক অভিনব কায়দায় মডার্ণ সঙ্গীত গাইতে গাইতে মঞ্চে প্রবেশ করবে।)

১ম যুবক ঃ যে কোনো একটি হিন্দি গান। অথবা হায় আল্লাহ্ কেমন প্রেমরে, শান্তি নাই আমার অন্তরে। (ফ্রিজ)

উপস্থাপক ঃ এই মাত্র আমার বাম পাশে যারা দাঁড়ালো তারা যুবক। উচ্ছৃলতায় ভরপুর। দেহ মনে টগবগে তারুণ্য। এদের বয়স কত হবে? ১৮ কিম্বা ২০। তারা দেখেনি ৭১ কে। মুক্তিযুদ্ধের আচড় লাগেনি তাদের গায়ে। তাদের কল্পনাতেও আসবে না, কত লক্ষ মায়ের সন্তান আত্মাহুতি দিয়েছে এ দেশের জন্য। (ফ্রিজ)

যুবকদের কণ্ঠে আবারো উন্মাতাল গান (গান শেষে ফ্রিজ)

উপস্থাপক ঃ না খাওয়া নজরুল পাংশু মুখে জীর্ণ-শীর্ণ দীনহীন অবস্থায় ভুলে যাননি এ দেশকে, এ দেশের মাটিকে। বিদ্রোহ ভরা জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে একটি স্বপ্ন দেখেছেন সুন্দর দেশের। বখতিয়ার খলজী, মৃত্যুঞ্জয়ী তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ্ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গেয়ে গেছেন এ দেশের গান। অথচ আজ কেন হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের যুব সমাজ। এদের পেয়ার হ্যায়, পেয়ার হ্যায় মিছিলে... (ফ্রিজ)

১ম যুবক ঃ দোস্ত দারুণ! আরে ব্যাটা বাংলা ছবিতে এখন অনেক কিছুই দেখা যায় না। যা দেখালো না ঐ নায়িকারা! ফাইন দোস্ত। জবাব নাই। একদম ঝাক্কাস। (ফ্রিজ)

২য় যুবক ঃ মূর্খ। তুই বাংলা ছবি দেখিস? তোর মধ্যে রুচিবোধ বলতে কিছু নেই। শোন, হলে যাওয়ার দরকারটা কি? ঘরে বসে রিমোট টিপলেই তো ডিশের একশন। বল আর কিছু লাগে?

৩য় যুবক ঃ আমি মনে হয় সত্যি সত্যিই দেবদাস হয়ে যাবরে।

১ম যুবক ঃ কেন? তোর আবার কি হল? সারা দিন তো পার্কে আড্ডা মারতে দেখি।

২য় যুবক ঃ এ জন্যই তো বলি ছবি দেখব না। শালার যদি নিজের জীবনের সঙ্গে কাহিনী না মিলাতে পারি তাহলে কি লাভ? বল।

৩য় যুবক ঃ আমাদের সাথে যে বন্ধুরা পলিটিক্স করে তারাই ভাল। আরাম-আয়েশ, রোমাঞ্চ, একশন সবই আছে তাদের জীবনে।

১ম যুবক ঃ দোস্ত চলে গেল। (উশৃঙ্খল যুবকদের ভাবভঙ্গিতে বুঝা যাবে একটি মেয়ে যাচ্ছে।)

২য় যুবক ঃ আহ্! আহ্!!

৩য় যুবক ঃ মাই হার্ট। (ফ্রিজ)

উপস্থাপক ঃ এই হল আজকের যুব সমাজ। এই ছাত্র সমাজ। যাদের উপর আমাদের আশা-ভরসা। তারা আজ প্রচন্ড দানবীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন। এরা হবে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের কর্ণধার, গণতন্ত্রের পূজারী, স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী। কিন্তু পড়ার টেবিলে বইয়ের পাতা নিরবে কাঁদছে। (ফ্রিজ)

(বয়স্ক ও যুবকেরা সচল হবে)

www.pathagar.com

১ম বয়স্ক : কিরে কলেজে যাসনে আজ?
২য় যুবক : গিয়েছিলাম।
১ম বয়স্ক : লেখাপড়া কেমন হচ্ছে? পড়াশুনা করিস তো ঠিকমত?
২য় যুবক : পড়ছি। কিন্তু প্রফেসর সাহেবেরা তো ঠিকমত পড়ায়না। খালি ফাঁকি দেয়।
১ম বয়স্ক : পরীক্ষা তো সন্নিকটে। ডিভিশন থাকবে তো।
২য় যুবক : না দিয়ে যাবে কোথায়? দাঁত উপড়ে নেবনা।
১ম বয়স্ক : ও কথা বলতে নেই বাবা। ভাল করে পড়া লেখা কর। মানুষ সব কিছু কেড়ে নিতে পারে। কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি কেড়ে নিতে পারেনা।
২য় বয়স্ক : পরীক্ষা এবার বেশ কড়াকড়ি হবে। সেন্টার চেইঞ্জ। নো চাঞ্চ।
১ম যুবক : সে জন্যই তো এবার আন্দোলন করব। ভাঙচুর হবে। ধর্মঘট...
৩য় বয়স্ক : যতই হোক কোনো লাভ হবেনা।
৩য় যুবক : ওসব চিন্তা বুঝিনা। নকল করব। যদি কোনো শালা বাধা দেয়
(৩ জনে মিলে বলবে)
বাঁধা দিলে বাধবে লড়াই, পরীক্ষাতে পাশ করা চাই। যে শালা সামনে রবে নির্ঘাত সে গুলি খাবে। (ফ্রিজ)
উপস্থাপক : এই হল আমাদের শিক্ষার মান। নকল ধরলে গুলি করবে। তাছাড়া আন্দোলন করতে চায়, নকল করার সুবিধার্থে। এমন হয় নাকি? হতেও পারে হয়ত ...। ফ্রিজ
১ম যুবক : আমি কিন্তু কয়েক জনকে হাত করেছি।
২য় যুবক : হাত করেছিস মানে...
১ম যুবক : বুঝলিনা নকল সাপ্লাই দিবে। এ ব্যাপারে খুব পটু।
৩য় যুবক : আরে এক কাজ কর। ঐ আমাদের একজন ভাল টিচার আছেনা, জ্ঞানার্জন বাবু। দেখ ঐ জ্ঞানার্জন বাবুরে ম্যানেজ করা যায় কিনা।
২য় যুবক : হ্যাঁ ভালোই তো হয়। প্রাইভেট পড়ব। ক্লাশ করার দরকার নেই।
১ম যুবক : প্রফেসর সাহেবের আয় রোজগারও বেড়ে গেল, আর আমরাও ক্লাশ করার ঝামেলা থেকে বেঁচে গেলাম।
২য় যুবক : আরে কোনোমতে পাশ করে নিই। তারপর দেখবি পলিটিক্স কারে কয়।
১ম যুবক : তুই পলিটিক্সে নামবি?
২য় যুবক : নয়ত কি? এ ছাড়া আর কোনো উপায় তো দেখছি না।
১ম যুবক : তাহলে আর পাশ করার দরকার কি? এখনই নেমে পড়।
২য় যুবক : পারলে তাই করব।
৩য় যুবক : এই, আমি ভাবছি কি জানিস? সাংবাদিকতার লাইনে চলে যাব।
১ম যুবক : মানে? তুই আবার এ ধান্ধায় পড়লি কবে?
৩য় যুবক : ধান্ধা কেন? আমি তো অলরেডি লেগেই আছি।
২য় যুবক : তোর লেখা ছাপে?
৩য় যুবক : ছাপে মানে? রাস্তার মোড়ে দেখিসনা? ওসব আসে কোত্থেকে? আমি প্রথমে গ্রাহক ছিলাম। এখন ভাবছি ঢুকেই পড়বো।

www.pathagar.com

২য় যুবক	ঃ	তা-ই-তো ঐ সব সাংবাদিকতায় আলাদা মজা আছে।
৩য় যুবক	ঃ	জানিস, গত সপ্তাহে আমার একটি নিউজ দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।
১ম যুবক	ঃ	কী রকম?
৩য় যুবক	ঃ	শ্বশুরের সাথে পুত্রবধুর লীলা। এটাই হেডিং। একেবারে ছবিসহ নিউজ।
১ম যুবক	ঃ	এত খোলামেলা? কোনো বাধা নেই....। (ফ্রিজ)
১ম বয়স্ক	ঃ	ছেলেকে কি বানাতে চান?
২য় বয়স্ক	ঃ	আমার তো ইচ্ছা ডাক্তারি লাইনে নিয়ে যাবো।
১ম বয়স্ক	ঃ	বহু টাকা দরকার। ছেলেদের মানুষ করা তো নয়, যেন হাতি পোষা।
৩য় বয়স্ক	ঃ	ছেলে পেলে যদি লেখাপড়া, স্বভাব চরিত্রে সচেতন হয়- তাহলে মনটাও সায় দেয়।
২য় বয়স্ক	ঃ	স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির বাইরের পরিবেশটা যে রকম, ভেতরটাও সে রকমই। শিক্ষকরাও নোংড়া রাজনীতির সাথে জড়িত।
১ম বয়স্ক	ঃ	আমাদের আমলে শিক্ষক ছাত্রের কত শালীনতা সুলভ সম্পর্ক ছিল। আর এখন ছাত্র শিক্ষক পিকনিকের নামে এক সাথে গাঁজা খাচ্ছে।
২য় বয়স্ক	ঃ	ওপেন কনসার্ট মানে ওপেন ড্রিংক্স বছর দেড়েক আগে এক জেলায় একশরও বেশি মানুষ মারা গেল বিষাক্ত মদ খেয়ে।
১ম বয়স্ক	ঃ	এই জেনারেশন ক্রমশই অধঃপাতে যাচ্ছে। ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের দৈনন্দিন যুদ্ধের কথা আর বলার দরকার নেই। সারা দেশ সন্ত্রাস, ছিনতাই, রাহাজানিতে ছেয়ে গেছে। দেখার জন্য কেউ নেই।
২য় বয়স্ক	ঃ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আগুন দিয়ে পোড়ানো হচ্ছে.........। ফ্রিজ
১ম যুবক	ঃ	দোস্ত। ঐ যে সোনিয়া ওকে আমি লাইক করি। কিন্তু ধরা দেয়না কেন বেচারী। বেটিকে কি কিডনিআপ করে নিয়ে আসব নাকি?
২য় যুবক	ঃ	ওর বাবা যে পুলিশ অফিসার জানিস তো?
১ম যুবক	ঃ	তাতে কি, টাকা দিলেই সব ম্যানেজ হয়ে যাবে।
৩য় যুবক	ঃ	আরে বলে কি? পাগল নাকি। এটা কী ট্রাফিক ব্যবস্থা? নিজের মেয়ে বলে কথা।
১ম যুবক	ঃ	অসুবিধা কি? পুলিশের এখন আর কোনো বেইল আছে নাকি? টাকা পেলে এরা সব করতে পারে।
২য় যুবক	ঃ	দে সিগারেট দে।
উপস্থাপক	ঃ	এই যে ভাইজান।
তিনজন	ঃ	আমাদের বলছেন?
উপস্থাপক	ঃ	হ্যাঁ।
তিনজন	ঃ	ঠিক আছে বলুন।
উপস্থাপক	ঃ	ধূমপান কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, বিষপান।
১ম যুবক	ঃ	কে বলেছে আপনাকে?
উপস্থাপক	ঃ	কেন? ডাক্তার।

www.pathagar.com

১ম যুবক : ঐ শালারাই বেশি খায়।

উপস্থাপক : সামনে তোমাদের পরীক্ষা?

২য় যুবক : তেমনই কথা।

উপস্থাপক : লেখাপড়া ভাল মত করছ নিশ্চয়ই।

৩য় যুবক : সে আমাদের পার্সোনাল ব্যাপার। তবে শোনেন পরীক্ষায় আমরা পাশ করবই।

২য় যুবক : কেউ ঠেকাতে পারবে না। আগে পাশ পরে আমাদের পরীক্ষা।

উপস্থাপক : সাবাস! এই না হলে ছাত্র। তা ভাই এখন তো বাড়ি গিয়ে পড়তে বসবে।

১ম যুবক : না, রাত ১২ টার আগে বাড়িই যাই না।

উপস্থাপক : এত রাত অবধি কি কর?

তিনজন : আড্ডা মারি, হাউজি খেলি, ক্লাবে যাই, ডিশে ছবি দেখি।

উপস্থাপক : পরীক্ষা তোমাদের মাথার উপরে। মাত্র ক'দিন বাকি।

৩য় যুবক : লেখাপড়া করে পাশ করতে পারবো না নিশ্চিত। তাই ঐ নকলের উপরেই যা বাহাদুরি। ব্যাস।

১ম যুবক : হ্যারে ইতিহাসের পড়াগুলো কেটেছিস?

২য় যুবক : ও নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। একদম কম্পোজ করে ফেলেছি। ফিফটি পার্সেন্ট।

উপস্থাপক : আচ্ছা বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের নাম বলতে পার?

৩য় যুবক : উম, কেন বলতে পারব না কেন? আনোয়ার হোসেন। কতবার দেখেছি টিভিতে।

উপস্থাপক : তা-ই-না-কি? আচ্ছা, নবাবকে কে মেরেছিল জান?

১ম যুবক : আরে যান যান যান। পন্ডিতির দরকার নেই।

উপস্থাপক : যাচ্ছি ভাই, তবে আর একটি প্রশ্ন। দুর্গম গিরি কান্তার মরু ... *কান্ডারী হুশিয়ার* কবিতাটি কার লেখা?

২য় যুবক : আরে ঐ সব এখন আর চলে না। ঐসব এখন ব্যাক ডেটেড।

৩য় যুবক : হ্যাঁ ঠিকই বলেছিস। এই জন্যই তো আমরা সাংবাদিকতায় যেতে চাচ্ছি। কারণ আমরা নিউ জেনারেশন। আরে চল....চল.... ফাও প্যাচাল পেরে লাভ নেই।

উপস্থাপক : এরা হল দেশের ভবিষ্যৎ, এরাই হবে রাষ্ট্রের কর্ণধার। শিক্ষার যা বাহার, তাদের কাছে কি আশা করা যায়। স্কুল আছে, কলেজ আছে, ভার্সিটি আছে, বেয়াড়া লাগামহীন ছাত্র আছে। রোগগ্রস্থ নির্জীব নিষ্প্রাণ শিক্ষক আছে। ছাত্রের ভয়ে শিক্ষকেরা অন্ধকারে মুখ লুকিয়েছে। কোথায় গেল শিক্ষকের সততা? চমক ঠমক গাম্ভীর্য। মেধাবীরা স্বেচ্ছায় পাচার হয়ে যাচ্ছে দেশের বাইরে। বাকি যারা আছে তারা কি শিখছে আজ? (একটু অন্য মনস্ক হয়ে) যাক সে কথা। মেজাজটা একটু অন্য দিকে নিয়ে যাই।

আচ্ছা! এ মূহুর্তে যদি নবাব সিরাজউদ্দৌলা এসে পরেন তাহলে কেমন হয়? (ফ্রিজ)

www.pathagar.com

(সিরাজ ও গোলাম হোসেনের প্রবেশ)

সিরাজ : গোলাম হোসেন?

গোলাম : (কুর্নিশ করে) জাঁহাপনা।

সিরাজ : এ কোন জায়গা গোলাম হোসেন?

গোলাম : এর নাম বাংলা। জাঁহাপনা।

সিরাজ : (আবেগে) বাংলা! আমার গুলবাগ, শ্যামলীমায় ভরা আমার বাংলা। আমার মনের মণি কোঠায় যে দেশটি প্রতিনিয়ত জ্বলজ্বল করত সেই বাংলা?

গোলাম : জ্বি... জাঁহাপনা।

সিরাজ : আমার হিরাঝিল কোথায়? মতিঝিল কোথায়? কোথায় আমার গোলাম বাদি। কোথায় আমার লুৎফা? কোথায় আমার পরিষদ বর্গ?

গোলাম : ওগুলো সব উল্টো দিকে পশ্চিমে।

সিরাজ : কেন?

গোলাম : আপনার প্রাণের গুলবাগ, আপনার চোখের মণি এ বাংলা জবাই হয়ে গেছে জাঁহাপনা।

সিরাজ : (রেগে) গোলাম হোসেন।

গোলাম : গোস্তাখি মাফ করবেন জাঁহাপনা। কসুর নেবেন না।

সিরাজ : কে সে পাপিষ্ঠ? কে সে নরাধম? যে আমার বাংলাকে কতল করেছে?

গোলাম : যারা আপনার কাছ থেকে বাংলাকে কেড়ে নিয়েছিল সেই লোভাতুর গোষ্ঠী আজকের পর্যদস্ত ক্ষত বিক্ষত বাংলাকে ঠেলে দিয়েছে আপনার উত্তরসূরিকে। তাদের স্বার্থের যুবকাষ্ঠে বলি হয়েছে আপনার সাধের বাংলা।

সিরাজ : কোথায় আমার মীর মদন? মোহনলাল? আমাকে নিয়ে চল সেখানে।

গোলাম : জাঁহাপনা গোস্তাখি মাফ করবেন। সেখানে আজ কাটা তারের বেড়া। সীমান্তের কাছে গেলেই নির্ঘাত গুলি করা হবে। আপনার উত্তরসূরিরা সব এখানেই আছে।

সিরাজ : মীর জাফর, রায় দুর্লভ, জগৎ শেঠ, ঘসেটি বেগমরা আজো বেঁচে আছে?

গোলাম : ওরা তো মরে না জাঁহাপনা। ওরা যদি মরে যায় তাহলে ফারাক্কার বাঁধ দেবে কে? কেন আজ হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার ধোয়া তুলে আধিপত্যবাদিদের ক্ষেপিয়ে তোলা হবে। বিশ্বের দরবারে খাটো করে দেয়া হবে বাংলার মান মর্যাদা।

সিরাজ : থামো, থামো, গোলাম হোসেন। চেয়ে দেখ গোলাম হোসেন বাংলার মাঠ, ঘাট শুকিয়ে চৌচির। নদ-নদী ভরাট, প্রচন্ড খড় রৌদ্রে জ্বলসে যাচ্ছে আমার প্রিয় বাংলার পত্রকুঞ্জ। এ আমি কী দেখছি গোলাম হোসেন?

গোলাম : জাঁহাপনা।

সিরাজ : চারদিকে আজ ভয়ার্ত মানবতার আর্তচিৎকার। ডুকরে ডুকরে কাঁদছে মাহিমা ফাহিমাদের আত্মা।

গোলাম : আপনি বলেছিলেন জাঁহাপনা বাংলার আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা।

সিরাজ : সে দুর্যোগ কি চিরকালই রয়ে যাবে?

www.pathagar.com

গোলাম ঃ সৎ মানুষের বাণী চিরকাল অক্ষয়, অম্লান।

সিরাজ ঃ না গোলাম হোসেন না। আমি ও বাণী ফিরিয়ে নিতে চাই। আমি নতুন করে বলতে চাই। এ বাংলার বীর সন্তানেরা যে সাহস দেখিয়েছ, যেভাবে রক্ত ঢেলে দেশকে মুক্ত করেছ তা আঁকড়ে ধরে রেখ। চল গোলাম হোসেন নতুন বাংলা একটু ঘুরে ফিরে দেখি।

গোলাম ঃ ভীষণ দুঃখ পাবেন জাঁহাপনা। বাংলার চারদিকে আজ অশান্তির আগুন। এদের মনে কোনো শান্তি নেই আজ। হত্যা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটিয়েও আজ তারা নিশ্চিত হতে পারছে না।

সিরাজ ঃ কেন এমন হচ্ছে গোলাম হোসেন?

গোলাম ঃ ঐ যে জাঁহাপনা। মীর জাফর, রায় দুর্লভ, জগৎ শেঠ ও ঘসেটি বেগমদের বেঈমানী আজও সমাজে সমান গতিতে চলছে। আপনার হৃদয়ে পরতে পরতে যে বাংলা গোলাপের মত সৌন্দর্য বিলি করতো তা আজও ষড়যন্ত্র মুক্ত নয়। প্রতি ধাপে সোনার বাংলাকে খতম করার চক্রান্ত অব্যাহত রয়েছে।

সিরাজ ঃ (চিৎকার দিয়ে) না। আমার ভুলে গোলামী জিঞ্জিরে বাঁধা পরেছিল এই জাতি। আমি চাইনা আমার মত কোনো ভুল এ দেশের কর্ণধারেরা করুক। আবার তারা পিছিয়ে যাক। হারিয়ে যাক অন্ধকারের অতল গহ্বরে।

গোলাম ঃ জাঁহাপনা। আজো সেই কুচক্রী মহল বাংলার স্বাধীনতা মান মর্যাদা ও সার্বভৌমত্বকে ধূলিসাৎ করার জন্য চক্রান্ত করে যাচ্ছে। কিছু নামধারী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ এনজিওরা এ দেশের কোমলমতি শিশু কিশোরদের মগজ ধোলাইয়ের কাজ করছে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে। অথচ দেখার মত যেন কেউ নেই। এ সব প্রতিষ্ঠান আমাদের শিশু-কিশোর, নারীদেরকে বেহায়পনায় ও উন্মত্ততায় আগ্রহী করে তুলছে। নষ্ট করছে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস। দেখতে চান জাঁহাপনা? তাহলে চলুন।

(নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও গোলাম হোসেনের প্রস্থানের পর মঞ্চে এনজিও কর্মী জুয়েল ও রুবেলের প্রবেশ। ইতিমধ্যে মদ্রাসার মক্তব চালু হয়েছে।)

ব্যাক কণ্ঠে ঃ দাঁড়াও। আমাদের লক্ষ্য কি তা পুনরায় জেনে নাও। আমরা সবুজ শ্যামল এ দেশকে ভুলে যাইনি। আমরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে ১৯৫৮ সালের ১৯শে জানুয়ারি লেজ গুটিয়েছি ঠিকই কিন্তু আশা ছেড়ে দেইনি। আমরা ভুলে যাইনি সেই বাংলার রূপ লাবণ্যে ভরা প্রাণোচ্ছ্বল চিত্র। এ দেশ যেন বিচিত্র বর্ণের এ্যালবাম। মাঠ, ঘাট, নদী, সাগর এ যেন স্বপ্ন রাজ্য। এদেশের বুকে দাঁড়িয়ে কার না সাধ জাগে নিঃশ্বাস নেবার। তাইতো আমরা আবার এসেছি এনজিওর মুখোশে। আর তোমাদেরকে অর্থের বিনিময়ে কেনা হয়েছে। অতএব, নির্দেশ মত কাজ করবে। ওকে আন্ডারস্টান্ড?

www.pathagar.com

(দু'জন মঞ্চের অপর দিক দিয়ে নেমে যাবে। এর সাথে সাথে শাহীন, বিপ্লব, তরমুজ, শামীম মক্তবে কায়দা পড়তে থাকবে। মৌলভী সাহেবের প্রবেশ।)

মৌলভী : আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

ছাত্ররা : অআলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

মৌলভী : তোমরা ভাল আছতো সবাই।

ছাত্ররা : জ্বি হুজুর। আমরা সবাই ভাল আছি। আলহামদুলিল্লাহ।

মৌলভী : তা তোমাদের পড়াশুনা হয়েছে?

ছাত্ররা : জ্বি হুজুর।

মৌলভী : তাহলে এবার পড়া শুরু কর। আমি একটু আসছি।
(প্রস্থান, ছাত্ররা যেতে যেতে বলবে)

শামীম : ঐ কাইল না আমগো বাড়িতে দুইডা লোক গেছিল। হ্যারা নাকি ঐ পাড়ায় একখান স্কুল দিছে। মাগনা খাইবার দিব, মাগনা জামা কাপড় দিব, আবার মাগনা পড়াইবও।

বিপ্লব : কসকি? হ্যারা না আমাগো বাড়িতেও গেছিল।

তরমুজ : হ। আমার মারেও কইয়া গেছে।

শামীম : কি কস বিপ্লব। যাবি নাকি?

তরমুজ : যামুনা মানে? নতুন জামা, নতুন বই, কিরে বিপ্লব কি কস?

বিপ্লব : আচ্ছা দেহি কি করণ যায়। ঐ চল।
(সবাই প্রস্থান)
(পরের দিন দেখা যাবে এনজিও স্কুলে ক্লাশ হচ্ছে)

স্যার : শুভ সকাল।

বিপ্লব : আসসালামু আলাইকুম স্যার।

স্যার : চুপ কর। সালাম দিতে হয়না। সকালে কারো সাথে দেখা হলে বলবে শুভ সকাল। রাতে কারো সাথে দেখা হলে বলবে শুভ রাত্রি। কেমন।

শামীম : স্যার দুপুর বেলা কি কমু?

মোখলেছ : ক্যা, শুভ দুপুর।

স্যার : চুপ কর। যা বলছি তাই শোন।

বিপ্লব : স্যার বাজানে কইছে কারো লগে দেখা অইলে সালাম দিবি।

স্যার : তোমার বাজান ভুল বলেছে। আমি যা বললাম আজ থেকে তাই বলবে।

সবাই : আচ্ছা স্যার।

স্যার : ও, তোমাদের যা বলছিলাম, এ স্কুলে তোমাদের বিনা পয়সায় পড়ানো হবে, বিনামূল্যে বই দেয়া হবে এবং প্রতিদিন খাবার দেব। আর তোমাদের বাবা মার সাথে কথা বলে তোমাদেরকে এখানে রাখার ব্যবস্থা করব। কি তোমরা খুশি তো?

শামীম : বিনামূল্যে মানে কি?

বিপ্লব : আরে বুঝিসনাই। মাগনা। স্যার মায়ে আমারে একদিন কইছিল দুনিয়াতে লাভ ছাড়া কেউ কোনো কাম করেনা। তাই আমাগো মাগনা পড়াইয়া আপনেগোরে লাভ কি স্যার?

www.pathagar.com

স্যার : (আপন মনে) লাভ, লাভ আবার অখন্ড ভারতীয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হা.....হা.... কত লাভ!

তরমুজ : স্যার ঐযে কইলেন কমপানি স্যার আপনে মনে অয় জানেন না আমাগোর নদীতে অনেক পানি।

স্যার : চুপ কর। ও তোমাদের নামগুলো জানা হয়নি। আচ্ছা বল তোমার নাম কি?

বিপ্লব : (বসে থেকে) স্যার আমার...

স্যার : স্ট্যান্ড আপ।

বিপ্লব : স্ট্যান্ড আপ মানে কি?

স্যার : চুপ কর। স্ট্যান্ড আপ মানে দাঁড়ানো।

বিপ্লব : ও দাঁড়ানো। তাইলে দাঁড়াইয়াই কই। আমার নাম মোঃ বিপ্লব।

স্যার : এই বার তোমার নাম বল।

শামীম : স্যার আমার নাম মোঃ শামীম হোসেন।

স্যার : এবার তোমার নাম বল।

তরমুজ : স্যার আমার নাম তরমুজ।

বিপ্লব : তরমুজ কাচা না পাকারে?

স্যার : চুপ কর। কি নাম বললে? তরমুজ?

তরমুজ : জে স্যার। স্যার আমার নাম খুব শখ কইরা রাখছে। নামের পিছে একখান ঘটনা আছে স্যার।

স্যার : বলতো কি ঘটনা?

তরমুজ : আমার জন্মের সময় আমাগো ক্ষ্যাতে ম্যালা তরমুজ অইছিল। তাই দেইখা বাজানে আমার নাম রাখছিল তরমুজ।

স্যার : ও, আচ্ছা শোন তরমুজ। তোমার নাম হবে আজকে থেকে জেমস।

তরমুজ : কি স্যার? জেমস।

বিপ্লব : স্যার মোঃ জেমস?

স্যার : চুপ কর। তুমি খুব বেশি কথা বল। যত সব ক্ষ্যাত। শোন আজকে থেকে তোমাদের নামের আগের মোঃ বাদ যাবে। ও সব সেকেলে চিন্তাভাবনা নিয়ে পড়ে থেকনা তো তোমরা। তোমাদের আরো এগিয়ে যেতে হবে। যাও আজ তোমাদের ছুটি।
আসসালামু আলাইকুম। শুভ সকাল। (সবাই বলবে)
(প্রস্থান/আলো নিভে যাবে)
(গ্রামের একটি বাড়ি জুয়েল ও রুবেল একজন গ্রামবাসীকে ডাকবে)।

জুয়েল : সাত্তার চাচা সাত্তার চাচা বাড়ি আছেন।

সাত্তার : কেডা ডাহে? কই ডাহে কেডা? আপনারগোরেতো চিনবার পারলাম না।

জুয়েল : আমাদের চিনবেন না। আমরা আপনাদের এলাকায় এসেছি দেশের অসহায় কৃষক-শ্রমিক, জেলে-তাঁতি, কামাড়-কুমার এদের সংসারে যাতে স্বচ্ছলতা ফিরে আসে তার জন্য আমরা অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

www.pathagar.com

সাত্তার ঃ তা আমার কাছে আপনেগো কি দরকার?

জুয়েল ঃ আমি জানতে পারলাম আপনি একজন গরীব কৃষক। তাই আপনাকে ঋণ দিতে এসেছি।

সাত্তার ঃ না, গরীব তো আল্লায় বানাইছে। আমারে ঐ আল্লায়ই দেখবে।

রুবেল ঃ না চাচা, আল্লাহ্ উপর থেকে এসে আপনাকে দেখে যাবে না।

সাত্তার ঃ (উত্তেজিত) ঐ মিয়া কি কইলা? আল্লায় দেখবনা তুমি দেখবা। যাও এহান থেইক্কা। যাও কইতাছি। আর খবরদার এহানে আইবানা। তোমার ট্যাহার আমার দরকার নাই।
(প্রস্থান)

রুবেল ঃ এদেশের মানুষ আসলে মৌলবাদী। মূলকে শক্ত করে ধরে আছে। বাবা টাকার কথায়ও টনক নড়লনা। ঠিক আছে চাচিকে বুঝিয়ে ১০ হাজার টাকা দিয়ে আসি। বাঙালী মেয়ে এতগুলো টাকা কি না নিয়ে পারে? দেখি যাই। চাচি...... ও চাচি।

সাত্তার ঃ কেডায়রে? আবার কেডায় ডাহাডাহি করে? ঐ মেয়া তোমাগো না কইলাম আমার বাড়ি ছাড়তে। খবরদার এই গ্রামে আর ঢুকবানা। আবার দেহি খারাইয়া রইছে। এই রাসেল লাডিডা লইয়ায় দেহি।
(জুয়েল ও রুবেলের তড়িঘড়ি করে প্রস্থান)
(মঞ্চে জুয়েল ও রুবেল বসে কাজ করছে)

ব্যাক কণ্ঠে ঃ গুড ভেরি গুড। তোমাদের কাজে আমি বেশি খুশি হয়েছি। তোমরা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছ। সেখানে কোমলমতি শিশুদের মগজ ধোলাই হচ্ছে জেনে আই এ্যাম ভেরি হেপি। আর গরীবদের ঋণ দিচ্ছ জেনেও খুশি হয়েছি। তবে শোন এ সব কাজে সচেতন মানুষের কাছ থেকে বাঁধা আসবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রেরিত নীতি অনুসরণ করবে। আন্ডারস্টান্ড?
আর হ্যাঁ, অনলি ৫০০টি মটর সাইকেল এবং লেডিস সাইকেল পাঠাচ্ছি। সাইকেলগুলো সুন্দরী মেয়েদেরকে দিবে। আর কিছু সুন্দরী মেয়ে আমাদের এখানে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠাবে। ওকে আন্ডারস্টান্ড?
(দুইজন একসঙ্গে) ইয়েস আন্ডারস্টান্ড।

রুবেল ঃ বন্ধু এ দেশে বাস করে এদেশের আলো ছায়ায় বড় হয়ে আমরা দেশের সাথে গাদ্দারী করছিনা তো?

জুয়েল ঃ কিযে বলিস, আমরা তো পরিশ্রম করে টাকা উপার্জন করছি। তাছাড়া চিন্তা করে দেখ লেখাপড়া শেষ করে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি একটি চাকুরির জন্য। আর এখন আমি মাসে ২৫ হাজার টাকা ইনকাম করি। আজ আমাকে সবাই সম্মান করে।

রুবেল ঃ জানস আমার চোখ শুধু ইতিহাস খুঁজে বেড়ায়। মীর সাদিক দেশপ্রেমিক টিপু সুলতানের সাথে গাদ্দারী করেছিল অর্থ আর সাম্রাজ্যের মালিক হওয়ার জন্য। মীর জাফরও তাই। আর আমরাও ছুটেছি সেই অর্থের পিছনে।

www.pathagar.com

জুয়েল : ওসব বাদ। ঐ পিছনে তাকাবার সময় নেই। সামনে এগিয়ে চল। এখন পিছনে তাকানো মানে মৃত্যু ডেকে আনা। ওরা যা বলবে তাই করতে হবে। বুঝতে পেরেছিস?

রুবেল : হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। (দু'জনের প্রস্থান)

(মঞ্চে এনজিও স্কুলে শিক্ষক ক্লাস নিচ্ছে)

স্যার : পড়, এ-তে এপ্রিল ফুল,
বোকাদের বিরাট ভুল।
বি-তে বিগ। বিগ মানে বড়
সবার বড় যিশু,
আর যত সব নিচু।
(তিনজন মুখস্ত করছে)

স্যার : কি হল বিপ্লব পড়ছোনা যে?

বিপ্লব : এ-তে এপ্রিল ফুল,
বোকাদের বিরাট ভুল।
বি-তে বিগ। বিগ মানে বড়
সবার বড় আল্লাহ।

স্যার : চুপ। একদম চুপ। ঠিক করে বল।

বিপ্লব : এ-তে এপ্রিল ফুল,
বোকাদের বিরাট ভুল
বি-তে বিগ। বি মানে বড়
সবার বড় যিশু,
আর যত সব নিচু।

স্যার : এবার শামীম বল।

শামীম : এ-তে এপ্রিল ফুল,
বোকাদের বিরাট ভুল
বি-তে বিগ। বি মানে বড়
সবার বড় যিশু,
আর যত সব নিচু।

স্যার : এবার জেমস বল।

তরমুজ : স্যার এপ্রিল ফুল মানে কি?

স্যার : শোন তাহলে। এপ্রিল হল একটি ইংরেজি মাসের নাম। আর ফুল মানে বোকা। পুরো অর্থ হল এপ্রিলের বোকা। এপ্রিলে একদিন কিছু মৌলবাদী মুসলমানদের বলা হয়েছিল তোমরা মসজিদে ঢুকে পড়, তোমাদের কিছু করা হবেনা। বোকা মুসলমানরা সুর সুর করে মসজিদে ঢুকে পড়ল। আর তৎক্ষণাৎ মসজিদে তালা লাগিয়ে আগুন দিয়ে দেয়া হল। বোকাদের সে কী চিৎকার। শেষে সবাই পুড়ে পুড়ে কয়লা হয়ে গেল। সেই ঘটনা মনে হলে আজও হাসি পায়। হাসো তোমরা হাসো। হা... হা... হা... হাসছোনা কেন?

www.pathagar.com

(সবাই মাথা নিচু করে থাকবে)

স্যার : কি ব্যাপার আজ তোমাদের পড়ালেখা ভাল লাগছেনা? এস আজ তোমাদের গান শিখাবো। উই শ্যাল ওভার কাম, উই শ্যাল ওভার কাম সানডে, আমরা করব জয় আমরা করব জয় একদিন...।

স্যার : ঠিক আছে আজ এ পর্যন্ত থাক। আচ্ছা তোমরা কেহ গান জান?

বিপ্লব : জানি স্যার।

স্যার : বল দেখি।

বিপ্লব : যে জন নামায পড়েনা সে তো শয়তানের নানা। এবার আসুক কবরে তারে মজা...

স্যার : স্টপ। এটা কোনো গান হল? 'এসব তো গায় ভিক্ষুকরা। মানে ফকিররা। তোমরা হবে জজ ব্যারিস্টার, উকিল, তোমরা কেন এসব গান গাইবে? আজ থেকে উই শ্যাল ওভার কাম গানটি গাইবে।

বিপ্লব : স্যার বাজানে কইছে নামায না পড়লে কবরে অনেক শাস্তি অইবো। আমাগো নামায শিখায়েন স্যার।

স্যার : উহ্ ও সব বাদ দ্যাওতো নামায টামায পড়ে কেউ বড়লোক হতে পেরেছে?

শামীম : স্যার টামাজ কি?

স্যার : সব সময় তুমি বেশি কথা বল। ও তোমাদের খাবার সময় হল। তোমরা সবাই হাত পেতে বস এবং চোখ বন্ধ কর এবার তিন বার বল আল্লাহ আমাদের খেতে দে। (সবাই তিনবার বলবে) এবার চোখ খোল দেখতো তোমাদের আল্লাহ খেতে দিয়েছে কিনা।

সবাই : না, স্যার দেয়নি।

স্যার : আবার চোখ বন্ধ কর। এবার একবার বলবে হে মহান যিশু আমাদের খেতে দাও। এবার চোখ খোল দেখতো খেতে দিয়েছে কিনা।

সবাই : হ্যাঁ স্যার দিয়েছে।

স্যার : তাহলে বলতো খাবার দিল কে?

সবাই : যিশু... হুররে। ... কি মজা। (প্রস্থান)

(গ্রাম্য মক্তব, শাহীন নামের ছেলেটি একা একা পড়ছে।)

শাহীন : আলিফ যবর আ, বা যবর বা। (মৌলভীর প্রবেশ) আসসালামু আলাইকুম।

মৌলভী : অ-আলাইকুম সালাম। কি ব্যাপার শাহীন, আজ বিপ্লব, তরমুজ ওরা আসেনি, ওদের দেখছিনা যে?

শাহীন : হুজুর। ওরা ঐ মাগনা স্কুলে ভর্তি অইছে। ঐহানে নাকি মাগনা খাবার দেয়, বই দেয়, জামা কাপড় দেয়, তাই অরা গেছে। এই হানো আর পড়বনা।

মৌলভী : হ্যাঁ ওদের স্কুল সম্বন্ধে সব জানি। হে আল্লাহ এমন কেন হচ্ছে দেশে। হে বাংলাদেশের আকাশ বাতাশ তোর সন্তানরা আজ চোখের সামনে বিধর্মী হয়ে যাচ্ছে। তোর কি কিছুই করার নেই... (কান্না)

www.pathagar.com

বিপ্লব ঃ (গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাটছে আর পড়ছে।
এ-তে এপ্রিল ফুল,
বোকাদের বিরাট ভুল
বি-তে বিগ। বিগ মানে বড়
সবার বড় যিশু, আর যত সব নিচু।

মৌলভী ঃ (রাগত স্বরে) কি তোর এত বড় সাহস তুই মুসলিম জাতিকে বোকা বলছিস? না না তোদের তো কোনো দোষ নেই। তোরা হচ্ছিস কাদামাটি তোদের যা ইচ্ছা তাই বানানো যায়। হে মুসলমানেরা তোমাদের চোখের সামনে ইসলামকে ধ্বংস করা হচ্ছে? নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের সোনামনিরা। আর তোমরা কি চেয়ে চেয়ে দেখবে? তোমাদের কি কিছু করার নেই? চুপ করে থেকনা। জবাব দাও। জবাব দাও। জবাব দাও।
(প্রস্থান)
(তিন যুবককে দেখা যাবে গান গাইতে গাইতে মঞ্চে প্রবেশ করছে)

সিরাজ ঃ এ কোন সঙ্গিত গোলাম হোসেন।

গোলাম ঃ বলতে পারিনা জাঁহাপনা।

১ম যুবক ঃ এ হল মডার্ন সঙ্গিত।

২য় যুবক ঃ আমরা আর পিছনে ফিরে যেতে চাইনা।

৩য় যুবক ঃ আমাদের মন প্রাণ ধাবিত হচ্ছে সম্মুখের দিকে। আমরা নিউ জেনারেশন। আমাদের নেতা মাইকেল জ্যাকশন, অনিল কাপুর।

সিরাজ ঃ এদের আমি উচিত শিক্ষা দিতে চাই। আমার তরবারী কোথায়।

গোলাম ঃ আপনার তরবারীতো নবাব বাড়িতে।

১ম যুবক ঃ ভয় দেখাবেন না।

২য় যুবক ঃ এদের পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দাও।

৩য় যুবক ঃ পুলিশের ডান্ডা খেলে ব্যাটারা ঠান্ডা হয়ে যাবে। পুলিশ আমাদের শান্তি রক্ষক। আপন মার পেটের ভাই।

সিরাজ ঃ গোলাম হোসেন।

গোলাম ঃ জাঁহাপনা।

সিরাজ ঃ এরা পুলিশ পুলিশ করছে কেন? এটা আবার কি?

গোলাম ঃ ওরা আপনার আমলের রক্ষী প্রহরী। এদের আমলে পুলিশ দারুণ অসৎ। ভাল মন্দ যাচাই করেনা। এরা টাকার বিনিময়ে সব কিছু করতে পারে।

সিরাজ ঃ কি বলছ তুমি? একি সত্যি?

গোলাম ঃ হ্যাঁ জাঁহাপনা, সারা দেশ এ বিষে জর্জড়িত।

সিরাজ ঃ ছিঃ ছিঃ চল আমরা এখান থেকে চলে যাই।

৩য় যুবক ঃ এই যে, হ্যালো একটু দাঁড়ান।

www.pathagar.com

সিরাজ : কিছু বলছ হে বাংলার অভাগা যুবক?
১ম যুবক : আপনার পরিচয় দিয়ে যান।
সিরাজ : আমি নবাব সিরাজউদ্দৌলা
২য় যুবক : কি করেন? চাকুরী না ব্যবসা।
গোলাম : তোমরা ভুল করছ উনি ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব।
৩য় যুবক : শালা ধাপ্পাবাজ।
সিরাজ : কি?
১ম যুবক : জামালপুর থেকে এসেছে শালা।
সিরাজ : আশ্চর্য! ... গোলাম হোসেন কি বলছে এরা? এরা কি ইতিহাস পড়ে না?
গোলাম : ইতিহাসবিদ কেউ নেই জাঁহাপনা। কে লিখবে ইতিহাস। এখন ইতিহাস লেখা হয় যখন যে সিংহাসনে বসে তার তুষ্টির জন্য।
সিরাজ : আশ্চর্য! হে বাংলার যুবকেরা তোমরা কি তোমাদের বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের নাম জান?
১ম যুবক : কেন? আনোয়ার হোসেন।
সিরাজ : গোলাম হোসেন, কে সেই ব্যক্তি?
গোলাম : আলমপনা। আপনার দেশপ্রেমকে কেন্দ্র করে এদেশে একটি ছবি তৈরি হয়। তাতে আনোয়ার হোসেন আপনার চরিত্রে অভিনয় করে। তাতেই সে ব্যক্তি নবাব বলে গণ্য হয়ে যায়।
সিরাজ : ছিঃ ছিঃ ছিঃ কী লজ্জা! কী ঘৃণা! আর নয় গোলাম হোসেন। চল এ মুহূর্তে স্থান ত্যাগ করি।
তিন যুবক : আরে যান যান। এখানে এসব চলেনা। রাস্তা মাপেন।
গোলাম : দেখলেন জাঁহাপনা, কত বড় বেয়াদপ। কত বড় নির্লজ্জ? এ দেশ থেকে আপনাকে চলে যেতে বলছে।
সিরাজ : আমি ছিলাম বাংলার স্বাধীন শেষ নবাব। বাংলার স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে সকল কুচক্রিপনা ভেদ করে বর্বর ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করেছিলাম। আমি আজ তাদের চেতনায় অনুপস্থিত। হায়রে বাংলা তোর এ করুণ পরিণতি। (ফ্রিজ)
উপস্থাপক : এই হল বাস্তবতা। আমাদের চোখের সামনে এ ধরনের বাস্তবতা যেন প্রখর রৌদ্রের জ্বলন্ত আগুন। আচ্ছা আমাদের জাতীয় পরিচয় কি বলুন তো? বৃটেনের লোকজন হাজার বছর ধরে বৃটিশ, আমেরিকার লোকজন আমেরিকান, পাকিস্তানের লোকজন পাকিস্তানী, ভারতের লোকজন ভারতীয়, আর আমরা... বলুনতো বাঙালী নাকি বাংলাদেশী। হায়রে দেশের মানুষ এটাতেও একমত হতে পারলামনা। দুঃখ... (ফ্রিজ)

(মঞ্চে ছিনতাইয়ের একটি ঘটনা দেখানো হবে)

সিরাজ : গোলাম হোসেন! এসব কি ঘটছে এ দেশে?

www.pathagar.com

গোলাম ঃ জাঁহাপনা।এরা হচ্ছে বাংলার অভিশপ্ত কাঙ্গাল। এদের হৃদয়ের মরুভূমি শুকনো মাঠের মত। এদের প্রাণ আছে, হৃদয় স্পন্দন আছে, এদের রক্ত-মাংস-শরীর আছে।

সিরাজ ঃ কেন? কেন তারা আজীবন কাঁদবে? এদের জন্ম কি শুধু কাঁদার জন্য? আজকে বাংলার বহু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

গোলাম ঃ হ্যাঁ, হয়েছে। রেডিও, টেলিভিশন, ফ্রিজ, কম্পিউটার, ইন্টারনেট আরো অনেক।

সিরাজ ঃ তবু কেন তারা সুখি নয়?

গোলাম ঃ লোকজ ও দেশজ সংস্কৃতির পিঠে চাবুক মেরে ডিশ এন্টেনার বদৌলতে এ দেশবাসী উপহার পেয়েছে বিজাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি, চাল-চলন।

সিরাজ ঃ বল কি?

গোলাম ঃ জানেন জাঁহাপনা। নজরুলকে আজ গলা ধাক্কা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে গঙ্গার অথৈ জলে। সে আজ আমাদের চিন্তা চেতনায় অনুপস্থিত।

সিরাজ ঃ কী রকম?

গোলাম ঃ কেউ বলে মুসলিম পূণর্জাগরণের কবি, কেউ বলে দেবতুল্য। এ বিতর্কের মাঝখানে সে বঙ্গোপসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। কেউ বলেনা যে, নজরুল বাংলার সম্পদ।

সিরাজ ঃ (রেগে) গোলাম হোসেন!

গোলাম ঃ জাঁহাপনা।

সিরাজ ঃ আর এক মুহূর্তও নয়। আমি বাংলার এ রূপ আর দেখতে চাইনা।

গোলাম ঃ চলুন জাঁহাপনা।

সিরাজ ঃ শেষ বারের মত বলে যাই। আমি অচিরেই আসব এ বাংলাদেশে। তোমরা সে দিনের প্রস্তুতি নাও। সে দিন আমার বাংলা আবার খুশবাগ হৃদয় কাননে পরিণত হবে। বিদায় বন্ধুগণ। (প্রস্থান)

('দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার, লঙ্গিতে হবে রাত্রী নিশিথে যাত্রীরা হুশিয়ার।' এ কবিতার মাধ্যমে একটি নৌকার দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হবে।

উপস্থাপক ঃ সুধীমন্ডলী, এই হল আজকের ইশারা। এসেছিলেন মন ভরে নাটক উপভোগ করবেন। এরপর ফুর ফুরে মন নিয়ে বাড়ি চলে যাবেন। কিন্তু আমরা এ কী করলাম। তবে বন্ধুগণ, আমাদের এ ইশারা কি সমাজের সাথে একেবারেই বেমানান? চলুন না আমরা সবাই মিলে আবারও একটি ঝাকুনি দিয়ে ভেঙে ফেলি অশান্তির সব লৌহকপাট। এ আশাতেই বুক বেঁধে আছি আমাদের কান্ডারিদের দিকে। (সকলেই ফ্রিজ)। #

www.pathagar.com

সম্মেলন সঙ্গীত

কথা ও সুর ঃ আমিরুল মোমেনীন মানিক

মিথ্যার বেড়াজাল ছিন্ন করে
আলোর দিশারী মোরা জাগবই
আগামীর পৃথিবী গড়ব মোরা
নতুন সকাল এক আনবই।

শুভ হোক সম্মেলন
জাসাপের এই আয়োজন।

আমরা তিতুমীর আমরা খালিদ
গোলামীর জিঞ্জির ভাঙবই
নষ্টামী ভণ্ডামী দু'পায়ে দলে
মননের কথা মোরা বলবই।

বাংলাদেশের এই আঙ্গিনায়
সত্যের বীজ মোরা বুনবই।

বিবেকের দুয়ারে হানবো আঘাত
আলোর মশাল মোরা জ্বালবই
সুরের আলিম্পনে নষ্ট সমাজ
হেরার আলোকে সবে গড়বই।

হৃদয়ে মোদের এই তো শপথ
চিরদিন সেই পথে চলব।

www.pathagar.com

জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন ২০০২

কেন্দ্রীয় কমিটি

উপদেষ্টা

কবি আল মাহমুদ
প্রফেসর মোহাম্মদ ইউসুফ আলী
কবি আফজাল চৌধুরী
জনাব আবদুল মান্নান তালিব
জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ
জনাব আরিফুল হক
জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী
কমোডর (অব:) এম আতাউর রহমান
জনাব শাহ আবদুল হান্নান
প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
জনাব মকবুল আহমদ
অধ্যাপক আ.ন.ম. আবদুজ্জাহের
ইঞ্জিনিয়ার ইস্কান্দার আলী
ইঞ্জিনিয়ার মোস্তফা আনোয়ার
অধ্যাপক ফজলে আজিম
জনাব আবদুর রকীব
জনাব এ টি এম আজহারুল ইসলাম
জনাব নূরুল ইসলাম বুলবুল
অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান
জনাব মাহবুবুল হক
মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
প্রফেসর ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আবদুর রব
ডা. রিদওয়ান উল্লাহ শাহিদী
ড. মিয়া মোহাম্মদ আইউব
ড. আবদুল হক
জনাব জয়নুল আবেদীন আজাদ

আহবায়ক

জনাব মীর কাসেম আলী

www.pathagar.com

যুগ্ম আহবায়ক

জনাব আবুল আসাদ
জনাব রফিকুল ইসলাম খান

সদস্য সচিব

জনাব তাসনীম আলম

যুগ্ম সচিব

মতিউর রহমান মল্লিক

সহকারী সদস্য সচিব

জনাব হামিদুর রহমান আযাদ
জনাব সাইফুল্লাহ মানছুর
জনাব মজিবুর রহমান মন্জু

প্রধান সমন্বয়কারী

জনাব ফিরোজ খান নুন

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি

জনাব আ জ ম ওবায়েদুল্লাহ	চট্টগ্রাম বিভাগ
জনাব আমিরুল ইসলাম	চট্টগ্রাম মহানগরী
জনাব এহ্সানুল মাহবুব জোবায়ের	সিলেট বিভাগ
জনাব সিরাজুল ইসলাম শাহীন	সিলেট মহানগরী
জনাব সরদার আবদুর রহমান	রাজশাহী বিভাগ
জনাব হাফিজ চৌধুরী	রাজশাহী মহানগরী
জনাব শেখ বেলালউদ্দীন	খুলনা বিভাগ
জনাব মোহাম্মদ কামরুজ্জামান	খুলনা মহানগরী
জনাব শেখ রেজাউল করিম	খুলনা মহানগরী
জনাব মাহমুদ হোসেন দুলাল	বরিশাল
জনাব মাহফুজুর রহমান আখন্দ	বগুড়া অঞ্চল

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

জনাব এম এ রশীদ চৌধুরী
জনাব মোহাম্মদ আমীনুল ইসলাম
জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
জনাব এম. তাজুল ইসলাম
মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম
জনাব রইস উদ্দিন
জনাব রফিকুন্নবী
ডা. স.ম. রফিক
জনাব মতিউর রহমান আকন্দ
জনাব নূরুজ্জামান ফারুকী
জনাব মোহাম্মদ আবদুল হান্নান
জনাব আতা সরকার

www.pathagar.com

ড. আবদুল ওয়াহিদ
জনাব খন্দকার আবদুল মোমেন
জনাব সুলতান আহমদ
কবি সোলায়মান আহসান
কবি হাসান আলীম
কবি আসাদ বিন হাফিজ
জনাব আশরাফুল ইসলাম
শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল
কবি শরীফ আবদুল গোফরান
জনাব তাফাজ্জল হোসেন খান
কবি গোলাম মোহাম্মদ
জনাব হাসান মুর্তাজা
শিল্পী তারেক মোহাম্মদ মুনাওয়ার হোসাইন
শিল্পী আবুল কাসেম
জনাব আরকানুল্লাহ হারুনী
শিল্পী হাসান আখতার
জনাব সরদার ফরিদ আহমদ
অধ্যাপক সালমান আল আযামী
শিল্পী চৌধুরী আবদুল হালীম
ড. আহসান সাইয়েদ
মোহাম্মদ সেলিম
আ স ম শাহরিয়ার
কবি মোশাররফ হোসেন খান
জনাব আনিসুজ্জামান
নাট্যকার শাহ আলম নূর
শিল্পী ফরিদী নুমান
জনাব শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
কবি জাকির আবু জাফর
জনাব আবু সাঈদ মোহাম্মদ ফারুক
জনাব মেসবাহ উদ্দীন মাহিন
জনাব আবদুর রাজ্জাক
ডা. আবু হেনা আবিদ জাফর
শিল্পী গোলাম মাওলা
জনাব হেলাল উদ্দিন
জনাব নূরুল ইসলাম
শিল্পী হাসনাত আবদুল কাদের
কবি ওমর বিশ্বাস
অধ্যাপক আবু তাহের বেলাল
শিল্পী আবদুল্লাহ আল মাসুদ

www.pathagar.com

শিল্পী মশিউর রহমান
কবি আজগর তালুকদার
শিল্পী আমিনুল ইসলাম
শিল্পী আবদুর রউফ
জনাব শামসুল আরেফিন
জনাব নাসির হেলাল
জনাব মুস্তাগীসুর রহমান
জনাব আহসান হাবিব
জনাব আবদুল লতিফ
জনাব আবদুর রহিম
জনাব তৌহিদুর রহমান
জনাব আফসার নিজাম উদ্দিন
কবি মতিউর রহমান মল্লিক

সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটি

উপদেষ্টা

কবি আল মাহমুদ
কবি আফজাল চৌধুরী
জনাব আবদুল মান্নান তালিব
জনাব মকবুল আহমদ
কমোডর (অব:) এম আতাউর রহমান
জনাব শাহ আবদুল হান্নান
অধ্যাপক আ.ন.ম আবদুজ্জাহের
ইঞ্জিনিয়ার ইস্কান্দার আলী
ইঞ্জিনিয়ার মোস্তফা আনোয়ার
অধ্যাপক ফজলে আজিম
জনাব আবদুর রাকীব
জনাব এ টি এম আজহারুল ইসলাম
জনাব নূরুল ইসলাম বুলবুল
অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান
জনাব মাহবুবুল হক
ডা. রেদওয়ান উল্লাহ শাহেদী
ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান
ড. আবদুর রব
জনাব জয়নুল আবেদীন আজাদ

www.pathagar.com

আহ্বায়ক
জনাব মীর কাসেম আলী

যুগ্ম আহ্বায়ক
জনাব আবুল আসাদ
জনাব রফিকুল ইসলাম খান

সদস্য সচিব
জনাব তাসনীম আলম

যুগ্ম সচিব
কবি মতিউর রহমান মল্লিক

সহকারী সদস্য সচিব
জনাব হামিদুর রহমান আযাদ
জনাব সাইফুল্লাহ মানছুর
জনাব মজিবুর রহমান মন্জু

প্রধান সমন্বয়কারী
জনাব ফিরোজ খান নুন

প্রস্তাবনা কমিটি

উপদেষ্টা	জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
আহ্বায়ক	কবি আসাদ বিন হাফিজ
সদস্য সচিব	জনাব আশরাফুল ইসলাম

স্মারক কমিটি

উপদেষ্টা	জনাব খন্দকার আবদুল মোমেন
আহ্বায়ক	সাংবাদিক সরদার ফরিদ আহমদ
সদস্য সচিব	কবি জাকির আবু জাফর
সদস্য	কবি ওমর বিশ্বাস

প্রচার

উপদেষ্টা	জনাব আতা সরকার
আহ্বায়ক	ড. আবদুল ওয়াহিদ
সদস্য সচিব	কবি শরীফ আবদুল গোফরান
সদস্য	সাংবাদিক সরদার আবদুর রহমান
	সাংবাদিক শামসুল আরেফিন
	জনাব আবিদুর রহমান

সমন্বয়

উপদেষ্টা	জনাব নুরুল ইসলাম বুলবুল
আহ্বায়ক	জনাব ফিরোজ খান নুন

www.pathagar.com

সদস্য সচিব		শিল্পী আমিনুল ইসলাম
সদস্য		সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীন
		জনাব হাসান মুর্তাজা
		কবি জাকির আবু জাফর
		শিল্পী আবদুর রউফ

অভ্যর্থনা

উপদেষ্টা		জনাব মজিবুর রহমান মনজু
আহবায়ক		জনাব হাসান মুর্তাজা
সদস্য সচিব		জনাব মেসবাহ উদ্দীন মাহিন
সদস্য		শিল্পী আরিফুর রহমান
		জনাব আবদুল লতিফ

প্রকাশনা

উপদেষ্টা	:	জনাব সুলতান আহমদ
আবায়ক	:	জনাব হেলাল উদ্দিন
সদস্য সচিব	:	জনাব নূরুল ইসলাম
সদস্য	:	জনাব কামরুজ্জামান

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

উপদেষ্টা	:	শিল্পী তাফাজ্জল হোসেন খান
আহবায়ক	:	শিল্পী সাইফুল্লাহ মানছুর
সদস্য সচিব	:	জনাব ফিরোজ খান নুন
সদস্য	:	জনাব আমিরুল ইসলাম
		নাট্যকার শাহ আলম নূর
		শরীফ বায়জিদ মাহমুদ
		কবি জাকির আবু জাফর
		শিল্পী আমিনুল ইসলাম
		জনাব মুস্তাগীসুর রহমান
		নাট্যকার আহসান হাবিব

দাওয়াত ও মেহমান

উপদেষ্টা	:	জনাব হামিদুর রহমান আযাদ
আহবায়ক	:	জনাব মজিবুর রহমান মনজু
সদস্য সচিব	:	জনাব হাসান মুর্তাজা
সদস্য	:	জনাব সাইফুল্লাহ মানছুর
		কবি জাকির আবু জাফর
		জনাব মুজাহিদুল ইসলাম

www.pathagar.com

আপ্যায়ন বিভাগ

উপদেষ্টা	জনাব মীর কাসেম আলী
আহবায়ক	জনাব রইস উদ্দিন
সদস্য সচিব	জনাব আমিনুল ইসলাম
সদস্য	জনাব আবদুর রহিম

শৃংখলা

উপদেষ্টা	:	জনাব রফিকুন্নবী
আহবায়ক	:	জনাব আবু সাঈদ মোহাম্মদ ফারুক
সদস্য সচিব	:	জনাব আনিসুজ্জামান

যোগাযোগ

উপদেষ্টা	জনাব তৌহিদুর রহমান
আহবায়ক	জনাব আবদুল লতিফ
সদস্য সচিব	জনাব আফসার নিজাম উদ্দিন
সদস্য	জনাব রেদওয়ানুল হক
	মাহমুদ বিন হাফিজ
	কবি মতিউর রহমান মল্লিক

অলংকরণ

উপদেষ্টা	:	জনাব মোশাররফ হোসেন
আহবায়ক	:	শিল্পী ইব্রাহীম মণ্ডল
সদস্য সচিব	:	কবি গোলাম মোহাম্মদ
সদস্য	:	শিল্পী ফরিদী নুমান
		শিল্পী জসিম উদ্দীন
		শিল্পী মোবাশ্বির মজুমদার
		শিল্পী রফিকুল্লাহ গাজালী

অনুষ্ঠান উপস্থাপনা

উপদেষ্টা	:	জনাব সাইফুল্লাহ মানছুর
আহবায়ক	:	জনাব শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
সদস্য সচিব	:	কবি জাকির আবু জাফর
সদস্য	:	শিল্পী কাজী ওমর ফারুক

অডিও ভিডিও

উপদেষ্টা	:	জনাব আরকানুল্লাহ হারুনী
আহবায়ক	:	জনাব হাসান আখতার
সদস্য সচিব	:	জনাব শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
সদস্য	:	জনাব আবদুর রাজ্জাক

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

উপদেষ্টা	:	জয়নুল আবেদীন আজাদ
আহবায়ক	:	অধ্যাপক সালমান আল আযামী
সদস্য সচিব	:	মুস্তাগিছুর রহমান
সদস্য	:	জামাল উদ্দিন
		ডা. আবু হেনা আবিদ জাফর
		শিল্পী গোলাম মাওলা
		শিল্পী হাসনাত আবদুল কাদের
		অধ্যাপক আবু তাহের বেলাল
		জনাব সাইফুল আরেফিন
		শিল্পী সালাহ উদ্দীন সুমন
		জনাব শিবলী সোহেল আবদুল্লাহ
		শিল্পী শাহজাহান সাজু
		শিল্পী মশিউর রহমান
		শিল্পী আবদুল্লা আল মাসুদ
		শিল্পী শামীমুল হক
		কবি আলী আজগর তালুকদার
		শিল্পী তৌহিদুল ইসলাম
		শিল্পী সোয়াইব হোসাইন
		শিল্পী আবদুল গফুর
		শিল্পী মুকুল
		অধ্যাপক হায়দার আলী
		শিল্পী ফজলুল হক শামিম
		শিল্পী জাফর সাদেক
		শিল্পী সাইফুল আরেফীন
		শিল্পী মনিরুজ্জামান
		শিল্পী কামরুজ্জামান
		শিল্পী ইকবাল আল্লামা

অর্থ কমিটি	:	জনাব শাহ আবদুল হান্নান
		জনাব আ. ন. ম আবদুজ্জাহের
		জনাব মীর কাসেম আলী
		জনাব এম আবদুর রাকীব
		জনাব এম তাজুল ইসলাম
		জনাব আমিনুল ইসলাম
		জনাব হাসান মুর্তাজা
		কবি জাকির আবু জাফর
		জনাব মোল্লা সালাহ উদ্দিন
		জনাব শামছুদ দোহা
		জনাব নুরুল ইসলাম

www.pathagar.com

বিশেষ বিভাগ

উপদেষ্টা : জনাব মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
আহ্বায়ক : ডা. স.ম. রফিক
সদস্য সচিব : শিল্পী আবদুর রউফ
সদস্য : শিল্পী আবুল কাসেম
শিল্পী মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান
কবি সোলায়মান আহসান
জনাব সিরাজুল ইসলাম শাহীন
কবি হাসান আলীম
কবি মোশাররফ হোসেন খান
ড. আহসান সাইয়েদ
কবি চৌধুরী গোলাম মাওলা
শিল্পী চৌধুরী আবদুল হালিম
শিল্পী তারেক মোহাম্মদ মুনাওয়ার হোসাইন
কথাশিল্পী মোহাম্মদ লিয়াকত আলী
শিল্পী শহিদুল্লাহ মাসুদ
নাট্যশিল্পী জি এম সালাহউদ্দিন
শিল্পী হাফিজ চৌধুরী
কবি নাঈম মাহমুদ
কবি নিয়াজ শাহেদী
কবি আজাদ ওবায়দুল্লাহ
কবি আহমদ বাসির

অফিস

উপদেষ্টা জনাব নাসির হেলাল
আহ্বায়ক জনাব শহীদুল ইসলাম
সদস্য সচিব জনাব আবদুল করিম শাহীন
জনাব মাহমুদ হোসেন দুলাল
জনাব মাহফুজুর রহমান আখন্দ
জনাব শেখ রেজাউল করিম
এডভোকেট আজাদ আবুল কালাম
জনাব শহীদুল ইসলাম
জনাব আরিফুল ইসলাম সোহেল
জনাব শেখ আবু সাঈদ
জনাব মীজানুর রহমান

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিল্পীগোষ্ঠী

চট্টগ্রাম বিভাগ

দুর্নিবার শিল্পীগোষ্ঠী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

এম এম ইফতেখার উদ্দিন রুমী
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
মুহাম্মদ সালাউদ্দিন জাহাঙ্গির
মুহাম্মদ সোহরাওয়ার্দী আযাদ
মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন
মুহাম্মদ বুলবুল আহমেদ
মুহাম্মদ বিল্লাল হোসেন বাপ্পী
এ কে এম শামসুল মাওলা
মুহাম্মদ দেওয়ান সাঈফ আলী
মুহাম্মদ নাজমুল আহসান

রেনেসা শিল্পীগোষ্ঠী
চট্টগ্রাম উত্তর জেলা

মুহাম্মদ শওকত ওসমান
মুহাম্মদ ফয়সাল আজাদ
মুহাম্মদ ছালিম উল্লাহ
মুহাম্মদ হাছানুল করিম
মুহাম্মদ ছরওয়ার উদ্দীন
মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ
মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ

প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংসদ
চট্টগ্রাম দক্ষিণ, বান্দরবান

মুহাম্মদ শাহাদাৎ হোসাইন
মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক
মুহাম্মদ শওকত আলী ইমন
মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন বিপ্লব
নাসির মাহমুদ
মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম

www.pathagar.com

মুহাম্মদ শেহাব উদ্দিন
মুহাম্মদ ওসমান গনি রায়হান
মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন

হিল্লোল শিল্পীগোষ্ঠী
নোয়াখালী জেলা দক্ষিণ
মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ মাসুম
মুহাম্মদ সালেহ উদ্দিন
মুহাম্মদ ওসমান গনী দিদার
মুহাম্মদ খন্দকার ওমর ফারুক
মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন
মুহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন
মুহাম্মদ নূর হোসেন
মুহাম্মদ আবদুস সামাদ হিমেল
ইকবাল মাহমুদ সোহেল
মুহাম্মদ অলিউদ্দিন মানিক
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

প্রবাহ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ
কুমিল্লা জেলা দক্ষিণ
মুহাম্মদ মেছবাহুল ইসলাম রিয়াজ
মুহাম্মদ রিয়াজ হোসেন নয়ন
এ কে এম হাবিবুর রহমান
মুহাম্মদ ইস্রাফিল মোল্লা
মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান রিয়াজ
মুহাম্মদ সাইয়েদুল ইসলাম তরুণ
মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম
মুহাম্মদ মনির হোসেন
সাইফুল ইসলাম মজুমদার
আনোয়ার হোসেন

কাণ্ডারী শিল্পীগোষ্ঠী
নোয়াখালী জেলা উত্তর
মুহাম্মদ নুরুজ্জামান
মুহাম্মদ নূর হোসেন

অনুপম শিল্পীগোষ্ঠী
লক্ষ্মীপুর জেলা
মুহাম্মদ আলমগীর হোসাইন
মুহাম্মদ জাকির হোসেন

www.pathagar.com

মারুফ আল্লাম
মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন টুটুল
মুহাম্মদ কাওসার হামিদ
এ টি এম আব্দুস সবুর
বেনজির আহমেদ
মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন

স্বরূপ সাহিত্যগোষ্ঠী
ফেনী জেলা
মুহাম্মদ সুলতান মাহমুদ ফারুকী
মুহাম্মদ মুনির উদ্দীন

সিলেট বিভাগ

রঙধনু শিল্পীগোষ্ঠী
সুনামগঞ্জ জেলা
মুহাম্মদ মতিউর রহমান খালেদ
মুহাম্মদ আলমগীর শাহরীয়ার
মুহাম্মদ আমজাদ হুসাইন
মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন
জাহিদ আহমদ
মুহাম্মদ মিজানুর রহমান সুমন
মুহাম্মদ মানসুর আলী
মুহাম্মদ রুহুল আমীন
মুহাম্মদ আখলাক হোসেন
মুহাম্মদ লুৎফর রহমান

মোহনা শিল্পীগোষ্ঠী
মৌলভীবাজার জেলা
মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
মুহাম্মদ আতাউর রহমান
মুহাম্মদ হিফজুর রহমান তাসনীম
ফাহাদ আহমদ
জুবায়ের আহমাদ তিতু

কাণ্ডারী শিল্পীগোষ্ঠী
সিলেট জেলা দক্ষিণ
মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন
মুহাম্মদ নূরুজ্জামান

www.pathagar.com

বরিশাল বিভাগ

সাইক্লোন শিল্পীগোষ্ঠী
পটুয়াখালী

মুহাম্মদ আবদুস সালাম
মুহাম্মদ ওবায়দুল হক শাওন
মুহাম্মদ আবু সাইদ রায়হান
মুহাম্মদ ওমর ফারুক মসিহ
মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির
মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম
মুহাম্মদ খাইরুল কবির
মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন ফয়েজ

দিশারী শিল্পীগোষ্ঠী
ঝালকাঠী জেলা

মুহাম্মদ আল-আমীন

সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ
বরিশাল জেলা পশ্চিম

মুহাম্মদ মশিউর রহমান মাসুম

ঝংকার শিল্পীগোষ্ঠী
বরগুণা জেলা

মুহাম্মদ ইদ্রিস আলম মিলন
মুহাম্মদ মিজানুর রহমান মিজান
এইচ এম বায়েজিদ
মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ পায়েস
মুহাম্মদ ফয়জুল মালেক সজীব

আল হেরা শিল্পীগোষ্ঠী
ভোলা জেলা

মুহাম্মদ শাহ আলম
মুহাম্মদ রেদওয়ানুল ইসলাম
মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম
মুহাম্মদ ইয়াসির আরাফাত
মুহাম্মদ আব্দুল খালেক
মুহাম্মদ সোহেল
মুহাম্মদ নোমান
মুহাম্মদ কবির হোসেন নুমান
মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন মনির
মুহাম্মদ মাইনুল ইসলাম সোহেল
শরীফ মোহাম্মদ ফয়সাল

www.pathagar.com

খুলনা বিভাগ

ব্যতিক্রম
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ
মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ আল মামুন
মুহাম্মদ হারুন অর রশীদ
মুহাম্মদ মনিরুজ্জামন
মুহাম্মদ মাঈনুল ইসলাম
মুহাম্মদ আবু জায়েদ আনসারী
মুহাম্মদ রুহুল আমীন সৌরভ
মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ রাসেল
মুহাম্মদ জাকারিয়া মুজাহিদ
মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান পাঠান

দিশারী শিল্পীগোষ্ঠী
নড়াইল

নাসির আহমেদ প্রিন্স
মুহাম্মদ জোনায়েদ আলী
মুহাম্মদ শাহজাহান সাগর
আহমাদ সাইফুল্লাহ মধু
মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ কাইছার
মুহাম্মদ শরীফুল ইমলাম হাদী
কাজী মাহমুদুল হাসান
মুহাম্মদ শাহ নেওয়াজ
এম, এম নাসির উদ্দিন সজল
মুহাম্মদ আলাউদ্দিন
মুহাম্মদ ইনামুল হক
মুহাম্মদ জিব্রাইল হোসাইন বুলবুল

টাইফুন শিল্পীগোষ্ঠী
খুলনা মহানগরী

শেখ মুজাহিদুর রহমান
মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান
মুহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম
মুহাম্মদ আব্দুস সালাম
মাহমুদ রাকিব
মুহাম্মদ সাঈদ আনোয়ার
মুহাম্মদ নাজমুল কবীর

www.pathagar.com

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
মুহাম্মদ সাজ্জাদুল আলম
শাওন আহমেদ মুকুল
মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

সেন্টার ফর লিটারেচার এন্ড কালচার
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
মুহাম্মদ খালীদ এম শাহীন
ইকবাল মাহমুদ

হিল্লোল সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ
কুষ্টিয়া
মুহাম্মদ রুহুল আমীন

জাগরণী শিল্পীগোষ্ঠী
সাতক্ষীরা জেলা
মুহাম্মদ মঈনুল ইসলাম
মুহাম্মদ মোস্তফা মাহফুজ বিল্লাল শাহী
মুহাম্মদ মোমিনুর রহমান
মুহাম্মদ তরিকুল ইসলাম
মুহাম্মদ আব্দুর রহীম
এস এম আনিছুর রহমান
মাষ্টার আবু নাঈম
মুহাম্মদ ওমর ফারুক
মুহাম্মদ শাহানুর রহমান
মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ আযাদী মহিব
মুহাম্মদ শরীফুল ইসলাম শরীফ

তরঙ্গ শিল্পীগোষ্ঠী
যশোর
মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম
মুহাম্মদ রোকনুজ্জামান মিন্টু
মুহাম্মদ ইলিয়াস ফকির জনি
মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম
মুহাম্মদ আকতার হোসেন
এস এম শরীফুল ইসলাম
মুহাম্মদ মোস্তফা রুহুল কুদ্দুস
মুহাম্মদ সাইদুর রহমান
এস এম রুহুল আমীন

www.pathagar.com

মুহাম্মদ শোভন মোল্লা
মুহাম্মদ ইলিয়াস হুসাইন
মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন

প্রপাত শিল্পীগোষ্ঠী
চুয়াডাঙ্গা
মুহাম্মদ মুন্সী আব্দুস সালাম
কে এম মেছদাকুর রহমান
মুহাম্মদ নূর-এ- মিসুয়ারী নূর
সজীব মেহমুদ
মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান
মুহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম রনি
মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
মুহাম্মদ মনিরুজ্জান
মুহাম্মদ আব্দুস সবুর

প্রতিশ্রুতি শিল্পীগোষ্ঠী
মাগুরা জেলা
মুহাম্মদ আবু হুরায়রা

রাজশাহী বিভাগ

বিকল্প সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
মুহাম্মদ ফজলুর রহমান
মুহাম্মদ সাজেদুল ইসলাম
মুহাম্মদ বোরহান উদ্দিন
মুহাম্মদ লুৎফর রহমান
মুহাম্মদ মুদাচ্ছের হোসেন
আবদুল খালেক
মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন মোল্লা
মুহাম্মদ মুজাহিদ
মুহাম্মদ আমিরুল মোমেনীন মানিক
মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম সবুজ
মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী
মুহাম্মদ সোয়াইব হোসাইন
মুহাম্মদ সাদেকুজ্জামান সৈকত
আবদুল মান্নান
মুহাম্মদ মঈন উদ্দিন বকুল
আব্দুল ওয়াদুদ

www.pathagar.com

প্রত্যয় শিল্পীগোষ্ঠী
রাজশাহী মহানগরী

মুহাম্মদ আবদুস শাকুর তুহিন
মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব
মুহাম্মদ মিজানুর রহমান
লিটন হাফিজ চৌধুরী
হাসানুল বান্না
সোহেল আহমেদ
আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ
সুমন আজিজ
মুহাম্মদ ইউসুফ বকুল
শহীদুল ইসলাম

বরেন্দ্র সাংস্কৃতিক সংসদ
রাজশাহী জেলা পশ্চিম

মুহাম্মদ মামুনুর রশিদ
মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
নাজমুদ্দিন আহমেদ
মুহাম্মদ হেকমত আলী
মুহাম্মদ একরামুল হক
মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন
মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
মুহাম্মদ মেহেদী হাসান
মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম
মুহাম্মদ আব্দুল আলীম

সমন্বয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ
বগুড়া শহর

মুহাম্মদ মাহবুব আলম মুকুল
মুহাম্মদ সুমন খাঁন
মুহাম্মদ মাসুদ রানা
মুহাম্মদ মিজানুর রহমান সরকার
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম
মুহাম্মদ এ আর সাজু
মুহাম্মদ কাওছার হাবীব
মুহাম্মদ আবুহুর ফরাজী
মুহাম্মদ আবদুল মোমিন
মুহাম্মদ শাহাব উদ্দিন
মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান

www.pathagar.com

মুহাম্মদ এহতেছান ফিল্লাহ
মুহাম্মদ শাহীন আলম
এস এম রিপন

অঙ্গীকার সাহিত্য সাংস্কৃতিকগোষ্ঠী
রংপুর শহর
মুহাম্মদ আবদুল জলিল মিঞা
মুহাম্মদ আব্দুল করিম সরকার
মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম মন্ডল
মুহাম্মদ ফেরদাউস
মুহাম্মদ শরীফুল আলম গোলাপ
মুহাম্মদ আবু রায়হান
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান হাবিব
মুহাম্মদ রায়হান সিরাজ
মুহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন সৈকত
আবদুল আলীম
শিব্বির আহমেদ
ইলিয়াছ আহমেদ

সৃজন সাংস্কৃতিক সংসদ
পাবনা জেলা
মুহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল আইনুল
এস এম ওবায়দুল্লাহ তারেক
এস এম আলাউদ্দিন
মুহাম্মদ আবু ইলিয়াছ খান
আবদুল জব্বার
মুহাম্মদ সেলিম হোসেন সুইট
মুহাম্মদ মনসুর আলী
মুহাম্মদ মুবিন উদ্দিন
মুহাম্মদ মামুন হোসেন রাসেল
মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান
আবদুল বারি
আমীর হামজা

অনির্বাণ শিল্পীগোষ্ঠী
পাবনা শহর
মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান মুঞ্জিল
মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন
মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল হাদী জীবন
মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম উজ্জল
মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনির
মুহাম্মদ সহিদুল ইসলাম

www.pathagar.com

মুহাম্মদ মিজানুর রহমান সাম্‌স
মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
মুহাম্মদ শামীম হোসেন

টর্নেডো শিল্পীগোষ্ঠী
লালমনিরহাট জেলা
মুহাম্মদ ফজলুল হক শামিল
মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
মুহাম্মদ আতাহারুল ইসলাম মিঠু
মুহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম
মুহাম্মদ নাজমুল হুদা
মুহাম্মদ আখলাকুজ্জামান মিজান
মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান ফেরদৌস
মুহাম্মদ সহিদার রহমান
আবদুল কাদের
হাফেজ মুহাম্মদ শামসুল হক

সীমান্ত সাংস্কৃতিক সংসদ
পঞ্চগড় জেলা
এইচ এম রায়হানুল কবির হৃদয়
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বাদশাহ
মাহমুদ আল মামুন হিমু
মুহাম্মদ খাইরুল বাশার

মোহনা সাহিত্য সাংস্কৃতিক শিল্পীগোষ্ঠী
সিরাজগঞ্জ
মুহাম্মদ আবু ওয়ারেছ
মুহাম্মদ মেহেদী আহসান
মাহমুদ হাসান রানা
মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ মাসুদ
মুহাম্মদ সবুজ রানা
মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

অভিযাত্রী শিল্পীগোষ্ঠী
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
মুহাম্মদ আবু সালেক
মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
মুহাম্মদ লুৎফর রহমান সেলিম
এম এ মাহবুব
মুহাম্মদ জুবাইর রহমান
মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার
আশরাফুল আলম সিদ্দিকী কাজল
মুহাম্মদ সেলিম রেজা

www.pathagar.com

রাহবার শিল্পীগোষ্ঠী
দিনাজপুর

মুহাম্মদ আতিকুর রহমান আতিক
মুহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম
মুহাম্মদ নাজমুল হক মোল্লা
মুহাম্মদ শরীফুল ইসলাম
মুহাম্মদ কামরুল আহসান
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন
মুহাম্মদ ফাতেমুল হক মোল্লা
মুহাম্মদ শাহ্ আলম নূর
মুহাম্মদ মশিউর রহমান মানিক

ঢাকা বিভাগ

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদ
কিশোরগঞ্জ জেলা

মুহাম্মদ শামসুল আলম সেলিম

ঝংকার শিল্পীগোষ্ঠী
ফরিদপুর শহর

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
মুহাম্মদ শামসুল হক
হাফেজ আব্দুল বাতেন
হাফেজ আশরাফুল ইসলাম
আবদুল কুদ্দুস খান
মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
মুহাম্মদ মিজানুর রহমান মজনু
সা. হামিদ
রফিকুল ইসলাম

উজ্জীবন শিল্পীগোষ্ঠী
নরসিংদী জেলা

মুহাম্মদ শাহজালাল
মুহাম্মদ ইমরান খান
মুহাম্মদ আছিম বিল্লাহ
মুহাম্মদ সামছুল ইসলাম
মুহাম্মদ মা'রুফ আল্লাম
মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক
মুহাম্মদ আব্দুল গাফ্ফার
মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক
মুহাম্মদ রুহুল আমীন
মুহাম্মদ হুসনে মোবারক

www.pathagar.com

ইনকিলাব সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ
নারায়নগঞ্জ শহর

মুহাম্মদ মনির হুসাইন
মুহাম্মদ ইমরান হোসেন আকাশ
হাফেজ যুবাইর হোসেন
মুহাম্মদ ইউসুফ আলী স্বপন
মুহাম্মদ সহিদুল ইসলাম
মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন মিজান
বোরহান উদ্দিন আহমদ
মুহাম্মদ বনি ইয়ামীন
শরীফ আবদুল্লাহ আল মাসুদ
মুহাম্মদ আল আমীন
মুহাম্মদ হাসনাইন
আবদুল কাইয়ুম
মুহাম্মদ আরিফুর রহমান

উত্তরণ শিল্পীগোষ্ঠী
মোমেনশাহী শহর

শেখ মুহাম্মদ শাহ পরান
মুহাম্মদ ফারকুলিত বিন হায়দার
মুহাম্মদ শাহাদাৎ হোসাইন
মুহাম্মদ কামরুল আহসান
আবু সাঈদ মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম

নীহারিকা সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ
মাদারীপুর জেলা

মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক
মুহাম্মদ মাসউদুর রহমান
মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম নিজাম
মুহাম্মদ নূরুল হক তপু
মুহাম্মদ নাজমুল হাসান
মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন
মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক

সঞ্জীবন শিল্পীগোষ্ঠী
শেরপুর জেলা

মুহাম্মদ মোস্তফা আশেকুজ্জামান বুলবুল

সাইফুন শিল্পীগোষ্ঠী
গোপালগঞ্জ জেলা

মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান

www.pathagar.com

আমন্ত্রণ শিল্পীগোষ্ঠী
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা

মুহাম্মদ আবদুল গনি বিদ্বান

রাহবার শিল্পীগোষ্ঠী
মাদ্রাসা আলীয়া

মুহাম্মদ বেলাল হোসেন
ক্বারী মুহাম্মদ মুনির উদ্দিন
মুহাম্মদ রায়হান উদ্দিন
মাহমুদুল হাসান

দিশারী সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ
ঢাকা জেলা দক্ষিণ

মুহাম্মদ কাজী রকিব আনছারী

স্পন্দন সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ
গাজীপুর জেলা

মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা খান
মুহাম্মদ মেহেদী হাসান রিয়াজ
মুহাম্মদ হুমায়ুন বিন হানিফ
রুবেল মাহমুদ
মুহাম্মদ আসিফ ইকবাল তানিম
মুহাম্মদ জিয়া হায়দার
মুহাম্মদ গোলজার মোল্লা
মুহাম্মদ রকিবুল হাসান
মুহাম্মদ মেহেদী হাসান বাবু
এস এম খাইরুল ইসলাম
মুহাম্মদ নুরুজ্জামান খান রুমী
মুহাম্মদ ইউনুছ আলী

উচ্চারণ শিল্পীগোষ্ঠী
মহানগরী উত্তর

মুহাম্মদ আবদুর রউফ
মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন
মুহাম্মদ বেলাল হোসেন
মুহাম্মদ আবুল কাসেম
মুহাম্মদ ইমতিয়াজ
মুহাম্মদ শেখ সাদী
মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বলি
মাসুম মাহবুব
মুহাম্মদ নাজমুল হাসান
আহমদ ফাহিম আশরাফী

www.pathagar.com

মুহাম্মদ হোসেন
মুহাম্মদ মাসুম
মুহাম্মদ রিয়াজ
মুহাম্মদ ইলিয়াস শরীফ
মুহাম্মদ রোকনুজ্জামান কাজল
মুহাম্মদ শামীম

সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী
ঢাকা
মুহাম্মদ মুস্তাগিছুর রহমান
মুহাম্মদ কাজী ওমর ফারুক
মুহাম্মদ শাহাবুদ্দীন
এ কে আযাদ
জাফর সাদেক
মুহাম্মদ শরিফুল ইসলাম
মুহাম্মদ ফয়সাল আমীন কাজী
মুহাম্মদ বদিউর রহমান সোহেল
সানজিদ মাহমুদ
মুহাম্মদ রিজভী

প্রবাহ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মুহাম্মদ মাহবুবুল্লাহ
মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম
মুহাম্মদ জাকির হোসাইন
মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন
মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
মুহাম্মদ মসিতুল্লাহ
মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন
মুহাম্মদ কামাল হোসেন
মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
মুহাম্মদ মিজানুর রহমান

সৃজন সাংস্কৃতিক অংগন
মিরপুর, ঢাকা
মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান
আবদুল মালেক
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান
মুহাম্মদ সাহাবুদ্দিন
মুহাম্মদ বেলাল হোসেন #

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের ফলাফল

গোষ্ঠীভিত্তিক বিজয়ী সংগঠন

প্রথম - মহানগর সাংস্কৃতিক সংসদ, ঢাকা
দ্বিতীয় - প্রত্যয় শিল্পীগোষ্ঠী, রাজশাহী
তৃতীয় - বিকল্প সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
চতুর্থ - সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী, ঢাকা
পঞ্চম - তরঙ্গ শিল্পীগোষ্ঠী, যশোর

একক গান

প্রথম - মুহাম্মদ মুজাহিদ
বিকল্প সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
দ্বিতীয় - মশিউর রহমান লিটন
মহানগর সাংস্কৃতিক সংসদ, ঢাকা
তৃতীয় - মারুফ আল্লাম
উজ্জীবন শিল্পীগোষ্ঠী, নরসিংদী

একক অভিনয়

প্রথম - মিজানুর রহমান
ঝংকার শিল্পীগোষ্ঠী, রংপুর
দ্বিতীয় - মুহাম্মদ শরীফুল আলম গোলাপ
অঙ্গীকার শিল্পীগোষ্ঠী, রংপুর
তৃতীয় - গোলাম মোস্তফা খান
স্পন্দন শিল্পীগোষ্ঠী, গাজীপুর

আবৃত্তি

প্রথম - মিজানুর রহমান
প্রবাহ সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
দ্বিতীয় - কাজী ওমর ফারুক
সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী, ঢাকা
তৃতীয় - তিন জনের বৃন্দ আবৃত্তি
পাঞ্জেরী শিল্পীগোষ্ঠী, চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

সম্মেলনের দাওয়াতপত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সুধী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্যোগে আগামী **২০ জুলাই ২০০২ শনিবার সকাল ১০ টায় বিয়াম মিলনায়তনে** জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী** সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় মন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক**, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় মন্ত্রী জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ**।

সভাপতিত্ব করবেন জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদের সম্মানিত আহ্বায়ক **জনাব মীর কাসেম আলী**।

অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি আমাদের আয়োজনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করবে।

তাসনীম আলম
সদস্য সচিব
জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটি

www.pathagar.com

অনুষ্ঠান সূচী

অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণ
তেলাওয়াতে কালামে পাক
নাতে রাসূল [স]
আবৃত্তি

স্বাগত ভাষণ
অধ্যাপক তাসনীম আলম

অতিথিদের আলোচনা
জনাব সাইফুল্লাহ মানছুর
সভাপতি, ঢাসাস
জনাব ফিরোজ খান নুন
আহ্বায়ক, সসাস

www.pathagar.com

কবি মতিউর রহমান মল্লিক
জনাব বাবুল আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক, জাসাস
জনাব আবুল আসাদ
সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম
কবি আফজাল চৌধুরী
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, হবিগঞ্জ সরকারী কলেজ
প্রফেসর ড. আবদুস সাত্তার
পরিচালক, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিল্পী মুস্তফা জামান আব্বাসী
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী
প্রফেসর মোহাম্মদ ইউসুফ আলী
সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বিশেষ অতিথিদের আলোচনা
কবি আল মাহমুদ
জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ
মাননীয় সমাজকল্যাণমন্ত্রী
ড. ওসমান ফারুক
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

প্রধান অতিথির ভাষণ
মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

সভাপতির ভাষণ
জনাব মীর কাসেম আলী
আহ্বায়ক, জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক

স্থান ঃ জাতীয় যাদুঘর মিলনায়তন

তারিখ ঃ ২০ জুলাই ২০০২ শনিবার

সময় ঃ সন্ধ্যা ৬টা

উদ্বোধক
জনাব শাহ্ আবদুল হান্নান
সাবেক সচিব, চেয়ারম্যান ইসলামী বাংক বাংলাদেশ লিঃ

www.pathagar.com

মিডিয়ায় সম্মেলন

সরদার ফরিদ আহমদ

The New Nation

"Islamic values very basis of country's political frontiers"

যুগান্তর

নিজ আদর্শের প্রতি আস্থাশীল হলে বিদেশী সংস্কৃতি ঠেকানোর প্রয়োজন হয় না
—নিজামী

যুগান্তর রিপোর্ট

মিডিয়ায় কভারেজ বলে একটি কথা এখন বহুল উচ্চারিত এবং আলোচিত বিষয়। বিশেষ করে উদ্যোক্তারা তাদের অনুষ্ঠানের বহুল প্রচার চান। এর পেছনে যৌক্তিক কারণও রয়েছে। অনুষ্ঠানটি কেমন হলো, কেন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো, উদ্যোক্তারা তা সবাইকে জানাতে চান।

জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন ২০০২-এর জন্য একটি প্রচার কমিটি করা হয়েছিল। এই প্রচার কমিটির উপদেষ্টা ছিলেন জনাব আতা সরকার। আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন ড. আব্দুল ওয়াহিদ। সদস্য সচিব ছিলেন কবি ও সাংবাদিক শরীফ আবদুল গোফরান। আর কমিটির সদস্য ছিলেন সরদার আবদুর রহমান, আবিদুর রহমান ও শামসুল আরেফিন। এছাড়াও বাইরে থেকে বেশ কয়েকজন প্রচার কমিটির কাজে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

দৈনিক পত্রিকাগুলো জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন ২০০২-কে শুরু থেকেই বেশ গুরুত্বের সঙ্গে নেয়। সম্মেলনটি কোথায় হচ্ছে, কবে হচ্ছে এবং এতে কারা অতিথি হিসেবে থাকছেন- সে সম্পর্কে আগেভাগেই দৈনিক পত্রিকাগুলো খবর পরিবেশন করে। হাতে গোনা দু'একটি পত্রিকা বাদে জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ আয়োজিত এই সম্মেলনের খবরটি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এবং ফলাও করে প্রচার করে।

সম্মেলনের খবরটি পরিবেশনে প্রায় সব পত্রিকাই সম্মেলনের প্রধান অতিথি কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর বক্তব্যকে উদ্ধৃতি দিয়ে শিরোনাম দেয়। বেশিরভাগ পত্রিকাই প্রথম পাতাতেই এই সম্মেলনের খবরটি ছাপে। *দৈনিক ইনকিলাব* ডাবল কলামে সংবাদটি ছাপে। তাদের পরিবেশিত খবরটির শিরোনাম ছিল "জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলনে দাবি- সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিশ্বাস ও চেতনার আলোকে সাংস্কৃতিক নীতিমালা দিতে হবে।" *ইনকিলাব* মাওলানা নিজামীর বক্তৃতারত ছবিও ডাবল কলাম করে ছাপে। *ইনকিলাব*-এর পরিবেশিত খবরে সম্মেলনে চারজন অতিথির বক্তব্য দেয়া হয়। মাওলানা নিজামী ছাড়াও আর যে তিনজনের বক্তব্য দেয়া হয় তারা হলেন, শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ ও কবি আল মাহমুদ। *ইনকিলাব*-এর পরিবেশিত খবরে জানানো হয় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সম্মেলনে ৬৬টি সাংস্কৃতিক সংগঠন অংশ নেয়। *ইনকিলাব* পরিবেশিত চার বক্তার বক্তব্যের আংশিক এখানে তুলে ধরা হলো।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ঃ "যে সংস্কৃতি মানুষের মনে পশুত্বের বিকাশ ও মানবতাবিরোধী চেতনা লালন করতে শিখায়, জাতিকে তা থেকে দূরে রাখতে হবে। আল্লাহ খোদার নাম নিলে বা ইসলামী লেবাস

www.pathagar.com

দেখলে মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত করার মনোভাব পরিহার করার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক অবস্থান শক্তিশালী করতে শক্তিশালী সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটা রাজনৈতিকভাবে যতটা কষ্টকর, সাংস্কৃতিকভাবে ততটা নয়। কারণ রাজনীতিতে সিট ভাগাভাগির সংকট থাকলেও সংস্কৃতিতে সেটা নেই। তিনি সংস্কৃতিকে উন্নত করতে শিক্ষা সংস্কারের বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন।"

ড. ওসমান ফারুক ঃ "স্যাটেলাইট টিভি অনুষ্ঠানগুলো এখন শিক্ষাঙ্গনের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন লেখাপড়া করার সময় তখন ছাত্ররা অশ্লীল ছবি নিয়ে মেতে থাকে। জাতির ভবিষ্যৎ রক্ষায় এ অবস্থার অবসান হওয়া প্রয়োজন। এজন্য নিজস্ব সংস্কৃতির ধারাকে শক্তিশালী ও বেগবান করতে হবে। আইন করে বা সরকারের একার পক্ষে এ অবস্থা পাল্টে দেয়া সম্ভব হবে না। বিদেশী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ঠেকাতে গণসচেতনা গড়ে তুলতে হবে। নৈতিকতাবিবর্জিত সংস্কৃতি কারও কাম্য হতে পারে না। যে সংস্কৃতি সন্ত্রাস, বেলেল্লেপনা ও অশ্লীলতা বহন করে- তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যে সংস্কৃতি আমাদের এই মাটি ও মানুষের কথা বলে সেটাই আমাদের সংস্কৃতি। আমাদের সংস্কৃতিতে আমাদের নিজস্ব আশা-আকাংক্ষা চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন থাকতে হবে।"

আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ ঃ "আমাদের সংস্কৃতিতে বিদেশী আধিপত্য বিরাজ করছে। শেকড়হীন খড়কুটোর মত ভেসে চলছে আমাদের সংস্কৃতি। স্রোতের অনুকূলে গা ভাসিয়ে নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা করা যাবে না। প্রতিকূলে পথ চলার অভ্যাস করেই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কবল থেকে জাতিকে রক্ষা করতে হবে।"

কবি আল মাহমুদ ঃ "রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন সমান্তরাল গতিকে চালিয়ে যেতে হবে। আগামী দিনের সাংস্কৃতিক রাজধানী ঢাকাকে সেভাবেই গড়ে তুলতে হবে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির রাজধানী হিসেবে ঢাকার কোনো বিকল্প নেই। শুধু কতিপয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এখনও কলিকাতার দিকে চেয়ে আছে। অথচ সাংস্কৃতিকভাবে আজ কলিকাতা পরাজিত। কিন্তু ঢাকা লড়াই করছে তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার জন্য- এটাই আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য।"

দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত সম্মেলনের খবরের শিরোনাম ছিল "নিজ আদর্শের প্রতি আস্থাশীল হলে বিদেশী সংস্কৃতি ঠেকানোর প্রয়োজন হয় না- নিজামী"। *দৈনিক ইত্তেফাক* সংবাদটির শিরোনাম করে "ইসলামই হলো স্বাধীনতার রক্ষাকবচ- কৃষিমন্ত্রী"। *দৈনিক আজকের কাগজ* পত্রিকায় খবরটির শিরোনাম ছিল "অপসংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে নিজস্ব সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হবে- নিজামী"। *দ্য নিউনেশন* পত্রিকা খবরটি সংবাদ সংস্থা বাসস থেকে নিয়ে ছাপে। তিন কলামে প্রকাশিত *নিউনেশন*-এর পরিবেশিত খবরের শিরোনাম ছিল- "Islamic Values very basis of country's political frontiers" পত্রিকাটি তিন কলামে সম্মেলনের ছবিও ছাপে। পত্রিকাটি সম্মেলনের প্রধান অতিথি মাওলানা নিজামীর উদ্ধৃতি দিয়ে লেখে, "Nizami urged the nationalist forces to ensure their dominance in the intellectual and cultural arena. 'If we can do that a large part of the media world of the country will come to our side', he said." *দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট* পত্রিকাটিও

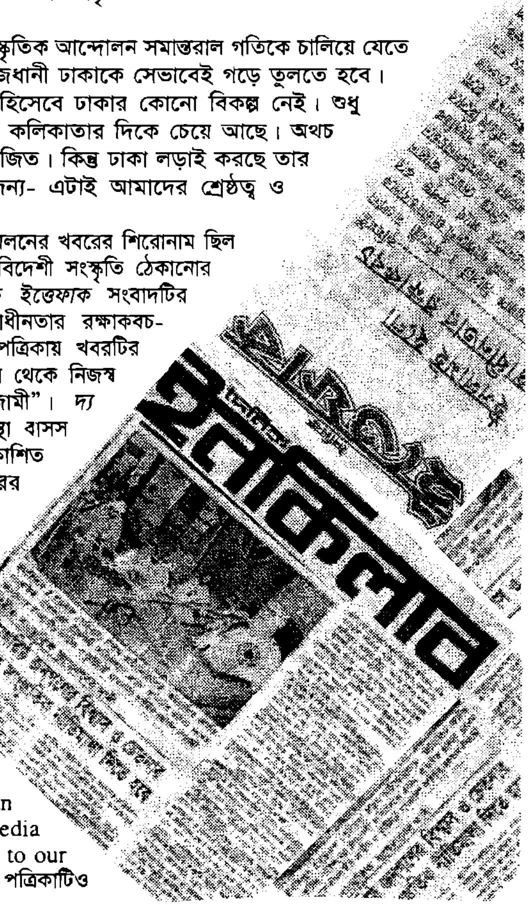

www.pathagar.com

ডাবল কলামে সম্মেলনের সংবাদ ছাপে। *ইন্ডিপেনডেন্ট*-এর খবরের শিরোনাম ছিল– "Note of caution on alien cultural aggression" শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুকের ভাষণের উদ্ধৃতি দিয়ে খবরে বলা হয়, "The education minister said, the western cultures have many aspects, 'but we take only negative sides.' 'We can stop aggression of alien culture strengthening our own cultural base' he said. আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদের ভাষণের উদ্ধৃতি দিয়ে পত্রিকাটি লিখেছে, "The social welfare minister urged the forces belonging to Islamic values to come forward for resisting cultural aggression." পত্রিকাটি আরো লিখেছে, "The conference unanimously adopted a resolation, which urged the alliance government to implement a seven-point demand including formulation of a national cultural policy based on belief system of majority of people."

দৈনিক আল মুজাদ্দেদ তিন কলামে সম্মেলনের খবরটি পরিবেশন করে। খবরের শিরোনাম ছিল "জাসাপ-এর জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলনে আহ্বান– জনগণের চেতনার ধারক সাংস্কৃতিক নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।" পত্রিকাটি ডাবল করামে সম্মেলনের ছবিও ছাপে। *দৈনিক দিনকাল*ও অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে সম্মেলনের খবর ছাপে। *দিনকাল* ডাবল কলামে সম্মেলনের ছবি ছাপে। *দিনকাল*-এ প্রকাশিত খবরের শিরোনাম ছিল "জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলনে নিজামী– বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ রাজনীতি সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।"

দৈনিক সংগ্রাম সম্মেলনের খবরটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ছাপে। পত্রিকাটি পাঁচ কলামে সম্মেলনের ছবি ছাপে। *সংগ্রাম*-এ প্রকাশিত খবরটির শিরোনাম ছিল "জাসাপ-এর জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলনে মাওলানা নিজামী– মানবতা ও মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করতে ওহীভিত্তিক সংস্কৃতির পক্ষে প্রচারণা জোরদার করতে হবে।" *সংগ্রাম*-এর খবরে সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে লেখা হয়, "নদীমাতৃক আমাদের এই জনপদ কখনো সামরিকভাবে কারো বশ্যতা মানেনি। তবে কখনো কখনো সাংস্কৃতিক সীমানায় পাহারাদারীর

দৈনিক সংগ্রাম
THE DAILY SANGRAM

জাসাপের জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলনে মাওলানা নিজামী

মানবতা ও মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করতে ওহী ভিত্তি সংস্কৃতির পক্ষে প্রচারণা জোরদার করতে হবে

জাতীয় জাদুঘর ঘিরে তৈরী হয়েছিল মুগ্ধ প্রাণের সুরের উৎসব

www.pathagar.com

দুর্বলতার কারণে শকুনীরা খামচে ধরেছে আমাদের শ্যামল মানচিত্র। অভিজ্ঞতা আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে হলে জাতির সাংস্কৃতিক সীমানাকে অবশ্যই সুরক্ষিত রাখতে হয়। দেশ গড়ার সাথে সমান্তরাল গতিতে এগিয়ে নিতে হয় জাতি গঠনের কাজকেও। আধুনিককালেও সাংস্কৃতিক সীমান্তের গুরুত্ব মোটেও কমেনি, বরং বেড়েছে বহুগুণ। আমাদের বর্তমান সংগ্রাম আমাদের সাহসী, ত্যাগী ও সচেতন পূর্ব-পুরুষদের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামেরই এ আপোসহীন ধারাবাহিকতা। এই ধারাবাহিকতা সমুন্নত, বেগবান ও সমৃদ্ধ করার অপরিহার্য তাগিদেই সারাদেশের সাংস্কৃতিক কর্মীদের অভিন্ন চেতনা ধারণ করে এ সম্মেলন সকল দেশপ্রেমিক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের নিরঙ্কুশ ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত বর্তমান দেশপ্রেমিক সরকারের কাছে ৭টি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করে।"

সম্মেলন উপলক্ষে বিকেলে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে *দৈনিক সংগ্রাম* পৃথক একটি খবর ছাপে। তিন কলামে পরিবেশিত এই খবরটির শিরোনাম ছিল "জাতীয় জাদুঘর ঘিরে তৈরি হয়েছিল মুগ্ধ প্রাণের সুরের উৎসব।" এতে লেখা হয়, "গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিণত হয়েছিল মুগ্ধ প্রাণের সুরের উৎসবে। সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠান শুরু হলেও শেষ বিকেলের বৃষ্টি উপেক্ষা করে শাহবাগ জাতীয় জাদুঘর ঘিরে পরিণত হয়েছিল সহস্র স্রোতার আর্দ্র আঙ্গিনায়। খণ্ড খণ্ড জনস্রোত সংলগ্ন এলাকায় ছড়িয়ে দেয় আনন্দ-মূর্ছনার বিমল উচ্ছ্বাস। মিলনায়তন চেয়ার-মেঝে ছাড়িয়ে সংস্কৃতি কর্মীদের ঢেউ বেরিয়ে পড়ে জাদুঘরের লবি-সিঁড়ি বেয়ে জাদুঘরের বাইরের উঠোনে। জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ আয়োজিত সাংস্কৃতিক সম্মিলনীতে এমন হাজার প্রাণের মুক্ত জোয়ার ছড়িয়ে পড়বে তা হয়তো আয়োজকদের অজানাই রয়েছিল। সন্ধ্যা সোয়া ৬টায় সাংস্কৃতিক পর্বের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষক শাহ আবদুল হান্নান। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, সংস্কৃতি হচ্ছে একটা জীবন পদ্ধতি। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ইসলামকেই তাদের জীবনাদর্শ হিসেবে বিশ্বাস করে। তাই ইসলামই আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের সংস্কৃতি, জাতীয় সংস্কৃতি। এদেশের অমুসলিমরাও তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির অনুসরণ করবে। সংস্কৃতি আইনের চেয়েও গভীর। আইন বদলানো যায় সংস্কৃতি বদলানো সহজ নয়। অশ্লীলতা, নোংরামী ও নারীর অপব্যবহার থেকে সংস্কৃতিকে মুক্ত করতে হবে। সংস্কৃতি হচ্ছে একটি ইতিবাচক শক্তি যা জাতিকে উন্নত করে।"

"শিল্পী মশিউর রহমানের হামদ-বারিতালার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক পর্ব শুরু হয়। সুরের উচ্চারণে ছড়িয়ে পড়ে *যেমন তুমি দিলে জমিন দিয়েছ আসমান, সুখের সমাজ গড়তে দিলে তেমনি কুরআন, তোমার দয়া অফুরান* এই গানের সাথে সাথে সহস্র জনতার কলরব থেমে যায় পরম প্রভুর কৃতজ্ঞতায়।"

"জাতীয় পতাকার ক্যানভাসে বাংলাদেশের নিসর্গ আঁকা মঞ্চে ছিল দৃষ্টির আনন্দ। অনবদ্য আলোক প্রক্ষেপণে তারার ঝলকানি ছড়িয়ে দেয় আলোর

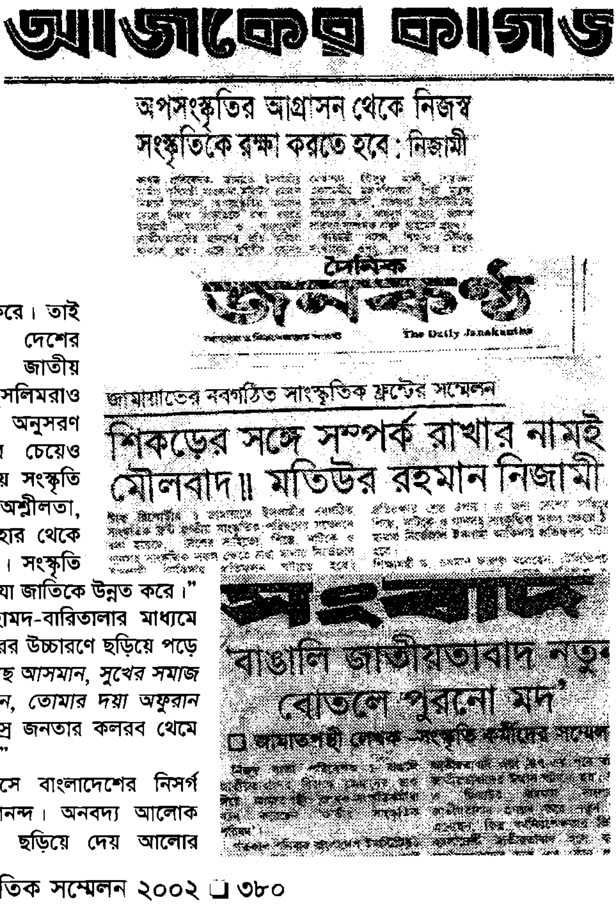

www.pathagar.com

রঙধনু। রাজশাহীর বিকল্প শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীরা পরিবেশন করে *মিথ্যার বেড়াজাল ছিন্ন করে আলোর দিশারী মোরা জাগাবো/আগামীর পৃথিবী গড়বো মোরা নতুন সকাল আনবো।"*

"শিশু শিল্পীদের ঝলমল উচ্চারণে দুলে ওঠে সোনালী সকাল আনার প্রত্যয়, ওমর ফারুকের কবিতার উচ্চারণে প্রলম্বিত শ্রোতাদের ভিড় সচকিত মুগ্ধতায় মেতে ওঠে। কান পেতে শোনে নিসর্গ থেকে জীবনের পেলবতা। লালমনিরহাটের টর্নেডো শিল্পীগোষ্ঠীর গণসঙ্গীতে বেরিয়ে আসে সমাজের সরস অসঙ্গতি। বিকল্প শিল্পীগোষ্ঠীর সুরের তরুণরা পরিবেশন করে ইংরেজি গানের বিতান। গভীর রাত পর্যন্ত সহাস্য শ্রোতা মেতে থাকে সুরের মুগ্ধতায়।" তিন কলামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একটি ছবিও ছাপে *সংগ্রাম*।"

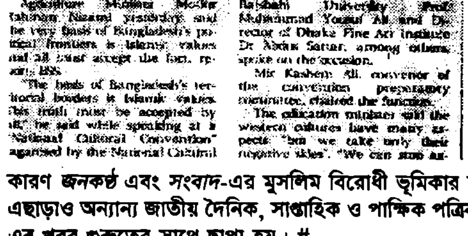

দৈনিক সংবাদ ও *দৈনিক জনকণ্ঠ*- এই দুটি পত্রিকা সম্মেলনের খবরটি গুরুত্ব দিয়ে ছাপলেও তাদের পরিবেশনার ঢঙ ছিল নেতিবাচক। *দৈনিক জনকণ্ঠ*-এর পরিবেশিত খবরের শিরোনাম ছিল "জামায়াতের নবগঠিত সাংস্কৃতিক দলের সম্মেলন– শিকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার নামই মৌলবাদ ॥ মতিউর রহমান নিজামী।"

ডাবল কলামে পরিবেশিত *দৈনিক সংবাদ*-এর খবরের শিরোনাম ছিল "বাঙালি জাতীয়তাবাদ নতুন বোতলে পুরনো মদ।" খবরটির ইনট্রোতে লেখা হয় "বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে জেহাদের ডাক দিয়ে জামাতপন্থী লেখক সংস্কৃতিকর্মীরা গঠন করেছেন জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ।" এই সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক ও জাসাস-এর সাধারণ সম্পাদক বাবুল আহমদও যে বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন তা হয়তো *সংবাদ* ইচ্ছে করে ভুলে গিয়েছিল। পত্রিকাটি চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. আবদুস সাত্তারের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেয়। "ড. আবদুস সাত্তার বলেন, আমাদের দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা ইসলামি শিল্পকলার কথা শুনলেই তাদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়। ক্যালিগ্রাফি ইসলামী শিল্পকলার অংশ। অথচ এদেশে এর চর্চা একেবারেই ছিল না। সম্প্রতি এর চর্চা শুরু হয়েছে এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এ জন্য তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের গাত্রদাহও শুরু হয়েছে। তিনি আরও বলেন, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা বলে বেড়ায় বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী কবি-সাহিত্যিক তেমন নেই। আসলে আমরা বিচ্ছিন্ন আছি বলেই এ কথা বলার সুযোগ পায়। ঐক্যবদ্ধ হলেই তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।"

সংবাদ ও *জনকণ্ঠ* সম্মেলন নিয়ে নেতিবাচক রিপোর্ট করলেও পত্রিকা দুটো এর গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারেনি। এ থেকে এই সম্মেলনের ঐতিহাসিক বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। কারণ *জনকণ্ঠ* এবং *সংবাদ*-এর মুসলিম বিরোধী ভূমিকার কথা কারো অজানা নয়।

এছাড়াও অন্যান্য জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকায় ছবিসহ জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন ২০০২-এর খবর গুরুত্বের সাথে ছাপা হয়। #

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ

বাংলাদেশে শরীয়াহ্ ভিত্তিক প্রথম ইসলামী জীবন বীমা (তাকাফুল)

আমাদের বৈশিষ্ট্য

সুদমুক্ত হালাল বীমা ব্যবস্থা

■

লাভ ও লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত

■

পরস্পরের মধ্যে দায়িত্বের অংশীদারিত্ব

■

সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ ও কল্যাণমুখী ব্যবস্থা

■

পারস্পরিক সংহতি ও সহযোগিতা

ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ

পারস্পরিক সহযোগিতার অঙ্গীকার

হেড অফিস ঃ রূপালী বীমা ভবন, ৭ রাজউক এ্যাভিনিউ, ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ৯৫৬৯২১৩, ৯৫৬৭৪৪১, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯৫৬৭৭৩০

www.pathagar.com

সম্মেলন
আলোকচিত্র

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশের বর্ডারের ভিত্তি ইসলাম, মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ, সম্মেলনে
এই ঘোষণা দেন কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

শিক্ষামন্ত্রী ড: ওসমান ফারুক বললেন বিস্‌মিল্লাহ্ বলে যে কোনো কাজ শুরু করাটাই আমাদের সংস্কৃতি

২৫—

www.pathagar.com

আমাদের শিকড় অনেক গভীরে -এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেন
সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ

কবি আল মাহমুদ বললেন, ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা প্রকৃতপক্ষে আগ্রাসনবাদী ও আধিপত্যবাদী

www.pathagar.com

জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আহবায়ক মীর কাসেম আলী বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন,
রাষ্ট্র ও ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার আন্দোলন শুরু করতে চাই

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মোহাম্মদ ইউসুফ
স্পষ্ট উচ্চারণ করলেন, জোর করে বাঙালী সংস্কৃতি আনা যাবেনা

www.pathagar.com

শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক মুস্তফা জামান আব্বাসী এই জাতির প্রকৃত অবলম্বন সম্পর্কে বললেন, আল কোরআনকে আমাদের আঁকড়ে ধরতে হবে

আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবেই অগ্রসর হতে হবে - বললেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর ড. আবদুস সাত্তার

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক আবুল আসাদ দুঃখ করে বললেন, আমাদের সামনে কোনো মডেল নেই

সম্মেলনের সদস্য সচিব অধ্যাপক তাসনীম আলম তার স্বাগত
ভাষণে বললেন, সংস্কৃতি একটি জাতির বিশ্বাসের প্রতিফলন

www.pathagar.com

জাসাস এর সাধারণ সম্পাদক বললেন, রাজনীতি
ও সংস্কৃতি পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত

সসাস -এর আহবায়ক ফিরোজ খান নুন ঘোষণা দেন, আমরা একটি
শক্তিশালী সাংস্কৃতিক বোমা তৈরি করতে চাই

www.pathagar.com

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি সাইফুল্লাহ মানছুর বললেন,
সাংস্কৃতিক কর্মী মানে একজন পরিপূর্ণ মানুষ

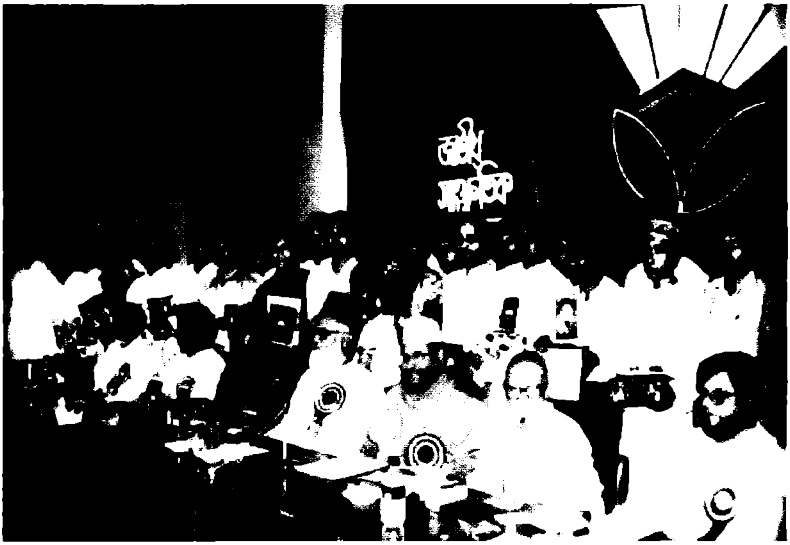

সম্মেলনে অতিথিদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিল্পীরা

www.pathagar.com

বিয়াম মিলনায়তনের সম্মেলনে উপচেপড়া দর্শকদের একাংশ

ক্বারী আবদুল মজিদের সুললিত কণ্ঠের কোরআন তেলাওয়াত সম্মেলনের দর্শক শ্রোতাদের বিমোহিত করে

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় মহানগর শিল্পী সমাজ মশিউর রহমানের নেতৃত্বে গান পরিবেশন করে

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিচারকমন্ডলী

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা দেখার জন্য এতো দর্শক হবে তা ভাবাই যায়নি

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় যশোরের তরঙ্গ শিল্পীগোষ্ঠী অংশ নেয়

সারাদেশ থেকে আসা বিভিন্ন শিল্পীগোষ্ঠীর চমৎকার পারফরমেন্স দর্শকদের অভিভূত করে

www.pathagar.com

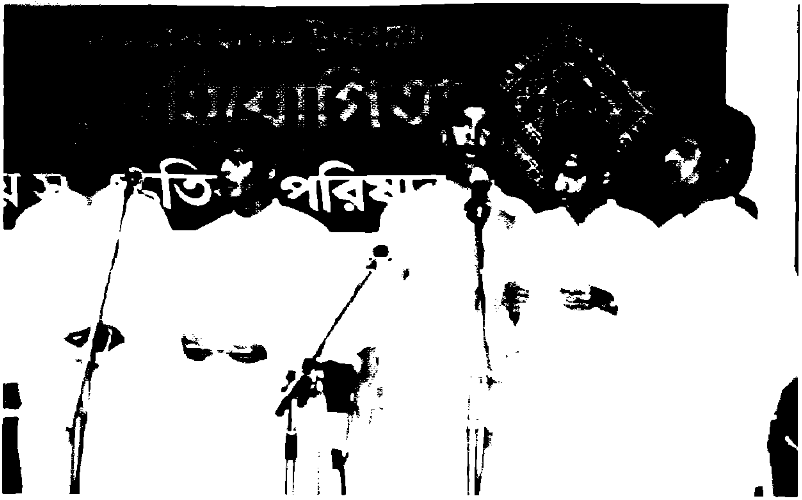

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতে বিভিন্ন শিল্পীগোষ্ঠী
তাদের সেরা পারফরমেন্স দেখানোর চেষ্টা করে

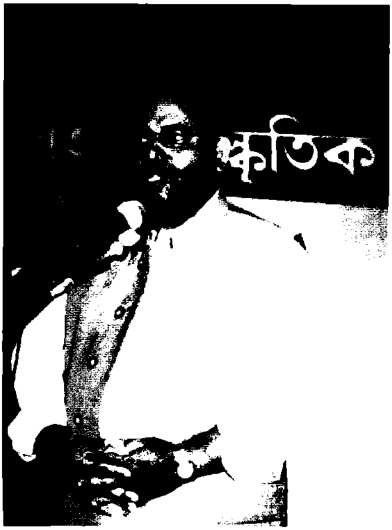

জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পরিষদের আহবায়ক মীর কাসেম আলী

সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সাংস্কৃতিক পর্বের উদ্বোধনী বক্তৃতায় শাহ আবদুল হান্নান বললেন, সংস্কৃতি আইনের চেয়ে শক্তিশালী

www.pathagar.com

সম্মেলন সঙ্গীত পরিবেশন করে রাজশাহীর বিকল্প শিল্পীগোষ্ঠী

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় নানান বিষয়ের উপস্থাপন

www.pathagar.com

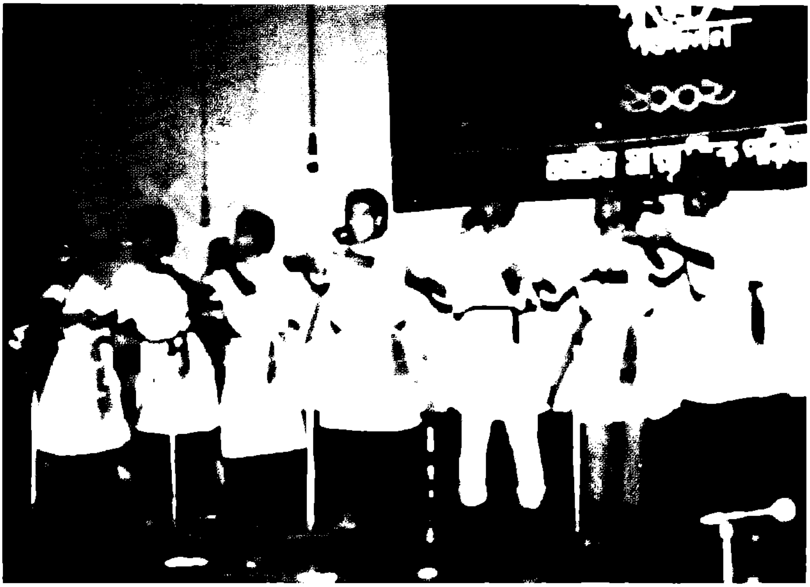

সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আঞ্চলিক গান পরিবেশন করে
বগুড়া সমন্বয় সাংস্কৃতিক সংসদের শিল্পীরা

সাইমুমের নাটক 'ইশারা' সবাইকে মুগ্ধ করে

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দর্শকদের একাংশ

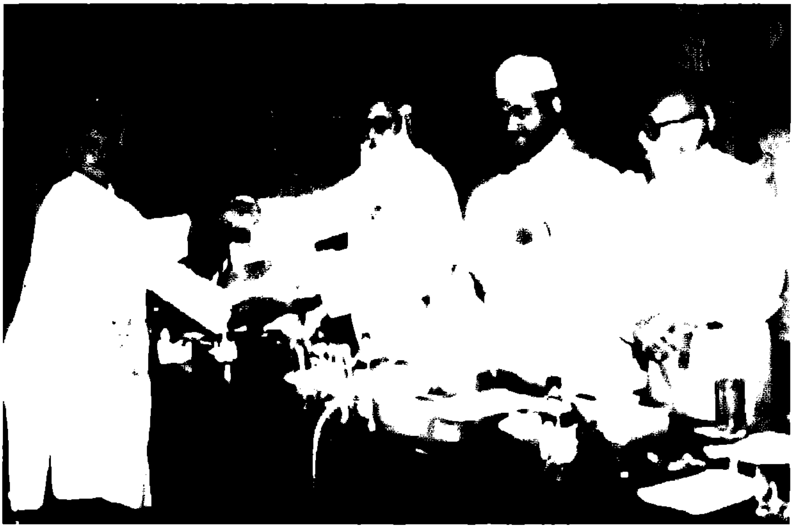

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন
কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

www.pathagar.com

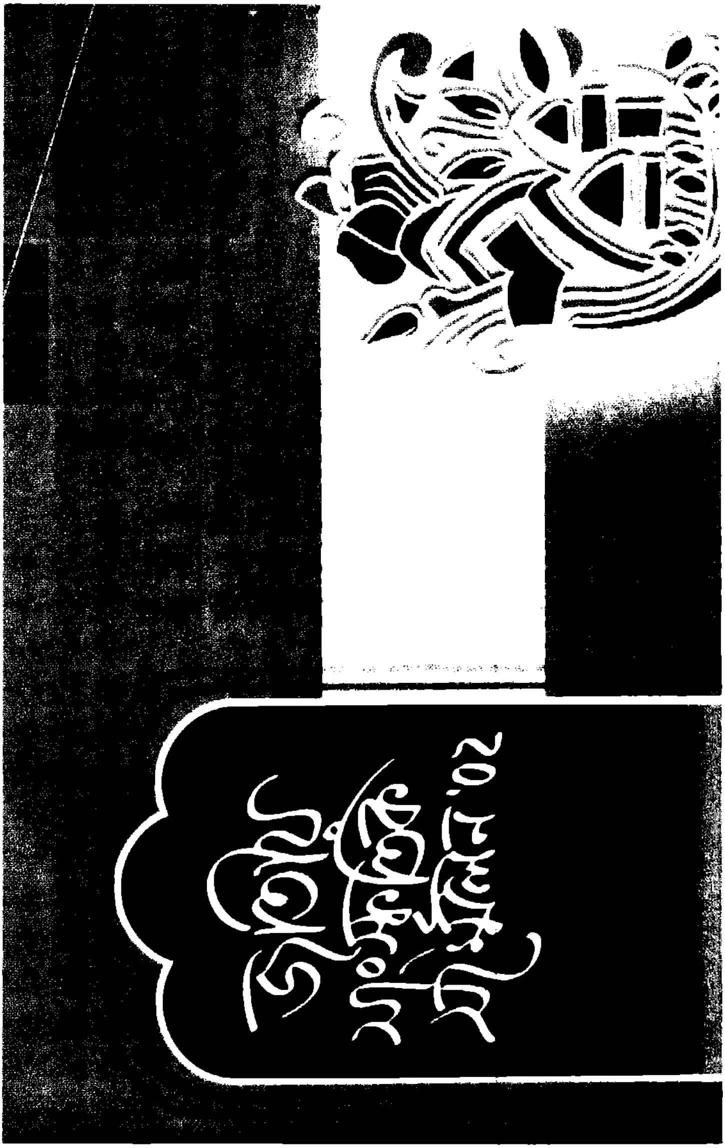

সম্মেলনের দাওয়াতপত্র

www.pathagar.com

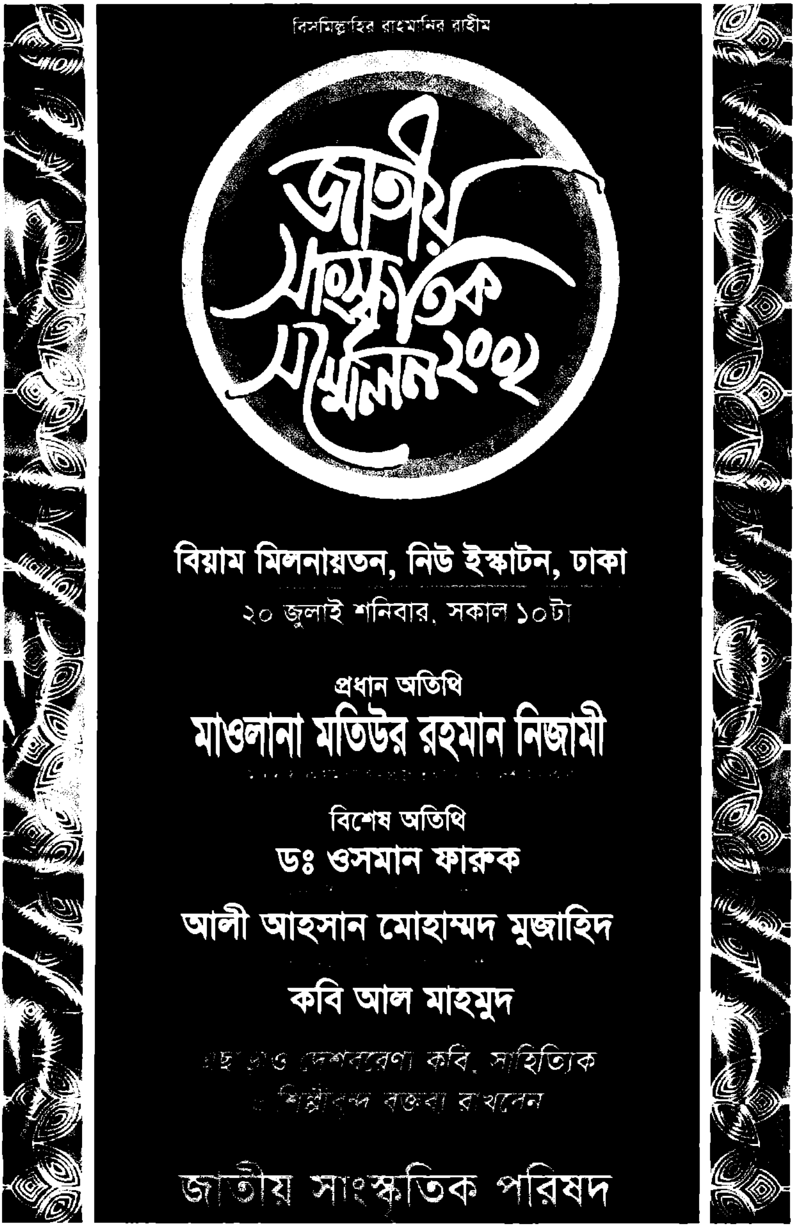

সম্মেলনের পোস্টার

www.pathagar.com

A Bank of Excellence

One of the TOP TEN BANKS in Bangladesh

ISLAMI BANK BANGLADESH LIMITED
committed to introduce a welfare-oriented banking system and establish equity and justice in the field of all economic activities, extend co-operation to the poor, helpless and low-income group for their economic uplift, play a pivotal role in human resource development and employment generation, contribute to achieve balanced growth and development of the country.

ISLAMI BANK is your reliable partner for international trade and business with three thousand two hundred ninety seven expert personnel, one hundred twenty six branches in the major cities, important urban and rural areas, out of which twenty nine are authorised to handle Foreign Exchange Business directly and two hundred twenty five banks & eight hundred thirty foreign correspondents throughout the world.

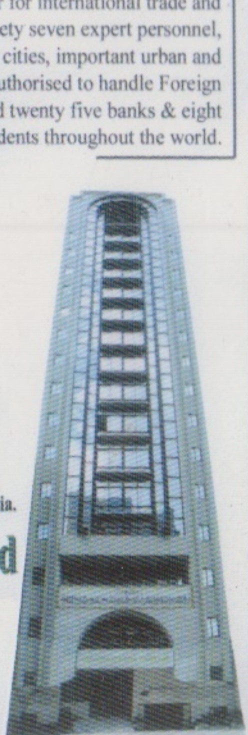

The First Islamic Shariah Based Multinational Bank in South-east Asia.

Islami Bank Bangladesh Limited

Head Office: Islami Bank Tower, 40, Dilkusha Commercial Area, Dhaka-1000
GPO BOX# 223, Phone: (02) 9563040, 9560099, 9567161-2, 9559417
Telex: 642525 IBANK BJ, 632403 IBANK BJ, 671620 IBANK BJ,
Fax: 880-2-863632, 9568634, Cable: ISLAMIBANK, SWIFT: IBBLBDDH
E-mail:- ibbl@nell.com, ibbl@agni.com, Web-site: www.islamibankbd.com